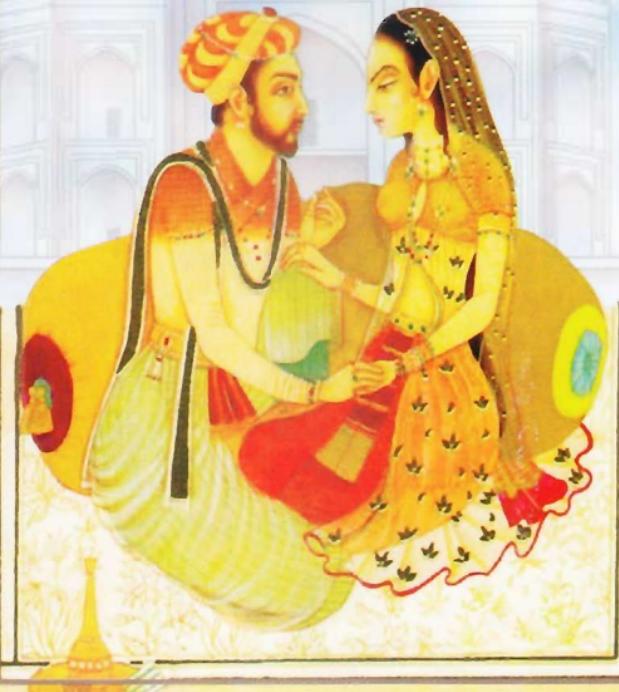


এ টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক অভ্ টাইম

# দি স্টোরি অভ্ দ্য তাজমহল

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড

অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্লোল

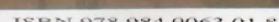


মুঃ 'মনোযোগ আকর্ষণ করে, সুখপাঠ্য... একটা চিন্তাকর্ষক কৃতিত্ব'-  
গার্ডিয়ান

মুঃ 'একটা জটিল পর্বতপ্রমাণ কাহিনী, আমি সন্দিঙ্গ আৱ কথনও এত  
সুন্দৰ করে বর্ণিত হবে'- মেইল অন সানডে

মুঃ 'গল্পটা এত সুন্দৰ করে বিবৃত হয়েছে যে কিছু কিছু অধ্যায় পাঠ  
করার সময় কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত মনে হয়...  
জনপ্রিয় ঐতিহাসিকের অর্থবহু সেরা ধারণা'- সানডে টেলিগ্রাফ

মুঃ প্রেসটনের লেখা পাঠ করা উচিত। দুর্দাত একটা খণ্কথা'-  
সানডে টাইমস।

ISBN 978 984 9063 01 8

9 789849 063018

১৬৩১ সাল, ভগ্নহৃদয় মোগল সম্রাট, শাহজাহান, তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল দীপ্তিময় আর জাঁকজমকপূর্ণ একটা স্মৃতিস্তম্ভ (মকবরা) নির্মাণের আদেশ দেন। তাদের প্রেম অসাধারণ আবেগের এক অপূর্ব কাহিনী: যদিও তিনি প্রায় সবসময়েই সন্তানসন্তুষ্টিবা থাকতেন তারপরেও মমতাজমহল প্রতিটা সামরিক অভিযানে তার স্বামীর সঙ্গী হয়েছেন, যার একটাই উদ্দেশ্য তারা যেন কখনও একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হন।

কিন্তু মমতাজ সহসাই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন, শোকে অন্ধ শাহজাহান নদী ঘমুনার তীরে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা উদ্ধৃত কিন্তু অসাধারণ স্থাপত্য কীর্তি সৃষ্টি করেন। ত্রুটিহীন প্রতিসাম্যের দীপ্তিময় একটা মকবরা তাজমহল নির্মাণে সফেদ মর্মর আর গোলাপী বেলেপাথর এবং মূল্যবান রত্নরাজির বৈভবখচিত একটা অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ হাজার শ্রমিকের শ্রম আর মোগল কোষাগারের সম্পদ মূল করে মকবরার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে প্রায় বিশ বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু শাহজাহানকে তার এই আবিষ্টতার জন্য আরো বড় মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল। আগ্রা দূর্গে নিজের সন্তান কর্তৃক অন্তরীণ অবস্থায়, নদীর অপর তীরে অবস্থিত প্রিয়তমার সমাধিসৌধের দিকে তাকিয়ে, তিনি জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। তাজমহল ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে, পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয় যা সতের শতকের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যকে অপরিবর্তনীয় অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।

তাজমহলের অন্তরালের কাহিনীর মাঝে রয়েছে গ্রীক বিশাদের ছন্দোলয়, জ্যাকোবীয় প্রতিশোধস্পৃহার সংহার রূপ এবং গ্রান্ড অপেরার আবেগময়তা। তাদের পূর্ববর্তী কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথকের দক্ষতা আবেগময় বিবরণমূলক ইতিহাসের এই কাহিনীতে অ্যালেক্স রাদারফোর্ড (ডায়ানা আর মাইকেল প্রেসটন) প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছেন যেখানে মর্মরের খ্যাতিমান স্থাপত্যের সেরা নির্দশনে তারা মানবিক মুখাবয়ৰ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~ আরোপ করেছেন।



অ্যালেক্স রাদারফোর্ড আসলে একটি ছদ্মনাম।  
বাস্তবে পর্দার আড়ালে রয়েছেন দুজন। তারা হলেন  
ভায়ানা প্রেস্টন এবং মাইকেল প্রেস্টন। এরা স্বামী-  
স্ত্রী এবং যুক্তরাজ্যের নাগরিক। এম্পায়ার অভ্যন্তরীণ  
মোগল সিরিজের পাঁচটি বই তাদের সম্মিলিত  
উদ্যোগে রচিত হয়েছে।

### অনুবাদক পরিচিতি:

#### সাদেকুল আহসান কল্লোল

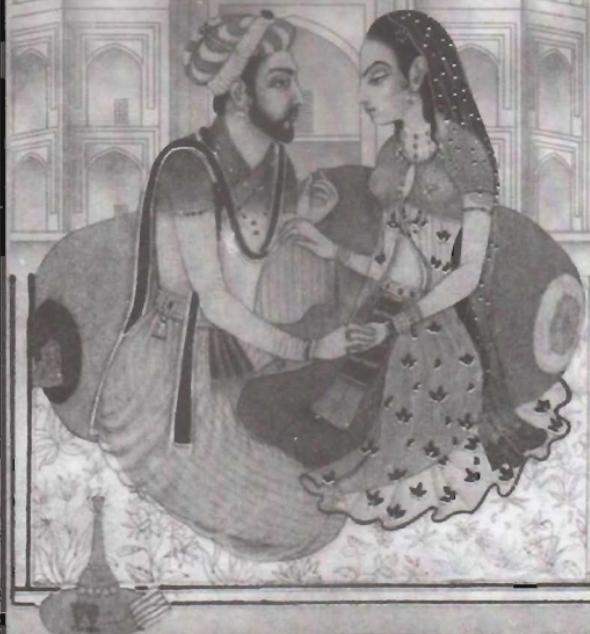
অনুবাদ সাহিত্য দিয়ে যার যাত্রা শুরু।  
হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক। নিজের আগ্রহেই শুরু  
করেছেন অনুবাদ। ইচ্ছে ইউরোপের নানা ভাষার  
উপন্যাস অনুবাদ করে সাহিত্যের একটা বিপণন  
অবস্থা চালু করা, সবার মতামত সবার কাছে পৌছে  
দিতে চাই। নরওয়ের লেখিকা- কি লিখছে আমরা  
জানি না, জানতে কিন্তু চাই তেমনি তাকেও জানাতে  
চাই আমাদের সাহিত্যের কথা। এই স্বপ্ন নিয়ে  
অনুবাদে হাত দিয়েছি। দেখা যাক কি হয়!



এ টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক অভ্ টাইম  
দি স্টোরি অভ্  
দ্য তাজমহল

# এ টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক অভ্ টাইম দি স্টেরি অভ্ দ্য তাজমহল

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড  
অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্পল



এ টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক অভ টাইম

দি স্টেরি অভ দ্য তাজমহল

মূল : অ্যাসেক্স রান্ডারফোর্ড

অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্পল

অনুবাদশত্ৰু © প্রকাশক

দ্বিতীয় প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৪২১ এপ্রিল, ২০১৪

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ২০১৩

রোদেলা ২৮৫



রোদেলা

প্রকাশক

রিয়াজ আন

রোদেলা প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)

১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচন্দ

মূল বইয়ের প্রচন্দ অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

মেকআপ

সুলিন কম্পিউটার

৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইনে পরিবেশক

[www.rokrnari.com](http://www.rokrnari.com)

মুদ্রণ

আল-কাদের প্রিস্টিং প্রেস

৫৭ ঘৰিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

---

A Teardrop on the Cheek of Time The Story of the Tajmahal  
by Alex Rutherford

Translated by Sadekul Ahsan Kolloi

First Published September 2013

Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani

11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

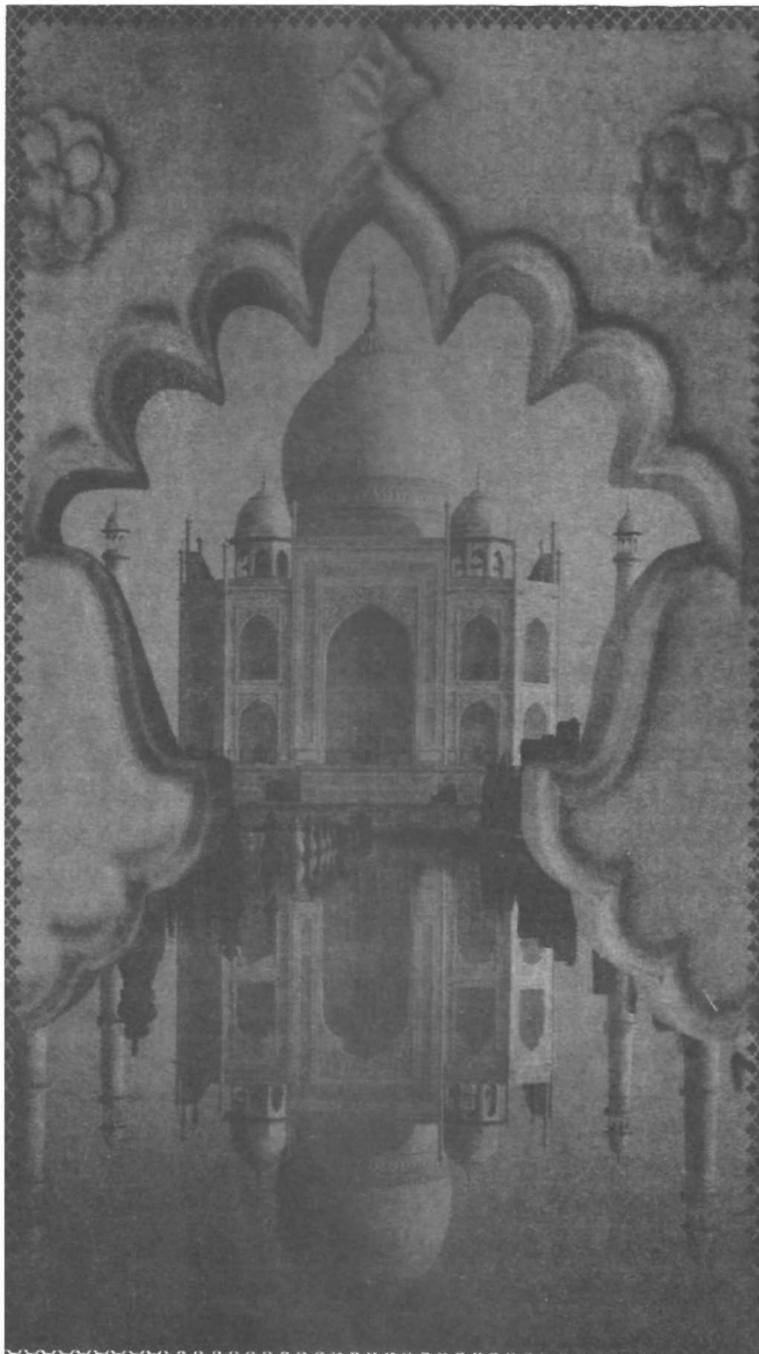
E-mail : [ro dela.prokashani@gmail.com](mailto:ro dela.prokashani@gmail.com)

Web : [www.ro dela prokashani.com](http://www.ro dela prokashani.com)

Price : Tk. 400.00 only                    US \$ 10.00

ISBN : 978 984 90630 1 8                Code : 285

অনুবাদকের উৎসগ  
স্নেহস্পাদেষ্মু রাকিবুল হাসান



## সূচি

ক্রতৃপক্ষ শীকার / ৯

বংশবৃত্তান্ত / ১১

মানচিত্র / ১৩

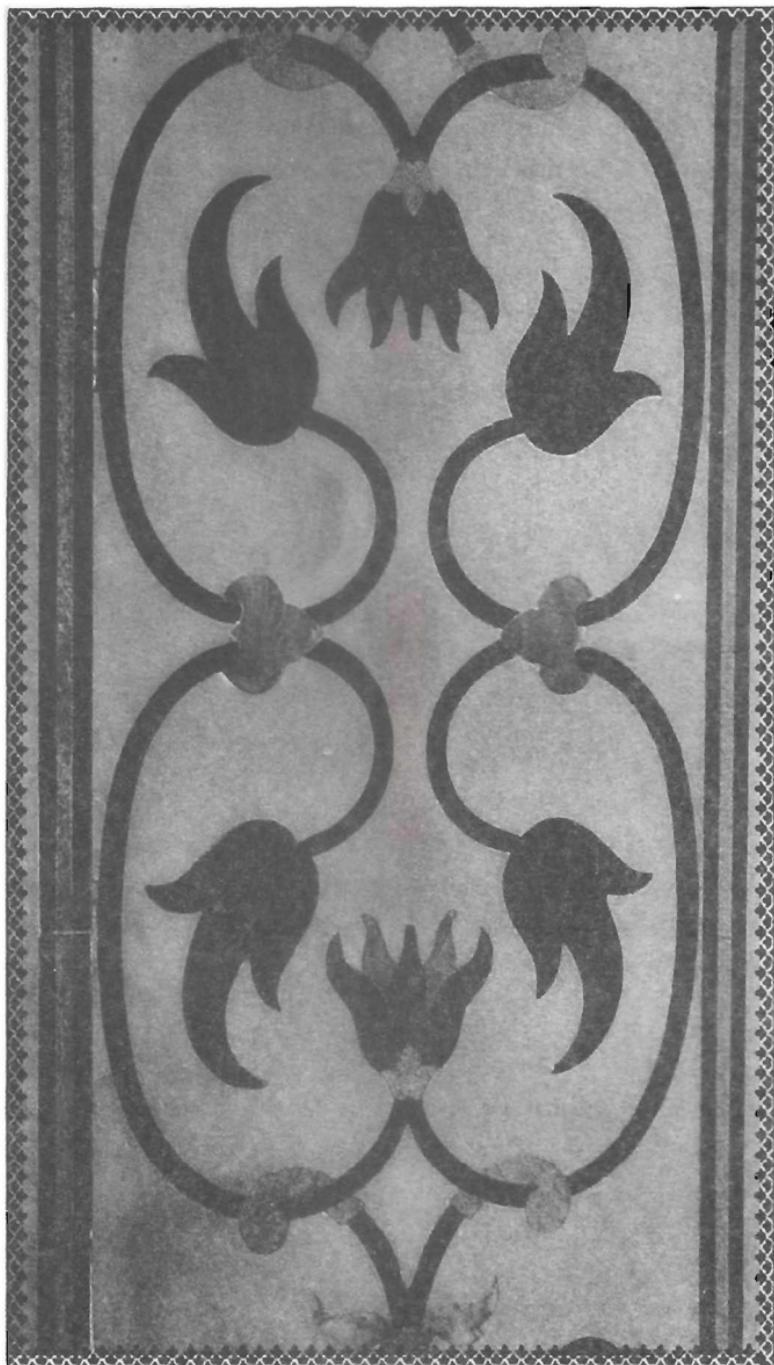
প্রারম্ভিক / ১৫

১. মুক্ত সম্বোধনের দেশ / ২৫
  ২. আশ্লাহ আকবর / ৪০
  ৩. অতুলনীয় মোতি আর চিত্তহারী উপচার / ৭১
  ৪. চম্পতি মুবরাজ / ৯৭
  ৫. পর্দার অন্তরালে অপেক্ষমাণ সন্ত্রাট / ১১৫
  ৬. প্রাসাদের আরাধ্য মালকিন / ১৩১
  ৭. ময়ূর সিংহাসন / ১৪৭
  ৮. আমার জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করবেন / ১৭৩
  ৯. যজ্ঞণার রেণুকপা / ১৮৯
  ১০. নির্মাতা এই পৃথিবীর অধিবাসী নয় / ২০৭
  ১১. এই বেহেশত-ভুল্য উদ্যান / ২৩১
  ১২. আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বলিত সমাধি / ২৪৩
  ১৩. সেই মহিমাময় মসনদ / ২৬১
  ১৪. সাপের দাঁতের চেয়েও শান্তি / ২৭৯
  ১৫. তথ্য-ই-তাউসের নিপতন / ৩০১
  ১৬. নদীর অপর তীরে তার আপন মকবরা / ৩১৫
- পুনর্ক্ষ : শেষকথার আড় কথা / ৩২৯

প্রামাণিকতার পর্থন-পাঠন অন্দেরক পাঠকের জন্য অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জি / ৩৩৩

টীকা, চিঙ্গনী আর তাদের উৎস / ৩৪০

চিত্রকর্মের চিত্রভাষ / ৩৬৬



## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভারতবর্ষে দীর্ঘসময় অতিবাহিত না করেই আমরা হয়তো এ বইটা লিখতে পারতাম। কিন্তু ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, বহুবার সেখানে ভ্রমণ করার পরও আজও দেশটা আমাদের অনুভূতিকে উদ্বেলিত করে। নয়াদিন্তে অধ্যাপক আর. সি. আগরওয়াল, আর্কিওলজিক্যাল সার্টে অব ইন্ডিয়ার জয়েন্ট ডি঱েষ্টের জেনারেল তার মূল্যবান সময় আমাদের সাথে উদারভাবে অতিবাহিত করেছেন এবং তাজমহল আর শাহজাহান এবং মমতাজ মহলের কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত অন্য স্থানসমূহে আমাদের ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আগ্রার তস্বাবধায়ক আর্কিওলজিস্ট ড. ডি. দয়ালান ও তার সহকারী এ. কে. তিওয়ারির বিশেষজ্ঞ পরামর্শের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং ড. আর. কে. দীক্ষিত, যিনি তাজের দক্ষিণ তোরণ দ্বারে অবস্থিত তার বাতাসে আপাত ভাসমান অফিসকক্ষে অধিষ্ঠিত হয়ে সেখানকার সাম্প্রতিক খননকার্য আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি সেইসাথে তাজমহল প্রাঙ্গণের পুরো এলাকাটা এবং পয়ঃপ্রণালীর খননকার্য ব্যাপকভাবে আমাদের সাথে করে নিয়ে ঘূরে দেখিয়েছেন এবং সব কিছু বাস্তব আর ঝুপকের নতুন আঙ্গিকে দেখতে আমাদের সাহায্য করেছেন। ড. কে. কে. মাহমুদ আর্কিওলজিক্যাল সার্টে অব ইন্ডিয়ার তস্বাবধায়ক আর্কিওলজিস্ট, তার সহায়তার কারণেই আমাদের পক্ষে বুরহানপুরের দুর্গপ্রাসাদ দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল, মমতাজ মহল যেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সেই জনশূন্য প্রান্তর যেখানে সাময়িকভাবে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ভারতে অসংখ্য মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তাদের স্বীকার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে দিন্তির মোগল স্মৃতিস্তু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী লুসি পেক, হিন্দু বাস্তুশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির জন্য বিভূতি সচদেব আর মোগল স্থাপত্য সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য ড. গাইলস টিলটসনের কাছে আমরা ঝুঁটী।

আলোচ্য কাহিনি অনুধাবনে অসংখ্য মোগল ইতিহাসবিদের ভাষ্য আমাদের সহায়তা করেছে। আমরা অবশ্যই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বোদলেয়ান লাইব্রেরি অব দি ইনডিয়ান ইনসিটিউটের কর্মচারীদের এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরি,

দ্য লন্ডন লাইব্রেরি এবং দ্য স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের  
সবাইকে, যারা সেই সময় তথ্যসূত্র থেকে তথ্য নির্বেশিত করতে সাহায্য  
করেছিল। আমরা সেইসাথে আরো অনেকের কাছে সমানভাবে ঝুঁটী।  
*Muqarnas*-এর সম্পাদক আমেরিকার জুলিয়া বেইলি স্থাপত্যরীতির তথ্যসূত্র  
সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। যুক্তরাজ্য ফিলিপ্পা ভন  
মোগল চিত্রকলায় রমণীদের উপস্থাপন সংক্ষে তথ্য-উপাস্ত সংগ্রহে আমাদের  
পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

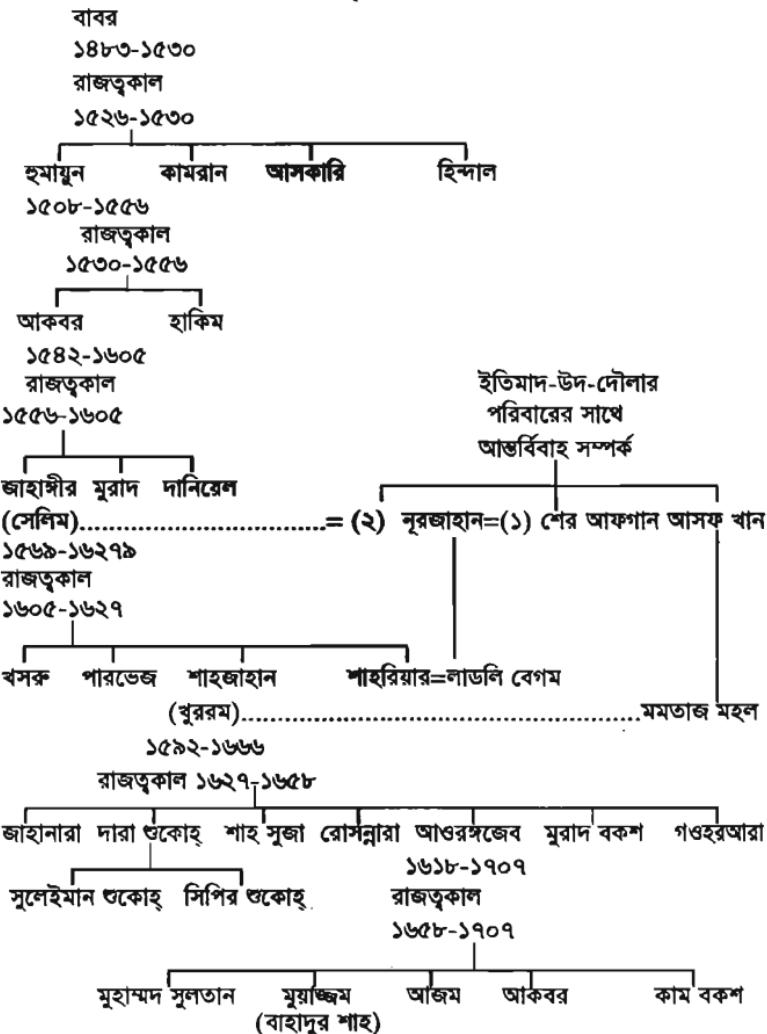
ভারতবর্ষে গবেষণার খাতিরে আমাদের দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়েছে, অনেক  
সময় দুর্গম স্থানেও যেতে হয়েছে। প্রেসেস ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনালের  
(যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র) মেহেরা ডালটন এবং তানিয়া ডালটন দক্ষতার সাথে  
আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং নয়াদিন্ত্বিতে প্রেসেসের মালা  
ট্যানডন আমাদের মূল্যবান সহায়তা প্রদান করেছেন। আমরা নয়াদিন্ত্বিতে  
ইস্পেরিয়াল হোটেল কর্তৃপক্ষের নিকট ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আর সেইসাথে  
মহেশ্বরে অহল্যা দুর্গের প্রিল রিচার্ড হোলকারের উদার অতিথিয়তার কথা  
বিশেষভাবে স্মরণ করছি। এক্সপ্লোর লিমিটেড আমাদের উজবেকিস্তানে  
সৌন্দর্যতাত্ত্বিক মোগল পূর্বপুরুষদের প্রাসাদ আর মকবরা তুলনা করার এবং  
ইরানে তাজমহল নির্মাণে পারস্যের দৃষ্টিশাহ্য প্রভাব অনুসরণের সুযোগ  
দিয়েছে।

বঙ্গদের পরামর্শ ও সমালোচনা ভূমিকা খুবই শুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা রবিন  
আর জান্টিনা বিংক, রবার্ট বিনন, চার্লি কোভেল, কিম আর শ্যারন লিউসন ও  
নেলি মনরোর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা উৎসাহ প্রদানের জন্য  
আমাদের পরিবারকে, বিশেষ করে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে তার  
গবেষণা কাজের জন্য লিলি ব্রডি-উলমানকে এবং আমাদের বাবা-মা লেসলি  
আর মেরি প্রেসটন এবং ভেরা ফেইথকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের প্রকাশকের সাহায্য আর পরামর্শ আমাদের কাছে ভীষণ শুরুত্বপূর্ণ।  
লন্ডনে ডাবললেডির মিরিয়ানা ভিলমানস আমাদের সম্পাদক মিশেল হাচিনসন  
আর সেইসাথে শিলা লি আর ডেবোরা অ্যাডামসের কাছে আমরা ভীষণ  
কৃতজ্ঞ। নিউইয়র্কের ওয়াকার বুকসের জর্জ গিবসন, সাথে পিটার মিলার ও  
মিশেল অ্যামন্ডসেনসহ তার দলের কাছে আমরা ঝুঁটী। দিন্ত্বিতে র্যানডম  
হাউজ ইভিয়ার বিবেক আউজার আমাদের মেহমানদারি আর উৎসাহ দিয়েছেন  
আর সাথে দিয়েছেন নতুন অন্তর্দৃষ্টি। সবশেষে আমরা আমাদের এজেন্ট লন্ডনে  
এ. এম. হিথের বিল হ্যামিলটনকে আর নিউইয়র্কের ইকওয়েল ম্যানেজমেন্টের  
মাইকেল কার্লাইসকে পুরোটা সময় তাদের উৎসাহ আর সমর্থনের জন্য  
ধন্যবাদ জানাই।

## বংশবৃক্ষান্ত

মহান মোগল স্ম্যাটেন্ড ১৫২৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ



\* বিবাহিত

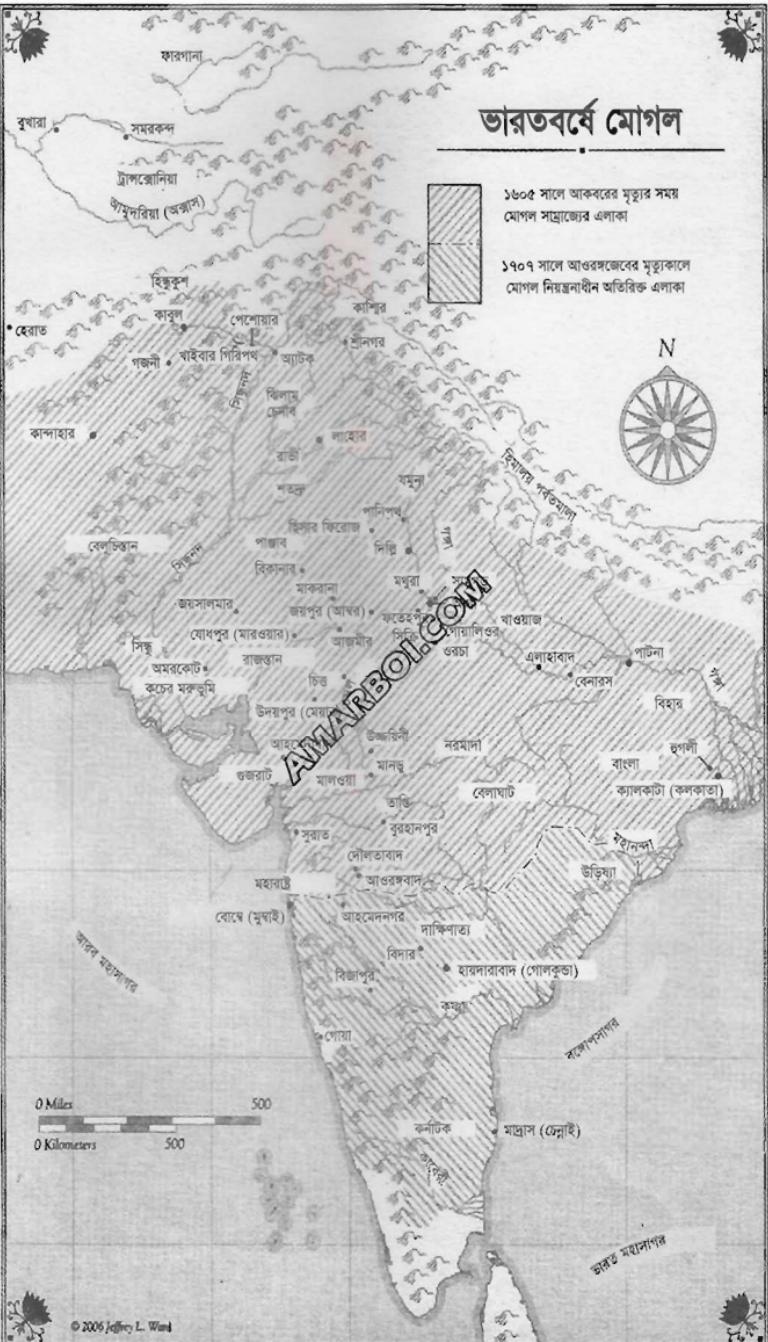
\* শাহজাহান আর মমতাজ মহলের সাত সন্তান প্রাণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিল  
টিকা : সব স্ম্যাটের একাধিক স্ত্রী ছিল

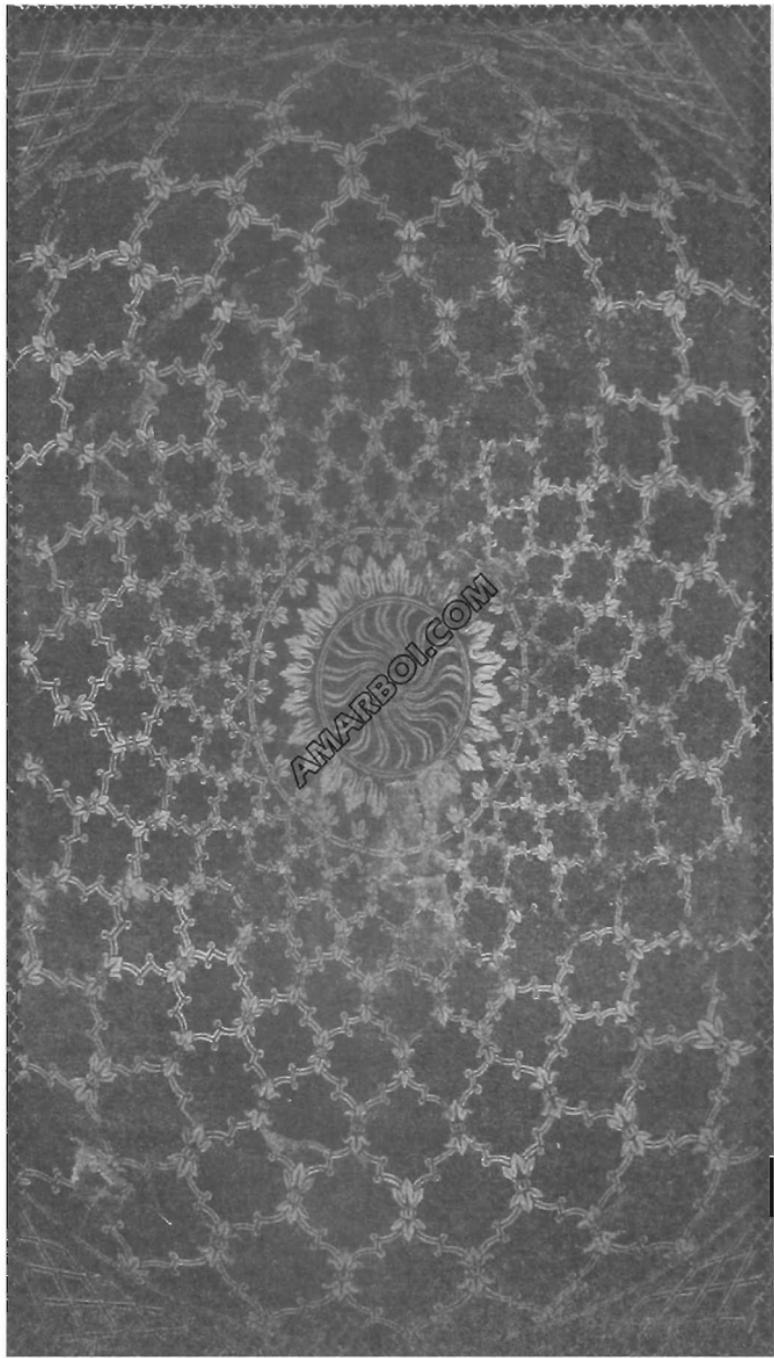
হুমায়ুনের আম্বিজনের নাম মা'সুমা

আকবরের আম্বিজন হামিদা

জাহাঙ্গীরের আম্বিজন ছিলেন আবারের অজ্ঞাতনামা একজন রাজকন্যা আবুল ফজল যার নাম  
উল্লেখ করেননি

# ভারতবর্ষে মোগল





AMARBOI.COM

## প্রারম্ভিক

দক্ষিণাত্যের উষ্ণ, ভ্যাপসা উপত্যকায় অবস্থিত ধূলিধূসরিত একটি দুর্গে এক সেনা অধিপতি নিজের সুন্দরী সালঙ্কারা আর আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর সাথে বসে শতরঞ্জ খেলার সময় আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত। সময়টা ১৬৩১ সাল। মুসলিম দিনপঞ্জি অনুসারে ১০৪০ হিজরি—আর বলার অপেক্ষা রাখে না, তারা উভয়েই মুসলমান। সহসা, গল্লিটার প্রচলিত ভাষ্য অনুসারে, একটি তীব্র ব্যথা সেনা অধিপতির সুন্দরী স্ত্রীর তলপেট খামচে ধরে। দুর্গের হেকিমকে দ্রুত ডেকে পাঠানো হয় এবং তাদের ঐকাণ্ডিক প্রয়াস সন্ত্রেও আটকিশ বছর বয়সী এই মাতার চতুর্দশতম গর্ভধারণ ক্রমেই ভীষণভাবে জটিল হয়ে ওঠে। রক্তক্ষরণের ফলে দুর্বল, তিনি শেষবারের মতো তার হতবিহুল শামীকে তাদের চিরস্থায়ী ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো দার পরিগ্রহ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। তার শেষ অনুরোধ ছিল তিনি যেন তার স্মৃতির উদ্দেশে এমন একটি মকবরা নির্মাণ করেন, যা পৃথিবীর বুকে যেমনটা তিনি স্মৃতিপুস্তিখন্দেশেন বেহেশতের মাত্রা যোগ করবে।

দরবারের রাজকীয় দিনপঞ্জির রচয়িতারা পরিবর্তী সময়ে সন্তান জন্ম দেয়ার পর তার মৃত্যুর কথাটা কয়েকটা পঞ্জিক্তৃত্বপূর্বক করেছেন :

‘যখন তিনি শেষ মোতাদী পৃথিবীর আলোয় ভূমিষ্ঠ করেন  
নিজের দেহকে তিনি বিশুকের মতো নিঃস্ব করে ফেলেন।

আমাদের সেই সেনা অধিপতি, তার শামী মোগল সন্তুষ্ট শাহজাহান, তাদের ভাষ্য অনুসারে দুই বছরের জন্য নিজেকে আড়াল করে ফেলেন, পার্থিব ভোগবিলাস এবং দৃতিময় রত্ন আর মূল্যবান পরিচছদের পরিবর্তে ধৰ্বধবে সাদা রঙের শোকের পোশাক পরিধান করেন। তার দরবারের এক সভাকবির ভাষায়, ‘তার চোখ থেকে অক্ষবিন্দু মুক্তাবিন্দু হয়ে থারে পড়ে।’ তার মাথার সব চূল এক রাতের ভেতর সাদা হয়ে যায়। তিনি তার স্ত্রী মমতাজ মহল, ‘প্রাসাদের প্রিয় পাত্রী’র আদিষ্ট স্মৃতিকে বাস্তব রূপ দিতে নিজের সমস্ত সামর্থ্য নিহিত করেন, তিনি এমন একটি মকবরা নির্মাণ করেন, যা কেবল পৃথিবীর বুকে বেহেশতকেই উপস্থাপিত করে না, একই সাথে মৃত্যুর মাঝেও বিলাসিতা আর ভোগাসক্তির একটি স্মারক হিসেবে বিরাজ করে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শাহজাহানের রাজধানী আগ্রায় যমুনা নদীর একটি বাঁকের ওপর

নির্মিত এই মকবরাকে আমরা আজ তাজমহল নামে চিনি, পৃথিবী বিখ্যাত ভালোবাসার স্মৃতিসৌধ।

তাজমহলের স্থপতি কে ছিলেন সেটা আজ আর নিশ্চিতভাবে জানার যেকোনো সুযোগ নেই কিন্তু গবেষকদের অঙ্গইন গবেষণার বিষয়বস্তু এই স্থপতি হিন্দু আর মুসলিম বাস্তুশাস্ত্রের সংশ্লেষ ঘটিয়ে, নিখুঁত প্রতিসাম্য আর মার্জিত সৌন্দর্যের একটি আকল্প শ্রেতত্ত্ব মর্মর আর গোলাপি বেলে পাথরের মাঝে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাজমহলের বিশাল আকৃতি সত্ত্বেও—প্রধান গম্বুজটা ২৪০ ফিট উচু আর এর আলম ১২০০০ টনের অধিক ভার বহন করছে। তাজমহলের মূল মকবরাকে চারপাশের সবুজ উদ্যান আর জলাধারের জলবিশ্বের ওপর আপাত নির্ভার হয়ে যেন ভেসে রয়েছে বলে মনে হয়। তাজমহলের সবচেয়ে কষ্টের সমালোচকও তাজের রূপকথাতুল্য নাজুক সৌন্দর্যে বিমোহিত হন।

তাজমহলকে সমসাময়িক কালের সবাই একবাক্যে শাশ্বত বিশ্বে স্থিরভাবে দিয়েছে। সন্দেশ শতকের এক ফরাসি পর্যটকের বীক্ষণ অনুসারে এই মকবরার হ্রান ‘বিশ্বের বিশ্বের মাঝে মিশরের পিরামিডের তুলনায় অনেক উচুতে হওয়ার দাবিদার।’ এক মোগল পণ্ডিত লিখেছেন, ‘তাজমহলের দিকে নির্নিয়মে তাকিয়ে থাকলে সূর্যের চোখও অঞ্চলারাক্ষত হয়ে উঠবে এবং এর ছায়া যেন পৃথিবীর বুকে জ্যোৎস্নার স্লিপ্ফড়া বনে আনে।’

পরবর্তীকালের দর্শকরা তাজের নির্মল, বিশুঁগু সৌন্দর্যের কারণে তাদের মাঝে জন্ম নেয়া আবেগ পূর্ণাত্মায় প্রকাশ লক্ষ্যে গিয়ে শব্দের অভাবে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি (স্যার) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তাজমহল ‘কালের কপোরে একটি অঞ্চলিন্দু।’ রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের কাছে তাজমহল ‘গজদন্তের প্রত্তোরণ, যার ভেতর দিয়ে সমস্ত শুভ স্বপ্নের আবাহন হয়; টেনিসন যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সেই ভোরের দৃতিময় পথের উপলক্ষি...যা কিছু পবিত্র, শুদ্ধ এবং অসংগত সব কিছুর মূর্ত প্রকাশ।’ এডওয়ার্ড লিয়ার রায় দেন, ‘এই অপূর্ব মনোরম স্থানের বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করাই বোকায়ি কারণ কোনো শব্দের পক্ষে এর সৌন্দর্যকে ধারণ করা সম্ভব নয়। অতএব পৃথিবীর বাসিন্দাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—একদিকে যারা তাজমহল দর্শন করেছেন আর অন্যদিকে যারা করেননি।’ একজন মহিলাই প্রথম ব্যক্তি, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তার স্ত্রী, যিনি যথাযথভাবে ভালোবাসার তীব্রতার ভীষণ সুন্দর রূপটা অনুধাবন করেছেন, যা এই মকবরার নির্মাণকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি তার স্বামীকে সহজ ভাষায় লিখেছেন, ‘আমি তোমায় বলতে পারব না আমি কী ভাবছি, কারণ আমি জানি না কীভাবে এমন একটি ইমারতের সমালোচনা করতে হয়, কিন্তু আমি তোমায় অকপটে আমার অনুভূতির কথা বলতে পারি। আমি আগামীকাল বা এখনই মরতে রাজি আছি, যদি কথা দেয়া হয় যে আমার সমাধির ওপর এমন আরেকটা মকবরা নির্মাণ করা হবে।’

আঠারো শতকের শেষ নাগাদ, ব্রিটিশ চিত্রকর টমাস দানিয়েল, যিনি প্রথম তাজমহলের কয়েকটা দারুণ চিত্রকর্ম আর ভূমি বিন্যাসের পরিকল্পনা অঙ্কন

করেছিলেন, তার পরিদর্শন শেষে লিখেছেন : ‘তাজমহলকে সব সময় বিবেচনা করা হয়...সর্বোচ্চমাত্রার একটি দর্শনীয় বস্তু...সমস্ত অঞ্চল আর সর্বস্তরের লোকজন এটা দর্শন করতে আসে।’ শতাব্দী অতিক্রান্ত হ্বার সাথে সাথে তাজের খ্যাতি কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। তাজমহল বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক স্মারক এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টি, আইফেল টাওয়ার, পিসার হেলান স্টপ, চিনের প্রাচীর, সিডনির অপেরা হাউসের মতো পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত শনাক্তযোগ্য একটি কাঠামো। একটি দখলদার রাজবংশ কর্তৃক নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এবং সেইসাথে সমস্ত পৃথিবীতে এটা ভারতবর্ষের প্রতীক হিসেবে স্থীরভাবে পেয়েছে। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজকুমারী ডায়ানা তার তৎকালীন স্বামী প্রিস চার্লসের সাথে যখন ভারত সফরে আসেন, সেই সময়ে তাজের প্রতিকৃতির ক্ষমতা এমনই যে তিনি যখন একাকী তাজ পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তার ছবি তোলার অনুমতি দেন—রাজকীয় প্রেমের একটি চিরস্মাই ইমারতের সামনে সাদা মার্বেলের একটি বেঞ্চে উপবিষ্ট, একাকী, শোকাত আর বিষণ্ণ এক প্রতিমা—তখন কোনো শব্দের আর কোনো প্রয়োজন হয় না।

তাজমহল কেবল পরম ভালোবাসার নয় একই সাথে সে বিশ্বস্ত সামর্থ্য আর প্রবল ক্ষমতার প্রকাশ। তাজমহল এমন একজন স্মার্টের সৃষ্টি, যার সম্ভাজ্য পশ্চিমে সিঙ্গুন নদ অতিক্রম করে বর্তমান সময়ের পাকিস্তান, আফগানিস্তান, পূর্বে সুবে বাংলা আর দক্ষিণে মধ্য ভারতের মাক্ষিকাত্ত্বের অধিত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। শাহজাহানের পূর্বপুরুষ, পূর্ববর্তী চারকঙ্গ সম্রাট, নাহৌড়বাদ্দার মতো নিজ অভিভাবে অটল থেকে এই বিশাল—বিপুল সমৃদ্ধ—ভূখণ্ড দখল করেছিলেন। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূখণ্ড থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালার অন্য পাশে স্থানীয় উপজাতি গোত্রের পাকিস্তানের নিজেদের মধ্যবর্তী রাজক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে বিতাড়িত হয়েছিলেন। বাবরের, প্রথম মোগল সম্রাট, তার নেতৃত্বে তারা খাইবার গিরিপথের ডেতের দিয়ে হিন্দুস্তান—উত্তর ভারত অভিযুক্ত যাত্রা শুরু করে। তারা তাদের দখলকৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেও প্রথমদিকে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সমক্ষে অনিচ্ছিত ছিল। বাবরের নাতির রাজত্বকালের পূর্বে—শাহজাহানের পিতামহ আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ সময়ে—ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্য নিরাপদ ছিল না।

স্থিতিশীলতার হাত ধরে এগিয়ে এসে ধরা দেয়া সমৃদ্ধি মোগলদের সুযোগ করে দেয় তাদের ঐতিহ্যবাহী নাম্বনিক আগ্রহ চরিতার্থ করতে। তারা তাদের পেছনে ফেলে আসা শীতল আবহাওয়ার জন্য অতীত বিধূরতায় আক্রান্ত হতেন, ঘরনা আর পানির নহর দ্বারা প্রবাহিত পানির সুন্দর উদ্যানের জন্য এবং সেইসাথে বিশামের জন্য খোলামেলা হাতেলির প্রতি তাদের ডেতের একটি দুর্বলতা কাজ করেছিল। তাজমহলের আদিরূপের সেটাই ছিল প্রথম অবস্থা এবং আজও সেইসব উদ্যানের অনেকগুলোই দেখতে পাওয়া যায়। একটি সময় সম্রাটও উৎসাহী নির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাদের নতুন ভূখণ্ডে দুর্গ আর প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন এবং নিজেদের প্রমোদ কাননের ডেতের নিজের জন্য সুন্দর মকবরা নির্মাণ করেন। তারা তাদের সাথে গম্ভুজ

নির্মাণের জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন, যা বহু বছর ধরে তারা ইসলামি আর স্থানীয় বাস্তুরীতির এক অনন্য সংমিশ্রণের ফলে তারা সৃষ্টি করেছিল। মোগল কোষাগারে স্তূপীকৃত হয়ে থাকা, ভারতবর্ষের অবিশ্বাস্য সম্পদরাশি অসাধারণ পরিশীলিত আর চমকপ্রদ ঘকবরা নির্মাণে তাদের সহায়তা করেছে। শাহজাহান আক্ষরিক অর্থেই তাজমহলকে বহুমূল্য রত্ন দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন, ঘকবরার সাদা মর্মরের পাথরে দীপ্তিময় ফুলের আকৃতি প্রশিখিত করে স্বর্গীয় আদিনিবাসের পার্থিব রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন, যেখানে মমতাজ মহল তার শোকার্ত স্থামীর সাহচর্য পুনরায় লাভ করার জন্য প্রতীক্ষা করেন।

তাজমহল মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শৈলিক অভিব্যক্তি—যার সমকক্ষ হবার সাধনা করা হলেও তাকে কথনো অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। তাজমহল নির্মাণের কারণে অবশ্য এর নির্মাতা শাহজাহানকে সর্ব অর্থেই চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে এক টুকরো বেহেশত নির্মাণ করাটা ছিল অর্থনৈতিক আর প্রাকৃতিকভাবে প্রায় অসম্ভব একটি কর্মভার। সমসাময়িক এক ইংরেজ পর্যটক লিখেছেন, ‘অত্যাধিক শ্রম আর ব্যয়ের দ্বারা ভবনটা নির্মিত হতে থাকে...সোনা আর রূপার মতো মূল্যবান ধাতুকে মাঝুলি আটপৌরি অবস্থায় নামিয়ে আনা হয় আর মর্মরে পরিণত করা হয় নুড়িপাথরে।’ তাজমহলের নির্মাণ আর মমতাজ মহলের আকস্মিক মৃত্যুর আবেগপূর্ণ প্রভাব শাহজাহানের কোষাগারকে প্রায় থালি করে ফেলে এবং রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে বিক্ষিণ্ড চিন্ত করে দেয়। মাত্রাইন রাজপরিবারে এর ফলে একটি নতুন উভেজনা দানা বাধে, শাহজাহানের নিজের পতনের ভিত্তিভূমি রচনা করে আর তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর স্ম্রাটকে আন্তর্ভুক্ত তার সাম্রাজ্যকে ধর্মীয় মৌলবাদ আর অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়, তাকে সর্বসে নিপাতিত করার মাধ্যমে।

শাহজাহান তখনো জীবিত, তিনিই তার আর মমতাজ মহলের চার পুত্রকে তার সিংহাসনের জন্য লড়াই করতে দেখে এবং এই লড়াইয়ের বিজয়ী কর্তৃর গৌড়া আওরঙ্গজেব নিজের আপন দুই ভাইকে আর শাহজাহানের বেশ কয়েকজন নাতিকে হত্যা করেন। শাহজাহান নিজেও তার জীবনের শেষ বছরগুলো আগ্রা দুর্গে অস্তরীত অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হন। বলা হয়ে থাকে, সেখানে তিনি যমুনার ওপারে অবস্থিত তাজমহলের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে তার দিন অতিবাহিত করতেন এবং আক্ষেপ করতেন, আজ যদি তাজমহলের মালকিন মমতাজ মহল বেঁচে থাকতেন তাহলে কি পরিস্থিতি এমন হতে পারত?

শাহজাহানের তিয়াস্তর বছরের জীবনের ১৫৯২ থেকে ১৬৬৬ সাল অবধি, মোগলদের জন্য একটি শুরুত্পূর্ণ পর্যায়কাল। কিন্তু একই সাথে সেটা এমন একটি সময় যখন বাইরের জগতে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে আর যার প্রভাব মোগল সাম্রাজ্যের ওপর ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্য লেপাত্তে ভেনিসীয় আর স্প্যানিশ নৌবাহিনীর হাতে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরাজয়ের শিকার হবার পরে নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করছে। তৃতীয় মেহমেতের অধীনে যিনি ১৫৯৫ সালে ক্ষমতা লাভ করার জন্য নিজের সাতাশজন আপন ভাইকে হত্যা করেছিলেন—একটি সংখ্যা, যা শাহজাহানের রাজত্বকালের অন্তিম পর্বে ভাতৃত্যার তালিকার সাথে একটি পারস্পর্যের জন্ম

দেয় এবং তার উত্তরসূরিয়া বলকানের অধিকাংশ অঞ্চল পুনরায় অধিকার করে। ১৬৩৯ সালে তারা পারস্যের কাছ থেকে, যা বর্তমানে ইরাক সেই অঞ্চল পুনরায় দখল করে নেয় এবং পারস্যের সাথে একটি স্থায়ী সীমান্তের সৃষ্টি করে। পারস্য এরপর যেকোনো ভবিষ্যৎ বিজয়ের জন্য তাদের মনোযোগ পূর্ব দিকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

পারস্য দীর্ঘদিন ধরে মোগলদের মিশ্র আর প্রতিপক্ষের ভূমিকায় পর্যায়ক্রমে অবর্তীণ হয়েছে। পারস্য স্ম্যাট পূর্ববর্তী মোগল স্ম্যাটদের প্রয়োজনের মুহূর্তে সমর্থন দিয়েছেন কিন্তু অতি সম্প্রতি নতুন সাফাবিদ রাজবংশের অধীনে তারা বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান এবং উৎসাহিত করতে শুরু করেছেন এবং মোগলদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত স্থানান্তরের বিরোধিতা করছেন। মধ্য এশিয়ায় তাদের যায়াবর উৎসাহ সন্ত্রেও মোগলরা তাদের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের জন্য পারস্যের মুখাপেক্ষী ছিল। স্ম্যাট আকবর দরবারের ভাষা হিসেবে ফার্সি কীর্তি দিয়েছিলেন এবং রাজপরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অমাত্যরাও ফার্সি গদ্য আর পদ্য রচনায় বেশ দক্ষ ছিল।

মোগলরা পারস্যকে দক্ষ জনশক্তির আধার হিসেবে বিবেচনা করত। অনেক মোগল অমাত্য, সেনাপতি আর চিকির, যারা পারস্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা ফার্সি বংশোদ্ধৃত ছিলেন। আমানত খান ছিলেন প্রথমোক্তদের অন্তর্গত, শিরাজ থেকে আগত চারলিপিকর, শাহজাহান কর্তৃক তাজমহলের কারুকাজে স্বাক্ষরের অনুমতি লাভকারী একমাত্র ব্যক্তিগত মহাতাজ মহল নিজে ছিলেন শেষোক্তদের অন্তর্গত, তার পিতামহ মাঝে কয়েক দশক পূর্বে কপৰ্দকশূন্য অবস্থায় পারস্য থেকে অভিবাসী হিসেবে মোগল দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই অবস্থা থেকে শাহজাহানের আকবাজান জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী বা উজিরের পদবর্ধনায় উন্নীত হয়েছিলেন।

শাহজাহানের জীবদ্ধশায় ইউরোপের বলিষ্ঠ পরিবর্তন ঘটে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ভেতরে ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়। ত্রিশ বছরের মুদ্রের পরিণতি জার্মানিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে দুইশ বছর পর প্রশিয়ার সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলেই কেবল এ পরিস্থিতির অবসান ঘটবে। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ফ্রান্স অবশ্য চতুর্দশ মুইয়ের রাজত্বকালে ক্ষমতার শিখারে আরোহণ করবে, যার কেন্দ্রীয় হৈরাচারী দরবারের সাথে মোগল দরবারের অনেক মিল রয়েছে এবং মোগলদের মতো তিনিও স্ম্যাটের দিব্য অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী ইংল্যান্ড অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ছিল না এবং ১৬৪৯ সালে প্রথম চার্লসের বিচার আর প্রাণদণ্ড, তার পরিবর্তে নীতিবাচীশ একটি প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি করে, যা ১৬৬০ সালে পার্লামেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৬০৭ সালে ইংরেজরা আমেরিকার ভার্জিনিয়ার জেমস্টাউনে তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, সে বছরই মহাতাজের সাথে শাহজাহানের বাগদান সম্পন্ন হয়। ১৬৬৪ সালে, শাহজাহানের মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে, ডাচদের কাছ থেকে তারা নিউ আমেরিকার শহর অধিকার করে এর নতুন নামকরণ করে নিউইয়র্ক। ডাচরা প্রাচ্যে তাদের একচেটিয়া আর দ্রুত বিকশিত হতে থাকা মসলার ব্যবসার মাঝে

সাম্রাজ্য পুঁজে পাবার চেষ্টা করে, যেখানে তারা ১৬১৯ সালেই বাটাভিয়ায় (জাকার্তা) ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির সদর দপ্তর স্থাপিত করেছে।

স্প্যানিশরা মধ্য আৱ দক্ষিণ আমেরিকায় বহু দিন ধৰেই কৃতৃ কৰছিল। শাহজাহানের মৃত্যুবরণের সময়েই তারা অবশ্য হতগোৱৰ একটি শক্তিৰ ভাগ্য বৰণ কৰতে চলেছে। তারা তাদেৱ সমসাময়িক মোগলদেৱ মতোই ধন-সম্পত্তিৰ লোভ আৱ রাজকীয় আমলাতঙ্গেৰ প্ৰভাৱ মুক্ত একটি স্বাধীন ব্যবসা পদ্ধতি গড়ে তুলতে ব্যৰ্থ হয়েছিল। ১৬৫৫ সালে ইংলিশ প্ৰজাতন্ত্ৰ স্পেনেৰ কাছ থেকে জ্যামাইকা দখল কৰে নেয় এবং সেখান থেকে এৱপৰ তাদেৱ প্ৰাইভেটিয়াৰ বা জলদস্যুৱা স্পেনেৰ ধনসম্পদ সুট শুল্ক কৰে। সৰ্বনাশেৰ ঘোলকলা পূৰ্ণ হয় যখন স্বাধীন ইংৱেজ ব্যবসায়ীৱা স্থানীয় স্প্যানিশ বণিকদেৱ স্পেনেৰ শুল্কব্যবস্থাৰ বিধি-নিষেধেৰ বাইৱে ব্যবসা কৰতে সহায়তা কৰা শুল্ক কৰে। ইংৱেজৱা বিশ্বেৰ অন্যান্য স্থানেও তাদেৱ নিজস্ব ঘৰানার মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়ে হাজিৰ হয়। ১৬১৯ সালে তারা ভার্জিনিয়ায় প্ৰথম নিয়ে আসা কৃষ্ণাঙ্ক কৃতদাসদেৱ জন্য আফ্ৰিকায় স্থানীয় শাসকদেৱ সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ইস্ট ইন্ডিজে ডাচ আৱ স্প্যানিশদেৱ একচেটিয়া ব্যবসায় ভাগ বসাতে শুল্ক কৰে।

শেকসপিয়াৰ এবং তাৱ সমসাময়িকৱা যেমন ক্ৰিস্টোফাৰ মাৰ্লো ‘ভাৱত’-এৱ কথা যখন উল্লেখ কৰেন সেটা তাদেৱ কাছে ছিল মসলা আৱ মূল্যবান রঞ্জেৰ বিবিধ ঐশ্বৰ্যেৰ সমাৰ্থক। ব্ৰিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি ১৬০০ সালে রাজকীয় ফৰমান লাভ কৰেছিল এবং ভাৱতবৰ্ষেৰ পৰ্যাপ্ত উপকূলে যেখানে ১৫১০ সাল থেকে পৰ্তুগিজৱা অবস্থান কৰছিল স্থানে প্ৰথম বাণিজ্য শুল্ক কৰে। মোগল দৱাবাৱে ব্ৰিটিশ আৱ পৰ্তুগিজৱা অবশ্য কেবল মামুলি পৰ্যবেক্ষকেৱ ভূমিকা পালন কৰত। শাহজাহানেৰ জুকোজান জাহাঙ্গীৱেৰ প্ৰতিকৃতিৰ একটি অনুচিত্রে তাকে পৃথিবীৰ শাসক হিসেবে দেখানো হয়েছে। ইংল্যান্ডেৰ প্ৰথম জেমসকে নিচেৰ অংশে একটি গোণ অবস্থানে শুল্কুলীন অবস্থায় দেখানো হয়েছে। চিত্ৰে তাৱ চেহাৱা খানিকটা খিটখিটে দেখায় যদিও জাহাঙ্গীৱেৰ চেয়ে তাৱ কাপড় আৱ দেহ তুলনামূলকভাৱে ছোট, সামান্য পৰিমাণ মুক্ত আৱ রত্ন তাৱ দেহে শোভা পাচ্ছে।

স্থাপত্যৱীতিৰ ক্ষেত্ৰে রোমে সেন্ট পিটাৰ্সেৰ নিৰ্মাণ যখন মাত্ৰ সমাপ্ত হয়েছে তখন শাহজাহান জন্মহণ কৰেছেন এবং ক্ৰিস্টোফাৰ ওয়াৰ্ন তাৱ সেৱা স্থাপত্যকৰ্ম লভনে পৃথিবীৰ প্ৰথম প্ৰটেস্ট্যান্ট ক্যাথিড্ৰাল সেন্ট পলসেৰ নিৰ্মাণেৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰেছেন, তখন তিনি মৃত্যুবৰণ কৰেন। সেন্ট পিটাৰ্সেৰ সাথে পৱৰত্তী সময়ে বাৰ্নিনিৰ নকশা কৰা পিয়াজ্জা এবং যা নিৰ্মিত হয়েছিল শাহজাহানেৰ জীবনেৰ শেষ দশকে, পুরোটাকে চাৰপাশ থেকে বেষ্টন কৰাৱ মতো বিশাল ছিল তাজমহলেৰ প্ৰাকাৱবেষ্টিত এলাকাটি। ভূমি থেকে ৩৬৫ ফিট উচু সেন্ট পলসেৰ তুলনায় তাজমহল ২৪০ ফিটেৰ চেয়ে সামান্য কিছুটা উচু কিষ্ট সেন্ট পলসেৰ পদচিহ্ন অনেক ক্ষুদ্ৰ। পাৱস্যেৰ দক্ষিণে অবস্থিত ইসফাহান শহৱে শাহ আবকাস ১৬১১ থেকে ১৬৩০ সালেৱ ভেতৱ দারুণ সুন্দৰ শাহ মসজিদ নিৰ্মাণ কৰেছিলেন। তাজমহলেৰ সাথে এই মসজিদেৱ, বাইৱেৰ আৱ ভেতৱেৰ স্তৱেৱ মাৰো ওজন সাশ্রয়ী শূন্যস্থান, বিশাল ক্ষীতি দিত্বা

বিশিষ্ট গম্ভুজ, যার অতিকায় আয়তাকার ইবান—প্রবেশপথ থেকে খানিকটা সারিয়ে নির্মাণ করা খিলানের কাঠামো—মকবরার সম্মুখভাগকে বিশিষ্টতা দান করেছে, নানা স্থাপত্যবিষয়ক মিল দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাজমহলের সাদা মর্মরের উপলব্ধ বর্ণময় প্রশান্তির সাথে পারস্যের মসজিদের নীল, হালকা হলুদ আর সবুজ টালি দিয়ে আবৃত নকশার প্রাচুর্যের একটি বৈপরীত্য রয়েছে এবং এটা থেকেই বোঝা যায় মোগল ইমারতের নকশা আর অলংকরণে পারস্যের অভিবাসীদের অব্যাহতভাবে নিয়োজিত করা সত্ত্বেও মোগল স্থাপত্য পারস্যের প্রভাব থেকে কতটা সরে এসেছিল।

শাহজাহানের জীবন্ধুর ক্যারাভাঙ্গিও, ভেনাস কুয়েদ, রুবেনস ছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীদের অঙ্গর্গত কিন্তু রেম্ব্রান্ট চিত্রশিল্পী ছাড়াও মোগল চিত্রকলা পরিলেখের সবচেয়ে বড় সংগ্রাহক। রেম্ব্রান্ট এসব চিত্রকর্মের ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য খসড়া নকশা এঁকেছিলেন এবং আপাতভাবে মনে হয় চিত্রকর্মগুলোতে প্রদর্শিত অলংকারগুলোর প্রতি তার আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। শাহজাহানের চিত্রকরদের অঙ্গিত চিত্রকর্মে, যারা তার আক্ষাজন জাহাসীরের দরবারে আগত ইউরোপীয় প্যটকদের উপহার দেয়া চিত্রকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, রেম্ব্রান্ট নকল তৈরি করতেন। আর এটা নিঃসন্দেহে একটি উদাহরণ হতে পারে, কীভাবে এমনকি তথনো শৈলিক প্রভাব পুরো পুরিবীব্যাপী পরিভ্রমণ করত। উৎকৃষ্ট স্বদেশি প্রেমে আপুত ইউরোপের ঐতিহাসিকরা তাজমহলের মানুষ্য সমক্ষে ওয়াকিবহাল থাকায় অচিরেই তারা দাবি করতে শুরু করেন; তাজমহলের কম দামি পাথরের প্রনিহিত জটিল নকশা এবং সম্ভবত এর আকল্প ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত বা এমনকি হয়তো তাদেরই সৃষ্টি তাজের মূল উৎসবিন্দু সম্পর্কে এমন রেষারেষি আজও বিদ্যমান। অঙ্গকল ভারতবর্ষে অনেকে এমন দাবিও করে যে, তাজমহল নির্মাণে ইসলামি আর হানীয় প্রভাবের মোগল সংশ্লেষের বদলে পুরোটাই বরং হিন্দুদের কৃতিত্ব। অন্য আরেক দলের দাবি এটা পুরোপুরি মুসলমানদের সৃষ্টি তাই শরিয়া আইনের অধীনে এর রক্ষণাবেক্ষণ হওয়া উচিত।

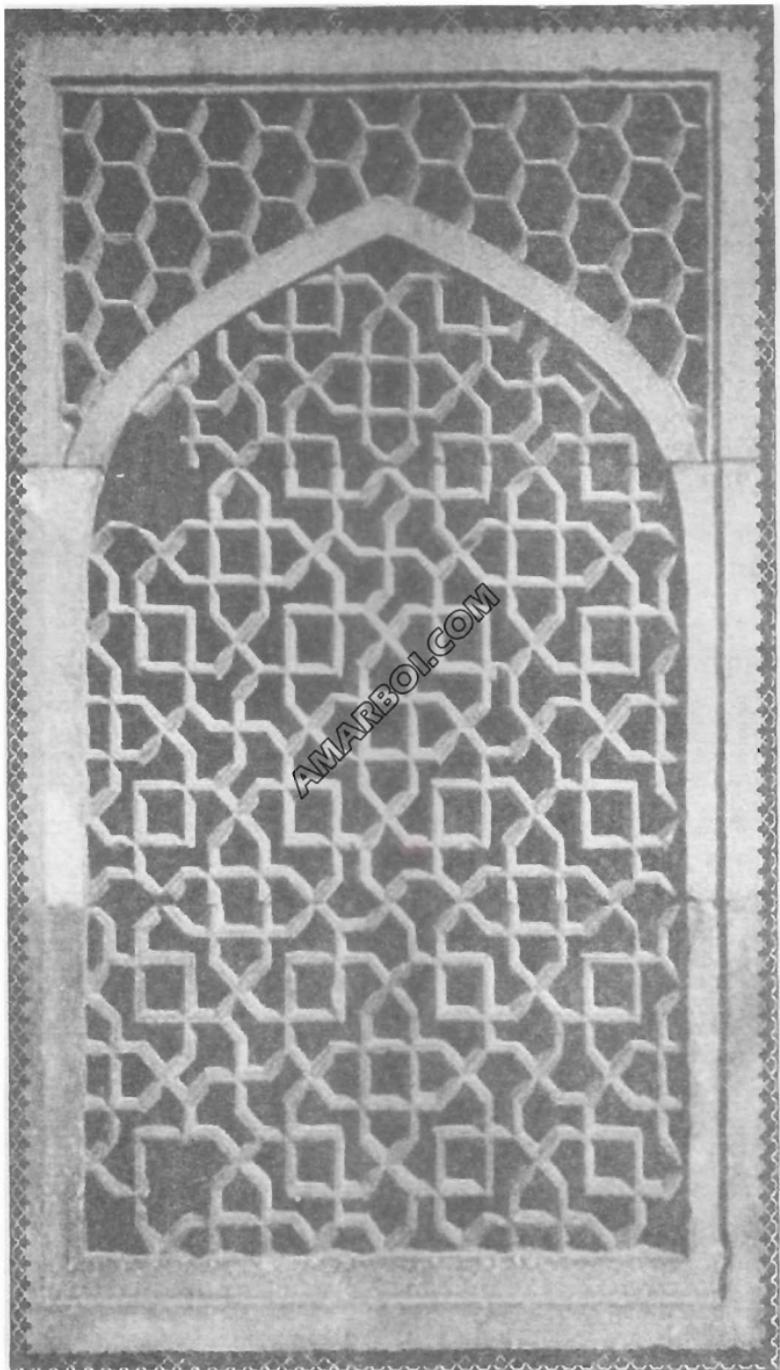
ইউরোপে মোগলদের সমকক্ষ যারা তাদের চেয়ে সম্ভবত তারা নিজেরাই নিজেদের বিস্তরিত জীবনযাত্রা নথিবদ্ধ রাখতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। স্মার্ট বাবর আর জাহাসীর রোজনামচা লিখতেন। আকবর আর শাহজাহান তাদের রাজত্বকালের প্রতিদিনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে দরবারে দিনপঞ্জি রচয়িতা নিয়োগ করেছিলেন এবং বিশেষ যত্নশীল ছিলেন সেগুলো আবেক্ষণ আর অনুমোদনের বিষয়ে। অনেক অমাত্যও রোজনামচা লিখতেন। রাজপরিবারের অধিকাংশ রোজনামচা আর অন্যান্য স্মৃতিকথা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সাধারণ মানুষ 'মহান মোগল'দের রূপকথার মতো জীবন কাহিনী শুনতে আগ্রহী হওয়ায় ভারতে আগত ইউরোপীয় প্যটকদের পুস্তকাকারে প্রকাশিত ধারাভাষ্যের সাথে একত্রে এসব দিনপঞ্জি আর ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা মুসাবিদা করা হলে রাজপরিবারের একটি বিস্ময়কর রকমের অন্তরঙ্গ আর বহুবর্ণ দৃশ্যকল্প ভেসে ওঠে, যার মধ্যে তাজমহলের সৃষ্টির বর্ণনাও পাওয়া যায়।



রেমব্রান্ড অঙ্কিত জনৈক মোগল শাসকের খসড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

তাজমহল আর তাকে সৃষ্টিকারী যে ভালোবাসা তার সাথে গ্রান্ত অপেরার পরিণত আবেগ আর গ্রিক ট্র্যাজেডির ছন্দ স্পন্দন পাওয়া যায়। তাজমহল হলো হারেমের রেশমের পর্দার পেছন থেকে দরবারের রাজনীতিতে কর্তৃত্বকারী ক্ষমতাশীল মহিমাময় নারী, ঈর্ষাঞ্চিত পুত্র, উদ্ধৃত গোত্রপতিদের অচেনা দুনিয়ার বিপরীতে আপুতকারী ভালোবাসার গন্ধ। একশ মিলিয়ন লোক অধূমিত একটি সম্রাজ্যের ভাগ্য রাজপরিবারকের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে পুত্র পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায়, ভাই অবলীলায় ভাইকে হত্যা করে এবং স্ম্রাজ্জী আর কেবল স্ম্রাজ্জী একসাথে পরম্পরের বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত আর চক্রান্তে লিঙ্গ হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও দৃতিময় ঐশ্বর্যের অবগুঠন, সর্বময় কর্তৃত্ব আর স্থিতিশীল দৃশ্যপট কোনোভাবেই আবেগের একান্ত ব্যক্তিগত কিন্তু সার্বলোকিক প্রকৃতিকে অস্পষ্ট করতে পারেনি, যা তাজমহল সৃষ্টি করেছে। তাজমহলের সাথে সৌন্দর্য, ভালোবাসা আর শোকের প্রকৃতি সমন্বে সময় আর সংক্ষার ছাপিয়ে যাওয়া কিছু প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে, আর সেইসাথে স্পর্শাত্তীত এসব শুণাৰলিকে কি আদৌ সত্যিকার আর চিৰস্থায়ী পার্থিব অভিব্যক্তি দেয়া সম্ভব সে সম্পর্কিত অনুচিত্নন।



## প্রথম অধ্যায়

### মুঝ সম্মোহনের দেশ

বাবর যদিও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তবে তার নিজের আবাজান ছিলেন মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের পূর্বে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্য ফারগানার রাজা। বাবরের ভাষায়, তিনি ছিলেন 'স্তুলকায় এবং খর্বাকৃতি...' তিনি তার আলখাল্লা এত আঁটসঁট করে পরিধান করতেন যে, দড়ি বাঁধার জন্য তাকে শাস টেনে পেট ভেতরের দিকে চেপে রাখতে হতো। যদি তিনি শাস ছেড়ে দিতেন তাহলে অনেক সময়ই দড়িগুলো ছিড়ে যেত।' তিনি ছিলেন 'সাহসী এবং বীর, মার্জিত-স্বভাবের, খানিকটা বাচাল আর তার সঙ্গ দারুণ ছিল। তার ঘূসিতে অবশ্য দারুণ জোর ছিল এবং তার ঘূসি খেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। নিজের ভূখণ্ড বৃক্ষের জন্য তার আর অনেক বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়।' ১৪৯৪ সালের ৮ জুন, খর্বাকৃতির গাটাগোটা এই মানবজীবন তার প্রাসাদের দেয়ালের ওপর অবস্থিত চবুতরা পরিদর্শন করছিলেন তখন দেয়ালের নিরাপত্তামূলক অংশ ভেঙে গিয়ে তাকে আর তার চরুকুলরাকে নিচের গিরিখাদে আছড়ে ফেলে। বাবর এরপরে লিখেছেন, এভাবেই 'আমার বয়স যখন বারো বছর আমি ফারগানা নামক রাজ্যের শাসকে পরিণত হই।'

বর্তমানকালের উজবেকিস্তান আর আফগানিস্তানে অবস্থিত বেশ কয়েকটা সুন্দর রাজ্যের একটি ফারগানা, যার শাসকরা ক্রমাগতভাবে নিজেদের ভেতর লড়াই করতেন দুটো পূর্ববর্তী রাজবংশের—চেঙ্গিস খান আর তৈমুর—বিখ্যিত উজ্জরাধিকারের বৃহত্তর অংশ কৃষ্ণগত করতে। প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকদের সবাই একটি না একটি রাজবংশোদ্ধৃত কিন্তু বাবর উভয় রাজবংশ থেকে উত্তৃত বলে দাবি করতে পারতেন। বাবর তার আম্বিজানের দিক থেকে কিংবদন্তিতুল্য চেঙ্গিস খানের সরাসরি বংশধর। মঙ্গোলীয় সমভূমির স্থানীয় এক সর্দারের পুত্র, চেঙ্গিস খানের যখন জন্ম হয়েছিল বলা হয় যে তিনি তার হাতের মুঠোয় রক্ষের একটি দলা খামচে ধরে ছিলেন, যা ছিল তার যোদ্ধা নিয়ন্তির প্রতীক। ১২২৭

সালে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি 'মহাসাগরবৎ শাসক' হিসেবে পরিচিত। তিনি আর তার যায়াবর অশ্বারোহী বাহিনী বেইজিং থেকে দানিয়ুব পর্যন্ত পরিচিত পৃথিবীর অর্ধেকটা অভিহরণ করেছেন।

তৈমূর ছিলেন তার আক্রান্তের দিক থেকে বাবরের প্র-প্র-প্রপিতামহ। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি তার ভাকনাম 'তৈমূর দা লেম'-এর অপভংশ থেকে তৈমূরলঙ্ঘ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন; তিনি ছিলেন যায়াবর বারলাস তুর্কিদের সর্দার যিনি বাবরের জন্মের একশ বছর পূর্বে আরো একবার চিনের সীমান্ত থেকে তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার রাজধানী ছিল উপকথাখ্যাত সমরকন্দের সোনালি শহর। তার পূর্বে চেঙ্গিস খানের মতো, তৈমূরের সম্রাজ্যও তার মৃত্যুর পর একজন উত্তরাধিকারীর হাতে ন্যস্ত হবার বদলে পরিবারের ভেতর ভাগ হয়ে যায়; ফলে দ্রুত সম্রাজ্যটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

বাবর তার মোঙ্গল উত্তরাধিকারীর চেয়ে তার তৈমূরীয় পরিচয়ের জন্য বা যাকে তিনি তার তুর্কি বংশক্রমাগম ভাবতেন বেশি গর্বিত ছিলেন। তার মন্তব্য যে 'মোঙ্গলরা যদি দেবদৃতদের বংশও হতো তার পরও তারা একটি জঘন্য জাতি হিসেবেই পরিচিতি পেত' তাদের সম্বন্ধে তার ধারণাকে প্রকাশ করে এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই অপমানিতবোধ করতেন যে ভূরতবর্ষে তিনি যে রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন সেটা ফার্সি মোঙ্গল শাসকের অপভংশ থেকে 'মোগল' হিসেবে পরিচিত হয়।

সে যাই হোক, তার মোঙ্গল পিতৃসন্মত বাবরকে তার শাসনকালের বয়ঃসন্ধির শুরুর বছরগুলোতে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি পর্দার নেকাবের পেছন থেকে মোগল সম্রাটদের পথপ্রদর্শনকারী প্রথম মহিলা কিন্তু কোনোভাবেই তার পরেই এই রীতি শেষ হবে না, তার পৌত্রের ভাষ্য অনুসারে তিনি ছিলেন, 'বৃদ্ধিমতী আর দারুণ পরিকল্পনাকারী। তার সম্মতি নিয়েই বেশির ভাগ সমস্যার সিদ্ধান্ত নেয়া হতো।' তার তত্ত্বাবধানেই বাবর তিনি বছরের ভেতরে সমরকন্দ দখল করে, কিন্তু তার শাসন মাত্র একশ দিন স্থায়ী হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, কিংবদন্তিত্ত্ব সোনালি শহরের দখল হারাবার কষ্ট সহ্য করা 'আমার জন্য কঠিন ছিল। আমি একদম বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদেছিলাম।' তিনি অবশ্য, তিনি বছরের কম সময়ের ভেতরে, ১৫০০ সালের জুলাই মাসে, পুনরায় সমরকন্দের ওপর অধিকার কায়েম করেছিলেন।

বাবর এই মধ্যে বিয়ে করেন কিন্তু অভিজ্ঞতাটা তিনি উপভোগ করতে পারেন না। 'বিয়ের পরে শুরুর দিকের দিনগুলোতে আমি ভীষণ লাজুক ছিলাম, আমি দশ, পনেরো বা বিশ দিন পরে তার কাছে যেতাম। আমি একটি পর্যায়ে তার প্রতি একেবারেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলি...চালুশ দিনে একবার আম্বিজান আমার রসদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের কঠোরতায় তার কাছে ঠেলে পাঠাতেন।' বাবর

শীকার করেছেন যে, বাবুরি নামে বাজারের এক ছেলের প্রতি কৈশোরের প্রেমভাব জাগ্রত হওয়ায় তার ভালোবাসা অন্যত্র নিবন্ধ ছিল : 'তার জন্য আমার ভেতর বিচিত্র একটি টান সৃষ্টি হয়েছিল—তার জন্য আমি নিজেকে কেমন খেলো করে তুলেছিলাম। এই অভিজ্ঞতার পূর্বে আমি কারো জন্য কখনো কোনো আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিনি। বাবুরি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত কিন্তু আমি এত লাজুক ছিলাম যে আমি কখনো তার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না, তার সাথে খোলামেলা কথাবার্তার প্রশ্নই ওঠে না। সংগতিগৃহ আলাপচারিতার কোনো সম্ভবনাই ছিল না।' বাবরের স্ত্রী তাদের বিয়ের প্রায় তিন বছর পরে তাকে পরিত্যাগ করতে তিনি লিখেছেন, 'তার বড় বোনের প্ররোচনায়।'

সমরকন্দে বাবরের দ্বিতীয়বারের শাসনকাল তিনি তার প্রতিপক্ষের কাছে শহর পরিত্যাগ করে গুটিকয়েক অনুসারী নিয়ে শহর ত্যাগে বাধ্য হবার পূর্বে এক বছরের কম সময় স্থায়ী হয়েছিল। তার সৌভাগ্যের এটা ছিল নিম্নতম বিন্দু। তিনি পরবর্তী সময়ে শীকার করেছেন, 'পাহাড় থেকে পাহাড়ে গৃহহীন, যায়াবরের ন্যায় বিচরণের স্বপক্ষে বলার মতো কিছুই নেই।' তিনি তারপর জানতে পারেন যে কাবুল, আরেকটি পুরুষানুক্রমিক তৈমূরের এলাকা। সেখানে পূর্ববর্তী শাসকের, বাবরের চাচাদের একজন, মৃত্যুর কারণে একজন বহিরাগত সের্বিসের কর্তৃত দখল করেছে। বাবর যদি শহরটা দখল করতে পারেন তাহলে যে কারো মতো তারও শহরটার ওপর জোরাল দাবি রয়েছে। বাবর অগ্রসর হতে শুরু করায় তার বাহিনী কলেবরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শাসকের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বিশ্বজ্ঞালার মাঝে শহরটা ফেলে রেখে পিঠটান দেন। বাবর স্মৃতিচারণা করেছেন, 'আমি শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় চেপে সেখানে উপস্থিত হই এবং চার-পাঁচজনকে গুলি করি আর দুই কিংবা একজনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিছিন্ন করতে হয়। বিশ্বজ্ঞালা বঙ্গ হয়।' ১৫০৪ সালের ১৪ জুন, মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি কাবুলের কর্তৃত গ্রহণ করেন। তার জীবনের বাকিটা সময় কাবুল তার শক্তির কেন্দ্র আর আধ্যাত্মিক বাসভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে। বাবর এখানে এই কাবুলেই পুস্তক আর বাগিচার প্রতি উত্তরাধিকার সূত্রে সাড়ে করা আগ্রহকে প্রশংস্য দেয়ার মতো অবসর পান।

ইউরোপে বর্বর যায়াবর হিসেবে তার পরিচিতি সত্ত্বেও এবং ক্রিস্টোফার মার্লোর ভাষায়, 'ঈশ্বরের চাবুক', তৈমূরও ছিলেন একজন পরিশীলিত মানুষ। সমরকন্দে তিনি চমৎকার সব উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন। এক ইউরোপীয় রাজদূত বর্ণনা করেছে কীভাবে উদ্যানগুলো 'ফলের বৃক্ষের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য জলের নহর প্রবাহিত হতো এবং একটি সুখকর ছায়ার সৃষ্টি করত। বৃক্ষশোভিত সড়কের কেন্দ্রে ছিল উচু মঞ্চ।'

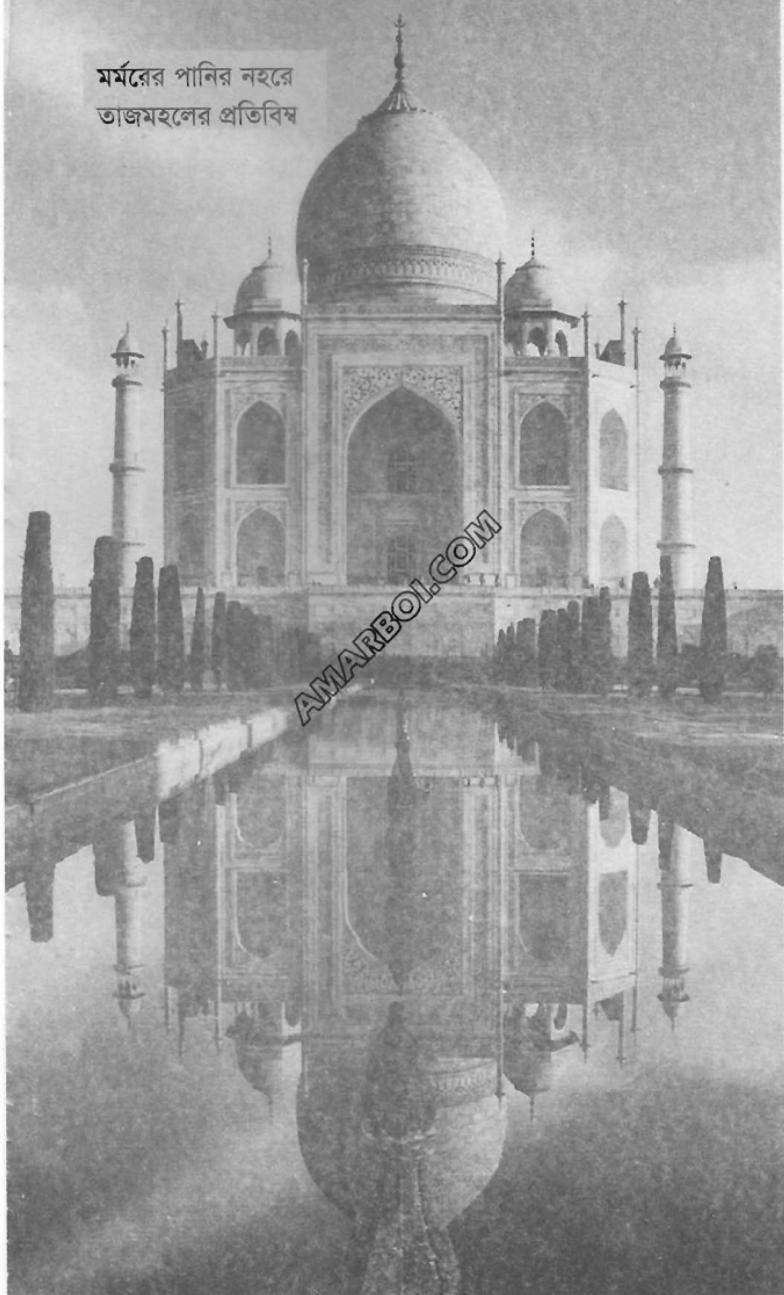
তৈমুর তার যায়াবর জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি অকপট থেকে নিজের নির্মিত উদ্যানে বিশালাকৃতির তাঁবুতে বাস করতেন, যার কোনোটা ছিল লাল রঙের, কোনোটা ব্যয়বহুলভাবে রেশমের তৈরি। কিন্তু তিনি সেইসাথে গম্ভুজযুক্ত মসজিদ আর মকবরাও নির্মাণ করেছিলেন, যার প্রতিটিই ছিল নিখুঁত পরিকল্পনার প্রতিসাম্য।

বাবর বর্ণনা করেছেন তিনি কীভাবে কাবুলে এবং সম্ভবত অন্যত্রও তার প্রিয় উদ্যানগুলো নির্মাণ করেছিলেন : ‘আমি পাহাড়ের পাশে দক্ষিণমুখী করে (এটা) নির্মাণের পরিকল্পনা করি। পানির একটি সতত প্রবাহিত ধারা মাঝখানে একটি ছোট টিলার পাশ দিয়ে বয়ে যায়, যার ওপর চারটা বাগানের ক্ষেত্র ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত বৃক্ষাকার জলাধারের চারপাশে ছিল কমলার গাছ এবং কয়েকটা ডালিমের আর পুরোটা একটি উপত্যকা দিয়ে ঘেরা। উদ্যানের এটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, কমলাগুলোয় যখন রং ধরত তখন সত্যিই একটি নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা হতো। সত্যিই।’ তিনি নিজেকে অভিনন্দিত করেন, ‘উদ্যানটা একটি দশনীয় স্থানে অবস্থিত।’ বাবর যখন ভারতবর্ষ শাসন করছেন তখনো তিনি কাবুলের সুবেদারকে সময় করে চিঠি লিখেছেন, তার উদ্যানে যেন ঠিকমতো পানি দেয়া হয় আর কলম করা ভালো জাতের ফুল দিয়ে যথাযথভাবে সজ্জিত থাকে।

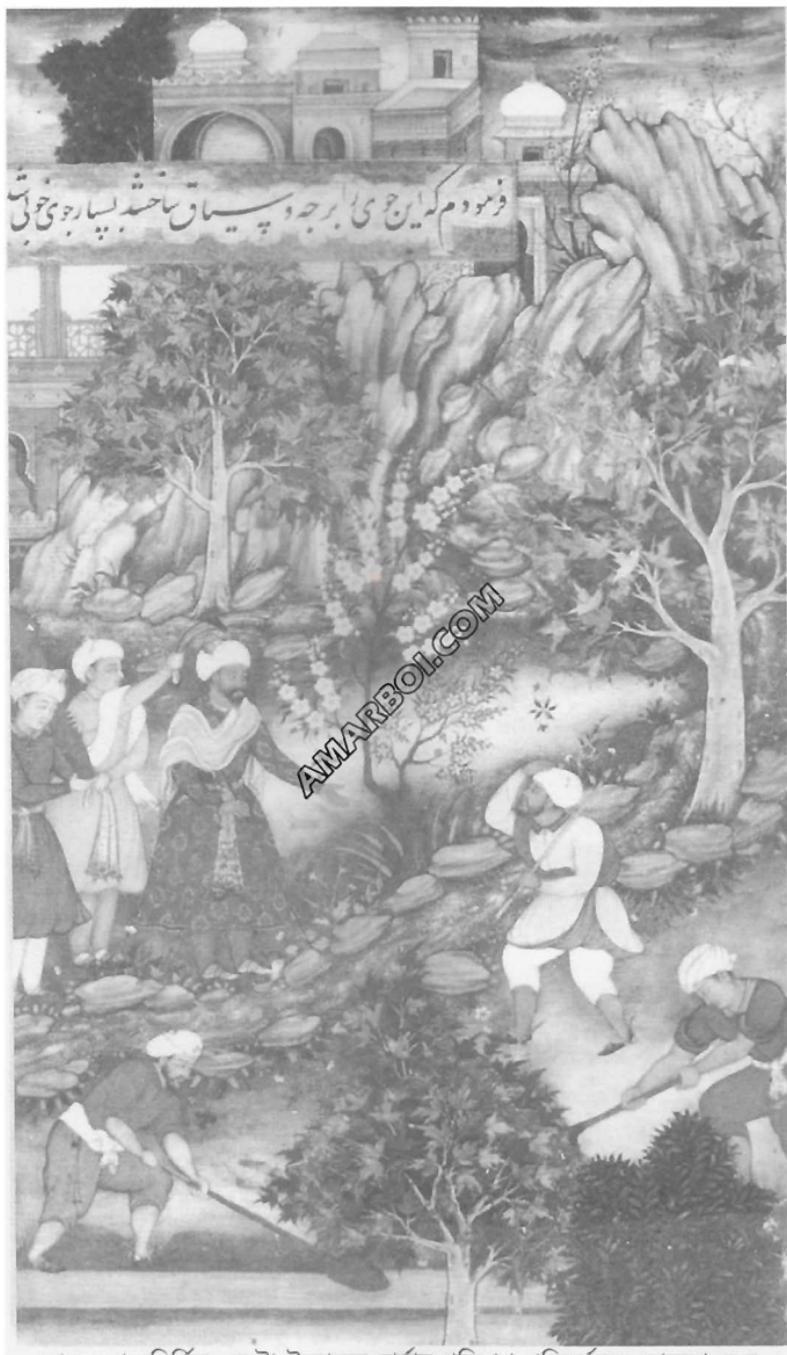
বাবর যখন নতুন ভূখণ্ড দখল করতেন, তার প্রথম কাজই ছিল পূর্ববর্তী শাসকের পাঠাগার লুট করে আর নিজের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করা।\* বাবর নিজে গদ্য আর পদ্য লিখতেন এবং শিল্পকলার প্রতি তার আগ্রহের মাত্রা তিনি তার এক আজীব্য সম্পর্কিত ভাইয়ের ওপর যে পড়াশোনা চাপিয়ে দিয়েছিলেন সেটা থেকে নির্ণীত করা যায়, ‘চারঙলিপি, পাঠাভ্যাস, পদ্য লেখা, চিত্রকলা, অলংকরণ আর পত্র লেখার রীতি...সিলমোহর নকশা করা, অলংকার নির্মাণ আর রত্নাকরের মতো হাতের কাজ।’

\* মধ্য এশিয়ার রাজকীয় পাঠাগারে কেবল পাতুলিপি থাকত। পথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ছাপা বই যদিও ওয়াঙ জি'র ডায়মন্ড সূত্র, ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে চীনে যা ছাপা হয়েছিল হাতে খোদাই করা কাঠের ব্লক দিয়ে যথেষ্ট ভোগাতি সহ্য করে এবং ইউরোপে ছাপানো বই সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ গুটেনবার্গের পুনর্ব্যবহারযোগ্য টাইপ আর ছাপাখানার আবিষ্কারের ফলে। উভয় প্রক্রিয়ার কোনোটাই মধ্য এশিয়ায় কিংবা মোগল ভারতে ব্যবহৃত হতো না। মৌখিক আদান-প্রদানের ওপর এর ফলে অনেক বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতার জন্য হয়েছিল এবং ঐতিহাসিকদের জন্য প্রায়ই সমস্যার সৃষ্টি করত, এর ফলে অবশ্য রাজাদের দিনপঞ্জির মতো আকর নথিপত্রের সুন্দরভাবে অলংকৃত করা নকল তৈরি করা হতো।

মর্মের পানির নহরে  
তাজমহলের প্রতিবিম্ব



AMARBOI.COM



বাবর তার নির্মিত একটা উদ্যানের ঝৰ্নার গতিপথ পরিবর্তনের আদেশ দেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

বাবর অবশ্য একটি বিষয়ে খুব ভালো করেই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, তিনি যদি তার বাহিনীকে নতুন ভূখণ্ডের সন্ধানে এবং নতুন লুটতরাজে ব্যস্ত না রাখেন, তাদের মনে হয়তো বিদ্রোহের চিন্তা খেলতে শুরু করবে। পারস্যের সহায়তায় তিনি সমরকন্দ দখলের আরেকটা প্রয়াস নেন। তিনি যদিও শহরটা পুনরায় দখল করেন এবং আট মাস সেটা নিজের আয়ত্তে রাখেন তিনি আবারও উজবেকদের সামনে সমরকন্দকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। তিনি পরবর্তী সময়ে দক্ষিণে হিন্দুস্তানের বা উত্তর ভারতের দিকে তার আগ্রাসী মনোযোগ নিবন্ধ করেন। তার দুই বিখ্যাত পূর্বপুরুষ উপমহাদেশ অধিক্রম পরিচালনা করেছিল। ১২২১ সালে চেঙ্গিস খান সিঙ্গু নদ, উত্তর ভারতকে রক্ষাকারী অন্যতম প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক পর্যন্ত পৌছে তারপর ফিরে গিয়েছিলেন। ১৩৯৮ সালে, তৈমূর, ঘাট বছর বয়সে, যার শীতল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ চোখ দুটোকে সমসাময়িক একজন ‘দীপিহীন মোমের আলো’র সাথে তুলনা করেছিল, নৌকার তৈরি সেতুর ওপর দিয়ে তার লুঠনের উদ্দেশ্যে আগত বাহিনীর সাথে সিঙ্গু নদ অতিক্রম করে। তারা দিল্লি পর্যন্ত লুটপাট আর ধৰ্বসম্যজ্ঞ করতে করতে এগিয়ে যায়, তাদের পেছনে পড়ে থাকে ‘মৃত শবদেহের স্তুপ, যা বাতাস দূষিত করে ত্বেষ্টে।’ ডিসেম্বরে তৈমূর দিল্লিতে প্রবেশ করেন এবং এত দক্ষতার সাথে প্রয়ো শহরটায় অগ্নিসংযোগ আর হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন যে, ‘পরবর্তী দুই মাস আকাশে এমনকি একটি পাখি ও উড়তে দেখা যায়নি।’

পুরো শহরটা আগনে পুড়ে যাবার আগেই অবশ্য, তৈমূর দিল্লির কারিগরদের, বিশেষ করে পাথরের কারিগর—সমবেত করেন তার পক্ষে যতজনকে সমবেত করা সম্ভব, তার সাথে সমরকন্দে গিয়ে সেখানে তার নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করতে, যেমন তিনি নিজের জন্য সে চমৎকার সবুজাভ-নীল গম্বুজ বিশিষ্ট মকবরা তৈরি করেছিলেন। তৈমূর বস্তুতপক্ষে তার প্রতিটি বিজয়ের পরে শিল্পের দক্ষ কারিগরদের নির্বাচিত করতেন তার রাজধানীর সৌন্দর্যবর্ধন করতে। তিনি তুরক্ষ থেকে রূপার কারিগরদের আর দামেক্ষ থেকে কাচে বাতাস প্রবেশ করাবার লোক নিয়ে এসেছিলেন। এক রাজদৃত বর্ণনা করেছেন কীভাবে শ্রমিকদের ‘এত বিপুল সংখ্যা’ সেখানে অবস্থান করত যে সমরকন্দ ‘তাদের স্থান দেয়ার মতো বিশাল ছিল না এবং এটা সত্যিই বিশ্ময়কর যে বাইরের গুহায় এবং গাছের নিচে কী বিপুল সংখ্যায় তারা বাস করত।’

লুটের মালপত্রে এতটাই বোঝাই যে একটি প্রতিবেদন অনুসারে তারা দিনে চার মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করতে পারত না। তৈমূর আর তার বাহিনী ভারতবর্ষে প্রবেশের ছয় মাসের ভেতর এখান থেকে বিদায় নেয়।

ভারতবর্ষে বাবর তার নিজের অভিযান শুরু করার পূর্বে, বাবরের বাহিনী আর তার পরিবারের লোকবল বৃদ্ধি পায়। সৈন্যবাহিনী কামান এবং ম্যাচলক গাদা

বন্দুক অটোমান তুর্কিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এবং বাবর মা'সুমা সুলতান বেগম নামে আরেকজন স্ত্রী প্রাণ করেন। তিনি যদিও বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'আমাকে প্রথমবার দেখার পর সে আমার প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করেছিল', তিনি অবশ্য তার প্রতি নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেননি। কিন্তু প্রায় নয় মাস পরে, ১৫০৮ সালের মার্চে, বাবর ঘ্যর্থহীন খুশিতে, এক পুত্রসন্তান, হুমায়ুনের, জন্মের সংবাদ প্রকাশ করেন : 'আমি আনন্দ উদ্ঘাপনের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করি। এক জায়গায় আগে কখনো একসাথে যত রূপার মুদ্রা দেখা গেছে তার চেয়েও বেশি সংখ্যক রূপার মুদ্রা স্থপীকৃত করা হয়। এটা ছিল দারুণ একটি আনন্দোৎসব।' হুমায়ুন শব্দের মানে 'সৌভাগ্যবান', কিন্তু তার ভাগ্য কোনোভাবেই সব সময় ভালো হবে না। অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া পুত্রসন্তানেরা যথাক্রমে : ১৫০৯ সালে কামরান, ১৫১৬ সালে আসকারি এবং ১৫১৯ সালে হিন্দাল।

১৫১৯ সালে শুরু করে, ১৫২৫ সালের শরৎকালে সর্বশক্তিতে অধিক্রম শুরু করার পূর্বে বাবর ভারতবর্ষে চারটা প্রাথমিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময় দিল্লির মুসলিম সালতানাত, তিনশ বছরের অধিক কালব্যাপী যারা উত্তর ভারতে অধিপত্য বজায় রেখেছিল, ক্ষমতাসূচী সুলতান ইব্রাহিম শোনীর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ ঘন্টের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বাবর তাই নির্বিম্মে আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের বরফাঞ্চু গিরিপথের ভেতর দিয়ে নেমে, সিঙ্গু নদ অতিক্রম করে, পাঞ্জাবের পাদদেশে অবস্থিত পাহাড়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ১৫২৬ সালের জুন মাসে কোনো শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার আগেই দিল্লি থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে ধূলিময়, উষ্ণ সমভূমি পানিপথে এসে উপস্থিত হন। সুলতান ইব্রাহিম যিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেখানে ১০০,০০০ জন সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন, বাবরের বাহিনীর চেয়ে তারা সংখ্যায় একজনে পাঁচজন বেশি ছিল। বাবর তার একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেন, যা ছিল কামান আর ম্যাচলক গাদা বন্দুক—ভারতের কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে দুটো অঙ্গই প্রথমবার মোতায়েন করা হয়েছিল। তিনি তার মালবাহী ৭০০ শকটকে চামড়ার দড়ির সাহায্যে পরম্পরের সাথে যুক্ত করে একটি প্রতিরক্ষা বৃহৎ তৈরি করেন—অনেকটা ঠিক আমেরিকার বুনো পশ্চিমের বৃত্তাকার ছাউনিযুক্ত ওয়াগনের বিন্যাস—যার পেছনে তিনি তার কামানগুলো আর বন্দুকধারী তবকিদের মোতায়েন করেন। ২০ এপ্রিল সকালের ঠিক অব্যবহিত পরেই যখন সুলতানের বাহিনী সম্মুখভাগে প্রায় এক হাজার রণহস্তি নিয়ে আক্রমণ শুরু করে, বাবরের গাদাৰবন্দুক আর ব্রোঞ্জের কামানের গোলা তাদের অগ্রাহ্য আটকে দেয় এবং তাদের সারির মাঝে বিভাস্তি আর আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বাবরের অশ্বারোহী তীরন্দাজের দল

এরপর বৃংহন করতে থাকা বিশ্বজগৎ হাতির পাল আর আতঙ্কিত, বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার করতে থাকা সৈন্যদের পাশ থেকে এবং পেছন থেকে আক্রমণ করে। পাঁচ ঘণ্টার ভেতরে তার শত্রুদের ২০,০০০ জন মৃত্যুবরণ করে, যাদের ভেতরে সুলতান ইব্রাহিমও ছিলেন। বাবর উভর ভারতের কর্তৃত্ব লাভ করেন। দিল্লিতে তার সার্বভৌম স্বৰূপার প্রকাশ্য বিবরণ হিসেবে শুক্রবারের জুমার নামাজের শেষে, তার নামে খুতবা পাঠ করে তাকে শাসক হিসেবে ঘোষণা করার পরই কেবল যমুনার তীর বরাবর তিনি আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। তার পুত্র হুমায়ুন এখানে তাকে বিশাল একটি হীরক ঝণ্ড উপহার দেয়, যা হুমায়ুনকে আবার দিয়েছিল গোয়ালিয়রের রাজপরিবার পানিপথে সুলতান ইব্রাহিমের পক্ষে লড়াই করার সময় তাদের শাসকের মৃত্যুর পরে, তাদের নিরাপত্তার জন্য কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে। বাবর বলেছেন, ‘একজন রত্ন ব্যবসায়ী একবার সারা পৃথিবীর অর্ধিদিবসের খরচের সমতুল্য হিসেবে এর মূল্যায়ন করেছিলেন...কিন্তু আমি (হুমায়ুনকে) এটা সাথে সাথে ফিরিয়ে দিই।’ এটা ছিল বিখ্যাত কোহ-ই-নূর, ‘আলোর পর্বত’, যা বেশ কয়েকবার মোগল কাহিনীতে আবির্ভূত হবে।

বাবর এবার তার নতুন সাম্রাজ্যের সম্পদের জালিকা করেন। তিনি পুরোপুরি অভিভূত হতে পারেন না : ‘হিন্দুস্তান মুঘল সম্রাহনের একটি জায়গা...শহর আর প্রদেশগুলো সবই অরুচিকর। উদ্যানগুলোতে কোনো দেয়াল নেই এবং অধিকাংশ স্থানই তজ্জর মতো সম্পত্তি। এখানের লোকদের মাঝে কোনো সৌন্দর্য নেই, মার্জিত সমাজ নেই, কোনো কাব্য প্রতিভা নেই, আভিজাত্য, পৌরুষত্ব বা সৌজন্যর কোণো বালাই নেই...এখানে ভালো জাতের ঘোড়া, ঘাঁস, আঙুর, তরমুজ, বা অন্য কোনো ফল পাওয়া যায় না...বরফ, শীতল পানি, ভালো আহার, গোসলের বন্দোবস্ত বা কোনো মাদ্রাসা নেই...তাদের প্রাসাদ বা উদ্যানে প্রবাহিত পানির নহর নেই এবং তাদের ইমারতগুলোয় দৃষ্টিনন্দন প্রতিসাময় বা মিল অনুপস্থিত।’ বাবর প্রথমে কেবল একটিই সন্তোষজনক বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করতে পারে : ‘হিন্দুস্তানের একটিই দারুণ দিক হলো যে দেশটা বিশাল এবং সোনা আর অর্থের বিপুল সংগ্রহ এখানে রয়েছে।’ তিনি একটু পরে আরেকটা বৈশিষ্ট্য যোগ করেন : ‘...বিপুলসংখ্যক কারিগর আর সব ধরনের কাজের লোক পাওয়া যায়।’ তার পূর্বপুরুষ তৈমুরের ন্যায়, তিনি পাথরের কারিগরদের বিশেষভাবে মূল্য দিতেন। তিনি আর তার উভর পুরুষরা তাদের নিয়োজিত করে দারুণ চিন্তাকর্ষক অভিব্যক্তির সৃষ্টি করেন।

বাবর শীত্রেই তার ধারণা করা কিছু দোষের প্রতিকার সাধন করেন, আগ্রায় যমুনার তীরে আজ যেখানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে তার ঠিক উল্টো দিকে একটি উদ্যান নির্মাণের মাধ্যমে। ‘আকর্ষণহীন আর বিসঙ্গত ভারতবর্ষে

চিন্তাকর্ষকভাবে নিয়মিত আর জ্যামিতিক আকৃতির উদ্যান নির্মিত হয় এবং প্রতিটি প্রাণে গোলাপ আর নার্গিস নিখুঁত বিন্যাসে মোপণ করা হয়,’ তিনি লিখেছেন।

বাবর তার পরাজিত শক্ত সুলতান ইব্রাহিম লোদির পরিবারের সাথে বেশ ভালো আচরণ করেছিলেন। সুলতানের আম্বিজান, বুয়াকে, তিনি দরবারেই ছান দিয়েছিলেন। বুয়া অবশ্য তার দয়ার মোটেই কোনো প্রতিদান দেননি। বাবর ইব্রাহিমের চারজন রাঁধুনিকে কাজে বহাল রাখেন তাকে হিন্দুস্তানি রান্নার স্থান আস্থাদনের সুযোগ দিতে। ১৫২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর, বুয়া বাবরের খাবারে বিষ মিশ্রিত করতে রাঁধুনিদের একজনকে রাজি করায়। বাবর এরপরে গল্লটা বলেছেন। ‘খাবারে কোনো দুর্গন্ধ বা তেমন কিছু ছিল না। আহার গ্রহণের জন্য উপবেশন করা অবস্থায় আমি দস্তকখানের ওপর প্রায় বমি করে ফেলি...আমি উঠে দাঁড়াই এবং প্রাক্ষালন কক্ষের দিকে যাবার সময় আমি প্রায় বমিই করে ফেলেছিলাম। আমি কোনোমতে প্রাক্ষালন কক্ষে পৌছে প্রচুর বমি করি। আমি কখনো খাওয়ার পর বমি করিনি, এমনকি যখন পান করতাম তখনো এমন হয়নি। আমি বমিটা একটি কুকুরকে দিতে বলি। (কুকুরটা) প্রায় নিজীব হয়ে পড়ে। তারা হতঙাগ্য প্রাণীটাকে ক্ষেক্ষ করে যতই পাথর নিক্ষেপ করুক না কেন সে উঠে দাঁড়ায় না কিন্তু আরও যায় না।’ বাবর রাঁধুনিকে ঘেঁষার করার আদেশ দেন। নির্বাতনের পর সে সব কিছু স্বীকার করে। দুজন বৃক্ষ মহিলা, যারা বার্তাবাহক আর বাবরের খাবারের পরীক্ষক হিসেবে কাজ করত এরপর তাদের ঘেঁষার করা হয়। ‘তারাও দোষ স্বীকার করে...আমি খাদ্য পরীক্ষককে কেটে টুকরো টুকরো করার আদেশ দিই আর জীবন্ত অবস্থায় রাঁধুনির গায়ের ছাল তুলতে বলি। দুই রংগীর একজনকে আমি হাতির পায়ের নিচে ফেলে পিট করি অন্যজনকে গুলি করে হত্যা করি। আমি বুয়াকে কারাগারে নিক্ষেপ করি।’ বাবর নিজেকে সুস্থ করতে দুধের সাথে খানিকটা আফিয় ঝিশিয়ে পান করেন। ‘এই ওষুধ গ্রহণের প্রথম দিন আমি পিচের মতো কালো পিস্তুরস বমি করি। সব কিছু আল্পাহর রহমতে ঠিক হয়ে যায়। আমি আগে কখনো বুঝতে পারিনি জীবন এত মধুর।’

বাবর সেবার যদিও মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি আর চার বছরেও কম সময় জীবিত থাকেন। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রশংসিত করতে এবং প্রতিবেশী রাজন্যদের আকশ্মিক হামলা প্রতিহত করতে তিনি এই সময়ের কিছুটা অতিবাহিত করেন এবং কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন পদ্য রচনায় আর তার অকপট আর অস্তরঙ্গ স্মৃতিকথা, বাবরনামা রচনায়, ইসলামিক সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবীনী। দিনপঞ্জি অনুসারে বাবরের মৃত্যু তার পুত্র হুমায়ুনের মারাত্মক অসুস্থতার কারণে হয়েছিল। বাবর হয়তো নিজের

স্তীদের প্রতি উদাসীন ছিলেন কিন্তু তিনি তার সন্তানদের ভালোবাসতেন আর হ্যায়ুনকে ‘অঙ্গুলনীয় সঙ্গী’ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তার এই পুত্র যখন গভীর চিন্তাবেকলে আক্রান্ত তখন ভবিষ্যদ্দশীরা বাবরকে পরামর্শ দেন, তিনি যদি হ্যায়ুনের মূল্যবান কোনো বস্তু উৎসর্গ করেন তাহলে তিনি হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবেন। তারা আপাতদৃষ্টিতে কোহ-ই-নূর বোাতে চাইলেও বাবর মনে করেন, আল্লাহর কাছে তার নিজের জীবন সমর্পণ করা উচিত। তিনি অঙ্গসজল চোখে তা-ই করেন, ‘আমি তার পরিবর্তে নিজেকে উৎসর্গ করব... আমি তার সমস্ত কষ্ট সহ্য করব’ এবং যখন আল্লাহ যখন তার প্রার্থনা মণ্ডের করেন... বাবর নিজের ওপর অস্তুত একটি প্রভাব অনুভব করেন এবং চিন্তার করে উঠেন ‘আমরা পরীক্ষায় উত্তরে গিয়েছি!’ মহামান্য স্বাক্ষরে মাঝে সাথে সাথে বিচিত্র একটি প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং (হ্যায়ুনের) ভেতর জ্বরের আকস্মিক হ্রাস ঘটে।’

এ ঘটনার পর বাবরের স্বাস্থ্য সত্যিই খারাপ হতে শুরু করে কিন্তু ১৫৩০ সালের ডিসেম্বরে তার মৃত্যুর পূর্বে বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হয়, যারা অপেক্ষাকৃত কম আবেগের অধিকারী তারা এই মৃত্যুর জন্য তার যৌবনের অতিরিক্ত পরিশ্রম আর সুরা, আফিয় এবং অন্যান্য মাদকের প্রতি তার আসক্তিকে দায়ী করে। (বাবর বর্ণনা করেছেন কীভাবে মাদকের প্রভাবে স্ট্রেস, হিপ্পির মতো, মোহাবিষ্টতায় তিনি ‘সুস্মর্ত্ত ফুলের বাগান’ উপভোগ করেছেন।) কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার সমস্তকদের আহ্বান করবেন হ্যায়ুনকে তার আইনসংগত উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এবং হ্যায়ুনকে উপদেশ দেন ‘তোমার ভাইদের বিরুদ্ধে কিছু করবে না এমনকি যদি সেটা তাদের প্রাপ্যও হয়।’ হ্যায়ুন তার উক্তর প্রকৃষ্টদের মতো ছিলেন না অনেকের খেকে আলাদা ছিলেন। তিনি তার আবাজানের আদেশ অনুসরণ করেছিলেন, যা একটি সাধারণ তৈমূরীয় নীতির ওপর আরোপিত যে রাজবংশের যুবরাজদের নিরাপদ রাখতে হবে। তাজমহলের ভবিষ্যৎ নির্মাণ স্থানের উল্লে দিকে তার নতুন উদ্যানে বাবরকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে তার মৃতদেহ তার ইচ্ছা অনুসারে কাবুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পাহাড়ের পাশে শহর দেখা যাওয়া তার নির্মিত উদ্যানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার অনুরোধে এবং ইসলামি রীতির সাথে সংগতি রেখে যে সমাধি খোলা আকাশের নিচে অবস্থিত হবে, তার কবরের ওপরের মার্বেলের স্মৃতিফলকের ওপর কোনো ইমারত নির্মাণ করা হয়নি।



বাইশ বছর বয়সী হ্যায়ুন ছিলেন ‘মর্যাদাবান আর চমৎকার চরিত্রের অধিকারী এক যুবরাজ, দয়ালু এবং উদার আর ন্যূন স্বভাবের এবং সদাশয়।’ তিনি

ব্যক্তিগতভাবে দারুণ সাহসী ছিলেন কিন্তু প্রাণবন্ত এবং মানুষকে উদ্বীপিত করার ক্ষমতার অধিকারী। তার আকৃতান্বয়ের ভারতবর্ষের ওপর চার বছরের পুরাতন শাসনকে মজবুত করতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর সংকলনের মারাত্মক ঘটাতি তার ভেতরে ছিল। তিনি সহজেই মনোযোগ হারিয়ে ফেলতেন এবং এতটাই কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন যে, কোনো কক্ষে প্রবেশের সময় ডান পা আগে ফেলতেন এবং যারা সেটা করত না তাদের বাইরে পাঠাতেন পুনরায় ঠিকমতো প্রবেশ করতে। তিনি জ্যোতিষবিদ্যার দারুণ ভক্ত ছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রঙের পোশাক পরিধান করতেন এবং সপ্তাহের দিনগুলোর নিয়ন্ত্রক তারকার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তিনি নিজের কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন করতেন। রবিবার যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করতেন এবং রাত্তীয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সোমবার সবুজ রং আর সেদিন ছিল আমোদের দিন। মঙ্গলবার তিনি যুদ্ধের মতো লাল পোশাক পরিধান করতেন এবং তীব্র ক্রোধ আর প্রতিশোধমূলক আচরণ করতেন। তার ক্রোধ একই সাথে নিষ্ঠুর আর খেয়ালি হতে পারত। এক মঙ্গলবার, তিনি অপরাধের সাথে শান্তি মানানসই করার দাবি করেন। তার বিবেচনায় যারা ‘শৌয়ার’ তাদের মাথাই কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং বিবেচনার ঘটাতি—মাসে, ‘নিজেদের হাত আর পায়ের মাঝে পার্থক্য করতে’ ব্যর্থতা যাদের বুঝেছে বলে তার মনে হয়েছে তাদের হাত আর পা কেটে ফেলতে বলেন।

তার স্বভাবজাত অবসন্নতা বহুগুণ বৃক্ষি পাবার জন্য একজন দিনপঞ্জির রচয়িতা দায়ী করেছে তার ‘মাত্রাতিরিঙ্গ’ আফিমের ব্যবহারকে, গোলাপ জলের সাথে মিশ্রিত করে তিনি যা সেবন করতেন। হ্রাস্যন এসব ঘটাতির ফলক্ষণতে হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য হারান এবং রাজ্যহীন শাসকের ন্যায়, বাবর তার যৌবনে যেমন করেছেন, যায়াবরের মতো বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার বহিকারের কারণ ছিল গাটোগোষ্ঠী দেহের অধিকারী, চতুর আর বিচক্ষণ শ্রেণি শাহ। গঙ্গার তীরে অবস্থিত বিহারের একটি নগণ্য মুসলিম রাজ্যের ততোধিক নগণ্য একজন আধিকারীকের পদবর্যাদা থেকে তিনি কয়েক বছরের ভেতরে সবার অগোচরে নিজেকে কার্যত বাংলা আর বিহারের শাসকে পরিণত করেন। হ্রাস্যন শ্রেণি পর্যন্ত যখন বুঝতে পারেন যে শ্রেণি শাহ তার রাজত্বের জন্য হৃষ্মকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি গঙ্গার উজানে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তার অভিগমন ছিল মহুরগতিতে এবং শ্রেণি শাহকে প্রস্তুতি গ্রহণের পর্যাণ সময় দিয়েছিলেন। ১৫৩৯ সালের জুন মাসে অনেক কৌশলী পরিচালনা শেষে দুটো বাহিনী অবশেষে যুক্তক্ষেত্রে অবর্তীণ হয়। শ্রেণি শাহের বাহিনী হ্রাস্যনের বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে এবং স্মার্ট বাধ্য হন

কলক্ষের বোঝা মাথায় নিয়ে পলায়ন করতে। তিনি নাজিম নামে তার এক ভিত্তির সাহায্যে কোনোমতে গঙ্গা অতিক্রম করে পালাতে সক্ষম হন। তার পশ্চর চামড়ার তৈরি পানির পাত্র ফুলিয়ে সেটা ভাসতে সাহায্যকারী অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করতে হ্যায়ুনকে দিয়েছিল। খামখেয়ালি হ্যায়ুন তার ভাইদের আর অমাত্যদের বিরক্তির উদ্রেক ঘটিয়ে মুহূর্তের উত্তেজনায় নাজিমকে রাজসিংহাসনে এক দিনের জন্য উপবেশনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা রক্ষা করেন। নাজিম সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং নিজেকে আর নিজের পরিবারকে সম্পদশালী করতে শুটি কয়েক ফরমান জারি করেন। হ্যায়ুনের এই কর্মকাণ্ড তার রাজত্বকালের একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তার রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধিতে কোনো সহায়তা করে না, যদিও এটা তাকে এমন একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত করে যার কথার মূল্য রয়েছে।

হ্যায়ুন পালিয়ে প্রথমে আগ্রা আসেন এবং সেখান থেকে তার পরে উত্তর-পশ্চিমে লাহোরে যান তার সংভাই কামরান, আসকারি আর হিন্দালের সাথে সাক্ষাৎ করতে। তাদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। চেঙ্গিস খান আর তৈমূর যে তাদের সাম্রাজ্য তাদের ফ্রেলেদের ভেতরে ভাগ করে দিয়েছিলেন সে সবক্ষে সচেতন, বাবর যেখন একজন উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন সে রকম না করে, অন্যান্য প্রায়ত্যক ভাই পুরাতন প্রথার প্রত্যাবর্তন কামনা করে এবং ইতিমধ্যে বিদ্রোহ বা নিকট-বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে এবং নিজেদের জন্য ভূখণ্ড দখলে সচেতন। হ্যায়ুন তাদের প্রতিবার অঞ্চলজন চোখে মার্জনা করেছেন তার আবৰাজনের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ধাকার পাশাপাশি আবেগপ্রবণ আর স্নেহশীল ব্যভাবের হওয়ায়। তাদের ভগিনী গুলবদনের ভাষ্য অনুসারে, চার সহোদর একটি সাধারণ হ্যকি হিসেবে বিদ্যমান ‘তারা মন্ত্রণা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে এবং পরামর্শ চায় কিন্তু কখনো কোনো বিষয়ে সমবোতায় পৌছায় না।’ শের শাহের সাথে গোপনে একটি পৃথক শান্তিকৃতি সম্পাদনের চেষ্টা করেন কামরান, যার ফলে তিনি কাবুলকে নিরাপদ রাখতে পারেন। হ্যায়ুন একই গোপনীয়তায় শের শাহের সাথে আপস প্রস্তাবের ভিত্তি হিসেবে চূক্ষি করেন, ‘আমি হিন্দুস্তান তোমায় ছেড়ে দিয়েছি। লাহোরকে রেহাই দাও এবং সিঙ্গ তোমার আর আমার মাঝে সীমান্ত হিসেবে বিদ্যমান থাকুক।’

শের শাহ উভয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যখন লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হন, হ্যায়ুন আর তার ভাইয়েরা এবং বলা হয় যে তাদের ২০০,০০০ অনুসারী স্বেফ পালিয়ে যায়। গুলবদন লিখেছেন, ‘পুনরুদ্ধানের দিনের মতো একটি বিষয়, লোকজন তাদের সুসজ্জিত প্রাসাদ যেমন আছে সেভাবেই ফেলে

ରେଖେ ଯାଯ ।' ହମ୍ମାୟୁନ ହିନ୍ଦାଲକେ ସାଥେ ନିଯେ ସିଙ୍ଗେର ଦିକେ ପାଲିଯେ ଯାନ ଏବଂ ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରାର ଜନ୍ୟ ଶାନୀୟ ଶାସକକେ ରାଜି କରାତେ ବେଶ କରେକ ମାସ ବୃଥାଇ ଚେଷ୍ଟା କରେନ । ତିନି ଅବଶ୍ୟ ରାଜି କରାବାର ଅନ୍ୟ ଏକଟି ପ୍ରୟାସେ ସଫଳ ହନ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ମାସ ଚେଷ୍ଟା କରାର ପରେଇ । ତିନି ହାମିଦାକେ, ହିନ୍ଦାଲେର ଏକଜନ ପରାମର୍ଶଦାତାର ଚୌଦ୍ର ବହରେର କଲ୍ୟା, ରାଜି କରାନ ତାକେ ବିଯେ କରତେ ରାଜି ହତେ । ପ୍ରଥମେ ହାମିଦା ଆର ହିନ୍ଦାଲ ପ୍ରବଳଭାବେ ବିଯେତେ ଆପଣି ଜାନାନ, କାରଣ ସମ୍ଭବତ ତାରା ନିଜେରା ପରମ୍ପରେର ପ୍ରତି ଆକୃଷିତ ଛିଲେନ । ହିନ୍ଦାଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ହେଁ କାନ୍ଦାହାର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରେନ ଏବଂ ହମ୍ମାୟୁନେର ଆସିଜାନ ତାର ତେତିଶ ବହରେର ପୁତ୍ରକେ ବିଯେ କରାର ଜନ୍ୟ ହାମିଦାକେ ଏହି ଯୁକ୍ତିତେ ରାଜି କରାନ ଯେ, 'ତୁମ୍ଭ କଥନୋ କାଉକେ ଅବଶ୍ୟଇ ବିଯେ କରବେ? ଏକଜନ ସନ୍ତାତେ ଚେଯେ ଆର କେ ସେରା ହତେ ପାରେ, ଯେ ସେଖାନେ ଅପେକ୍ଷା କରରେ?' ହମ୍ମାୟୁନ 'ନିଜେର ଆଶୀର୍ବାଦପୁଷ୍ଟ ହାତେ ଏକଟି ଆୟାସ୍ତୋଲେଇବ ନେନ' ଏବଂ ତାଦେର ବିଯେର ଜନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷୀର ଦୃଷ୍ଟିତେ ସବଚେଯେ ମନ୍ଦଲମ୍ୟ ଦିଲି ଗଣନା କରେନ—୧୫୪୧ ସାଲେର ୨୧ ଆଗସ୍ଟ ।

୧୫୪୨ ସାଲେର ମେ ମାସେ ହମ୍ମାୟୁନ ଆର ହାମିଦା ସିଙ୍କ ତ୍ୟାଗ କରେନ । ଏର ପେହନେ କାରଣ ଛିଲ ରାଜହାନେର ମରଭୂମି ଅଭିକ୍ରମ କରେ ତାରା ଭାରତେ ଫିରେ ଆସତେ ଚାନ, ସେଥାନେ ହମ୍ମାୟୁନ ଘେଓୟାରେର (ଯୋଧପୁର) ପ୍ରାଜାର ସୀଥେ ମିତ୍ରତାର ଆଶା କରେଛିଲେନ । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ ଶୀଘ୍ରଇ ବ୍ୟର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୟ ଏବଂ ପୁରୋ ଦଲଟା ବହରେର ସବଚେଯେ ଉଷ୍ଣ ସମୟେ ଗନ୍ଧନେ ଫେସକା ପରା ମରଭୂମି ଅଭିକ୍ରମ କରେ ଫିରେ ଯାଯ । ହାମିଦା ତଥନ ଆଟ ମାସେର ଗର୍ଭତ୍ଵୀ । ଯାହିଁ ହୋକ, ହମ୍ମାୟୁନେର ପ୍ରତି ତାର କିଛୁ ଆଧିକାରୀକେର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଏମନ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ପୌଛାଯ ଯେ, ଏକଦିନ ହାମିଦା ଯଥନ ଘୋଡ଼ାବିହୀନ ହେଁ ପର୍ଦେଶ ତଥନ କେଉ ତାକେ ଏକଟି ଘୋଡ଼ା ଦେଯ ନା । ହମ୍ମାୟୁନ ଅବଶ୍ୟେ ତାକେ ନିଜେର ଘୋଡ଼ଟା ଏଗିଯେ ଦିଯେ ନିଜେ ହାଚଢ୍-ପାଚଢ୍ କରେ ଏକଟି ଉଟେର ପିଠେ ଚେପେ ବସେନ—ସନ୍ତାତେ ଜନ୍ୟ ଯା ଅର୍ମ୍ୟାଦାକର ଏବଂ ଅମନ୍ଦଲଜନକ ଏକଟି ବାହନ । ଏକଜନ ଆଧିକାରିକ ଅବଶ୍ୟେ ସଦୟ ହନ ଏବଂ ନିଜେର ଘୋଡ଼ଟା ହାମିଦାକେ ଦିଯେ ହମ୍ମାୟୁନକେ ଉଟେର ପିଠ ଥେକେ ନେମେ ଆସାର ସୁଯୋଗ କରେ ଦେଯ ।

ହତ୍ତ୍ଵୀ ଦଲଟା ଶୀଘ୍ରଇ ଅମରକୋଟ, ମରଭୂମିର ମାଝେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକଟି ଶହରେ ପୌଛାଯ, ହମ୍ମାୟୁନେର ଶକ୍ତଦେର ହାତେ ଯାର ଶାସକେର ମୁତ୍ତ୍ୟ ହେଁଲେ । ବ୍ୟାପାରଟା ଅନେକଟା 'ଆମାର ଶକ୍ତର ଶକ୍ତ ଆମାର ବନ୍ଧୁ' ଏମନ ଏକଟି ବିଷୟ ଏବଂ ହମ୍ମାୟୁନେର ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଦଲଟାକେ ଶାଗତ ଜାନିଯେ ଡୋଜେର ଆଯୋଜନ କରା ହୟ । ୧୫୪୨ ସାଲେର ୧୫ ଅଷ୍ଟୋବର, ସେଥାନେଇ ହାମିଦା ଏକଟି ପୁତ୍ରସନ୍ତାନେର ଜନ୍ୟ ଦେନ—ଭବିଷ୍ୟ ସନ୍ତାତ ଆକବର । ହମ୍ମାୟୁନ, ଅବଶ୍ୟଇ ନିଜେର ସନ୍ତାନେର ରାଶିଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରେନ । ରାଶିଚକ୍ର ଦାର୍ଶନ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରତୀଯମନ ହୟ । ହମ୍ମାୟୁନେର ନିଜେର ଅବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ ଏକଇ ରକମ ପ୍ରତିକୂଳ ଥାକେ । ତିନି ଆରୋ ଏକବାର ଭାରତର୍ବର୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରେନ, ତାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାଇଯେରା ଆସକାରି ଏବଂ କାମରାନ ତାକେ ପରିବେଚ୍ଛିତ କରେ ଫେଲେଛେ । ତିନି

সিদ্ধান্ত নেন, এমন পরিস্থিতিতে তার একমাত্র ভরসা যেমনটা তার আবকাজানও একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে করেছিলেন পারস্যের শাহের কাছে সহযোগিতা কামনা করা।

শীতকালে রুক্ষ প্রান্তরের ওপর দিয়ে যেহেতু তাদের যাত্রা করতে হবে, দুই সন্ন্যাম অভিভাবক তাদের একমাত্র পুত্রকে, তখন মাত্র চৌদ্দ মাস বয়স, তার বিদ্রোহী চাচাজান আসকারিক তস্ত্বাবধায়নে সমর্পণ করেন। তৃতীয় রিচার্ডের সাথে কোনোমতেই আসকারিকে তুলনা করা যাবে না এবং যুবরাজদের প্রতি আচরণে তৈমুরীয় অনুশাসনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করেন, তার স্ত্রী তার ভাতিজার ভালোই যত্ন নেন। ছেলের শিতা অবশ্য সেই সময় দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। ‘শীতের তীব্রতায় আমার মাথা যেন জমে গেছে,’ হ্যায়ুন পরে স্মৃতিচারণ করেছেন। খাদ্যদ্রব্য আর রান্নার পাত্র দুটোই বাড়ত এবং ভাগ্যাম্বেষী দলটা তাদের একটি ঘোড়া জবাই করতে বাধ্য হয় এবং ‘শিরোপ্রাণে খানিকটা মাংস সিক্ষ করে।’ যাই হোক, ১৫৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে তারা পারস্যে পৌছায়। শাহ সম্মানিত অতিথির মতোই হ্যায়ুনকে স্বাগত জানান এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি তাকে বেশ ভালো ধরনের সাহায্য প্রদান করবেন। শাহের পরোপকারী মনোভাব জোরাল করতে অবশ্য মোগল ভবঘূরে তার আলখাল্লার সিঁচে থেকে যে সবুজ ফুলের নকশা করা বটুয়াটা বের করেছিল সিঁচসন্দেহে সেটার বিশেষ অবদান রয়েছে। হ্যায়ুন বটুয়ার ভেতর থেকে কোহ-ই-নূর এবং আরো কয়েকটা রত্ন বের করে, শুক্রির রংধনসুস্তুপ খোলা দিয়ে তৈরি বাঞ্ছে সেগুলো রেখে শাহের হাতে তুলে দেন। আবকবরের প্রধান দিনপঞ্জি রচয়িতা আবুল ফজল পরবর্তী সময়ে লিখেছেন, হ্যায়ুনের জন্য শাহ যত ব্যয় করেছিলেন, রত্নের মূল্য তার ‘চার গুণের বেশি ছিল।’

শাহ অবশ্য সহযোগিতা অনুমোদন করার পূর্বে হ্যায়ুনের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন যে, তিনি একজন সুন্নি মুসলমান, তার উচিত নিজের ধর্মসত্ত্ব পরিবর্তন করে শিয়া মতাবলম্বী হওয়া।\* হ্যায়ুন শাহের প্রভাবে অবস্থানকালীন সময়ে

\* ১৫০১ সালে সাফতিদ রাজবংশ পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে শিয়া ধর্মসত্ত্ব গ্রহণ করে। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে শিয়া আর সুন্নির মাঝে পার্থক্য সৃচিত হয় এবং মুহাম্মদ (সা.) আইনসংগত উত্তরাধিকারী কে হবে এবং দায়িত্ব কি নির্বাচিত কাউকে প্রদান করা হবে নাকি হবে না সে বিষয়ের সাথে জড়িত, শিয়ারা মহানবীর জামাত আর তার আতীয় সম্পর্কিত ভাইয়ের বংশধরদের উত্তরাধিকারী দাবি করে। ‘শিয়া’ শব্দটার অর্থ ‘দল’ এবং ‘আলির দল’ শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ‘সুন্নি’ মানে ‘যারা মুহাম্মদের (সা.) রীতি বা ‘সুন্নাহ’ অনুসরণ করে। ঘোড়শ শতাব্দী নাগাদ দুটো ধর্মসত্ত্বের মাঝে নানা বিষয়ে যেমন প্রতিদিনের নামাজের প্রকৃতি প্রভৃতি ব্যাপক বিভেদের সৃষ্টি হয়।

অস্তত কেবল নীরবে বিষয়টি মেনে নেন। কথামতো তাকে একটি সেনাবাহিনীর কর্তৃত প্রদান করা হয় এবং হ্যায়ুন আফগানিস্তান পর্যন্ত অগ্রসর হন, যেখানে তিনি তার ভাই আসকারির কাছ থেকে কান্দাহার এবং কামরানের নিকট থেকে কাবুল দখল করেন। কাবুলে তিনি আর হামিদা আকবরের সাথে পুনরায় মিলিত হন। আকবর তখন বাবরের আরেক ভাগিনী খানদুরার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, যে মোগল রাজপরিবারের রমণী হবার কারণে যুদ্ধরত ভাইদের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিল। প্রজাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসেবে, তিনি বছরের আকবরের খৎনা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়। হ্যায়ুন তার অম্বাত্যদের সাথে উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মল্লযুক্তি নিজে অংশ নেন।

ভাইয়েরা যদিও আরো একবার মিলিত হন কিন্তু তাদের মধ্যকার একতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। কামরান আর আসকারি অচিরেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। আসকারির বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় হিন্দালের মৃত্যু হয়। হ্যায়ুন শেষ পর্যন্ত আসকারিকে হজ করতে মুক্ত পাঠাতে বাধ্য হন—মোগলদের মাঝে নির্বাসনের একটি প্রচলিত উপায়—সেখানেই তিনি মারা যান। কামরান দুবার কাবুল হ্যায়ুনের কাছ থেকে দখল করে এবং দুবারই সেটার কর্তৃত হারানোর পর হ্যায়ুনের বাহিনী ১৫৫২ সালে তাকে বন্দি করেন। কামরানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য হ্যায়ুনের পরামর্শদাতারা জ্ঞান-শব্দবির করেন, ‘রাজত্ব আর রাজ্য পরিচালনার সাথে ভাত্তের কোনো সম্বন্ধ নেই হতে পারে না। আপনি যদি স্ম্বাট হতে চান তাহলে ভাত্তের স্বাবেগ বর্জন করতে হবে...কেউ কারো ভাই নয়! সবাই মহামান্য স্বারাটের শক্তি! ’

হ্যায়ুন অনিচ্ছাসন্ত্রেও কামরানকে অক্ষ করতে সম্মতি দেন, যা প্রতিপক্ষকে অকার্যকর করতে তৈমুরীয় রাজবংশগুলোর মাঝে স্বীকৃত কৌশল হিসেবে প্রচলিত ছিল। হ্যায়ুনের কয়েকজন লোক উন্মানের ন্যায় ধন্তাধ্বনি করতে থাকা কামরানকে মাটিতে চেপে ধরে, তার চোখের মণি বারবার বল্লমের ফলা দিয়ে বিন্দু করে তারপরে ক্ষতস্থানে লবণ আর লেবুর রস ডলে দেয়। কামরান তার ক্রন্দনরত ভাইকে পরবর্তী সময়ে বলেন, ‘আমার নিজের দুর্কর্মের কারণেই আমার ভাগ্যে যা কিছু ঘটেছে।’ কামরানকেও এরপর মুক্ত হজ পালনে পাঠানো হয়, যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৫৫৪ সালে কাবুলে অবস্থানরত হ্যায়ুনের কাছে শের শাহের পুত্র আর উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহের হিন্দুস্তানে মৃত্যুবরণ করার খবর এসে পৌছায়। (শের শাহ নিজে একটি অভিযানের সময় বাকুদের বিক্ষেপণের ফলে ১৫৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।) শীঘ্রই আরো সুখবর এসে পৌছে—হিন্দুস্তানের সিংহাসনের জন্য তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেদের ভেতর লড়াই করছে। হ্যায়ুনের মতো দ্বিধান্বিত ব্যক্তিও এমন সুর্বণ সুযোগ উপেক্ষা করতে পারেন না। নিজের অল্প বয়সী উত্তরাধিকারী আকবরকে সাথে নিয়ে তিনি দ্রুত ভারতবর্ষের দিকে

অগ্রসর হন, তার প্রধান প্রতিষ্ঠানের দুবার পরাজিত করেন এবং ১৫৫৫ সালের জুলাই মাসে দিল্লি অধিকার করেন—শের শাহের আক্রমণের মুখে পলায়নের পরে পনেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

হ্মায়ুন পুনরায় নিজের সিংহাসনে আরোহণ করে নিজেকে জ্যোতিষবিদ্যা আর সাহিত্যের চর্চায় মগ্ন করলে বিশ্বিত হবার কিছু থাকে না। তিনি একটি মানবন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং শের শাহের প্রাসাদে শের মণ্ডল নামে পরিচিত বেলে পাথরের একটি ছোট অষ্টভূজাকৃতি কক্ষকে নিজের পাঠাগার হিসেবে সজ্জিত করেন। (তার মরহুম আব্বাজানের স্মৃতিকথার পাঞ্জলিপি, তার অন্যান্য মূল্যবান সম্পদের মতো তার যাবাবর জীবনে সব সময় তার সঙ্গেই থাকত।) কিন্তু তার নামের সাথে যুক্ত ‘সৌভাগ্যবান’ শব্দটা সব সময় ভ্রাতৃ বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে। ১৫৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যাবেলো সূর্যাস্তের সময়, তিনি তার জ্যোতিষীদের সাথে শের মণ্ডলের সমতল ছাদে বসে রাতের আকাশে শুক্রগহ কখন উদিত হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, যেহেতু তার মতে শুক্রতৃপূর্ণ ঘোষণার জন্য সেটা একটি অনুকূল সময়। তিনি কিছুক্ষণ পরে নিজের মহলে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যখন শের মণ্ডলের সংকীর্ণ ধারাল কিনারাযুক্ত সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে যাবেন পাশ্ববর্তী মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি তার কানে ডেসে আসে এবং ~~জ্বর~~ সম্মানিত পদযুগলের একটি তার আলখাল্লায় জড়িয়ে যায়... তিনি ভাস্তুসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং মাথা নিচের দিকে দিয়ে তিনি সিঁড়িতে এক জোরে আছড়ে পড়েন যে তার ডান কপালের পাশে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্তি হন আর তার ডান কান দিয়ে রক্ত নির্গত হয়।’ তিনি চেতন-অবচেতনের মাঝে তিন দিন অতিবাহিত করার পর ‘আমার ডাক এসেছে’ কথাটা বলে মৃত্যুবরণ করেন। তার তখন সাতচল্পিশ বছর দশ মাস বয়স এবং তার আব্বাজান বাবর যখন মারা গিয়েছিলেন তখনকার চেয়ে তার বয়স তখন মাত্র কয়েক দিন বয়স বেশি।

হ্মায়ুন তার জীবনের এক-তৃতীয়াংশের কম সময় ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেছিলেন। তার পুত্র আকবর, যিনি তার সমসাময়িক শেকসপিয়ারের মতো নিজের জন্মদিনেই মৃত্যুবরণ করেন, ঠিক তেষটি বছর বাঁচেন, যার পঞ্চাশ বছর তিনি ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেন আর এই সময়ের উন্পঞ্চাশ বছরই স্বার্গাট হিসেবে রাজত্ব করেন। তিনি ভারতবর্ষে মোগল শাসনকে ভিন্নদেশি দখলদারী থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ, স্থায়ী সাম্রাজ্যের কাঠামো দান করেন।



## ত্রিতীয় অধ্যায়

### আল্লাহ্ আকবর

কিশোর আকবরের রাজত্বকালের প্রথম হয় বছর, তার প্রধান দিনপঞ্জি রচয়িতা যেভাবে ব্যাপারটা বর্ণিত করেছেন, ‘নেকাবের পেছন থেকে’ পরিচালিত হয়েছিল, প্রথমে তার আকবাজানের প্রধান সেনাপতির তত্ত্বাবধানে এবং তারপরে তার পালক মা বা তাকে স্তনদানের জন্য নিযুক্ত ধাত্রীদের প্রধান মাহাম আগা আর তার পরিবারের অধীনে।<sup>\*</sup> আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, রাজস্থানের মরম্ভনিতে আকবর যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাকে তার পনেরো বছর বয়সী মায়ের স্তন্যপান করতে দেয়া হয়, ‘সত্তান বাংসল স্তনের অভয় লাভ করে তার মধু মাখানো ওষ্ঠব্য, তার জ্ঞানে প্রাণসঞ্চারী দৃঢ়ের প্রবাহে মধুময় হয়ে ওঠে।’ অবশ্য তৈমুরীয় রীতি অনুসারে তাকে এরপর উচ্চবংশীয় একাধিক স্তন্য দানকারী ধাত্রীর অধীনে অপর্ণ করা হয়। তারা তাদের আরাদ্দ অবস্থানের কারণে বিশাল প্রতিশ্রুতির অধিকারী হয় এবং তাদের সত্তান রাজকীয় নবজাতকের পালক ভাইয়ের মর্যাদা লাভ করে। আকবরের

- 
- \* আবুল ফজল, আরব বংশোদ্ধূত, এক করণিকের সত্তান। ১৫৭৪ সালে তিনি আকবরের অধীনে তেইশ বছর বয়সে কাজে যোগ দেন। তার আকবাজানের মতো উদারমনস্ক, তিনি স্ত্রাটের দিনপঞ্জি রচয়িতার দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি তার অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হন। তিনি দাবি করেন, ‘সত্তার বরাভয় ধন্য লেখনী’ দিয়ে সব কিছু রচনা করেছেন। তিনি যদিও আকবরের প্রতি পক্ষপাত্রস্ত ছিলেন এবং ক্রমাগত আর বাকবিস্তারের সাহায্যে স্ত্রাটের প্রশংসা করেছেন, তথাপি দিনপঞ্জি রচয়িতা হিসেবে তার অধ্যবসায় আর আপাত যথার্থতা সদেহাত্তীতভাবে স্বীকৃত। আকবর সবক্ষে ইংরেজিতে তার রচনার পরিমাণ ৪০০০ পৃষ্ঠার সামান্য কম হবে, এর প্রায় ৬০ ভাগ আকবরের আর তার পূর্বসূরিদের ইতিহাস, আকবরনামা, এবং অবশিষ্টাংশ আইন-ই-আকবরী কীভাবে রাজ্য পরিচালিত হতো আর দরবারের আনুষ্ঠানিকতা বিষয়ক।

শাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি পালক মা ছিল, যার কারণ তার জন্মের সময় নিজের অনুগত সমর্থকদের অন্য কিছু দেয়ার মতো সামর্য হ্যায়ুনের ছিল না। মাহাম আগাম পুত্র আদম খানের কাছে ক্ষমতা হ্যানান্তরিত হয়। আবুল ফজলের ভাষায় সে ‘যৌবন আর সমৃদ্ধি ধারা মাতাল’ হয়ে যায় এবং ‘উদ্ব্লত্যের বাতাসে তার গর্বের টুপি উড়ে যায়।’ তিনি দখল করা শহর থেকে স্বাটোর জন্য প্রেরিত সম্পদ আর দখল করা হারেমের সবচেয়ে সুন্দরী বাসিন্দাদের নিজের জন্য আলাদা রাখতে চেষ্টা করেন। ১৫৬২ সালের মে মাসের উক্তপ্ত এক দুপুরবেলা তিনি তার দেহরক্ষীদের নিয়ে আগ্রার রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ করেন যখন প্রতিদ্বন্দ্বী এক মঙ্গী প্রকাশ্যে দর্শন দান করছিলেন। আকবরের আরেকজন ধাত্রীর স্বামী এই মঙ্গী যাহোদয় যখন উঠে দাঁড়ান তাকে স্বাগত জানাতে তখন আদম খান তার পাণ্ডাদের একজনকে ইশারা করেন তাকে ছুরিকাঘাত করতে। সে তার কথায়তো কাজ করে। আদম খান তরবারি হাতে পাশে অবস্থিত হারেমের দিকে অগ্রসর হন, যেখানে আকবর ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু একজন খোজা প্রহরী দরজা আটকে ভেতর থেকে শিকল টেনে দেয়। উনিশ বছর বয়সী আকবরের ঘূম ইতিমধ্যে ভেঙে যায়, পাশের একটি দরজা খুলে বের হয়ে এসে আদম খানের দিকে দৌড়ে যান, চিন্কার করে ওঠেন ‘হারামির বাচ্চা!’ আদম খান ঘূরে দাঁড়িয়ে আকবরের পরনের কাপড়ের হাতা ধরতে চেষ্টা করেন। আদম খানের মুখে আকবর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুসি বসিয়ে দেন—তার দিনপাঞ্জি রচয়িতাঙ্গ প্রশংসনীর ভঙ্গিতে লিখেছেন, দেখে মনে হয়েছে যেন কেউ তার মুকুটদা দিয়ে আঘাত করেছে। আকবর তখনো সংজ্ঞাহীন আদম খানের দেহ প্রাসাদের প্রাচীর থেকে নিচে নিষ্কেপের আদেশ দেন, যা প্রায় দ্বিশ ফিট উঁচু। প্রথমবার ফেলার পরও যখন তার মৃত্যু হয় না তখন আকবর পুনরায় চুল ধরে তাকে উপর নিয়ে এসে আবার নিচে ফেলতে বলেন। এবার মাথা নিচের দিকে দিয়ে। আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, ‘তার গলা ভেঙে যায় এবং ঘিলু বেরিয়ে পড়ে। এভাবেই রক্ষণপাসু লম্পটটা তার অপরাধের উচিত শাস্তি লাভ করে।’ আকবর পর্দার আড়াল থেকে প্রত্যাশাত্মীতভাবে আবির্ভূত হন।

আদমের সাথে তার সংঘর্ষ থেকে বোঝা যায় আকবর ব্যক্তিগতভাবে সাহসী ছিলেন। তিনি তার আবাজানের কাছ থেকে উস্তুরাধিকার সূত্রে প্রাণ স্বারাজ্য বিস্তার করার ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন। আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, তিনি বিশ্বাস করতেন ‘একজন স্বাটোরে সব সময় বিজয় অর্জনের বিষয়ে আগ্রহী থাকতে হবে নতুনা তার প্রতিবেশীরা তার বিবরণে অন্তর্ধারণ করবে।’ তিনি প্রভৃতি হ্যাপনের জন্য পরবর্তী বছরগুলোতে বহু যুদ্ধ পরিচালিত করেছেন। গিলটি করা দীপ্তিময় বর্মে বেশির ভাগ সময় সজ্জিত হয়ে তিনি সামনে অবস্থান

করে তার বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতেন। দক্ষ আর নতুন ধারার প্রবর্তক একজন সেনাপতি হিসেবে তিনি জীবনে কখনো কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি। আকশ্মিক আক্রমণ আর চোরাগোষ্ঠা হামলায় দক্ষ আকবর নয় দিনে একবার তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। তার বাহিনীর চেয়ে অনেক বড় একটি বাহিনীকে বিশ্বিত আর পরাজিত করতে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি আর কামান দ্রুত স্থানান্তরের জন্য ভাসমান পটুন ব্যবহার করতেন। উচ্চ কোণে গোলা নিষ্কেপের জন্য তার একটি কামান ছিল, যেটাকে টেনে নিয়ে যেতে ১০০০ ষাঁড়ের প্রয়োজন হতো আর এমন কৌশল উন্নাবন করেছিলেন, যার ফলে চৌক্ষিক ম্যাচলক গাদাবন্দুক থেকে একসাথে শুলিবর্ষণ করা সম্ভব ছিল।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম বিজয় অভিযান, আজমির, গোয়ালিয়র আর জৌনপুরে পরিচালিত, তিনি তখনো পর্দার অন্তরালে অবস্থান করছেন সেই সময়ে তার পক্ষে পরিচালিত হয়েছিল। আকবর তার ব্যক্তিগত শাসনকালের গোড়ার দিকে রাজস্থানের (রাজপুতানা) কয়েকজন ক্ষমতাবান রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। রাজপুত, যাদের নামের মানে, ‘রাজার সন্তান’, এবং যারা সব সময় পৃথিবীর সাহসী যোদ্ধাদের অন্যতম এবং স্ক্রিপ্টানদের মতো যাদের মাঝে কঠোর সম্মানের সংহিতা প্রচলিত ছিল আর যাদের গোত্রসম্মত ক্ষটিশ হাইল্যান্ডের সমতুল্য। তাদের অনেকজনেই হিন্দু ভারতের নাইট বলা যায়। তাদের বীরত্বগাথা নিয়ে প্রচুর গল্প আর গান রচিত হয়েছে। নবম শতকের দিক থেকে রাজপুতরা উন্নতপূর্ণ ভারতে ধীরে ধীরে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে, যেখানে তারাই ছিল শাসক রাজবংশের বেশির ভাগ। তারা অবশ্য প্রায়ই একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান প্রবল গোত্রগত বৈরিতা আকবরের ‘বিভক্ত আর শাসন’-এর প্রাথমিক নীতিকে সাহায্য করেছে।

১৫৬৭ সালের শেষের দিকে আর ১৫৬৮ সালের গোড়ার দিকে আকবরের চিতোর অবরোধ রাজপুতদের বীরত্বের একটি গৌরবময় অধ্যায় কিন্তু একই সাথে তাদের আপাত স্বাধীনতার সমাপ্তিও বটে। চিতোরের দুর্গ নিচের সমভূমি থেকে খাড়াভাবে উঠে যাওয়া পৌমে এক মাইল লম্বা একটি বেলে পাথরের শিলাস্তরের ওপর অবস্থিত ছিল। আকবর তার সৈন্যদের দুর্গের নিকটে পৌছাবার সুযোগ করে দিতে একটি লম্বা, আবৃত আক্রমণ গলিপথ নির্মাণের আদেশ দেন, সাবাত, যার ভেতর দিয়ে পাশাপাশি দশজন অশ্বারোহী অঞ্চল হতে পারবে এবং গলিপথটার দেয়াল পাথর আর পাথরকুচি দিয়ে তৈরি করা হয় আর ছাদ কাঠ আর চামড়া দিয়ে আবৃত করা হয়। প্রতিদিন চিতোরের দুর্গ প্রাকার থেকে তবকিবা প্রতিদিন নির্মাণ কাজে নিযুক্ত শত শত শ্রমিককে হত্যা

করে, যারা ধীরে, সর্পিল ভঙিতে কিন্তু পাথরের মাঝ দিয়ে অপ্রতিরোধ্যভাবে এই মারাত্মক মনুষ্য নির্মিত সুড়ঙ্গটা তৈরি করছে। আকবর কয়েক মাস অবরোধের পর সহস্র দুর্গের বিভিন্ন স্থান থেকে অগ্নিকুণ্ড আর ধোয়া নিঃসৃত হতে দেখেন। একজন দর্শক তাকে ব্যাখ্যা করে যে, রাজপুতেরা যদ্যন পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পারে তখন তাদের পুরুষেরা নিজেদের বিয়ের জাফরান-হলুদ রঙের পোশাকে সজ্জিত হয়ে শহীদ হবার জন্য শেষবারের মতো আক্রমণ করার পূর্বে তাদের পরিবার জওহরবৰ্ত পালন করছে—‘শেষ ভয়ংকর উৎসর্গ, যা দেবতার উদ্দেশে রাজপুতদের হতাশ নিবেদন।’ অগ্নিশিখাগুলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিতার যেখানে রাজপুত রমণীরা নিজেদের আত্মাহৃতি দিচ্ছেন।

যুদ্ধ করে রাজপুত যোদ্ধারা মৃত্যুবরণ করার পর এবং তার বক্তৃত্ব স্থাপনের স্বাভাবিক নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আকবর চিতোর দুর্গে তখন যারা বেঁচে ছিল, যাদের বেশির ভাগই আশ্রয়সন্ধানী কৃষক, সবাইকে নির্বিচারে হত্যার আদেশ দেন। তিনি এটা করেছিলেন সম্ভবত এ অন্য যে, চিতোর রাজপুত প্রতিরোধের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল বা তিনি হয়তো ভবিষ্যৎ শক্তদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, যত বেশি প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলবে তিনি স্বীকৃতভাবে প্রত্যাঘাত করবেন। ১৫৭০ সাল একজন বাদে বাকি সব রাজপুত রাজা, মেওয়ারের রাজা (উদয়পুর) যিনি পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যোগল আধিপত্য স্থাকার করে নেন।

আকবর এর পরে পঞ্চিম উপজল্লাবর্তী রাজ্য গুজরাটের দিকে মনোযোগ দেন। আরব আর অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যের একটি প্রধান প্রবেশপথ হিসেবে, সেইসাথে মঙ্গার উদ্দেশে তীর্থযাত্রীরা এখান থেকেই যাত্রা শুরু করায়, এর অবস্থানের সুবিধার কারণে রাজ্যটা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল। যোগলরা প্রায়ই যা করে থাকে, আকবরও একটি তুচ্ছ অছিলার ওপর ভিত্তি করে নিজের কর্মকাণ্ডকে ন্যায়সংগত প্রতিপাদন করতে চান দাবি করেন, যে গুজরাট হুমায়ুনের সাম্রাজ্যের আজ্ঞাধীন ছিল। আকবর সেইসাথে তার বৈশিষ্ট্যসূচক কৌশলের সুযোগে রাজ্যের ক্ষমতাসীন অভিজাতদের মাঝে বিদ্যমান বিরোধের সুযোগ নেন, তাদের একটি দল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে দাবি করেন। আকবর পরবর্তী জীবনে কুটিলতার সাথে দাবি করবেন যে, তার প্রতিটি বিজয় ‘শ্বেচ্ছায় এবং আত্মপ্রশ়্য থেকে অর্জিত হয়নি...আমাদের সাধারণ মানুষের প্রতি দয়ালু হওয়া ছাড়া এবং তাদের নিপীড়কের হাত থেকে মুক্তি দেয়া ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না।’ গুজরাট অভিযান ছিল একটি সংক্ষিপ্ত অভিযান এবং ১৫৭৩ সালের শেষ নাগাদ গুজরাট নিরাপদে যোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আকবর, একজন সুন্নি মুসলমান, যখন রাজপুতদের সাথে যুদ্ধরত তখনই তাদের সাথে এবং তার শাসনধীন নতুন হিন্দু অধ্যুষিত সাম্রাজ্যের অন্যান্য হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে বক্রতৃ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারেন। তিনি একাধিক উপায়ে এই লক্ষ্য অর্জন করেন। আবুল ফজল প্রথমটা বর্ণনা করেছেন : ‘মহামান্য সম্রাট হিন্দুজানের এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজকুমারীদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এসব প্রীতিকর বন্ধনের সাহায্যে বিশ্ব শাস্তি আনয়ন করেন।’ আকবর উনিশ বছর বয়সে রাজপুত রাজকুমারীদের প্রথমজনকে বিয়ে করেন, আধাৱের (জয়পুর) রাজার কন্যা। তার এবং আকবরের অন্যান্য অমুসলিম স্ত্রীদের হারেমে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অনুমতি ছিল। আকবর অবশ্য তার নিজের কল্যানের অন্য ধর্মের শাসকদের সাথে বিয়ে দেননি এবং বস্তুতপক্ষে তার সময়কাল থেকেই এটা প্রথায় পরিণত হয় যে, মোগল রাজকন্যারা পারতপক্ষে একেবারেই বিয়ে করবে না, সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ সৃষ্টির সম্ভাবনা পরিহার করতে। আকবর তার দরবারে বয়োজ্যেষ্ঠ রাজপুত অভিজাতদের উচ্চপদে বহাল করেন। শীঘ্ৰই, ব্রিটিশ রাজকীয় বাহিনীর ক্ষেত্রের মতো, তার বাহিনীর আর মৌলাপতিদের মধ্যে অনুপাতহীন সংখ্যায় তারা বহাল হয়, তাদের রাজপুতদের অশ্বারোহী প্রহরী কিংবা রাজকীয় দুর্গপ্রাসাদে তারা প্রবেশ করার সময় ঢাক বাজানোর মতো বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

হিন্দু মন্দির অপবিত্রীকরণ আন্তর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১৫৬৩ সালে তিনি যখন জানতে পারেন যে তার আধিকারীকেরা আগ্রার চালুশ মাইল দূরে হিন্দু তীর্থস্থান মথুরা যা ডগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করে, দর্শন করার জন্য হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে বিশেষ কর আদায় করছে তিনি সাথে সাথে তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে এমন কর আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফরমান জারি করেন। ১৫৬৪ সালে মোঘলাদের অধুনির কারণ ঘটিয়ে, তিনি আরো অগ্রসর হয়ে কোরআনে বর্ণিত ‘বিধৰ্মী’দের ওপর আরোপিত জিজিয়া বিলুপ্ত করেন, যা মোঘলাদের দৃষ্টিতে শরিয়ার বা ইসলামি আইনের ‘সরল পথ’-এর অপরিহার্য উপাদান। আকবর সেইসাথে অসংখ্য কুন্দ, বৈশম্যমূলক আর মর্যাদাহনিকর রীতির যেমন হিন্দুরা তাদের কর দিতে বিলম্ব করলে মুসলিম কাজীদের তাদের মুখে থুতু ফেলতে পারার মতো উন্নত অধিকারের বিলুপ্তি সাধন করেন।

আকবর তার বিস্তৃত হতে থাকা সাম্রাজ্য সংঘটিত করতে পরম্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক প্রশাসনিক আর ভূমি আইন সংস্কার করেন। তিনি শের শাহের, যিনি নিজে একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, প্রবর্তিত পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে এটা

করেন এবং সামরিক অভিজাত্যকে উচ্চ মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত রাজকীয় আমলাত্ত্বে পরিণত করেন, যেখানে শুরুত্বপূর্ণ সবাই সাম্রাজ্যের সেবক হিসেবে বিবেচিত হবেন। রাজপুত এবং করদ রাজ্যগুলো যাদের শাসকরা মোগল আধিপত্য স্থীকার করে নিয়েছে এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ পরিচালনার বিনিয়য়ে রাজকোষে বার্ষিক কর পরিশোধে সমত্ব হয়েছে সেগুলো ভিন্ন আকর্ষণ তার সাম্রাজ্যের সমত্ব ভূমি তার নিজস্ব রাজকীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন এবং সেগুলো জাগীর হিসেবে বিভক্ত করেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার পক্ষে সেগুলো শাসন করার জন্য অভিজাতদের নিয়োগ করেন। রাজকীয় কর্মচারী, অভিজাতদের ঘরাণ জাগীর থেকে সংগৃহীত খাজনার পরিবর্তে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। তারা সামরিক দায়িত্ব পালন করুক বা না করুক, তিনি তার অভিজাত আর আধিকারিকদের দশ থেকে দশ হাজারের ভেতর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের প্রাধান্য পরম্পরাবিশিষ্ট সেনাপতি হিসেবে বিভক্ত করেন। রাজকীয় রক্ষণশালার প্রধানও ‘যুশত মসনবদার’ হিসেবে বিবেচিত হয়।\*

আকবর আরো ফরমান জারি করেন, যখন কোনো অভিজাত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে তার সম্পত্তি স্থান্ত কর্তৃক বাঞ্ছেয়ান্ত করা হবে। কারণ তিনি অভিজাতদের নিজের খেয়াল খুশিমতো তাদের জাগীর থেকে সরিয়ে দিয়ে বা সাম্রাজ্যের অন্যথাতে কোনো জাগীরে তাদের পাঠানোর পাশাপাশি তাদের মৃত্যুর পরে তাদের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের কাছ থেকে অধিকতর আনুগত্য প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রথম সেইসাথে অন্যত্র বৈরী শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টির সম্ভাবনাও বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন। দিনপঞ্জি রচয়িতাদের ভাষ্য অনুসারে তার পরও তাকে ১৪৪ বার বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছে—সবাই অসফল—তার রাজত্বকালে।

আকবর তার সাম্রাজ্য ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার, শব্দটার উভয় অর্থ অনুসারেই, শুরুত্ব বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। ব্রিটিশরা পরবর্তীকালে যখন ইংরেজি আর রেলপথ ভারত শাসনে ব্যবহার করেছিল, আকবর দরবারের ভাষা হিসেবে ফার্সি এবং রাস্তার দুই পাশে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষমুক্ত দীর্ঘ সড়ক পথ নির্মাণ করেন।\* উন্নত সড়ক বরাবর নির্দিষ্ট দূরত্বে

- \* ভারতীয়দের প্রবর্তিত শূন্যের উপর ভিত্তি করে আকবরের ‘দশের’ ব্যবহার নির্দিষ্ট ছিল। আবরী সংখ্যা হিসাবে আমরা যা তিনি সেগুলো বক্তৃতপক্ষে ভারতীয় সংখ্যা। মধ্যপ্রাচ্যের ভিত্তি দিয়ে সেগুলো মূলত ইউরোপে এসেছে।
- \* উদ্দু, বর্তমানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা, হিন্দীর সাথে মোগল শাসকদের ঘরাণ ব্যবহৃত ফার্সীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। যোগল সামরিক ছাউনিতে মূলত এটা ব্যবহৃত হতো এবং উদ্দু শব্দটির মানে ‘ছাউনি’।

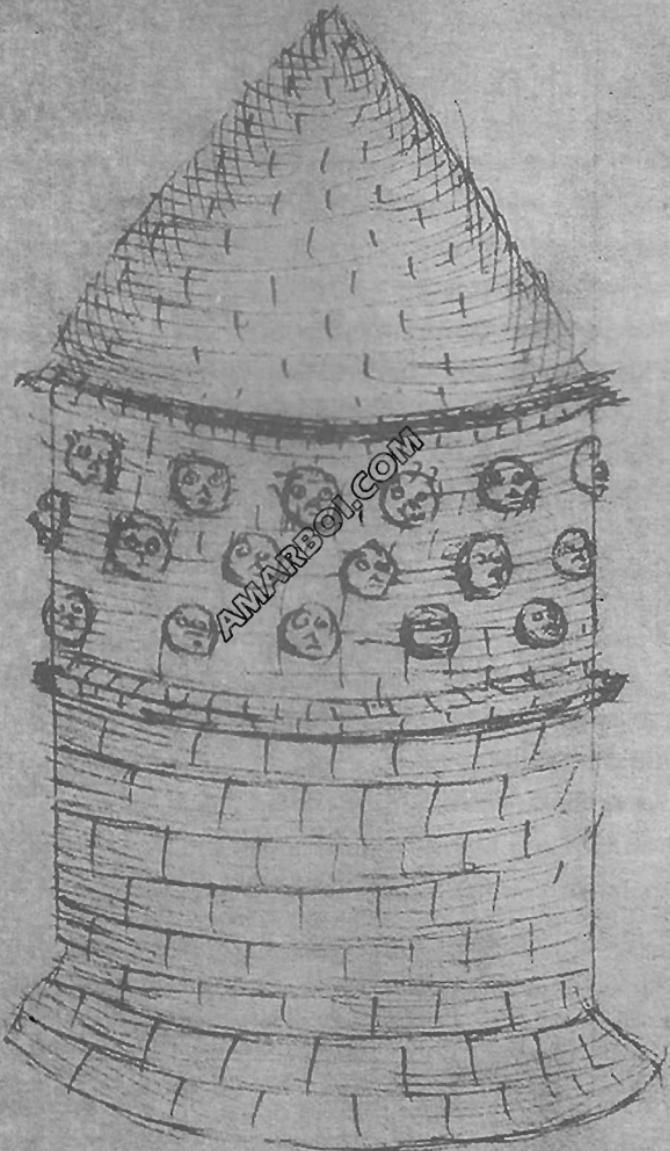
অবস্থিত সরাইখানায় পথিকেরা বিশ্রাম নিতে পারত এবং রাজকীয় বার্তাবাহকেরা তাদের বাহন ঘোড়া কিংবা বার্তা বদল করতে পারত। অশ্বপর্যায়ের মাধ্যমে এভাবে চরিষ ঘটার ভেতর রাজকীয় ফরমান দেড়শ মাইল পর্যন্ত বহন করা সম্ভব ছিল। পর্যটকদের রাজকীয় ক্ষমতার পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে নির্দিষ্ট দ্রুত পরে কোনো একটি সরাইখানায় বিদ্রোহী আর ডাকাতদের ভাগ্য কী লেখা রয়েছে সেটা দেখাতে ছিন্ন মন্তক খুঁগ করে রাখা থাকত। এক ইংরেজ পর্যটক বর্ণনা করেছেন কীভাবে ছিন্ন মন্তকগুলো একত্রে গেঁথে, কীভাবে ছেট একটি গম্ভুজ বা বলভি নির্মাণ করা হতো, যা ‘দেখতে অনেকটা কবুতরের বাসার মতো’, তিনি কি চার ফিটের বেশি উচু হবে না।\*

আকবরের কাছে, ধর্ম তার শাসনামলের পুরোটা সময় তার শাসনের এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনের মূল সুর হিসেবে বিদ্যমান থেকেছে। আকবর যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার হারেমে তিনশর অধিক স্ত্রী ছিল, অধিকাংশই রাজবংশীয় বধ। কোরআন শরিফে একজন লোকের সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে কিন্তু একটি আয়াতে সম্ভবত অগণিত রমণীকে বিভায় শ্ৰেণীৰ এক প্রকার বিয়ের কথা পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। আকবর এবং শিয়া ধর্মবেদ্বা উভয়ের মতামত অনুসারে, আকবরের অতিরিক্ত বিয়ে এই পূর্বোপায় দ্বারা আইনত সিদ্ধ হয়েছে। ধৰ্মীয় আইনের বিষয়ে আকবরের প্রধান উপদেষ্টা সুন্নি ধর্মবেদ্বা যখন দীর্ঘ বিতর্কের পর স্তুতি মত পোষণ করেন আকবর তখন তার পরিবর্তে অনেক নতজানু শিয়া ধর্মবেদ্বা নিয়োগ করেন। (প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে অট্টম হেনরির বর্জন তুলনীয়, যখন পোপ তার আ্যারাগনের ক্যাথরিনের সাথে বিবাহ বিছেন্দ আর আ্যানা বোলিনকে বিয়ে করার অনুমতি দিতে রাজি হয় না, তখন ক্যাথলিক বিশ্বাস পরিত্যাগ করে নিজের সৃষ্টি স্ট্রিটান ধর্মমত প্রচলের কারণ এখানেও স্পষ্ট।)

আকবরের মাঝে আপাতদৃষ্টিতে সব সময় একটি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তার কৈশোরের শেষ দিকে তিনি একবার সহসা ঘোড়া নিয়ে একাকী মরুভূমিতে চলে গিয়ে, সেখানে নিজের ঘোড়াটা ছেড়ে দেন এবং কঠিন ধ্যানে নিয়োজিত হবার পরে দাবি করেন যে ঐশ্বরিক কঠুন্দ শুনতে পেয়েছিলেন। বহু বছর পরে, পাঞ্চাবে শিকারের জন্য একটি ফলবান বৃক্ষের নিচে প্রস্তুতি মেয়ার সময়, ‘একটি মহামহিমাশ্চিত আনন্দ তার দৈহিক কাঠামোকে আপ্ত করে, স্বষ্টার (দর্শন) অবধারণের রশ্মি আপত্তি করে।’ অভিজ্ঞতাটা তাকে

\* ইংল্যান্ডে সেই সময়ে স্থানীয় ফাসিকাটে রাহাজানদের ঝুলন্ত দেহ প্রদর্শিত হতো এবং লভনেই কেবল টেমসের ওপর সেতুর বরাবর বিদ্রোহীদের ছিন্ন মন্তক প্রদর্শিত হতো, রাজকীয় ক্ষমতার কথা অনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিতে।

A Minaret or Pillar of  
dead men's heads.



পর্যটক পিটার মানডির অঙ্কিত মানুষের ছিল মশত্বকের গম্ভুজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

এতটাই বিপর্যস্ত করে তোলে যে তার আমিজান, হামিদা তার সন্তানের যত্নের জন্য আঘা থেকে বিশাল একটি দূরত্ব অতিক্রম করে তার কাছে ছুটে আসেন। তার সহজাত আধ্যাত্মিকতা আর এর সাথে রাজনৈতিক অভিপ্রায় যুক্ত হয়ে ধর্মকে তার সামাজিক বিভেদকারী শক্তির পরিবর্তে এক্ষের স্মারকে পরিণত করে, তুলনামূলক ধর্ম সমষ্টি আকবরকে আরো গভীর ধ্যানে মগ্ন করে তোলে। তিনি ‘ইবাদতখানা’—‘উপাসনা গৃহ’ হিসেবে পরিচিত স্থাপনা নির্মাণ করেন এবং সব প্রধান ধর্মভরে তাদ্বিকদের সেখানে প্রবেশ করে নিজেদের ধর্মমত ব্যাখ্যা আর বিতর্কের আমন্ত্রণ জামান।

বিবদমান মুসলমান পণ্ডিতরা যখন দ্রুত একে অপরকে ‘আহাম্বক আর খারেজি’ বলে অবহিত করতে আরম্ভ করে, তিনি তার নিজের পক্ষে অভ্রান্তি সত্যতার ফতোয়া জারি করেন। মুসলমান ধর্মবেতারা যদি কোঅরান শরিফের ব্যাখ্যা সমষ্টি ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে আকবর নিজে সে সমষ্টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়ায় বলা হয় যে, আকবর যখন বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে কোনো ফতোয়া জারি করেন সেটা নিয়ে কোনো প্রকার তর্ক করা যাবে না, যদি না সেটা প্রতিপাদনীয়রূপে কোরআন শরিফের কোনো পূর্বৌপায়ের বিরোধিতা করে। ১৫৩৪ সালে অষ্টম হেনরি ইংল্যান্ডে যা করেছিলেন ঠিক সে রকম তিনি নিজেকে তার ধর্মবিশ্বাসের অনাধ্যাত্মিক প্রধান করে তুলছিলেন, মোল্লাদের ক্ষমতাকে যাচুড়ান্তভাবে ধর্ব করছিল।

আকবর স্মাটের উপস্থিতিতে অভিবৃদ্ধিমন জানাবার ন্তুন একটি রীতি প্রবর্তন করেন, সাটাঙ্গপাত, মাটিতে কম্পাল ঠেকিয়ে যা জানাতে হতো। মুসলমান ধর্মের অনুসারী যারা বিশ্বাস করে এমন অভিবাদন কেবল আল্লাহতায়ালার প্রতি করা যথোর্থ তাদের কাছে এটা ছিল চরম ঘৃণিত একটি প্রথা। মোল্লার দল আকবরের অন্যান্য আরো অনেক তুচ্ছ রীতির প্রতি প্রতিবাদ জানায় যেমন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দৈহিক মিলনের পর নয়, পূর্বে গোসল করার সিদ্ধান্ত। তাদের এই ক্ষেত্রে আপত্তির কারণ সম্ভবত এই যে তিনি যৌনতা থেকে পরিচ্ছন্ন হবার অবশ্য পালনীয় আচার দূরে সরিয়ে এই অনভূতির উদ্দেশ্যের সময় একে আনন্দের বিষয়ে পরিণত করছেন, যা সেই প্রত্যাশায় পরিচ্ছন্নতা দাবি করে। তিনি একই সাথে রাবিবার পও জবাই করা নিষিদ্ধ করেন, কারণ দিনটা সূর্যের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত। তিনি দাঢ়ি রাখাকে নিরুৎসাহিত করেন, যা গোঁড়া মুসলমানদের কাছে মুখের শোভাবর্ধক হিসেবে জনপ্রিয়, সেইসাথে পেঁয়াজ আর রসুন খাওয়াও কমাতে বলেন। তিনি মনে করতেন, ‘এক টুকরো তুকের অপসারণ কোনোভাবেই ঈশ্বরের কাছে কাঞ্চিত হতে পারে না।’ এবং সে জন্য ফতোয়া জারি করেন, ছেলে বাচাদের বয়স বারো বছর না হওয়া পর্যন্ত তাদের খৎনা করা যাবে না, যখন তাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হবে যে তারা খৎনা করাতে চায় কি না।

আকবর হিন্দুদের সাথে তর্ক করেন, তাদের মহাকাব্যগুলোর অনুবাদ করান, তাদের উৎসবে যোগ দেন, এমনকি কপালে লাল তিলক দিয়ে তিনি সেখানে হাজির হন। বীতশ্রান্ত এক মুসলমান অভিযোগ জানায় যে, আকবর ‘আগুন, পানি, পাথর এবং বৃক্ষ আর অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু, এমনকি গরু আর তার গোবরকে গভীরভাবে ভক্তি করতে’ প্রয়োচিত হয়েছেন। আকবর পার্সিদের বা অন্য জরোট্টিয়ানদের মতো করেই সূর্যের সামনে নিজেকে প্রণত করতেন। তিনি তাও, জৈন আর কনফুসিয়াসের যত্বাদের ভেতরে সারবস্তুর সক্ষান পেয়েছিলেন। শিখরা তার মাঝে ‘মনোযোগী একজন শ্রোতার’ দেখা পেয়েছিল।

১৫৭৯ সালে আকবর ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপকূলে অবস্থিত গোয়ার পর্তুগিজ উপনিবেশের জেসুইট পাদ্রিদের তলব করেন। তিনি পাদ্রিদের প্রতি যথাযোগ্য সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক আপ্যায়িত করেন এবং তারা পরবর্তী সময়ে জানায়, তিনি বাইবেলের চার খণ্ড ‘গভীর শ্রুতির সাথে’ গ্রহণ করেছেন, প্রতিটি খণ্ড পর্যায়ক্রমে ছুঁন করে এবং সেটা ‘নিজের মাথায় ছাপন করেছেন, যা পাদ্রিদের মাঝে সম্মান আর শ্রুতির ইঙ্গিতবহু।’ তিনি এমনকি পাদ্রিদের ব্যক্তিগত প্রার্থনার ছোট বেদিযুক্ত ছানে প্রমোক্ষের সময় নিজের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে রেখেছিলেন এবং কখনো কখনো ত্রুশ পরিধানে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং একটি ত্রুশ তার শয়ালের পাশে বোলানো থাকত। পাদ্রিয়া দুই বছরের অধিক সময় আশাবাদী ছিলেন, তিনি হয়তো কনস্ট্যান্টিনের সমকক্ষ হয়ে একটি সাম্রাজ্যকে প্রিস্টান ধর্মতের নিকট অর্পণ করবেন কিন্তু তিনি সেটা করেননি।

আকবরের কাছে, ভূমগুলের চারপাশের অসংখ্য ধর্মতের মাঝে প্রিস্টধর্ম একটি, প্রতিটি বিশ্বাসের ভেতরেই সত্ত্বের উপাদান রয়েছে। আকবর বিশ্বে কোনো ধর্ম গ্রহণ করার পরিবর্তে একটি নতুন ধর্মতের সূচনা করেন—দীন ই ইলাহি নামে পরিচিত—যা তার প্রজাদের একতাবন্ধ করবে তাদের নিজেদের সন্তান ধর্মবিশ্বাস পরিহার করতে বাধ্য না করেই। তার প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব শক্ত গাঁথুনির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল না, যেখানে পুনরুত্থান আর কর্ম উভয় নীতিই গৃহীত হয়েছিল এবং সকল জীবিত বস্তুর প্রতি ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা এবং দয়া প্রদর্শন করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। দশটা অধর্ম আর দশটা সদ্গুণের নামোল্লেখ করা হয়। সূর্যকে দেবতৃ জানে পূজা করা হয় এবং সৃষ্টির সাথে একীভবন চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। যেহেতু ‘রাজার অঙ্গর্জানের মাঝেই দিব্য নিজেকে প্রতীয়মান করবে’, আকবর নিজে দৈব আর মানবতার মধ্যবর্তী একমাত্র সংযোগ পথ, কিন্তু তিনি নিজের জন্য কোনো দিব্য মর্যাদা দাবি করেছিলেন কি না, সেটা কখনো পরিষ্কার করা হয়নি। তিনি তার

সাম্রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রায় পরিবর্তন সাধন করে সেখানে ‘আশ্লাহ আকবর’ কথাটা উৎকীর্ণ করেন, পূর্বে যেখানে কেবল তার নাম উৎকীর্ণ করা থাকত। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একটি শব্দ দুটোর মানে ‘স্তুষ্ট আকবর—মহান—কিন্তু এই শব্দ যুগলকে ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় ‘আকবরই স্তুষ্ট।’

আকবরের প্রথম সারির অনেক শীর্ষস্থানীয় অঘাত নিজেদের স্বার্থের কারণে যদিও তার ধর্মবিশ্বাস মেনে নেন, তিনি কখনো এটাকে ধর্মান্তরিতকরণের ধর্মমতে পরিণত করেননি; সে কারণেই মতবাদটি কখনো ব্যাপক অনুসারী লাভ করেনি এবং তার মৃত্যুর পর বিশ্বৃতির অতলে তলিয়ে যায়। অবশ্য ধর্মীয় বিতর্কের তুমুল উপস্থিতি আর আকবরের সারা জীবনের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তার প্রজাদের ডেতের অন্তর্ভুক্তির একটি বৃহত্তর বোধের জন্ম দেয়, তারা তার সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মমতগুলোর যেটার প্রতিই বিশ্বস্ত থাকুক।



আকবরের বয়স যখন ঘরের ঘাঁটামাটি এবং অসংখ্য স্তুর্তী থাকা সত্ত্বেও তিনি তখনো জীবিত কোনো উত্তরাধিকারীর প্রিতৃত্ব অর্জন করেননি এবং পীর-ফকিরের সাথে পরামর্শ করা শুরু করেন। শেখ সেলিম চিশতি নামে একজন মুসলিম আধ্যাত্মিক সাধক বা সুফির স্টুপকে জানতে পারেন, আগ্রার তেইশ মাইল পশ্চিমে সিক্রির ছোট একটি স্টুপদে বাস করেন, তিনি তার সাথে দেখা করতে যান।<sup>\*</sup> মহান শেখ আকবরকে সান্ত্বনা দেন যে তার তিনটি পুত্রসন্তান হবে। আকবরের প্রধান মহিষী, আঘারের রাজপুত রাজার কন্যা, এর কিছুদিনের ডেতেরই গর্ভধারণ করেন। আকবর তাকে শেখ সাহেবের কাছে অবস্থান করতে প্রেরণ করেন, যাতে তার গর্ভধারণ সৌভাগ্য বয়ে আনে। ১৫৬৯ সালের ৩০ আগস্ট, সিক্রিতে তিনি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলে মরমি সাধকের নাম অনুসারে আকবর তার এই পুত্রের নাম রাখেন সেলিম কিন্তু স্ম্যাট হবার পর আমরা তাকে জাহাঙ্গীর নামেই চিনি। অন্য দুই পুত্র মুরাদ আর দানিয়েলের জন্ম অন্য মায়েদের গর্ভে, পরবর্তী তিনি বছরের ডেতেরই জন্মগ্রহণ করেন, একজন জন্মগ্রহণ করেন সিক্রিতে আর অন্যজন চিশতির অন্য আরেকটা আশ্রমে।

\* নানা ধরনের মরমি তরিকার মাধ্যমে সুফি সাধকরা স্তুষ্টির সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুসন্ধানের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে থাকে। সুফি শব্দটার মানে ‘যারা সুফ পরিধান করে’, পশ্চের তৈরি এক ধরনের রূক্ষ পোশাক। মরমি সাধকরা ত্রিস্টান তপস্বীদের মতোই বিশেষ এক প্রকার সেবাস গ্রহণ করেছে দারিদ্র্য আর কৃত্ত্বাতর লক্ষণ হিসেবে।

আকবর তার পরামর্শদাতাকে সম্মান প্রদর্শন করতে এবং সিক্রি থেকে তার জন্য যে সৌভাগ্য বয়ে এসেছে তা থেকে যথার্থভাবে লাভবান হতে, তিনি সিদ্ধান্ত নেন, সেখানে নতুন একটি শহর তৈরি করে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রা থেকে সেখানে স্থানান্তরিত করবেন। তিনি পরবর্তী সময়ে সিক্রির নাম 'ফতেহপুর' উপসর্গযোগে অলংকৃত করবেন, যার মানে 'বিজয়ের নগর', গুজরাটে তার সামরিক সাফল্যের স্মারক। আকবরের শাসনামলে ফতেহপুর সিক্রি অবশ্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ প্রকল্প নয়—সেটা ছিল তার আকবাজান হুমায়ুনের মকবরা। দিস্ত্রি দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এই বিশাল উদ্যানবেষ্টিত মকবরা নির্মিত হয়েছিল এবং অনভিজ্ঞ একজন লোকই বুঝতে পারবে, এটাই তাজমহলের স্পষ্ট অনুদৃত। একটি বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে লাল বেলে পাথরের বর্গাকৃতির বাইশ ফিট উচু খিলানযুক্ত মোকাম-কুর্সির ওপর একটি প্রতিসম পরিকল্পনা অনুসারে মকবরাটা নির্মিত হয়েছে। মকবরার বেলে পাথরের ওপর সাদা মার্বেলের জটিল নকশা প্রণিত করা হয়েছে এবং সৌধের কেন্দ্রস্থলে সাদা মার্বেলের একটি চওড়া গমুজ, যা ইবানের পেছনে বা সৌধের দেয়াল থেকে সরিয়ে এনে নির্মিত খিলানাকৃতি প্রবেশপথ অবস্থিত। অধিকাংশ যোগল ইয়ারাত থেকে এটা একেবারেই আলাদা। এই মকবরাটার নির্মাণের সাথে দুজন খ্যাতিমান স্থপতির নাম জড়িয়ে রয়েছে, সৈয়দ মোহাম্মদ আর তার পিতা উস্তাদু-কি-উস্তাদ মীরক সৈয়দ মির্জা গিয়াস। তারা উভয়েই পারস্যের অধিবাসী এবং মকবরাটা মূলত পারস্যের স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত, যেখানে রয়েছে অষ্টভূজাকৃতি সমাধিকক্ষ আর খিলানযুক্ত প্রতিহার। মকবরায় একটি স্থানীয় উপাদান অবশ্য রয়েছে সেটা হলো গমুজে অধিরোপিত বাইশ ফিট উচু পিলারের কন্দসদৃশ পঞ্জের কারুকাজ এবং খিলানের ওপরের দেয়াল আর মকবরার মূল অংশের প্রতিটি ছাদে অবস্থিত ছাতীতে—হিন্দু রাশিচক্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক, যা আজ্ঞা আর বস্ত্র মাঝে ভারসাম্য নির্দেশ করে—ছয় কোণবিশিষ্ট তারকা। (ছয়ী শব্দটার মানে 'ছাতা' কিন্তু স্থাপত্যবিদ্যায় এর মানে শুল্কযুক্ত আর গমুজবিশিষ্ট উন্মুক্ত শামিয়ানা।)

ভারতবর্ষে হুমায়ুনের মকবরায় প্রথম এত বিপুল পরিমাণ মার্বেল আর বেলে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। স্থাপত্যবিদ্যার কোনো কোনো ঐতিহাসিক এমনও ইঙ্গিত করেন, সাদা (মার্বেল) আর লালের (বেলে পাথর) সর্বজনীন ব্যবহারের মাধ্যমে, ছিতৰ্ধি আকবর যোগলদের সাথে হিন্দুদের সামাজিক কাঠামোর দুটো শীর্ষস্থানীয় জাতের—ব্রাহ্মণদের সাদা আর ক্ষত্ৰিয়দের লালের সংযোজন ঘটিয়েছেন।

আকবর যমুনার তীরে অবস্থিত আগ্রার দুর্গ পুনরায় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নিজের সামর্থ্যের প্রদর্শন করতে বাস্তবিকই দুই হাতে দুজন

প্রাণবয়স্ক লোককে উঁচু করে তুলে ধরে বেলে পাথরের তৈরি দেড় মাইল দীর্ঘ আরক্ষা প্রাচীরের পুরোটা দৌড়ে অতিক্রম করেন। ফতেহপুর সিক্রিন্টেই অবশ্য স্থাপত্যকলা সমষ্কে তার ধারণা ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একটি বিশাল চতুর্ভুজের আকৃতিতে শহরটা গড়ে উঠেছে, যার তিন দিকে দুর্গ নির্মাণপূর্বক শক্তিশালী করা হয়েছে এবং বাকি একটি দিকে লম্বা সরু ছুঁড়াযুক্ত গিরিপর্বতের অবস্থান। শহরটা যদিও মোগল রীতি অনুসরণ করেই নির্মিত হয়েছে কিন্তু ইমারতগুলোর নির্মাণশৈলীতে, যার অনেকগুলোই সংরক্ষণের কারণে আজও দারুণভাবে টিকে আছে, প্রায় পুরোপুরি হিন্দু প্রভাব রয়েছে। শহরটা বেলে পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছে, যা একজন দক্ষ পাথর খোদাইকারী সূর্যধর যেভাবে কাঠে খোদাই করে সেভাবে খোদাই করতে সক্ষম। হিন্দু মন্দিরের কাঠের অলংকৃত ভাস্কর্যের সাথে তাই স্পষ্টভাবে খোদাই করা অলংকরণের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বেলে পাথরের শুণাবলির জন্য প্রাক গঠনের সুযোগ পাওয়া যায়। ইউরোপ থেকে আগত জেনুইট পাত্রি, ফাদার আঙ্গোনিও মনসেরাত, লক্ষ্য করেছেন, ‘পাথর খোদাইয়ের শব্দের কারণে আকবর নিজে যেন বধির না হয়ে যান সে জন্য তিনি সব কিছু ইমারতের সঠিক পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে সব কিছু দারুণ দক্ষতার স্মৃতি অন্যত্র নির্মাণ করেন এবং নির্মিত টুকরোগুলো এরপর নির্ধারিত স্থানে সিয়ে এসে পরম্পরারের সাথে যুক্ত আর গ্রন্থিত করা হয়।’ ফতেহপুর সিন্ডির পাথর খোদাইকারীদের কাজে আকবরের ব্যাপক আগ্রহের বাস্তবকৃতি অনুচিতে দেখা যায়। মনসেরাত আরেকটু এগিয়ে গিয়ে জানান, ‘আকবর মাঝেমধ্যেই অন্য শ্রমিকদের সাথে একত্রে পাথর আহরণের স্থানে গিয়ে নিজে পাথর বাছাই করতেন। তিনি আমোদের জন্য হলেও, সাধারণ কারিগরের শিল্প-কৌশল অনুশীলন...করতেও কখনো পিছপা হতেন না।’

ফতেহপুর সিক্রিন্টে মনসেরাত উল্লেখ করেছেন প্রাক গঠন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি কিন্তু তার পরও এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না কীভাবে নয়টা তোরণঘারযুক্ত প্রাচীরবেষ্টিত এ শহরটা মাত্র সাত বছরে নির্মিত হয়েছিল। নিরাপত্তা প্রাচীরের অভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় টাকশাল, হাস্যামখানা, উদ্যান, মসজিদ, অভিজাতদের বাসস্থান এবং সেইসাথে অবশ্যই আকবরের নিজের বসবাসের জন্য নির্মিত রাজপ্রাসাদ। তার ব্যক্তিগত মহল থেকে ঝলমলে অনুপ তালাও বা ‘অতুলনীয় জলাধার’ দেখা যেত।

বিশাল হারেম, যার নিরাপত্তার জন্য ছিল প্রহরীদের একটি বাসস্থান আর পুরু ধাতব পাত্যযুক্ত দরজা যার সাথে দুর্গেরই সাদৃশ্য বেশি। হারেমের অধিবাসী মেয়েরা দেয়ালের অনেক উচ্চতে অবস্থিত পর্দা ঘেরা বারান্দা থেকে বাইরের পৃথিবীতে উঁকি দেয়ার সুযোগ পেত। কিন্তু এসব পুরু দেয়ালের পেছনে ছিল

বিলাসবহুল প্রমোদকানন। উজ্জ্বল ফুলের কেয়ারির মাঝে খেলা করত পানির কারনা এবং সূর্যের আলোয় ছাদের উজ্জ্বল মীল রঙের টালি দ্যুতি ছড়াত। যখন প্রশান্তিদায়ক বাতাস প্রবাহিত হতো, মেয়েরা একটি উচু শামিয়ানার নিচে সমবেত হতো—হাওয়া মহল বা ‘বায়ুকানন’—সবাই মিলে সময়টা উপভোগ করতে। তাদের মহলের লাল বেলে পাথরের খোদাই করা ভাস্তর্য আর পরম্পরের সাথে সংযুক্ত প্রাঙ্গণের মাঝে হিন্দুদের একটি ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বিদ্যমান। আকবর, যিনি পর্দা ঘেরা সুড়মের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা ব্যবহার করে হারেমে প্রবেশ করতে পারতেন, ধারণা করা হয় তিনি তার রক্ষিতাদের সাথে লুকাচুপি খেলতেন বা নর্তকীদের দিয়ে দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে শতরঞ্জ উপভোগ করতেন।\*

ইমারতসমূহের ভেতরে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ইমারত একটি হলঘর, যার অভ্যন্তরে একটি চওড়া, দারুণভাবে কারুকাজ করা একটি স্তম্ভের ওপর একটি মঞ্চ রাখিত রয়েছে, যেখান থেকে সরু, সমকোণে অবস্থিত ঝুলন্ত সেতুর সাহায্যে প্রত্যেক কোণে অবস্থিত ঝুলন্ত প্রদর্শনী কক্ষে যাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা এর সুনির্দিষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে প্রচুর বিতর্কের জন্য দিয়েছেন কিন্তু অধিকাংশের বিবেচনায় আকবর এটাকে দর্শন দানের কামরা হিসেবে ব্যবহার করতেন। তিনি যখন মঞ্জিপুরিভুদের বৈঠক আহ্বান করতেন, তখন তিনি বৃত্তাকার মঞ্চের ওপর আবস্থান গ্রহণ করতে পারতেন এবং যারা সেই মুহূর্তে বারান্দায় অবস্থাল করছিল তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে পারতেন, যাদের পক্ষে যদি প্রয়োজন হতো তার দিকে সেতুর ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারত।

রালফ ফিচ, গোড়ার দিকের একজন ইংরেজ বণিক, আগ্রা আর ফতেহপুর সিক্রি দেখে এতটাই বিমোহিত হয়েছিলেন যে তিনি লিখেছেন, ‘(তারা) দুটো বিশাল বড় শহর। তাদের যেকোনো একটি শহরই লভনের চেয়ে অনেক বিশাল এবং জনসংখ্যাও অনেক বেশি।’ অবশ্য দৃষ্টিনন্দন ফতেহপুর সিক্রিতে অবশ্য মাত্র চৌদ্দ বছর পরিপূর্ণভাবে জীবনযাত্রা বজায় ছিল, এর পরই ১৫৮৬ সাল থেকে এটা ধীরে ধীরে একটি পরিভ্যক্ত শহরে পরিণত হয়। শহরটার পরিত্যাগের কারণ নিয়ে অনেক বিতর্ক হলেও কখনো নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা

\* তাজমহলের গাইডরা বর্তমানে পাথরের নিচু কিছু জায়গার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি করবে যে সেগুলোতে হারেমের মেয়েরা তাদের অলংকার লুকিয়ে রাখত, যাতে অলংকারের কিন্ডিনী শব্দ তাদের অবস্থান ইঙ্গিত করতে না পারে। দাবা খেলা উৎপন্নিতি হয়েছে তারতবর্ষে এবং পারস্যের কাছ থেকে এটা ইউরোপে পৌছে গিয়েছে, সেখানে প্রচলিত ‘চেক মেট’-এর অভিব্যক্তি মূলত ফার্সি ‘শাহ মাত’ থেকে এসেছে, যার মানে, ‘রাজা পরাত্ত হয়েছেন’।

যায়নি। দুর্বল পানি সরবরাহ এবং অসম্মোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থার হয়তো কিছু অবদায়ী ভূমিকা রয়েছে। ফতেহপুর সিঙ্গি আগ্নার মতো আকবরের সাম্রাজ্যকে সংযুক্তকারী অতিকায় ট্রাক রোডের যেকোনো একটির পাশে অবস্থিত ছিল না; এমনকি শহরটা যমুনার তীরেও অবস্থিত নয়, যা পণ্য পরিবহন আর ভ্রমণের অন্যতম প্রধান নদীপথ, বিশেষ করে যারা দিল্লি থেকে এবং দিল্লি অভিমুখে যাওয়া করতে আগ্রহী। আকবর অবশ্য কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফতেহপুর সিঙ্গি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি—সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এটা ঘটেছে।

আকবরের মনোযোগ অন্য আরো অনেক বিষয়ের মাঝে একটি একেবারেই ভিন্ন স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়—কাশী। ১৫৮৬ সালে সংক্ষিপ্ত একটি অভিযানের মাধ্যমে দখল করার পর, কাশীর আকবর আর তার উস্তুরসূরিদের মন জয় করে নেয়। উস্তুর ভারতের উচু পার্বত্য এলাকার মাঝে কাশীরের উপত্যকা অবস্থিত এবং জায়গাটা মাঝে নরকই মাইল দীর্ঘ আর পঁচিশ মাইল চওড়া। খিলম নদী ধারা বিশোত, এটা একটি সৃষ্ট্যামল-শ্যামলি-লা, এর ঢালে বাগানবিলাস আর জুনিপার এবং বিশেষ এক পুকার ফার এবং সিডারে ছেয়ে আছে, যখন এখানের হৃদের প্রান্তদেশ শঙ্গলার আর পাইনে ছেয়ে আছে। আকবর শরতের উজ্জ্বল রঙের বিন্যাস বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং গ্রীষ্মে জাফরানের ক্ষেত্রে বেগুনি রং।

১৫৮০ সালের মাঝামাঝি নাম্বুজ, তখন তার বয়স প্রায় চল্লিশ ছুইছুই করছে, ক্ষমতা আর আড়ম্বরের মধ্য গগনে তার অবস্থান, ভারতীয় আর ইউরোপীয় নির্বিশেষে যারাই তাকে দেখেছে তাদের সবার চোখেই তাকে আকর্ষণীয়, রাজকীয় আর অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম একজন মনে হয়েছে। ফাদার মনসেরাত তাকে বর্ণনা করেছেন এমন একজন হিসেবে ‘যার রাজকীয় মহিমার সাথে মানানসই আর সংগতিপূর্ণ তার শুণাবলি, যার ফলে তাকে যারা প্রথমবারের মতো দেখেছে তারাও তাকে দেখামাত্রই বুঝতে পারত যে তিনিই স্ম্যাট। তার কাঁধযুগল প্রশংসন্ত আর দৈধ্য বাঁকানো দুটো পা ঘোড়া পরিচালনায় বিশেষভাবে কার্যকরী এবং শ্যামলা বা বৌধ করি চাপাই দেহত্বক... তার অভিব্যক্তি প্রশংসন্ত, খোলামেলা আর একই সাথে গাঢ়ীর্যপূর্ণ এবং তিনি যখন কুপিত হতেন, স্ম্যাট তখন ভয়ংকর... তিনি সবার কাছে নিজেকে কতটা অভিগম্য করে তুলেছিলেন সে সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা কঠিন... তাকে দেখতে এবং তার সাথে কথা বলতে সাধারণ মানুষ এবং তার অমাত্যরা যাতে সুযোগ পায় সে জন্য প্রতিদিনই তিনি সুযোগ সৃষ্টি করতেন; তিনি সবার প্রতি কঠোর মনোভাব ধারণের পরিবর্তে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করতেন নিজেকে মধুরভাষী



AMARBOI.COM

আকবরের ক্ষেত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

এবং বন্ধুভাবাপন্ন হিসেবে উপস্থাপন করতে... তার প্রজাদের মনে তার জায়গা করতে এই অমায়িক ব্যবহার আর সৌজন্যতাবোধ কর্তৃ ভূমিকা রেখেছিল সেই সত্যিই বিস্ময়কর... তার একেবারেই নিজস্ব বোধক একটি অন্তর্দৃষ্টি ছিল আর বিচক্ষণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

আকবরের পুত্র সেলিম, অবশ্য একটি দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রাজকীয় প্রস্থাগারে ব্যয়বহুলভাবে বাঁধাই করা পাশুলিপির সংখ্যা ২৫,০০০ অতিক্রম করলেও তার আকাজান ছিলেন 'অশিক্ষিত'। কিন্তু সব সময় বিজ্ঞ আর শিক্ষিত মানুষদের সাথে আলাপচারিতার ফলে, তার মুখের ভাষা এতটাই মার্জিত ছিল যে তার সাথে আলাপ করে কেউই কখনো বুঝতে পারত না যে তিনি একেবারেই 'অশিক্ষিত'। আকবরের বৃক্ষিক্ষিত তার চারপাশের বিশাল পৃথিবী সমক্ষে তার গভীর কৌতুহল থেকেও সহজবোধ্য, যা তাকে করেছিল 'বিদেশিদের প্রতি দারুণ প্রসন্ন'।

১৫৭৭ সালে দারুণ সুশিক্ষিত একজন ডিনদেশি, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পার্সি অভিজাত নাম মির্জা গিয়াস বেগ, আকবরের দরবারে উপস্থিত হন। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু নিঃশ্ব লোকটা, অর্থনৈতিক কারণে নিজের মাত্ভূমি পরিত্যাগ করে তার আসন্ন প্রসবা জ্ঞানী আর তিখিয়ে ছেট ছেট সন্তান নিয়ে বন্য আর বসতিহীন অঞ্চলের ভেতর পাড়ি দিয়ে নিজের ভাগ্য ফেরাতে মোগল দরবারে এসেছিলেন। এই দুঃসাধ্য এইই বিপজ্জনক যাত্রায় অধিক নিরাপত্তার জন্য তারা বণিকদের একটি কান্দেক্কার সাথে যোগ দিয়েছিল। তারা পারস্য অতিক্রম করার পূর্বেই তক্ষর পরিবারটার ওপর হামলা চালিয়ে তাদের নিঃশ্ব করে দুটো খচর ছাড়া বাকি সব কিছু ছুরি করে নিয়ে যায়। পরিবারটা পর্যায়ক্রমে পরিশ্রান্ত জন্ম দুটোর পিঠে ঢড়ে অহসর হয়ে, হত্যাণী দলটা কান্দাহার পৌছায়, যেখানে গিয়াস বেগের জ্ঞানী একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তারা তাদের নবজাত কন্যার নাম রাখেন মেহেরুন্নিসা, 'রমণীকুল শিরোমণি'। কোনো কোনো দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, বেপরোয়া, দুর্গত পিতা-মাতা তাদের নবজাত কন্যাকে মৃত্যুর জন্য অসংরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করেন কিন্তু কাফেলার ধনাঢ়ি ব্যবসায়ীর দৃষ্টি মেয়েটার স্ফুর্দ্ধ অবয়ব নড়াচড়া করতে দেখে তাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে মেয়েটার মাকে খুঁজে বের করেন এবং তাদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্য গল্পগুলোতে ফুলিয়ে ফাপিয়ে যোগ করা হয়েছে কীভাবে পিতা-মাতা, সব কিছু সন্ত্রেণ, নিজেদের নবজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। গিয়াস বেগ দ্রুত যে গাছের নিচে মেয়েকে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন সেখানে ফিরে এসে কুঙ্গলীকৃত বিশাল একটি কালো কালকেউটের কাছে শুয়ে আনন্দে হাত-পা ছুড়তে থাকা অবস্থায় মেহেরুন্নিসাকে খুঁজে পান। উন্নত পিতাকে

এগিয়ে আসতে দেখে সাপটা কুশলীকৃত অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে নীরবে প্রস্থান করলে গিয়াস বেগ নিজের কন্যাকে ফিরে পান।

বাস্তবতা যাই হোক, মেহেরন্নিসা তার জীবনের শুরুর এই অনিচ্ছিতা কাটিয়ে উঠে তার পরিবারের সাথেই মোগল ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হয়। ফতেহপুর সিক্রিতে পৌছাবার পর, দরবারে আগত আগস্ত কর্তৃকদের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুসারে গিয়াস বেগকে আকবরের সামনে উপস্থিত করা হয়। পার্সি অভিযাত্রিক তৎক্ষণিকভাবে একটি ছাপ ফেলতে সক্ষম হন। তিনি তার আকবাজানের মতোই জন্মস্থেই বাগিচা অর্জন করেছিলেন। একজন স্বত্ত্বাব-কবি, যিনি কালক্রমে ইসফাহানের উজির হয়েছিলেন। তার পরিবারের অন্য সদস্যরা ইতিমধ্যে মোগল দরবারে নানা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করায় এটাও তার জন্য শুভ হয়েছিল। গিয়াস বেগের মতো সাফল্য অবশ্য কেউই অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, যার পরিবার পরপর বেশ কয়েকজন সন্ত্রাটিকে মানসিক আর বৌদ্ধিকভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তার কন্যা এবং পৌত্রী মোগল সন্ত্রাঙ্গী হন এবং তার প্রপৌত্র মোগল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

গিয়াস বেগের শুরু অবশ্য এত কিছুর প্রতিক্রিয়া দেয় না। আকবর তাকে মাঝারি একটি পদে নিয়োগ দিয়ে উত্তরের সীমান্ত-ফাঁড়ি কাবুলের কোষাধক্ষের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন। ১৫৯৬ সালে, তাকে আঘায় ফিরিয়ে এনে রাজদরবারের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়। মধ্যবর্তী বছরগুলোতে মেহেরন্নিসা একজন সুন্দরী আর শুণ্ডিতা মেয়ে হিসেবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। একটি ভাষ্য অনুসারে, ‘অন্য কোনো মেয়ে নৃত্য, গীত, চিত্রকলা আর পদ্য রচনায় তার সমকক্ষ ছিল না। তার মেজাজ ছিল খেয়ালি, প্রণবন্ত আর বিদ্রূপাত্মক ধীশক্তি এবং উদ্বাম আর বেপরোয়া সন্তুর অধিকারী।’ এত কিছু প্রশংসনার আড়ালে যা বলা হয়নি সেটা হলো তিনি ভীষণ যৌনাবেদনময়ী ছিলেন। তার যখন সতেরো বছর বয়স তখন তার বিয়ে হয় উচ্চ বংশীয় আর কুশলী এক পার্সি সেনাপতির সাথে, যিনি আকবরের সেনাবাহিনীর নানা অভিযানে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন এবং সাহসিকতার জন্য তাকে শের আফগান, ‘ব্যাত্র হস্তারক’ উপাধি দেয়া হয়েছে।

অনেকগুলো ভাষ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, হয় কাকতালীয় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, ইতিমধ্যে যুবরাজ সেলিমের প্রণয়নুর দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। একটি ভাষ্য অনুসারে সেলিম তার আকবাজানের সাথে দেখা করতে এলে ‘প্রথা অনুযায়ী নেকাব পরিহিত অবস্থায় মেয়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।’ মেহেরন্নিসা আবেগোদ্বীপ্ত সেলিমের সামনে নৃত্য পরিবেশন করে যিনি ‘ভদ্রতার দোহাই দিয়ে কোনোমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছিল... তার দৃষ্টি যখন তাকে গ্রাস করবে বলে মনে হতে থাকে, মেহেরন্নিসা, অসাবধানতার

অজুহাত সৃষ্টি করে, নিজের নেকাব ফেলে দেয় এবং নিজেকে তার সামনে প্রকাশ করে...' কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করেন, আকবর নিজে তার বিয়ের আয়োজন করেছিলেন নিজের ছেলের নাগাল থেকে তাকে দূরে রাখতে। কিন্তু অন্য ভাষ্য অনুসারে সেলিম নিজের আবেগ সংযত করেছিলেন তার বাগদান অন্যত্র সম্পন্ন হবার পর এবং আকবরও 'কোনো ধরনের অবিচারকে লেশমাঝ প্রশ্ন দিতে কঠোরভাবে অনিচ্ছুক' বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে কোনো বাধা দেন না।

এসব ঘটনা সংঘটিত হবার বহু বছর পর এসব ইতিহাস রচিত হয়েছিল এবং কোনো কোনো ভাষ্য রচিত হবার সময় মেহেরুন্নিসা ভারতবর্ষের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রমণী, আবার কোনো কোনোটা রচিত হয়েছে ক্ষমতা থেকে তার পতনের পর। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে আর তার পরিবারকে কুশলী নব্য ভূইফোড় হিসেবে উপস্থাপন করতে উদ্বৃত্তি ছিল, যেখানে অন্য রচনায় অভিজাত্য আর চিরঙ্গন প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। মেহেরুন্নিসার মতোই সত্যিটা নেকাবের আড়ালেই রয়েছে, যে শিয়াস বেগের বাড়ির জেনানা মহলের মেয়েদের মাঝে একজন অভিজাত বংশীয় মেয়ের মতোই নিভৃত জীবনযাপন করত। সেলিমের জন্য বস্তুতপক্ষে দরবারে বৃক্ষপ্রকাশে অন্য কোথাও তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন ছিল। মেহেরুন্নিসা অবশ্য একজন বিশ্বত্ব অমাত্যের কন্যা হবার সুবাদে রাজকীয় হারেমের রমণীদের সাথে দেখা করার জন্য জুমিত্রিত হতেন, পেশিবহুল জেনানা প্রহরী আর খোজাদের দলের সতর্ক স্টোর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে ভেতরের রেশম আবৃত আর সুবাসিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নেকাব নামিয়ে রেখে নাচে গানে মুখরিত হতে পারতেন, যেখানে সংরক্ষিত প্রাঙ্গণে স্বার্গ ব্যতীত অন্য কোনো দৈহিকভাবে সক্ষম পুরুষের প্রবেশের অধিকার ছিল না।

সেলিম ইতিমধ্যে বিবাহস্থলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন, যার অধিকাংশই আকবরের সাম্রাজ্যের বিচ্চির উপাদানকে একত্রে গঠিত করার লক্ষ্যে মূলত রাজবংশগুলোর ভেতর এক ধরনের মিত্রতা। ১৫৮৫ সালে তার আত্মীয় সম্পর্কিত ভগিনী মান বাস্তীয়ের সাথে, আস্বারের (জয়পুর) হিন্দুরাজার কন্যা, তার প্রথম বিয়ে হয়। ১৫৮৭ সালে তার গর্জে তাদের প্রথম পুত্র খসরু জন্মগ্রহণ করেন। সেলিমের দ্বিতীয় পুত্র পারভেজ ১৫৮৯ সালে এক মুসলমান স্ত্রীর গর্জে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য তার তৃতীয় সন্তানের জন্মগ্রহণ, ১৫৯২ সালের ৫ জানুয়ারি শাহোরে মারওয়ারের (যোধপুর) হিন্দু রাজকুমারী অভিজাত আর বৃক্ষিমতী যোধা বাস্তীয়ের গর্জে জন্ম নেয়ার ঘটনায় আকবর সবচেয়ে প্রীত হন। আকবর আর তার জ্যোতিষীরা এই পুত্রের জন্মগ্রহণকে সবচেয়ে মঙ্গলময় হিসেবে বিবেচনা করেন। এই সন্তান 'রাজবংশের

সৌভাগ্যের উক্ষীষে আরেকটা পালকযুক্ত করবে এবং সূর্যের চেয়েও দীপ্তিময় হবে।' আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তার জন্মের সময় তারকারাজির অবস্থান তৈমুরের জন্মের সময়ের সাথে আপত্তি হয়; অন্যদিকে মহানবী (সা.)-এর জন্ম মাসের সাথে তার জন্ম মাস মিলে যায় এবং বছরটা ছিল মুসলিম বর্ষপঞ্জির ১০০০ বছর। স্ম্রাট তার এই পুত্রের নামকরণ করেন 'খুররম', যার মানে 'আনন্দময়।' এই সন্তান, যিনি একদিন স্ম্রাট শাহজাহান হিসেবে পরিচিত হবেন, একেবারে প্রথম দিন থেকেই আকবরের সবচেয়ে প্রিয় পৌত্র ছিলেন।

গিয়াস বেগও পরের বছর একটি সন্তানের জন্মগ্রহণের বিষয় উদ্যাপনের সুযোগ পান—তার এক পুত্রের ওরসে জন্ম নেয়া এক নাতনি, যার নাম রাখা হয় আরজুমান্দ বানু। তিনি তার জীবদ্ধশায় মমতাজ মহল হিসেবে পরিচিত হন, 'প্রাসাদের প্রিয়পাত্রী' এবং শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা। তার অকালমৃত্যু তাকে প্রবাদপ্রতিম 'তাজের রমণী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আকবর খুদে যুবরাজ খুররমকে নিজের প্রথমা স্ত্রীর হেফাজতে অর্পণ করেন, যার নাম রূক্মাইয়া বেগম। নিঃসন্তান এই রমণী আবার আকবরের আত্মীয় সম্পর্কিত ভগিনী, হিন্দাশের মেয়ে আর একজন সর্বপ্রাপ্ত মুসলমান। হিন্দু যোধা বাহে সাত্ত্বনা হিসেবে মূল্যবান মোতি আর রূপবর্ণ অলংকার লাভ করেন। মোগল রীতি অনুসারে, চার বছর চার মাসে আর চার দিন বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে খুররমের শিক্ষাদান শুরু হয়। আকবর নিজে রেশমের পোশাক পরিহিত, রত্নালংকার সজ্জিত খুদে যুবরাজকে হাতির পিঠে চাপিয়ে শাহি মসজিদের মক্কবে নিয়ে যান যেখানে সাত্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় আলেমরা তাকে শিল্প, সাহিত্য আর তার পূর্বপুরুষদের, বিশেষ করে মহান তৈমুরের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন। দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতারা, সম্মুখ ভাবীকথন, দাবি করেন যে, খুদে যুবরাজ শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি আর সেইসাথে বিষয়ের ব্যাপকতা দারুণ সাবলীলতার সাথে আয়ত্ত করেন। কিন্তু আরো অস্বাভাবিকভাবে তারা এটাও লেখেন, কীভাবে সেই অল্পবয়সেই তার মাঝে ইন্দ্রিয়পরায়ণ একটি অভিযোগ পরিলক্ষিত হয়। সুগন্ধির মাঝে কাপড় সিক্ত করতে তিনি পছন্দ করতেন এবং উজ্জ্বল, দৃতিময়, নির্বৃতভাবে পালিশ করা রত্ন স্পর্শ করলে উদ্বিগ্নিত হয়ে উঠতেন। ঐতিহাসিকরা খুঁজে বের করেছেন, খুররমের খণ্ডন কোনো উল্লেখ কোথাও করা হয়নি, সম্মুখ একটি বিশাল উৎসবের আয়োজন এবং তাদের অভিমত এই যে, তার দাদাজান আকবরের প্রক্রিয়াটির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মিলজনিত কারণে তার খণ্ডন হয়তো কখনো করাই হয়নি। তার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আকবর নিজে তাকে যুদ্ধ আর মন্ত্রযুদ্ধের কসরত শেখান। খুররমের যখন মাত্র ছয় বছর বয়স, আকবর তাকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে

একটি অভিযানে যান, অভিযানের সময় একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার, চৌকশি নিশানাবাজ আর ওস্তাদ তরোয়ালবাজকে তার প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। সেই অভিযানে তিনি একটি চিতাবাঘকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলি করে আহত করেন। খুররম এর কিছুদিন পরই শুটিবসন্তে আক্রান্ত হন কিন্তু তার দাদাজানকে স্বত্তি দিয়ে কোনো প্রকার শারীরিক ঝটি ছাড়াই সুস্থ হয়ে ওঠেন। তার যথন নয় বছর বয়স আকবর তাকে তার সামরিক মন্ত্রণাপরিষদের সভায় অংশ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

আকবরের তার পৌত্রের প্রতি ভালোবাসার ঠিক বিপরীত অনুভূতি ছিল সেলিমের জন্য, যিনি নিজের স্মৃতিকথায় খানিকটা বিশ্বাসীয় সাথেই খুররমের প্রতি আকবরের মমত্ববোধের এবং কীভাবে বৃক্ষ সম্ভাট অল্পবয়সী যুবরাজকে নিজের ‘আসল সন্তান’ হিসেবে সর্বসমুখে ঘোষণা করতেন সেই স্মৃতিচারণা করেছেন। আবুল ফজলও ঠিক একই কথাই লিখেছেন, ‘মমতাময়ী সম্ভাট নাতিকে পুত্রের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।’ কিন্তু একটি সময় ছিল যখন আকবরও সেলিমকে চোখে হারাতেন। তিনিও শৈশবে হারেমের সবচেয়ে প্রশঞ্চ লাভ করা প্রিয়প্রাত্ ছিলেন, যার শিকার আর অন্ত চালনায় দক্ষতা লাভের ইঙ্গিত দেখে আকবর আনন্দিত হয়েছিলেন। তার যখন মাত্র বারো বছর বয়স তাকে বিশাল একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দান্ত করা হয় এবং আকবরের সাথে যুদ্ধযাত্রায় গমন করেন। যাই হোক, সেলিম বয়োঃবৃদ্ধির ফলে দক্ষ আর যোগ্য একজন প্রাণ্ডবয়কে পরিণত হলে তার প্রতি আকবরের ভালোবাসায় ভাট্টা পড়ে। বৃক্ষ সম্ভাট সম্ভৱত হ্রস্মৃতি অনুভব করেছিলেন, যা কোনো কারণে তার কাছে মনে হয়েছিল তার ছেলের অস্ত্রিং আর লোভী আকাঙ্ক্ষা।

মোগল দরবারে আগত এক ইংরেজ বণিক, উইলিয়াম ফিপ্পের লিখিত ভাষ্যে এর ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী মোগল ঐতিহাসিকরা দুজনের ভেতরে যৌনতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা খোলাখুলিভাবেই বলেছেন। তারা দাবি করেন, সেলিম তার আবোজান আকবরের সবচেয়ে সুন্দরী রক্ষিতা, আনারকলির, যার মানে ‘ডালিম ফুল’ প্রেমে পড়ে এবং আকবর বিষয়টি জানতে পেরে হতভাগ্য প্রেমিকাকে জীবন্ত অবস্থায় দেয়াল তুলে সমাধিস্থ করেন।

সেলিম নিশ্চিতভাবেই জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে অনিচ্ছিয়তা বোধ করেন। মোগলদের পূর্বপুরুষরা যেহেতু সব সময় জ্যোত্ত্রের নীতি অনুসরণ করেননি, তাই তিনি যদিও আকবরের জ্যোত্ত সন্তান, তিনি কোনোভাবেই ধরে নিতে পারেন না যে সিংহাসন তারই হবে। সিংহাসন দাবি করতে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে তিনি বহুদূরে অবস্থান করার সময় যদি তার আবোজানের মৃত্যু হয় এমন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেলিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে অস্থীকৃতি জানান। আকবর এই বেয়াদবির কারণে প্রকাশ্যে

তার অন্য ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা আরম্ভ করেন, যুবরাজ মুরাদ আর যুবরাজ দানিয়েল, দুজনেই অপদার্থের চূড়ান্ত আর বেহেড মাতাল। সেলিমও সুরাপান পছন্দ করতেন। তিনি আঠারো বছর বয়সে এক পাত্র মিটি হলুদ বর্ণের সুরা পান করেছিলেন, যা তিনি স্বীকার করেছেন, ‘আমি পান করলাম আর অনুভূতিটা আমার দারুণ পছন্দ হলো।’ তিনি প্রতিদিন পান করা শুরু করেন, অচিরেই সুরা পরিত্যাগ করে অ্যালকোহল পান আরম্ভ করেন। তার যখন বয়স ত্রিশও হয়নি তখন প্রতিদিন তিসি ‘দো-চোয়ানি অ্যালকোহলের বিশটি ছোট শিশি’ পান করেছেন আর মূলা এবং রুটির মতো মামুলি খাবার খেয়ে বেঁচে ছিলেন। খোয়ারির ফলে বিপর্যস্ত এবং হাত এত ভীষণভাবে কাঁপছিল যে তার পক্ষে একটি পানপাত্রও ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তিনি দরবারের হেকিমের শরণাপন্ন হন। তারা তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তিনি যদি সুরাপান বন্ধ না করে তাহলে হয় মাসের ডেতর তার মৃত্যু অবধারিত। সেলিম মাঝা কমিয়ে দিলে হয় পাত্র অ্যালকোহলের সাথে সুরা মিশিয়ে পান করেন, সাথে চৌক ফ্রেন আফিম। সুরার আসক্তি মুক্ত হবার প্রক্রিয়া, হোক অসম্পূর্ণ, সম্ভবত তার মেজাজের কোনো উন্নতি ঘটাতে পারেনি বা তার প্রতি তার আকৃজানের অবহেলার জন্য অধিক ক্ষমতাশীল করে তোলেনি।

১৬০১ সালে, বিক্রুত সেলিম বিদ্রোহ করেন। তার বিদ্রোহ ছিল নিরুৎসাহী একটি প্রচেষ্টা এবং নিজেকে আপাতত স্থিরীকৃত ভঙ্গিতে স্ম্বাট হিসেবে অভিহিত করে ৩০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পিতা পুত্র উভয়েই প্রকাশ্য যুদ্ধ পরিহার করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেলিম বরং নিজের ক্ষোড় আবুল ফজলের দিকে ধাবিত করেন, যিনি আকবরের দিনপঞ্জির রচয়িতার পাশাপাশি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের একজন। তাদের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, শিকার করতে বের হয়ে আকবর যখন অগুকোষে আঘাত প্রাপ্ত হন, আবুল ফজল গর্বের সাথে স্মরণ করেন, ‘সৌভাগ্যের এই পুস্তকের লেখক’ ক্ষতস্থানে মলম লাগাবার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে, বায়ান্ন বছরের এই বৃদ্ধ অবশ্য আকবরের অন্যতম সফল সেনাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং সেলিমের বিদ্রোহের সময় অন্য আরেকটি অভিযানে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। ১৬০২ সাল নাগাদ আবুল ফজলকে আগায় ডেকে পাঠাবার মতো বিরক্তিতে আকবর আক্রান্ত হন। সেলিম এই পণ্ডিত সেনাপতিকে অপছন্দ আর অবিশ্বাস করত। সে পরবর্তী সময়ে নিজের স্মৃতিকথায় যেমন লিখেছে, ‘কোনোভাবেই আমার বন্ধু নন’ এবং তাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটতে থাকেন। স্মাটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবুল ফজল দ্রুত ফিরে আসার সময় স্থানীয় এক রাজাৰ হাতে তার মৃত্যু হয়। সেলিম যাকে পুরস্কৃত করার প্রস্তাৱ



পৃথিবীর শাসক হিসাবে জাহাঙ্গীর, ইংল্যান্ডের জেমস, স্কটল্যান্ডের ষষ্ঠ জেমসের  
সাথে যাকে নীচের বামপাশে অপসারিত করা হয়েছে।



জাহাঙ্গীর আর খুররমের (শাহজাহান) জন্য নূরজাহানের আয়োজিত বিজয় উৎসব। তাকিয়ে থাকা রামণীদের একজন সম্মুখত মমতাজ মহল।

দিয়েছিলেন 'যদি তিনি এই রাজবৈরী লোককে বাধা দিতে আর তাকে হত্যা করতে পারে'। কোনো কোনো ভাষ্য অনুসারে, সেলিম বিজয়দীপ্তি রাজাকে আদেশ দিয়েছিলেন আবুল ফজলের ছিল মন্তক তার কাছে প্রেরণ করতে, যাতে সেটা পায়খানার খাড়িতে নিষ্কেপ করা যায়।\*

আকবর তার পোষা করুতর ওড়াবার সময় হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পারেন এবং নিরাকৃণ কাল্পনা ভেঙে পড়েন। তিনি সেলিমকে শাস্তি দিতে চান কিন্তু ভীষণ জটিল একটি পরিস্থিতির মাঝে নিজেকে আবিঙ্কার করেন। মুরাদ, চিত্তবেকল্যে আক্রান্ত হয়ে তীব্র ঘন্টাগায় কাঁপতে কাঁপতে মৃত্যুবরণ করেন এবং দানিয়েল সুরাপান বজায় রেখে দারূণ ব্যন্তিতায় দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেন। তার কাছ থেকে অ্যালকোহল দূরে সরিয়ে রাখতে তার আবারাজানের ঐকান্তিক প্রয়াস সন্ত্বেও তার সমর্থকরা আকবরের শুষ্ঠচরদের চোখ ফাঁকি দিয়ে গরুর মৃত্যুশয়ের মাঝে লুকিয়ে তার কাছে অ্যালকোহল নিয়ে আসত, তারা তাদের পোশাকের নিচে দেহের সাথে মৃত্যুশয় পেঁচিয়ে বেধে রাখত। আকবর বুঝতে পারেন, মোগল রাজবংশকে রক্ষা করতে হলে সেলিম আর তাকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধের মীমাংসা করতে হবে। মোগল রীতি অনুসারে, রাজপরিবারের মেয়েরা এ ক্ষেত্রে বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করে থাকে। আকবরের বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রীদের একজন তার সাথে আগায় ফিরে আসতে হতাশ মুবরাজকে রাজি করান, যেখানে তাকে তার দোদিজান হামিদা স্বাগত জানান, পঞ্চাশ বছর পূর্বে যিনি ছিলেন হয়ায়নের সম্পত্তি স্ত্রী। বৃন্দা রমণী সেলিমকে তার আবারাজানের পায়ের কাছে প্রগতি হিতে রাজি করান। আকবর নাটকের দৃশ্যকল্পের ন্যায় দুই হাত বাড়িয়ে তেজের পথভূত ছেলেকে দাঁড় করিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং তেজের রাজকীয় উষ্ণীষ তার মাথায় পরিয়ে দেন—প্রতিক্ষেপণের প্রতি একটি ইঙ্গিত যে, সেলিম তার উত্তরাধিকারী। তিনি বিরোধ মীমাংসার কথা ঘোষণা করতে জোরে উদ্দাম তালে ঢাক বাজাবার আদেশ দেন।

কিন্তু তখনো পারিবারিক সমস্যা আর অবরাধিকার সম্পর্কিত অনিষ্টয়তা দূর হয়নি। ১৬০৪ সালে, জং ধরা গাদাবন্দুকের নলের ভেতর লুকিয়ে রাখা দো-চোয়ানি অ্যালকোহল দিয়ে বিশেষভাবে দর্শনীয় এক প্রস্তু সুরাপান পর্বের শেষে, দানিয়েল মৃত্যুবরণ করে সেলিমকে ভার্তায় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে যান। অবশ্য তারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, তেজেদীপ্তি কিশোর খসরু,

\* আবুল ফজলের সাথে প্রারম্ভ করে আকবর যেসব নীতি প্রচলন করেছিলেন সেগুলো যারা অপছন্দ করত তারা তাকে 'তার নির্লজ্জ চাটুকারিতা দ্বারা এবং স্থাটের মেজাজ সম্পর্কে ভালোমতো ওয়াকিবহাল থাকা, তার শঠতা, তার কাজ করতে গড়িমসি করা' দ্বারা তার প্রতিপন্থি অর্জিত হয়েছে এমন অভিযোগ করত। আবুল ফজল সমবেক একটি কৌতুহলকর প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে, তার খাদক হিসেবে একটি সুনাম ছিল, দিনে প্রায় ত্রিশ পাউন্ডের মতো খাবার তিনি খেতে পারতেন।

সমর্থকদের চোখে তার খামখেয়ালি আর হিংস্র পিতার চেয়ে অনেক কম খামখেয়ালি আর নমনীয় প্রতিপন্ন হওয়ায় সিংহাসনের একজন দাবিদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বাট আকবরের শাসনামলের শেষ বছর সাধারণে একটি শক্তির মহড়া অনুষ্ঠিত হয় যখন স্বাট ইচ্ছাকৃতভাবে সেলিম আর খসরুর সবচেয়ে শক্তিশালী রণহস্তির মাঝে একটি লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করেন। হাতির লড়াই রাজন্যদের একটি প্রিয় অবসরকালীন বিনোদন, যেখানে অতিকায় প্রাণীগুলোকে তাদের পিঠে অবস্থানরat মাহুতের দল সূচালো লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করে। অবশ্য এবারের লড়াইয়ের একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। বুড়ো স্বাট হয়তো ভবিষ্যৎ স্বাটের জন্য একটি আলামত অনুসন্ধান করছিলেন বা তিনি কেবল তার নিজের অতি-আগ্রহী পুত্রকে বিভ্রান্ত করতে চাইছিলেন যে, এক বছর পূর্বে সাতাম্বর বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী তার আম্বিজান হামিদার জন্য তখনো তিনি শোকার্ত ছিলেন।

আকবর তেরো বছরের খুরমের সাথে, যে চিরাচরিতভাবে তার পাশেই ছিল দাঁড়িয়ে, সেনিনের লড়াইয়ের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিল, বারান্দা থেকে হটগোলপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবলোকন করেন। খসরুর হাতির কাছে সেলিমের হাতি রীতিমতো পৰ্যন্ত হয় এবং খুরম সাথে সাথে একটি অতিরিক্ত হাতি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নিয়ে এসে প্রতিদ্বন্দ্বী হাতি দুটোকে বিছিন্ন করার আদেশ দেন। এই প্রয়াস যখন ব্যর্থ হয়ে তখন প্রহরীরা আতশবাজি হোড়ে দ্রুত, বৃহন্নরত জন্ম দুটোকে আলাদা করতে। আগনের ঝলক আর আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে খসরুর হাতি পাশাতে শুরু করে, সেলিমের হাতি অপ্রত্যাশিতভাবে বিজয়ী হয়। পরিস্থিতি জীৰ্ণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে, এক পর্যায়ে দুই পক্ষের সমর্থকদের ভেতরে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং আকবর খুরমকে আদেশ দিয়ে পাঠান, খসরু আর সেলিম যেন নিজেদের সমর্থকদের প্রশংসিত করেন। সম্ভাব্য দুই স্বাটের মধ্যকার ঈর্ষা আর লড়াই সম্বন্ধে খুরমের ভাবনা এবং তার নিজের হস্তক্ষেপের কথা কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু দাদাজানের পাশে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে কিশোর যুবরাজ অনেক কিছু বুঝতে পারেন। ভবিষ্যতে শাহজাহান একদিন পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিনাশে এমন নির্মমতার পরিচয় দেন, যা তার পূর্বসূরিদের কেউই করেনি।

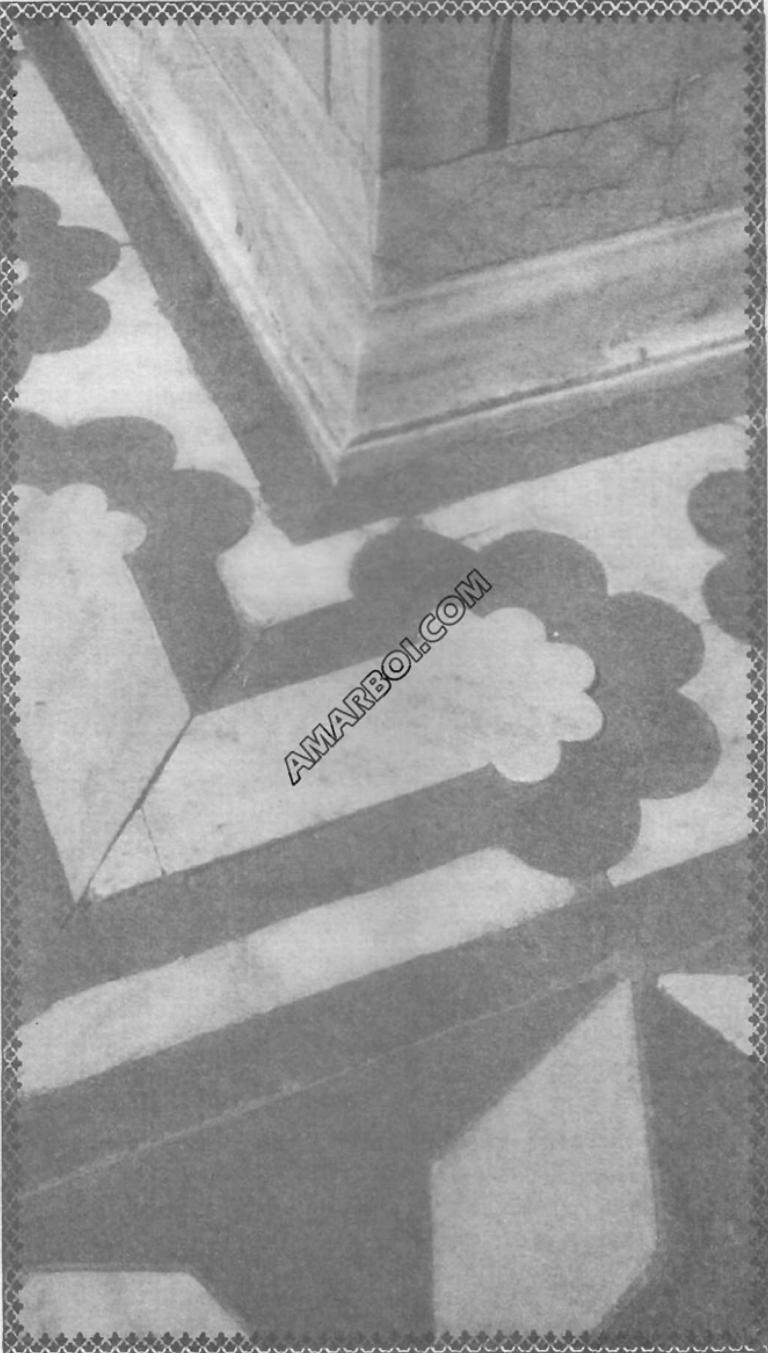
খুরমের তার পিতা বা সংতাই সম্বন্ধে অনুভূতি যা-ই হোক না কেন, তিনি তার দাদাজানকে ভালোবাসতেন। হাতির লড়াইয়ের এক সপ্তাহ পর বৃক্ষ স্বাট উদারাময় আর অভ্যন্তরীণ রক্তপাতের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলে হতবিহ্বল খুরম তার পাশ থেকে নড়তে চান না, জোর দিয়ে বলতে থাকেন, ‘শাহ বাবার (আকবর) দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত সামান্যতম শ্বাস বজায় থাকবে, আমাকে তার পাশ থেকে কেউ সরাতে পারবে না।’ তার পিতা আর সংতাই ইত্যবসরে সিংহাসনের জন্য ঘড়যন্ত্র শুরু করেন। আকবর উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে অম্যাত্যদের একটি বড় অংশকে তাদের মতামত জানতে ডেকে পাঠালে তারা তরুণ খসরুর পরিবর্তে অভিজ্ঞ সেলিমের পক্ষে তাদের রায় দেন। নিজের

সাম্রাজ্যকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যগ্র আকবর তাদের মতামত মেনে নেন। মৃত্যুপথব্যাপ্তি সম্ভাট সেলিমকে সম্ভাটের আলখাফ্তা আর উষ্ণীষ আর তার শয়ার পায়ের কাছে ঝুলতে থাকা হৃষায়নের তরবারি কোমরে পরিধানের অনুমতি দেন। সেই দিনই, ১৬০৫ সালের ১৫ অক্টোবর, কয়েক ঘণ্টা পরে তেষটি বছর বয়সে আকবরের মৃত্যু হয়। প্রত্যুষে একটি শবদ্যানে করে তার মৃতদেহ আগ্ন থেকে পাঁচ মাইল দূরে সিকান্দ্রার বিশাল মকবরায় নিয়ে যাওয়া হয়, যা তিনি নিজের জন্য নির্মাণ করতে শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি।

ভারতবর্ষের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে জাতিগত আর ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত ১০০,০০০,০০০ প্রজার একটি শক্তিশালী আর একতাবক্ষ সাম্রাজ্য আকবরের দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রাণশক্তির কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। হৃষায়ন তাকে যে ভূখণ্ড দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি সেই অনিচ্ছিত আধিপত্যকে বাড়িয়ে প্রায় তিন শুণ করেছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের শেষের দিকে যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তার ভেতরে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলা আর বিহারে মোগল শাসন আরোপ আর সংহত করা, আফগানিস্তানে তার সাম্রাজ্য বিস্তার যার ভেতরে রয়েছে পার্সিদের কাছ থেকে কাবুল এবং তার পৰ্মের, বর্তমানের মতো, তখনো কৌশলগত কারণে শুরুত্বপূর্ণ শহর কান্দাহার দখল করা, বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত সিঙ্ক আর বেলুচিস্তান দখল এবং দক্ষিণে দাক্ষিণ্যত্যে হামলা করা। রাজ্য দখল করার চেয়ে সেখানে স্থায়িত্ব কায়েম রাখা অনেক কঠিন সে সম্বন্ধে সচেতন থাকায় তিনি তাৰ সাম্রাজ্যে সংক্ষার সাধন করেন এবং তার শাসনব্যাস্থাকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করে তাকে একটি দক্ষ শাসনযন্ত্রে রূপান্তরিত করেন।

আকবরের ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য তার বিশাল সেনাবাহিনী আর কোষাগারে স্তুপীকৃত হয়ে থাকা দৃতিময় হীরক, রুবি, পান্না আর মেতির মাঝে প্রতীকায়িত হয়েছে, যার জন্য মোগলদের মাঝে একটি অস্বাভাবিক আকাশকা রয়েছে। তিনি তার দরবারকে পরিশীলিত বিলাসিতার একটি হালে পরিণত করেন এবং তার নির্মিত বিশালাকৃতির, অভিজ্ঞত ইমারতগুলো দুনিয়াকে একটি ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, মোগলদের যায়াবর দিনের সমাপ্তি ঘটেছে। তৈমুরের সমস্ত উত্তরসূরিদের ভেতরে, আকবর নিজেকে সবচেয়ে যোগ্য আর বিচক্ষণ হিসেবে, তার সত্যিকারের উত্তরসূরি এবং তার ‘মহান’ উপাধির উপর্যুক্ত হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

আকবরের মৃত্যুর নয় দিন পর আগ্ন দুর্গের দরবার কক্ষে এই চমৎকার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে, ছত্রিশ বছরের সেলিমকে সম্ভাট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তিনি নিজের জন্য জাহাঙ্গীর উপাধি বেছে নেন, যার মানে ‘পৃথিবীর অধিশ্বর’। কারণ তিনি কোনো রাখাঢ়ক না করেই বলেছেন, ‘রাজাৰ কাজ পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করা।’



AMARBOI.COM

## তৃতীয় অধ্যায়

### অতুলনীয় মোতি আর চিত্তহারী উপচার

তরুণ যুবরাজ খুররম, পরবর্তীকালে যিনি শাহজাহান নামে পরিচিত হন, তার আকাজানের শাসনকাল শুরু হবার পরে নিজের সংভাই খসরুর আচরণের কারণে ক্ষমতা আর সেইসাথে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বৈরী পারিবারিক সদস্যদের কারণে সৃষ্ট হয়কি সমস্কে গভীর অঙ্গুষ্ঠি লাভ করেন। সিংহাসনে তার আকাজানের পরিবর্তে খসরুকে দেখতে চান তখনো এমন লোকের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না। ১৬০৬ সালের এপ্রিল মাসে, নিকটেই অবস্থিত আকবরের মকবরা জিয়ারতের মেকি অজুহাতে খসরু আগ্রার লালকেন্দ্রা থেকে দুলকি চালে ঘোড়া নিয়ে বের হন যেখানে জাহাঙ্গীর তাকে নামহস্তি গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন। রসদের জন্য মিষ্টির দোকান লুট করতে স্তৰ্ণন্য সময় যাত্রা বিরতি করে তিনি সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে লাহোর আস্তিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে তার চারপাশে আরো সমর্থক জড়ো হয়ে থাকে এবং সেখানে পৌছে তিনি শহর অবরোধ করেন। জাহাঙ্গীর একটো বছরের খুররমকে নিজের সাম্রাজ্য পরিচালনাকারী পর্ষদের কায়কলাপ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে নিজের বিপথগামী সন্তানের পশাদাধাবন করেন এবং এত দ্রুত তিনি রওনা দেন যে সেদিন সকালের ‘বরাদ্দকৃত আফিম’ সেবন করতেও ভুলে যান।

জাহাঙ্গীরের সৈন্যরা অনায়াসে বিদ্রোহীদের পরান্ত করে। খসরু পালিয়ে যান কিন্তু জাহাঙ্গীর সংকল্প করেন, ‘আমি তাকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করব না।’ খসরু রাতের বেলা নাম না জানা একটি নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন কিন্তু নৌকার মাঝি তাকে আর তার সঙ্গীসাথীদের সাহায্য করতে অস্বীকার করে। তারা নিজেরা নৌকা বাইতে চেষ্টা করলে, নিজেদের বিচলিত আর অনভিজ্ঞতাজনিত তাড়াহড়োর কারণে বালুচড়ায় তাদের নৌকা আটকে যান। ভোরের প্রথম আলো ফোটার সাথে সাথে তারা আত্মসমর্পণ করলে ‘কম্পিত আর ত্রন্দনরত’ খসরুকে তার দুই শীর্ষ সহযোগী

সমেত টেনেছিঁড়ে তার আবাজানের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাঙ্গীরের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘খসরুকে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে এবং পায়ের শিকল পরিয়ে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়।’ স্বার্ট তার সন্তানের দুই সহযোগীকে সদ্য জবাই করা একটি গাধা আর ঘাঁড়ের দুর্গন্ধযুক্ত চামড়া পানিতে ভিজিয়ে সেটার ভেতরে ঢুকিয়ে শক্ত করে সেলাই করে দিতে বলেন, চামড়ার সাথে যেন তখনো হতভাগ্য জন্মের মাথাটা আটকানো অবস্থায় থাকে। লোক দুজনকে এরপরে খচরের পিঠে উল্টো করে বসানো হয়। এই হাস্যকর খুদে শোভাযাত্রাটাকে এরপরে লাহোরের গণগনে সূর্যের আলোয় ঘোরানো হয় যতক্ষণ না ঘাঁড়ের চামড়ার ভেতরের লোকটা খাসরন্দি হয়ে মারা যায়। যেহেতু জাহাঙ্গীর কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করেন ‘ঘাঁড়ের চামড়া গাধার চামড়ার চেয়ে অনেক দ্রুত শুকিয়ে যায়।’ গাধার চামড়ার ভেতরের লোকটা কোনোমতে প্রাণে বেঁচে যায় এবং পরবর্তী সময়ে পুনরায় স্বার্টের অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়। খসরুকে একটি হাতির পিঠে ঢাকিয়ে একটি সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যার দুই পাশে সুচাপ্র অগভাগযুক্ত কাঠের দণ্ডে তার তিনশ আর্তনাদরত সমর্থককে গেঁথে রাখা হয়েছিল। জাহাঙ্গীর স্বচ্ছচিপ্তে লেখেন, ‘প্রলিপ্তি যন্ত্রণায় দুর্কৃতিকারীদের মৃত্যুবরণ করার জন্য এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ আর হতে পারে না। এই নির্মম অভিজ্ঞতাটা খসরুকে প্রতটাই বিচলিত করে তোলে যে, তার আবাজান আবেগহীন কষ্টে স্মৃতিচারণা করেছেন, ‘সে তিন দিন কিছু খেতে বা পান করতে পারেনি, প্রকৃষ্টা সময় ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে কেবল কেঁদেছে আর আর্তনাদ করেছে।’ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিন্তু এমন বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার পরও নির্বাপিত হবার পরিবর্তে সামান্য সময়ের জন্য কেবল প্রশংসিত হয়। জাহাঙ্গীর তাকে কিছুদিন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন কিন্তু তার আবাজান যখনই তিলমাত্র সদয় হবার লক্ষণ প্রকাশ করে তার পা থেকে শিকল খুলে দিতে বলেন, তিনি পুনরায় তার বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। তার মাঝে একটি সন্দেহ কাজ করেছিল যে, তার চেয়ে সাড়ে চার বছরের ছেটে এবং বর্তমানে তার আবাজানের প্রিয়পাত্র খুররমকে বোধ হয় অচিরেই তার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করা হবে। ঈর্ষা তার ইতিমধ্যে বাড়তে শুরু করা অসঙ্গোষ্ঠকে আরেকটু উসকে দেয়।

খসরু শিকারের সময় জাহাঙ্গীরকে হত্যা করার জন্য একদল অমাত্যকে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেন। নিয়তির পরিহাস যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী খুররম এই ঘড়যন্ত্রের কথা আগেই জানতে পারেন এবং জাহাঙ্গীর লিখেছেন, ‘ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সে সাথে সাথে আমাকে বিষয়টি সমন্বে অবহিত করে।’ জাহাঙ্গীর সাথে সাথে নাটের শুরু চারজন অমাত্যকে হত্যা করার আদেশ দেন, এবং খসরুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেন,

‘পিতৃস্মেহ তার প্রাণ নেবার অনুমতি আমায় দেয় না।’ তিনি এর পরিবর্তে তার সন্তানকে অঙ্ক করে দেয়ার আদেশ দেন। খসরু যেহেতু পরবর্তী সময়ে সীমিত পরিমাণে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিলেন তাই ধারণা করা হয়, চোখ একেবারে তুলে ফেলা কিংবা তার চোখের পাতা একত্রে সেলাই করে দেয়ার পরিবর্তে চোখের মণিতে সম্ভবত ক্ষারজাতীয় কোনো পদার্থ ঘষে দেয়া হয়েছিল। ঘটনা যা-ই হোক, তার অস্তিত্ব একটি দুর্বিষ্হ পরিণতি লাভ করে এবং তার আবাজান তাকে চোখের সামনে দেখলেই বিরক্ত হতেন, যিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী খানিকটা অনেকিভাবেই হয়তো অভিযোগ করেন যে, তাকে যখনই তার সান্নিধ্যে হাজির করা হতো তার সন্তান ‘সব সময় বিষণ্ণ আর মনমরা হয়ে থাকত’। খসরুর সাথে তার আবাজানের বৈরিতার একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এই যে, তার আবাজান জাহাঙ্গীরের প্রথম স্ত্রী, হতাশার বশবর্তী হয়ে ‘ভাবাবেগের তাড়নায় যা রাজপুত স্বত্বাবের একটি অবিছেদ্য অংশ, আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি বহুবারই আকস্মিকভাবে ক্ষিণ হয়ে উঠতেন—যা নিচিতভাবেই পারিবারিক বৈশিষ্ট্য যেহেতু তার বাবা আর সব ভাই সহসাই বদ্ধ উন্নাদে পরিণত হতো...আমি একবার শিকারে গেলে...সে তার ভারসাম্যহীন মানসিক স্থিতির কারণে প্রচুর পরিমাণে আফিম খেয়ে ছেলে আর তার প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত মারা যায়,’ জাহাঙ্গীর লিখেছেন।

জাহাঙ্গীর খসরুর প্রতি তার আচরণের সময় নিজের বৃক্ষ পিতার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ নিজের স্মৃতি থেকে সুবিধাজনক কারণেই একেবারে মুছে ফেলেছিলেন। তার প্রাণবন্ত স্মৃতিকথায়, তার প্রপিতামহ বাবরের মতো সব সময় অকপট না হলেও প্রায় একই সঙ্গীবতায় ঝংক, সততার সাথে দাবি করা হয়েছে যে, ‘সন্তানের উচিত সব সময় সন্ত্রাজ্ঞের প্রতি অনুগত থাকা।’ রোজনামচায় স্মার্টকে আমরা নানা অসংগতিতে আক্রান্ত একজন মানুষ হিসেবে দেখতে পাই—আফিম বা সুরার প্রভাবে যখন বিভ্রান্ত না থাকেন তখন তিনি একজন দক্ষ শাসক, পরিশীলিত আর প্রীতিকর শুণের অধিকারী এবং কখনো কখনো অনুসন্ধিৎসু, অন্যদের প্রতি অদ্ভুতভাবে নিষ্ঠুর। জাহাঙ্গীর প্রাণদণ্ড আর নির্যাতনকে রীতিমতো প্রদর্শনীতে পরিণত করেছিলেন, একবার জীবন্ত অবস্থায় একটি লোকের দেহের চামড়া তুলে নেয়ার দৃশ্য তিনি বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছিলেন। ভারতে ইংল্যান্ডের প্রথম রাজদূত স্যার টমাস রো, যিনি তার দরবারে ১৬১৫ সালে এসেছিলেন এবং স্মার্টকে নির্বিকার চিন্তে হাতির পায়ের নিচে অপরাধীদের নিষ্পেষিত হবার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে শিউরে উঠে ভেবেছিলেন যে, জাহাঙ্গীর ‘রক্তপাতের মাঝে খুব বেশি পুলক’ অনুভব করেন। জাহাঙ্গীরের উন্নতভাবে চিত্র আরো বেশি করে বোঝা যায় যখন তিনি নিজের সাত বছরের ছেলেকে প্রহার করেন

সে কাঁদে কি না দেখতে এবং ছোট ছেলেটা যখন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে তিনি তার গালে সুচ দিয়ে খৌচা দেন। ছেলেটার গাল রক্তে ভেসে গেলেও সে তখনো নীরব থাকে।

জাহাঙ্গীর সম্মত কাপটিক ছিলেন। সব বিষয়ে ভীষণ বিলাসী হয়েও, তিনিই একবার সুরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু নিজে অভ্যাসটা পরিত্যাগ করার সাহস অর্জন করতে পারেননি। মদের প্রতি আসক্ত এক বৃন্দ রমপীর ছলনার সহায়তায় নিজের দুর্বলতাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করান।\* তিনি যদিও বহুবার মাত্রাত্তিরিক্ত পানের কারণে দাঁড়িয়ে থাকার অক্ষমতার বহু নজির উপেক্ষা করে, তিনি জোর দিয়ে দাবি করেন, তিনি মদকে প্রশ্রয় দেন ‘আমার খাবার ভালোমতো হজমে সাহায্য করতে।’ তিনি একই সাথে নিজের বিবেককে প্রশ্রমিত করতে সিদ্ধান্ত নেন যে, ‘শুক্রবার সন্ধ্যায় আমি সুরা পানের পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখব।’ তার রাজত্বকালের শেষের দিকে তিনি খানিকটা দ্যর্থক ভঙিতে খুরুমকে সুরার উপকারিতার বিষয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন কিন্তু একই সাথে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সতর্কতা অবলম্বন করতে : ‘বাছা আমার, তুমি সন্তানের পিতা হয়েছ এবং রাজা আর রাজকুমারেরা সুরা পান করে থাকে। আজ উৎসুবের দিন এবং আমি তোমার সাথে সুরা পান করব এবং আমি তোমায় জ্ঞানের দিনগুলোয়, নববর্ষের দিনে, আর বিশাল কোনো আনন্দের দিনে সুরা পান করার বিষয়ে আমি তোমায় সুরা পান করতে নিষেধ করব না কিন্তু সেব সময় মাত্রা বজায় রাখবে, কারণ মাত্রাত্তিরিক্ত পান করে নিজের বুক্তিশূন্তকে দুর্বল করাটা বিজ্ঞনেরা সব সময় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে; বস্তুতপক্ষে পরিমিত সুরা পানের মাধ্যমে মঙ্গলময় আর উত্তম কিছু অর্জন করা সম্ভব।’

বিজ্ঞান আর প্রকৃতির বিষয়ে জাহাঙ্গীরের গভীর কৌতুহল ছিল, সারসদের প্রজননের বিষয়ে এবং হাতির গর্ভধারণকাল সম্বন্ধে কিছু মৌলিক গবেষণাও করেছেন, সদ্য ভূমিতে পতিত ধোয়া উদ্দগীরণকারী একটি উক্তাপিণ্ড মাটি খুঁড়ে তুলে নিয়ে এসে সেটা দিয়ে তরবারি নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন আর সিংহের অস্ত্র ব্যবহেদ করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তারা এত সাহস কোথা থেকে পায়। তিনি হিন্দুদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য বটবৃক্ষ কীভাবে ঝুলন্ত শিকড় নিচের দিকে প্রসারিত করে নিজের পুরো ওজন আলমিত করে দেখে মুক্ত হয়েছেন। তিনি যদি কিছুকাল পরে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে অনেক কারণেই ১৬৬০ সালে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য দ্বিতীয় চার্লসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল সোসাইটির একজন স্বাভাবিক সদস্য হিসেবে বিবেচিত হতেন। ভর্মণের সময় জাহাঙ্গীরের সাথে দরবারের চিত্রকরদের

\* ‘অ্যালকোহল’ শব্দটা আরবি থেকে এসেছে, যার মানে আসলে ‘রূপালি সাদা চূর্ণ’।



AMARBOI.COM

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অঙ্কিত টার্কির মোগল চিত্রকর্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

একটি পুরোদস্ত্রের দল থাকত স্ম্যাটের মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন যেকোনো বিচিত্র প্রাণীর সংস্কৃতি অনুপুষ্ট বিবরণ নথীভুক্ত করতে। একটি চমৎকার তুর্কি মোরগ, ভারতবর্ষে সেই সময়ে বিরল, তাকে একবার উপহার দেয়া হলে তিনি এর ছবি আঁকবার আদেশ দেন এবং উদ্ধৃত ভঙ্গিতে মন্তব্য করেন যে, ‘স্ম্যাট বাবর যদিও তার স্মৃতিকথায় বেশ কিছু প্রাণীর বর্ণনা আর চিত্র সংযোজনে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় তাদের ছবি আঁকবার আদেশ তিনি সম্ভবত তার চিত্রকরদের কথনে দেননি।’

জাহাঙ্গীর বিশেষভাবে পছন্দ করতেন বিদেশি অতিথিরা তার জন্য ইউরোপীয় প্রতিকৃতির যেসব অণুচিত্র নিয়ে আসতেন এবং পাগড়ি কিংবা গলায় রত্নখচিত অণুচিত্র ঝোলাবার একটি নতুন রীতিই তিনি দরবারে প্রবর্তন করেছিলেন। অনুগ্রহভাজন শুটিকয়েক ব্যক্তি স্ম্যাট নিজে যেমন ধারণ করেন সেই রকম ক্ষুদ্রাকৃতি অণুচিত্র ধারণের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

হ্যাপ্ট্যকলা ছিল জাহাঙ্গীরের আরেকটা আঘাতের বিষয়। তিনি আঘাত কাছে সিকান্দ্রায় তার আক্ষণ্যানের জন্য ‘একটি চমকপ্রদ সমাধিসৌধ’-এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত করতে পেরে দারুল্ম সম্মতি লাভ করেছিলেন। আকবর তার নিজের জীবন্তশায় মকবরার নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু সেখানে একবার নির্মাণকাজের তদারকি করতে গেলে জাহাঙ্গীরের কাছে নকশাটাকে যথেষ্ট পরিমাণ চিন্তাকর্ষক বলে মনে হয় না : ‘আমার অভিপ্রায় ছিল এই যে মকবরাটা এতটাই নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ হুক্ম যে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীর দল সেটা দেখে একবাক্যে স্বীকার করবে, বাসযোগ্য পৃথিবীর কোথাও এর তুল্য দ্বিতীয় কোনো ইমারত তারা কখনো দেখেনি।’ খসরুর বিদ্রোহ দমনে তিনি যখন ভীষণ ব্যস্ত সেই অবসরে, ‘নির্মাতারা তাদের আপন রুচি অনুসারে সেটার নির্মাণ সমাপ্ত করে এবং সেটা করতে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো মূল নকশায় পরিবর্তন আনয়ন করে।’ জাহাঙ্গীর ‘আপত্তিজনক অংশগুলো’ ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেন এবং ‘কুশলী স্থপতিদের’ নিয়োগ করেন, যাতে ‘চারদিকে চমৎকার উদ্যান পরিবেষ্টিত একটি জাঁকজমকপূর্ণ আর মাত্রার দিক দিয়ে আক্ষরিক অঞ্চেই বিশালাকৃতির ভবন নির্মিত হয়, যার প্রবেশপথে থাকবে একটি সুউচ্চ তোরণঘার আর সাদা পাথরের তৈরি মিনার।’ দৃতিময় সাদা মর্মরের তৈরি চারটি মিনার একটি নতুন ধারার সূচনা করে, যা গুরুত্বপূর্ণ মোগল হ্যাপ্ট্যের সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। আকবরের মর্মরের স্মৃতিস্মৃতের ওপর কারুকার্যময় ফিতার মতো সূক্ষ্ম গোলাপ, নার্গিস, লিলি আর অন্যান্য ফুলের প্রণিহিত নকশা সেইসাথে ভবিষ্যতের গর্ভে কি অপেক্ষা করছে তার একটি ইঙ্গিত দান করে।

দর্শনার্থীদের বিস্মিত করার জাহাঙ্গীরের অভিপ্রায় সফল হয়। মকবরাটা যখন নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে তখনই, উইলিয়াম ফিল্ড একজন স্মাটের ‘যিনি প্রায়ই পৃথিবীটাকে তার জন্য বজ্জ ছোট বলে মনে করতেন’ জন্য নির্মিত শৃঙ্খলাধীন দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ১৬৩০ সালের গোড়ার দিকে আরেক ইংরেজ পর্যটক, পিটার মানডি যিনি মকবরাটার একটি নকশা-চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, লিখেন যে পৃথিবীর সগুম আক্ষরের ভেতরে এটা গণ্য হবে। ত্রিশ বছর পরে অবশ্য আরেকজন ফরাসি পর্যটক মন্তব্য করবেন যে, আকবরের মকবরাটা নিঃসন্দেহে দর্শনীয়, তিনি এর কোনো বর্ণনা দেবেন না, যেহেতু ‘তাজমহলের মাঝে এর সমস্ত সৌন্দর্য আরো উৎকৃষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়।’\*

খসরুকে নিছিয় করা আর সাম্রাজ্য শাস্তি আর স্থিতিশীলতা বিরাজমান হবার সাথে সাথে জাহাঙ্গীরের অপ্রত্যন্তের অধিশ্রয়ন কর্মেই খুররমের প্রতি নিবন্ধ হয়, আকবরের মৃত্যুর পরই যাকে তিনি ভালো করে জানার সুযোগ পেয়েছেন। তরুণ যুবরাজ সামরিক বিদ্যায় দারুণ পারস্পর্য-এবং সুন্দর ইমারতের প্রতি তার পিতার মতো তিনিও আগ্রহী, ধ্বনিকুণ্ঠ হয়তো বেশিই হবেন। ১৬০৭ সালের কথা, স্মাট খুররমের নির্মিত ত্রিকট হাতেলি পরিদর্শন করেন এবং সেটাকে ‘সত্যিকারের প্রীতিকর একটি কাঠামো’ হিসেবে রায় দেন। ১৬০৮ সাল, স্মাট তার অন্য সন্তান প্রসুভেজের, খুররমের চেয়ে মাত্র আড়াই বছরের বড়, দাবি অগ্রহ্য করে ঘোলেন বছরের যুবরাজকে পাঞ্চারের হিস্যার ফিরোজার জায়গির প্রদান করেন এবং টকটকে লাল রঙের তাঁবু স্থাপনের অধিকার দেন—ঐতিহ্য অনুসারে স্মাটের মনোনীত উত্তরাধিকারীকে এই সম্মান দান করা হয়।

খুররমের ইতিমধ্যে বিয়ের বাগ্দান সম্পন্ন হয়েছে। ১৬০৭ সালের এপ্রিলে, পারস্য থেকে আগত গিয়াস বেগের নাতি, চৌদ বছরের পরমা সুন্দরী আরজুমান্দ বানুর সাথে তার বিবাহার্থ বাগ্দান হয় এবং জাহাঙ্গীর নিজে কনের আঙ্গুলে বাগ্দানের আংটি পরিয়ে দেন। কল্পনাবিলাসী ভাবধারা অনুসারে, খুররম তার হবু বধূকে প্রথম দেখেছিলেন নওরোজ—সূর্যের মেষরাশিতে প্রবেশ

\* আজ কেউ যদি দুটো ভবনের মাঝে তুলনা করে তাহলে তিনি সন্তুষ্ট একমত হবেন যে, আকবরের মকবরাকে, যা রেসাস বানর আর হরিণের অভয়ারণ্য একটি উদ্যানের মাঝে অবস্থিত, মনে হয় যেন ‘বাছাই আর মিশ্রণ’-এর একটি চুলন, ইসলামী আর হিন্দু বাঞ্ছান্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সান্নিধি কিন্তু সংশ্লেষণ কিংবা আসঙ্গে কোনোটাই অর্জিত হয়নি।

উদ্যাপন করতে স্বাট আকবরের প্রবর্তিত নববর্ষের অনুষ্ঠান—উদ্যাপনের জন্য প্রাসাদের হারেমে আয়োজিত মীনা বাজারে। নওরোজ আঠারো দিনব্যাপী বিলাসিতা আর প্রাচুর্যের একটানা আয়োজন। রাজপ্রাসাদের উদ্যানে, শ্রমিকরা, দুই এক র জায়গাব্যাপী, সোনার জরির কারুকাজ করা মেরুন মখমলের টাঁদোয়াযুক্ত বিশাল একটি তাঁবু স্থাপন করে যেখানে রাজপরিবারের মহিলাদের জন্য ব্যক্তিগত কামরার বন্দোবস্ত রয়েছে যেখানে তারা বসে নওরোজের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পাবে না। তাঁবুর ভেতরটা ‘সোনালি রেশমের গালিচা এবং সোনার জরি, মুক্তা আর মূল্যবান পাথরের কারুকাজ করা মখমলের পর্দা দিয়ে’ আবৃত। স্বাট স্থানে দরবার আয়োজন করতে পারতেন বা পাশেই স্থাপিত তার অমাত্যদের সুসজ্জিত তাঁবুগুলোয় দর্শন দিতেন, যেখানে ‘উপটোকন হিসেবে বিরল রত্ন বা উপচার নজরানা হিসেবে তাকে পেশ করার জন্য তাদের ভেতরে রীতিমতো প্রতিযোগিতা আরঞ্জ হতো।’

রাজকীয় মীনা বাজার বস্তুতপক্ষে আসল বাজারের একটি ভদ্র সংক্রণ। এক ফরাসি পর্যটক একে বর্ণনা করেছেন, এই ‘বেয়ালি প্রকৃতির মেলা’ সবেগে পানি ছিটাতে থাকা ঘরনার প্রেক্ষাপটে এবং শয়েছের শাখায় আন্দেলিত রঙিন লংঠন আর মোমবাতির দবদব করতে থাকা আলোয় উজ্জ্বাসিত সুবাসিত বাগিচায় রাতের বেলা আয়োজন করা হতো। অভিজাত পরিবারের দ্বী আর মেয়েরা সোনা আর রূপার মাঝে অলংকার আর রেশমের গাঁট দিয়ে দোকানের পসরা সাজিয়ে বসত আর বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের সম্ভাব্য ক্রেতাদের—রাজপরিবারের প্রবীণা এবং রাজতনয়া, আর অবশ্যই স্বাট এবং তার পুরুষ প্রিয়প্রাত্মের সাথে—হাসিঠাট্টা আর দরকষাকষিতে মেতে উঠত। এই উৎসবটা, সামান্য কয়েকটা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের অন্যতম যথন মেয়েরা তাদের মুখের রেশমের নেকাব পুরোপুরি খুলে ফেলার এবং তাদের যত্নের সাথে প্রসাধন চর্চিত মুখাববর কোমল আলোয় উজ্জ্বাসিত করার অনুমতি পেত। বিবাহযোগ্য সুদর্শনা কন্যার মায়েদের জন্য পাত্রী দেখাবার জন্য এটা ছিল একটি দারুণ সুযোগ। আরজুমান্দ বানুর দিকে, যিনি নিজের বাকি জীবনের পুরোটা সময় তাকে শারীরিক আর মানসিকভাবে আপুত করে রাখেন, খুরুম এখানেই কেবল সরাসরি তাকিয়ে থাকতে পারেন।

দরবারের ঐতিহাসিকরা তাদের স্বভাবজাত অলংকারবহুল ভাষায় বাগদানের কথাটা লিপিবদ্ধ করেছেন, অন্নবয়সী মেয়েটার প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে ‘কৌমার্যের বলয়ের উজ্জ্বল দেবী’ এবং ‘নিষ্কলক্ষ বংশানুক্রম’ আর ‘নিষ্পাপ চরিত্রে’র অধিকারী হিসেবে তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। সকল ভাষ্য, সরকারি কিংবা অন্য যেকোনো, একটি বিষয়ে একমত যে, আরজুমান্দ বানু দরবারের একজন অসাধারণ সুন্দরী রমণী, যার সৌন্দর্যের ক্ষমতির কথা তার



মমতাজ মহলের উনিশ শতকের একটা প্রতিকৃতি এবং বলা হয়ে থাকে এটা  
সপ্তদশ শতকের মূল চিত্রকর্ম থেকে নকল করা হয়েছে।

ঘোরতর সমালোচকও বলবে না। তাজমহলের মালকিন, ভবিষ্যতের মমতাজ মহলের প্রতিকৃতি, অবশ্য ছলনার অতৃপ্তিতে আবৃত। তার একটি সমসাময়িক মোগল চিত্রকলায়, আবক্ষ প্রতিকৃতি, তাকে হাতে একটি গোলাপ আর শাস্ত, কোমল অভিব্যক্তির নির্খুত বাঁকানো জ্ঞান অধিকারী, সুন্দর মুখাবয়বের একজন যুবতী হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে বলে কেউ কেউ দাবি করেন। তার মাথার লম্বা কালো কেশ একটি সোনালি নেকাবে আধো ঢাকা রয়েছে এবং তার মসৃণ গলা আর সরু কোমরে চুনি আর পান্নাখচিত মুক্তার লহর জড়িয়ে রয়েছে এবং তার হাতের তালু আর নখ মেহেদি রঞ্জিত। অন্য আর মাত্র একটি প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, বলা হয়ে থাকে উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্বের আরেকটা মূল চিত্রকর্ম থেকে যা অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে মার্জিতভাবে বাঁকানো জ্ঞান আর দীঘল কালো চোখের অধিকারী মুকুট পরিহিত একজন নারী হিসেবে তাকে দেখানো হয়েছে এবং এখানেও তার হাতে আমরা গোলাপ ফুল দেখতে পাই।

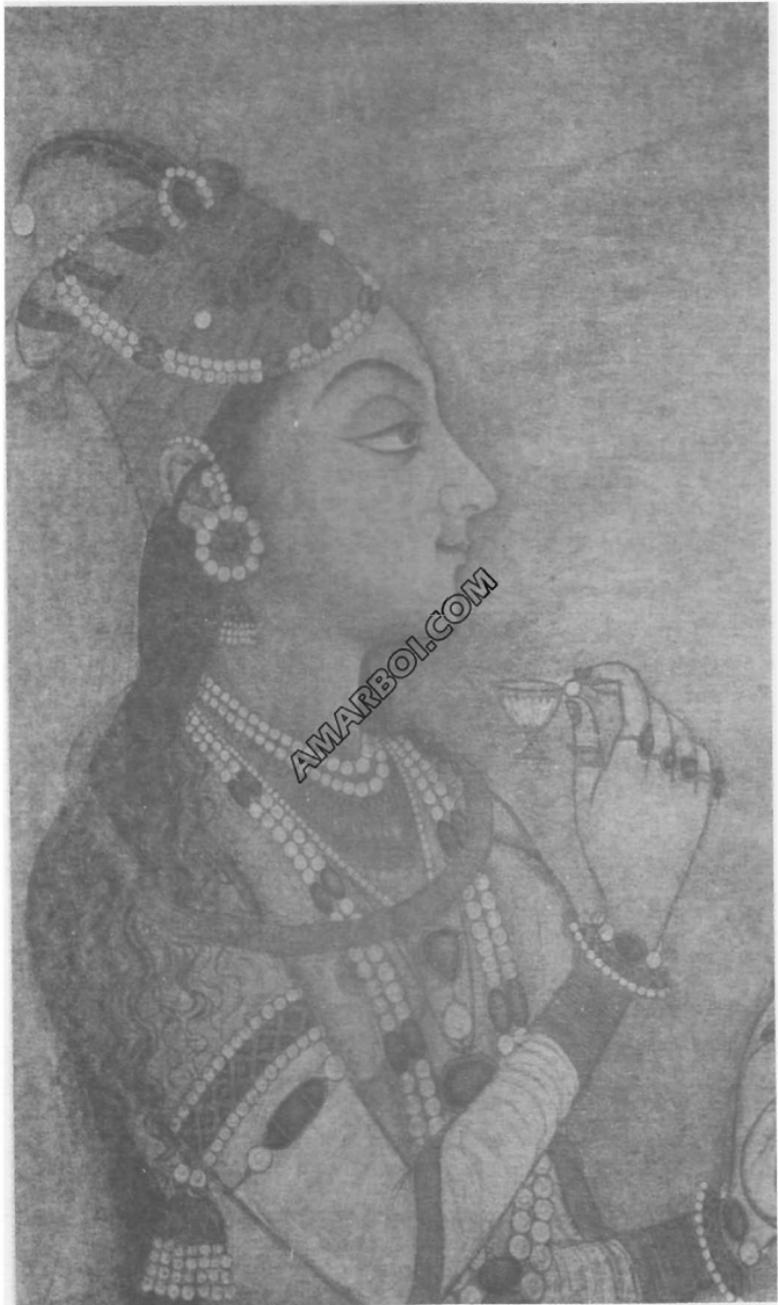
বাগদানের কয়েক মাসের ভেতরেই অবশ্য আরজুমান্দ বানুর পরিবার ভয়ংকর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণের পরে গিয়াস বেগকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন, তাকে ইতিমাদ-উদ-দৌলা, ‘সরকারের স্তম্ভ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। পারস্য থেকে আগতে এই অমাত্যের প্রশাসনিক দক্ষতা নিঃসন্দেহে দায়িত্ব পালনের জন্য উত্পন্ন, কিন্তু তার সমসাময়িক একজন তার বেপরোয়া দুর্নীতি সম্বন্ধে তাঁথেরে ‘উৎকোচ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই ছিলেন সবচেয়ে নিজীক অক্তৃত্বাপন্নাইন।’ প্রথমে তার বিরুদ্ধে তহবিল তহরুপের অভিযোগ আনা হয়েও, পরে আরো অনেক গুরুতর অভিযোগ আন্তীত হয়। খসরুর স্ম্যাটিকে হত্যা করার শেষ চক্রান্তে সংশ্লিষ্টতা থাকার জন্য জাহাঙ্গীর যে চারজন ষড়যন্ত্রকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন তাদের ভেতরে একজন ছিল গিয়াস বেগের পুত্র। গিয়াস বেগ নিজেও অভিযুক্ত আর বন্দি হন এবং অঞ্জের জন্য মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি জাহাঙ্গীরকে বিশাল অক্ষের অর্থ, স্বত্বত তার দুর্নীতির ফলে সংগৃহীত সম্পদ থেকে, পরিশোধ করেন নিজের জীবন বাঁচাতে আর তার পদমর্যাদা বজায় রাখতে। জাহাঙ্গীরের ‘সরকারের স্তম্ভ’, বা ‘ইতিমাদ-উদ-দৌলা’ হিসেবে তিনি পুনরায় সর্তর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন শুরু করলেও তার পরিবার আসলেই দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল।

ইতিমাদ-উদ-দৌলার বিরাগভাজন হওয়া এবং তার পুত্রের প্রাণদণ্ড স্বত্বত ব্যাখ্যা করে কেন পরবর্তী পাঁচ বছরে তার নাতি আর খুররমের মধ্যে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়নি—বিবাহযোগ্য পাত্র আর পাত্রীর ক্ষেত্রে যা একটি বিরল দীর্ঘস্থিতি। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে খুরুম একটি রাজবংশীয় মেঝীজনিত বৈবাহিকসম্বন্ধে আবক্ষ হন। ১৬১০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি

পারস্যের আরেক রাজতনয়াকে—পারস্যের শাহ ইসমাইল সাফাভির বৎশে জন্মগ্রহণকারী রাজকন্যা—বিয়ে করেন, যার গর্তে ১৬১১ সালের আগস্ট মাসে তার প্রথম সন্তান, একটি কন্যার জন্ম হয়। নিজের পরিবারের ওপর ঘনায়মান দুর্যোগ, তার বাগদানের দীর্ঘস্থিতা এবং আরেকজন নারীর সাথে খুরমের সম্পর্কের কথা চিন্তা করার অভিজ্ঞতা আরজুমান্দ বানুর জন্য মোটেই সুখকর ছিল না, তিনি তার আকাঙ্ক্ষান্বেষ হারেমে উদ্বেগ আর অসহায়তার সাথে অপেক্ষা করতে থাকেন।

১৬১১ সালে জাহাঙ্গীরের সাথে ইতিমাদ-উদ-দৌলার কন্যা তার ফুপিজানের নিকাহ সম্পন্ন হবার সাথে সাথে আরজুমান্দ বানুর জন্য সব কিছু বদলে যেতে আরম্ভ করেন। চার বছর পূর্বে, তখন ত্রিশ বছর বয়স্ক মেহেরেন্নিসা বিধবার বেশে রাজদরবারে ফিরে এসেছিলেন। জাহাঙ্গীরের পালক ভাইকে হত্যার ঘটনাটা জাহাঙ্গীরকে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণিত করেছিল এবং গিয়াস বেগের পরিবারকে সম্ভবত আরো কলঙ্কিত করেছিল—প্রতিশোধ নিতে, তার যোদ্ধা স্বামী শের আফগানকে সুবে বাংলায় হত্যা করা হয়। এই সময়কালের ইউরোপীয় ভাষ্য অনেক বেশি উদ্দেজনাপূর্ণ আর রোমাঞ্চকর একটি রূপকল্প ফুটিয়ে তোলে, দাবি করে যে, শের আফগানকে হত্যা করার জন্য জাহাঙ্গীরই তার পালক ভাইকে বাংলায় প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তিনি মেহেরেন্নিসাকে লাভ করতে পারেন। কিন্তু শের আফগান, কিছু একটি আঁচ করতে পেরে প্রথমেই আঘাত হানেন। স্ম্যাট স্টিচিতভাবেই তার স্বামীর মৃত্যুর পর মেহেরেন্নিসাকে আঘাত দেকে প্রাণ, যেখানে রাজকীয় হারেমে আকবরের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ বিধবা পঞ্জির মহলে তার অবস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়। তিনি অবশ্য হারেমে পৌছাবার পরে সেখানেই আপাতভাবে ‘কোনো প্রকার মনোযোগ আকর্ষণ ব্যক্তীতই দীর্ঘসময় অবস্থান করেন’ এবং এই সময়ে তিনি আর জাহাঙ্গীর শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।

১৬১১ সালের নওরোজ উৎসবের সময় সম্ভবত মেহেরেন্নিসা প্রথমবারের মতো জাহাঙ্গীরের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন। এক দিনপঞ্জির রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, ‘তার উপস্থিতি স্ম্যাটের দূরদর্শিতাপূর্ণ চোখের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং সে তাকে তার নির্বাচিত হারেমের অধিবাসীদের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।’ আরেকজনের ভাষ্য অনুসারে, ‘তার সৌভাগ্যের তারকা দীপ্তি ছড়াতে আরম্ভ করে এবং গভীর সুষ্ঠি থেকে জেগে উঠবার মতো...কামনারা মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করে।’ জাঁকজমকপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তারা দুজনে দুই মাসের ভেতরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। জাঁকালো পোশাক বা অলংকার এবং বিলাসিতার প্রতি জাহাঙ্গীরের ভালোবাসা তার নিজের আকাঙ্ক্ষান্বেষ চেয়ে



সুরা পানরত নূরজাহান ।

অনেক বেশি ছিল এবং রত্নপাথৰ তাকে আনন্দ দিত, বছরের প্রতিদিন তিনি ভিন্ন ভিন্ন অলংকার ধারণ করতেন। তিনি উচ্চরাধিকার সূত্রে ১২৫ কিলোগ্রাম হীরক খণ্ড, পান্না, মুক্তা আৰ চুনি—৬২৫,০০০ ক্যারেটের রত্ন—লাভ কৱায় নিজের শখ অনায়াসেই পূৰণ কৱতে পেরেছিলেন। ইংৰেজ রাজদূতের কাছে তাকে পোশাকের পৰিবৰ্তে রত্নপাথৰে আবৃত বলেই মনে হয়েছে ‘এবং বড়, উজ্জ্বল সব মূল্যবান অলংকার...তার মাথা, গ্রীবা, বুক, বাহু, বাহুর উর্ধ্বাংশ, কোমরে আৰ তার হাতের প্রতিটি আঙুলে চেইন দিয়ে সংযুক্ত দুই বা তিনিটি অঙ্গুলীয় রয়েছে...চুনিঙ্গলোৱ একেকটোৱ আকৃতি আখরোটেৱ চেয়েও বিশাল; এবং মুক্তেগুলো এতটোই দ্যুতিময় যে আমাৰ চোখ সেদিকে মুঝ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।’ নিজেৱ বিয়েৱ দিনে এই মহান মোগল স্মার্ট নিশ্চয়ই একটি দারুণ দৰ্শনীয় দৃশ্যেৱ জন্ম দিয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীৰ তার নববিবাহিত বধূকে ‘নূৰ মহল’, ‘প্ৰাসাদেৱ আলো’ উপাধি দান কৱেন এবং মেহেরনিসাই আনুষ্ঠানিকভাৱে তার শেষ স্তৰীৱ স্বীকৃতি লাভ কৱেন। ১৬১৬ সালে, তিনি তাকে আৱো মৰ্যাদাসম্পন্ন উপাধিতে ভূষিত কৱেন—‘নূৰ জাহান’, ‘দুনিয়াৰ নূৰ।’ তিনি তার স্মৃতিকথায় লেখেন, ‘আমাৰ তার চেয়ে বেশি কেউ পছন্দ কৱে বলে আমৰুৱ মনে হয় না।’ জাহাঙ্গীৰ তার পৰিবারকে পুনৱায় পদোন্নতি দান কৱেন্ন আৰ তাদেৱ পুৱৰকৃত কৱেন। ইতিমাদ-উদ-দৌলা, পূববৰ্তী অবিচারণ্য জন্য তাকে মাৰ্জনা কৱা হয়, বৰ্ধিত খেতাবেৱ পাশাপাশি বিপুল পৰিমাণ অৰ্থ লাভ কৱেন। জাহাঙ্গীৰ তার পুত্ৰ আৱজুমান্দেৱ পিতাকে, সারাজুজ, ‘মস্তক ছিন্নকাৰী’, নিজেৱ বিখ্যাত, ক্ষুৰধাৰ তৱৰিষারিঙ্গলোৱ একটি উপহাৰ দেন। (১৬১৪ সালে জাহাঙ্গীৰ তাকে ‘আসফ খান’ উপাধিতে ভূষিত কৱেন, এ নামেই তিনি তার দীৰ্ঘ আৰ প্ৰভাৱশালী জীবনেৱ অবশিষ্ট সময় পৱিচিত হৈ।) নূৰ, অবশ্য তার নব্যপ্রাণ গৌৱবেৱ অস্তত একজন সমালোচককে হারেমে খুঁজে পান। যোধা বাটী, খুৱৱমেৱ তীক্ষ্ণধি আৱ বাকপটু আমিজান, রাজকীয় হারেমেৱ এই নবাগতার প্ৰতি সব সময় অবজ্ঞাপূৰ্ণ মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৱেছেন। একটি গল্প অনুযায়ী, জাহাঙ্গীৰ যখন যোধা বাটীকে বলেন, নূৰ তার বিষ নিষ্পত্তি নিঃখাসেৱ প্ৰশংসা কৱেছেন তখন মেজাজি রাজপুত রাজকন্যা রাগত স্বৰে কেবল মস্তব্য কৱেন, বহু পুৱৰমেৱ সান্নিধ্যে সময় কাটাবাৰ অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একজন রমণীৱ পক্ষেই কেবল বলা সম্ভব যেকোনো পুৱৰমেৱ নিঃখাস মিষ্টি, না টক।

পৱবৰ্তী বছৰে, ১৬১২ সালেৱ ১০ মে, একটি দিন যা দৱবাৱেৱ জ্যোতিষীৱা নববিবাহিত দম্পত্তিৱ নীৱবছিন্ন সুখেৱ নিশ্চয়তাদানকাৰী হিসেবে শনাক্ত কৱেছেন, খুৱৱৱয় অবশ্যে আৱজুমান্দ বানুকে বিয়ে কৱেন। দৱবাৱেৱ দিনপঞ্জিৱ রচয়িতাৱা বৰ্ণনা কৱেছেন কীভাৱে এই মঙ্গলময় রাতে, ‘তাৱকাৱাজি

আর মশাল এবং লস্তনের দুতিময় বাতি-উৎসবের উজ্জ্বলতা আকাশ আর পৃথিবীর বুকে যুগপতভাবে জুলজুল করেছিল। 'যৌবনের দিনের চেয়ে উজ্জ্বল একটি রাত' তারা যোগ করে 'কামনার পরিত্তি আর পুলকিত আনন্দ দানকারী।'

দীর্ঘ অপেক্ষার তিক্ততা মুছে দিতেই যেন বিয়ে উপলক্ষে জাঁকালো আর আড়ম্বরপূর্ণ সমস্ত আয়োজন করা হয়, যা একটি বিপুল বিস্তারী সাম্রাজ্যের পক্ষে করা সম্ভব। 'স্ট্রাটের যথান মহিমার সাথে মানানসই মাত্রায় আয়োদ্ধ আর আহুদের জন্য অপরিহার্য এবং উৎসবের প্রয়োজনীয় উপকরণের' বল্দোবস্ত করার দায়িত্ব জাহাঙ্গীর নিজে গ্রহণ করেন। তিনি আরো লেখেন : 'আমি খুররমের মহলে যাই এবং সেখানে একদিন আর একরাত্রি অবস্থান করি। আমার আগমন উপলক্ষে সে আমাকে নানা উপচোকন প্রদান করে, তার নিজের মা এবং সৎমায়েরা আর বেগমদের ও হারেমের পরিচারিকা, সবাই তার অনুগ্রহ লাভ করে এবং আমির-ওমরাহদের সম্মানসূচক আলখাল্লা প্রদান করে।' খুররমের উপহার সামগ্রীর ভেতরে ছিল 'অতুলনীয় বহুমূল্য রত্ন এবং হৃদয়ে প্রশংসিত আনন্দকারী উপচার।' খুররমের হবু স্ত্রীর মহলে তার বস্তুরা উপহার হিসেবে অর্ধ আর মূল্যবান রত্ন নিয়ে আয় এবং তিনি বিশাল একটি হাতির পিঠে জাঁকালোভাবে উপবিষ্ট অবস্থায় তাদের অনুসরণ করেন।\*

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার পূর্বে, মোগল অভিজাতবৃন্দ, একটি পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে, খুররমের হাত সৌভাগ্যের জন্য মেহেন্দি আর হলুদ দিয়ে রঙিত করে দেয় এবং জাহাঙ্গীর নিজে তার ছেলের মাথায় 'বিয়ের দুতিময় মোতির কিরীট পরিয়ে দেন।' মোগলরা কোরআন শরিফ থেকে পবিত্র আয়াত পাঠ করে—খুররম, যদিও তার শরীরে বহমান রাজপুত রঞ্জের কারণে জন্মসূত্রে এক-ত্রীয়াংশ হিন্দু, তাকে একজন সুন্নি মুসলমান হিসেবেই বড় করা হয়েছে, অন্যদিকে আরজুমান্দ বানু একজন শিয়া ধর্মাবলম্বী। তরুণী বধূ এরপর বিয়েতে তার আনুষ্ঠানিক সম্মতি প্রদান করেন এবং উভয়ের পরিবার নিজেদের ভেতরে উপহার আদান-প্রদান করে—'খনি আর কোয়ারি থেকে খুঁজে আনা মূল্যবান পদার্থ আর অমরকুন্ডার মাঠের বাছাই করা শস্য।'

আনুষ্ঠানিকতার একেবারে শেষ পর্যায়ে, গোলাপজলে খুররমের হাত ধুইয়ে দেয়া হয় এবং একীনতা নিশ্চিত করতে তিনি এক পাত্র পানি পান করেন। নববধূর পিতার মহলে বিবাহ পরবর্তী ভোজসভার আয়োজন করা হয়।

\* মোগলরা হিন্দুদের বিয়ের শোভাযাত্রার রীতি গ্রহণ করেছিল। আকবরের শাসন আমল থেকে, মোগল রাজকীয় পরিবারে হিন্দু স্ত্রীদের বিয়ে করে আনা শুরু হলে, তারা কনের মহলে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা আয়োজনের হিন্দু মীতিও গ্রহণ করে।

মাসব্যাপী আতশবাজির প্রদর্শনী আর চাকচিক্যময় শোভাযাত্রার সাথে—যা ‘আনন্দঘন ঢাকের বাদ্য আর তীক্ষ্ণ কঠের উদ্দীপিত চিৎকারে’র কারণে এতটাই কোলাহলপূর্ণ যে, তারা অনায়াসে ‘ঘূর্ণায়মান ভূ-গোলককে নাচাতে’ সক্ষম—উৎসব উদ্যাপিত হয়।

রাজকীয় দিনপঞ্জির রচয়িতারা অবশ্য বন্ধনিষ্ঠার শার্থে স্ট্রাটদের, যাদের কীর্তিকলাপ তারা লিপিবদ্ধ করছেন তাদের পুরুষত্বের বিষয়েও ইঙ্গিত দান করতেন, কিন্তু খুররমের ক্ষেত্রে তাদের কোনো কিছু বাড়িয়ে লেখার প্রয়োজন হয়নি। তিনি তার জীবনের পুরোটা সময় একজন ভোগবিলাসী আর ইন্দ্ৰীয়প্ৰবণ ব্যক্তি ছিলেন। আরজুমান্দ বানুৰ সাথে তার বিয়ের সময়, পেশল দেহ আৰ চওড়া ছাতিৰ অধিকাৰী, যুবরাজেৰ বয়স যখন বিশ বছৰ তিনি তখন তার যৌন ক্ষমতার তুঙ্গে অবস্থান করছেন এবং ইতিমধ্যে একজন পরিণত আৱ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন, দৱবাৰেৰ প্ৰশংসনেৰ কাৱণে যেখানে নিৰ্ণজ্ঞভাৱে দৈহিক সুখ উপভোগ কৰা হয়। মোগলৱা তাদেৱ নতুন বাসস্থানেৰ ভোগবিলাসী রীতি বেশ দ্রুতই আত্মস্ফুল কৰেছিল। ইসলামিক বিশ্বেৰ সৰ্বত্ত ভাৱতবৰ্ষ তাৰ যৌনতা আৱ ভোগবিলাসিতা এবং কামকলাৰ হিন্দুশাস্ত্ৰ কামসূত্ৰেৱ, যা ত্ৰিস্তীয় তৃতীয় খেকে পঞ্চম শক্তিৰ মধ্যে রচিত হয়েছিল, এৱ জন্য বিখ্যাত। শেখ নেফওয়াজি, যিনি ত্বিঙ্গনিসেৱ পৰিবাৱেৰ জন্য পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীতে দ্য পারফিউমড গার্ডেন রচনা কৰেছিলেন, স্বীকাৱ কৰেছেন, ‘রতিক্ৰিয়া সম্পর্কিত অনুসন্ধান আৱ জ্ঞানে ভাৱতবৰ্ষেৰ লোকজন আমাদেৱ চেয়ে অনেক বেশি অগ্ৰসৱ ছিল।’ তিনি লিখেছেন, নিকট প্ৰাচ্যে যখন রতিক্ৰিয়াৰ কেবল এগাৰোটা আসন প্ৰচলিত ছিল, ভাৱতীয়ৱা তখন অনেক বেশি আসনেৱ কথা জানত, যাৱ ভেতৱ দ্য পারফিউমড গার্ডেন-এ বৰ্ণিত পঁচিশটি কল্পনাশুয়ী অঙ্গস্থিতিও এৱ অন্তৰ্গত।

বিয়েৰ রাতে প্ৰচলিত প্ৰথা অনুসৰেই সৰ্বাধিক যৌনত্পন্ন নিশ্চিত কৰতে অনেক যত্নেৰ সাথে সমস্ত আয়োজন কৰা হতো। বৱ আৱ বধু উভয়কেই তাদেৱ নিজ নিজ পৰিচাৰকৱা গোসল কৰিয়ে তেল আৱ সুগন্ধি মাৰিয়ে দিত তাৱপৱ চমৎকাৱ একটি শয়্যায় তাদেৱ শায়িত কৰা হতো, যেখানে পৰিচাৰকৱা দক্ষতাৰ সাথে তাদেৱ দেহ মালিশ কৰে তাদেৱ রতিক্ৰিয়াৰ জন্য প্ৰস্তুত কৰত। নারী আৱ পুৱুষ উভয়েৰ জীবনেৱ জন্য যৌনত্পন্নিকে একটি অধিকাৱ, বন্ধনতপক্ষে অপৰিহাৰ্য হিসেবে গণ্য কৰা হতো। খুৱৰম আৱ আৱজুমান্দ বানু তাদেৱ প্ৰথম রতিক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰাৱ পৱ তাদেৱ শয়্যা সতৰ্কতাৰ সাথে পৱীক্ষা কৰা হতো রতিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং আৱো একটি বিষয় যে নবপৱিণীতা বধু বাস্তৱিকই কুমাৰী ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। বিয়েৰ ছয় সপ্তাহ পৱ দৱবাৱেৰ দিনপঞ্জিতে গৰ্ভধাৱণ বিষয়ে তাৱ অমিত ক্ষমতাৰ কাৱণে ‘রাজবংশেৰ

রত্ন প্রসবিনী আকর' হিসেবে তার প্রশংসা করে ঘোষণা করা হয়, নবদম্পত্তির প্রথম সন্তান তিনি গর্জে ধারণ করেছেন।

খুররমের দিনপঞ্জির রচয়িতারা বর্ণনা করেছেন, নিজের নবপরিণীতা বধূকে 'অভিজ্ঞতার কঠিপাথরে যাচাই করে তার অনন্যতা খুঁজে পেতে; সেইসাথে তার সৌন্দর্যের দৃষ্টিগোচরতার নিরিখে সমসাময়িক পৃথিবীর নারীদের মাঝে তিনি সর্বাধ গণ্য আর নির্বাচিত (মহতাজ) বুঝতে পেরে, তিনি (খুররম) তাকে মহতাজ মহল উপাধি দান করেন, যাতে খেতাবটি একদিকে সময়ের নির্বাচিত রমণী হিসেবে তার গর্ব আর মহিমা ইঙ্গিত করে, অন্যদিকে ইহকাল আর পরকালের এই খ্যাতিমান রমণীর সত্যিকারের প্রথিতযশা নাম, সংগত কারণেই যেন সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত না হয়।' মোগলদের মাঝে এমন খেতাব প্রদান করার রীতি প্রচলিত ছিল 'যখন রাজকীয় শয়্যার সৌভাগ্যের মহিমা যারা লাভ করেছে তাদের মাঝে বিশেষ কাউকে তারা অধিকতর সম্মান প্রদর্শনপূর্বক স্বাতন্ত্র্য প্রদানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত।'

মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রা ছিল, যেখানে তরুণ দম্পতি তাদের বহু-বিলম্বিত বিবাহিত জীবন শুরু করে, ১৫০,০০০ জন অধিবাসী অধ্যুষিত একটি কর্মচক্ষল শহর। ইংরেজ পর্যটকদের কাছে শহরটাকে 'শুমারির অতীত জনবহুল'\* বলে মনে হয়েছে। শহরের সাধারণ অধিবাসীদের বাসস্থান ইট আর টালির তৈরি হতো, তাদের পক্ষে যদি এর ব্যয় বহন করা সম্ভব হতো, সম্ভব না হলে কাদামাটি দিয়েই কাজ তৈলান হতো। মাটি দুরমুজ করে সেটা গোবর গোলা পানি দিয়ে লেপে দেয়া হতো। গ্রীষ্মের দাবাদাহের হাত থেকে রক্ষা পেতে ঘরের চালে কেবল খড়ের আচ্ছাদন দেয়া হতো এবং সে কারণেই ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড ঘটত—গ্রীষ্মের উষ্ণ, ঝলসে দেয়া বাতাসে, যার জন্য আগ্রা বিখ্যাত ছিল, চুল্লির আগুন থেকে উড়ে আসা স্ফুলিঙ্গ ঘূরপাক খেতে খেতে প্রায়ই এসব শুষ্ক ছাদে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করত। শহরের মেয়েরা অনেক সময় পর্দা ভেঙে দৌড়ে বাইরে গিয়ে আগমন্তকের সামনে নিজেদের প্রকাশ করার পরিবর্তে ঘরেই আগুনে পুড়ে মারা যাওয়াকে শ্রেয়তর মনে করত।

মোগল রাজধানীতে পুরো সাম্রাজ্য এমনকি সাম্রাজ্যের বাইরে খেকেও প্রচুর আগমন্তকের আগমন ঘটত। সমগ্র শহর জুড়ে অবস্থিত নকবইটা সরাইধানায় ভাগ্যাদ্বৰ্ধী সৈন্যদের পাশাপাশি আফগান, উজবেক, তুর্কি, পার্সি এবং ইউরোপীয় বণিকরা আশ্রয় লাভ করত। ক্লান্ত পর্যটকরা শহরের আটশ

\* লতন সেই সময়ে প্যারিস আর কনস্ট্যান্টিনোপলের পরেই ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল, যার লোকসংখ্যা ছিল তিনি লাখ।

হাম্মামের (গোসলখানা) একটি পথের ধুলো আর ঝুঁতি থেকে পরিত্রাণ খুঁজে পেত। বর্তমানের ন্যায়, তখনে শহরের রাস্তাগুলো নানা পণ্য নিয়ে ঘূরে বেড়ানো হরকরাদের ভিড়ে গিজগিজ করত। এক ইংরেজ কেরানি বর্ণনা করেছে কীভাবে ‘প্রতিটি সন্ধ্যাই ছিল উৎসবের আমেজে পূর্ণ, যখন তারা গণিকালয়ে প্রবেশ করে সেখানের খাটে ওয়ে বসে থাকা গণিকাদের ভেতর থেকে পছন্দ করে নিয়ে দরদাম করত।’ সে দেখেছে কীভাবে অল্পবয়সী কৃতদাসীদের নর্তকী হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো, তাদের কুমারিত্ব উপভোগের প্রস্তাব দেয়া হতো ‘প্রথমে বিশাল অক্ষের অর্ধের বিনিময়ে, তারপর তাদের সাধারণ বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করা হতো।’ শহরের সড়কগুলো মানুষে এতটাই গিজগিজ করত যে যখন দরবারে গমনকারী অমাত্যদের বহনকারী সোনালি রং করা শিংয়ের সাদা গুরু গাড়িগুলো তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন তাদের রাস্তার পাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। বিশালাকৃতি হাতিগুলো তাদের পিঠে বাঁধা আন্দোলিত হাওদাগুলো নিয়ে, যেখান থেকে পর্দানশীল মহিলারা বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকত, যখন মন্ত্র পদক্ষেপে এগিয়ে চলত সেগুলো ছিল আরো বেশি বিপজ্জনক। কোনো কোনো ধনাচ্য ব্যক্তি পালকিতে, স্যাটিন বা রেশেমের কারুকাজ করা ঝালরযুক্ত পর্দা দেয়া এক ধরনের বিছানা, দোল ফৈতে খেতে চলাচল করতে পছন্দ করত, যেগুলো বহন করে নিয়ে যেতে কৃতিদাসের দল, যারা পালকি কাঁধে করে দৌড়ে যাবার সময় তাদের নতুনপায়ের আঘাতে ধুলোয় নিয়মিত একটি শব্দ সৃষ্টি করত।



টমাস কেয়াট, একবার হলেও অস্বাক্ষর পায়ে না হৈটে দ্রমণ করছেন।

বেলে পাথরের অতিকায় আকাশজননীযুক্ত লালকেল্লার ভেতরে অবস্থিত মহলে যখন স্মাট অবস্থান করতেন তখন দরবারের কৃত্যানুষ্ঠান সবার জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। আকাশে ভোরের ধূসর আলো ফোটার সাথে সাথে দিন শুরু হতো যখন

দুর্দুতির (ঢাকের) শব্দ বরোকা-ই—দর্শনে, দর্শনদানের বারান্দায়, প্রতিটি দুর্গ আর প্রাসাদের বাইরের দিকের দেয়ালের অনেক উচুতে নির্মিত হতো, স্মাটের আগমনের কথা ঘোষণা করত। স্মাট জীবিত আছে এবং তিনি নিরাপদ আছেন এটা প্রজাদের কাছে প্রতীয়মান করতেই এই দর্শনদান। হিন্দু রাজাদের দরবারে প্রচলিত প্রথা থেকে গৃহীত এই রীতি প্রথম প্রচলন করেছিলেন স্মাট আকবর। জাহাঙ্গীর তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এই প্রথাটা এতই শুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, কোনো কিছুই, এমনকি ‘প্রচণ্ড যত্নণা বা দুঃখ’ তাকে দর্শনদান থেকে বিরত রাখতে পারত না। জাহাঙ্গীর অবশ্য এটাও স্বীকার করেছেন, দর্শনদানের পর তিনি পুনরায় কয়েক ঘণ্টার জন্য শয়ায় ফিরে যেতেন।

প্রজাদের ভেতরে যারা সাহস সঞ্চয় করতে পারত তারা নিজেদের দুর্দশার জন্য জাহাঙ্গীরের কাছে সরাসরি প্রতিবিধান কামনা করার সুযোগ লাভ করত। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে বিবেচিত হতে ব্যবহৃত যে ‘সব লোকের হৃদয় জয় করে বিষণ্ণ পৃথিবীতে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারবে’, তিনি তার রাজত্বকালের প্রথমদিকে একটি প্রধার প্রচলন করেছিলেন, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন ‘ন্যায়বিচারের শিকল।’ শিকলটা আদতে ষাটটি সোনার ঘণ্টাযুক্ত আশি ফিট লম্বা একটি দড়ি এবং দড়িটার কাছ ছিল ‘তার প্রজাদের অস্তর থেকে নিপীড়নের ক্ষত মুছে দেয়া।’ আঘা~~জামে~~ আকাশজননী আর নদীর তীরের একটি পাথরের স্তম্ভের মধ্যবর্তী ঝালে ঝুলত এই দড়িটা সময়ে ইংরেজ পর্যটক উইলিয়াম হকিঙ্স লিখেছেন: ‘পুরো দড়িটার দৈর্ঘ্য বরাবর সোনার গিণ্ঠি করা ছোট ছোট ঘণ্টা বাস্তু, ফলে কেউ দড়িটা ধরে ঝাঁকালে স্মাট ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাবেন, যিনি তখন কাউকে প্রেরণ করবেন দুর্দশার কারণ সম্পর্কে অবহিত হতে এবং তারপর প্রয়োজনীয় ন্যায়বিচার করবেন।’

স্মাট যদি মনে করেন তুচ্ছ কারণে কেউ দড়ি টানার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাহলে তার কপালে শাস্তি জুটত; সেই কারণে স্মাটের সাথে দেখা করতে হলে সাহসের প্রয়োজন ছিল। রাজদরবারের রাজকীয় আদব-কায়দা ছিল জটিল আর অবশ্য পালনীয়। পরিপূর্ণ নীরবতা বজায় রাখা ছিল অবশ্য পালনীয় আইন এবং দর্শনার্থী কক্ষে নিজেদের নির্ধারিত আসন থেকে কেউ, এমনকি যুবরাজরাও অনুমতি না নিয়ে আসন ত্যাগ করতে পারত না। স্মাটের সামনে আদেশ দেয়া মাত্রই শাস্তি প্রদান করা হতো। হকিঙ্স বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘স্মাটের ঠিক সামনেই কতোয়ালদের একজন তার প্রধান জল্লাদকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, যার সাথে থাকত আবার প্রায় চত্ত্বিশজন সহকারী জল্লাদ, যারা প্রত্যেকে মাথায়, অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা মোটা কাপড়ের তৈরি বিশেষ এক ধরনের পাগড়ি পরিধান করত। তাদের কাঁধে থাকত একটি ছোট কুড়াল এবং অন্যদের কাছে থাকত নানা ধরনের চাবুক, স্মাট যা আদেশ দেবেন সেটা তৎক্ষণাত পালন করতে প্রস্তুত।’

ଆହ୍ରାୟ ଆରୋ ଅନ୍ୟ ଘଣ୍ଟାର ଧରିନିଓ ଶୋନା ଯେତ, ସେମନ ସ୍ଥ୍ରାଟ ଆକବରେର ଆମଲେ ଜେସୁଇଟ ପାଦ୍ରିଦେର ନିର୍ମିତ ଗିର୍ଜାର ଘଣ୍ଟାଗୁଲୋ, ଯାଦେର ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ମସଜିଦ ଥେକେ ନାମାଜେର ଜନ୍ୟ ଡେସେ ଆସା ମୁୟାଙ୍ଗଜିନେର ସୁଲଲିତ କର୍ଷେର ଆଜାନେର ଧରନିର ସାଥେ ଯିଲୋମିଶେ ଏକାକାର ହେଁ ଯେତ । ଜାହାଙ୍ଗୀର ଛିଲେନ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ମୂଳତ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବେର ଅଧିକାରୀ । ନିଜେର ସ୍ମୃତିକଥାଯ ତିନି ଲିଖେଛେନ, ସ୍ଥ୍ରାଟ ଆକବରେର ନ୍ୟାୟ ତାର ଇଚ୍ଛା, ‘ଧର୍ମୀୟ ବିଷୟେ ପାର୍ଥିବ ଶାନ୍ତିର ନିଯମ ଅନୁସରଣ କରା ।’ ତାର ଦରବାରେ ଇତାଲି ଥେକେ ଆଗତ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟିକ ପିଯେଣ୍ଟୋ ଡେମ୍ବା ଭାଲେ ଲିଖେଛେନ, ତିନି ‘ତାର ରାଜତ୍ତେ ଏକ ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ଆରେକ ଗୋତ୍ରେର ଭେତର କୋନୋ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେନ ନା ଏବଂ ତାର ସେନାବାହିନୀ ଆର ଦରବାରେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ଏଟା ପାଲିତ ହୟ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟେର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ମାନୁଷେର ମାବେଓ, ସବହି ଏକଇ ଜ୍ବାବଦିହିତା ଆର ବିବେଚନାର ଅର୍ତ୍ତଗତ ।’ ଆହ୍ରା ସଡ଼କେ ଗରକୁ ପାଲ ଦଲବେଂଧେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାତ, କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଜାଦେର କଥା ବିବେଚନା କରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଜ୍ବାଇ କରେ ଗର ହତ୍ୟା କରା ନିଷିଦ୍ଧ କରେଛିଲେନ । ଆକବରେର ଚୟେ ତାର ସହନଶୀଳତା ଅବଶ୍ୟ ଅନେକଥାନିହି ସ୍ତଳ । ତିନି ମାବେମଧ୍ୟେ କୋନୋ କିଛୁର ଆବେଗପ୍ରବଳ କିଂବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭାବିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମେ ଆପ୍ଲତ ହତେନ—ଏକବାର ସେମନ ବରାହ ମନ୍ତ୍ରକ୍ୟୁକ୍ତ ଏକଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ଯା ତାର କାହେ ଦୃଷ୍ଟିକୁଟୁଁ ବଲେ ମନେ ହେଁଛିଲ, ତିନି କୁନ୍ଦ ହୟେ ସେଠୀ ଡେଙ୍ଗେ ଫେଲାର ଆଦେଶ ଦିଯେଛିଲେନ ।

ଜାହାଙ୍ଗୀରେ ନିଜେର ଧର୍ମମତ ସବକେ କେବଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍‌ଟ୍ରାଙ୍କୁଇ ବଲା ଯାଯ ଯେ, ତିନି ଇସଲାମେର ମତବାଦେ ବିଶ୍ୱାସ କରଲେଓ ମୋହର୍ ଆର ଜେସୁଇଟଦେର ମାଝେ ତର୍କ୍ୟୁଦ୍ଧ ଶୁନତେ ପହଞ୍ଚ କରନେନ । ସ୍ୟାର ଟମାକ୍ ରୋ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସାଥେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେଛିଲେନ ଯେ, ଜାହାଙ୍ଗୀରେ ଧର୍ମ ‘କ୍ଷେତ୍ର ନିଜେର ଉତ୍ତାବନ’ ଏବଂ ଏମନ୍ତ ମତାମତ ଦେନ ଯେ, ତିନି ମୂଳତ ଏକଭାବ ମୌତିକ । ୧୬୧୦ ସାଲେ ତିନି ତାର ମୃତ ଭାଇ ଦାନିଯେଲେର ତିନ ସଂତାନକେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରାର ଅନୁମତି ଜେସୁଇଟଦେର ଦେନ ଏବଂ ପୁଲକିତ ପାଦ୍ରିଦେର ଘନ୍ୟରାତେ ପ୍ରାସାଦେ ଡେକେ ନିୟେ ଆସା ହୟ, ଯାତେ ତିନି ତାଦେର ହାତେ ଛେଲେଦେର ତୁଲେ ଦିତେ ପାରେନ । ତାର ଭାତିଜାଦେର ଏଇ ଧର୍ମାନ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ବେଶ ଦିନ ହାହୀ ହୟନି । ଜେସୁଇଟ ପାଦ୍ରିରା ବିରକ୍ତିର ସାଥେ ଲିଖେଛେନ, ଯୁବାବାଜେରା ‘ଆଲୋକିତ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ନିଜେଦେର ଅନ୍ଧକାରାଚିନ୍ ଜୀବନେ ଫିରେ ଯାଯ ।’

ଶିଖ

ଯମୁନା ନଦୀର ତୀର ବରାବର, ଅମାଭ୍ୟଦେର ବୃକ୍ଷଶୋଭିତ ଆର ଫୁଲେର କୁଞ୍ଜବୀଥି ସମ୍ମଦ୍ଧ ବାଗିଚା ଆର ଶୀତଳ ପାନିର ପ୍ରସ୍ତରଗ୍ୟୁକ୍ତ ବିଲାସବହୁଳ, ଅଭିଜାତ ପ୍ରାସାଦଗୁଲୋ

\* ଜାହାଙ୍ଗୀର ଶିଖ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ସିଂ୍ହେର ପ୍ରାଗଦିନେର ଆଦେଶ ଦିଲେ ତିନି ଶିଖଦେର ସବଚୟେ ମହା ଆତ୍ମୋର୍ଗନ୍ତକାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରେନ, ଯଦିଓ କୋନୋ ଧର୍ମୀୟ କାରଣେ ନା ବରଂ ଖସରୁର ବିଦ୍ରୋହେ ଅଂଶ ନେୟାର ଜନ୍ୟ ତାକେ ମୃତ୍ୟୁଦତ୍ତ ଦେଯା ହେଁଛିଲ । ଶିଖ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅବଶ୍ୟ ଖସରୁକେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ସୌଭାଗ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ତାର କପାଳେ କୁନ୍ଦମେର ତିଳକ ଏଁକେ ଦିଯେଛିଲେନ ।

অবস্থিত ছিল। নদীর সমুখভাগ ভীষণ চাহিদাসম্পন্ন হওয়ায়, একজন ইউরোপীয় পর্যটকের ভাষ্য মতে শহরটা, 'চওড়ার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা ছিল', নদীর গতিপথের সাথে অর্ধচন্দ্রের ন্যায় বাঁকানো। খুররমের প্রাসাদটা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, মমতাজ যেখানে কোরআনের নির্দেশ অনুসারে সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে, হারেমের প্রাকারবেষ্টিত প্রথাগত প্রাঙ্গণে তার জন্য নির্ধারিত মহলে বসবাস শুরু করেন। হারেম শব্দটি আরবি হারিম থেকে গৃহীত, যার অর্থ পবিত্র বা নিষিদ্ধ। খুররম দুই বছর পূর্বে পারস্যের যে রাজতনয়াকে বিয়ে করেছিলেন তার ভাগ্য সময়ে দিনপঞ্জির রচয়িতারা মৌন থেকেছেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে অস্তত আরো একজনকে স্তৰী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতারা পরবর্তী সময়ে তার প্রত্যক্ষ আদেশে লিপিবদ্ধ করেন, 'এই কীর্তিমান রমণীর (মমতাজকে) প্রতি তার সমস্ত অগ্রহ এমনভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল যে, তিনি তার প্রতি যে ভালোবাসা অনুভব করতেন অন্যদের প্রতি তার সহস্র ভাগের এক ভাগও অনুভব করতেন না...' মমতাজের ক্ষেত্রে এতটুকু বলা যায় যে, তিনি তার নিজের পারস্যের পরিবারে যেমন বৈবাহিক বন্ধন দেখেছিলেন অবিকল তেমনই পারিবারিক বন্ধনের সুখ লাভ করেছিলেন। তার পিতামহ ইতিমাদ-উদ-দৌলা এবং তার স্ত্রী, একান্তভাবে পরম্পরারের অনুরক্ত ছিলেন এবং তার ফুরিজান নূর মহলের সাথে, যাকে আমরা মেহেরান্নিসা হিসেবে পূর্বে চিনতাম, ইতিমধ্যে তার নতুন স্বামী, জাহাঙ্গীরের একটি শক্তিশালী সম্পর্ক সৃষ্টি হতে শুরু করে।

নূর বিশাল রাজকীয় হারেমে নিজের ক্ষেত্রীয় অবস্থান সংগত করছে, এমন একটি স্থান যেখানের 'কামোদীপুর' ক্ষেত্রিয়পরায়ণতা, খেয়ালি আর বেপরোয়া আমোদ-প্রমোদ' মোগল দরবারে আগত পশ্চিমা পর্যটকদের, এই সময়ে তাদের সবাই অবশ্য পুরুষ মুক্ত করেছে। রমণীদের এই নিজস্ব দুনিয়ার ভেতরে কী হয় সে সমস্কে তারা আগ্রহভরে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছেন এবং প্রহরীরা কীভাবে মেয়েদের এসব খাসকামরায় পুঁলিঙ্গের আকৃতির কোনো কিছু, এমনকি শসা বা মূলাও প্রবেশ করতে দেয় না সে সমস্কে সুড়সুড়ি দেয়া কাহিনী লিখেছে। খামখেয়ালি ইংরেজ পর্যটক টমাস ক্রোয়াট, যিনি ১৬১৫ সালে মোগল দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন : 'পুরুষাঙ্গের আকৃতির যেকোনো কিছু' যাতে 'অস্বাভাবিক ব্যবহারের উদ্দেশ্য সেটাকে পরিবর্তিত করা না হয় সে জন্য কেটে ফেলা এবং বিষমধারে পরিণত করা হতো'। হারেমের রমণীদের অবশ্য এমন কোনো মোটাদাগের উপচারের প্রয়োজনই ছিল না। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, গজদন্ত, শিং এবং কাঠের তৈরি কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ যা ভেতরে ফাপা এবং অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার জন্য বাইরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রক্ষীতি রয়েছে, তা ভারতবর্ষে সহজলভ্য ছিল।

রাজকীয় হারেম ছিল অবশ্যই যৌন সংগমের একটি লীলাভূমি—জাহাঙ্গীরের কমপক্ষে তিনশ যৌনসঙ্গী ছিল, কাম-উদ্দীপক আরক পান করে নিজেকে সহবাসের জন্য প্রস্তুত করতেন তিনি। হারেমের মহিলা আধিকারীকেরা যত্নের

সাথে তার সহবাসের নথিপত্র রাখত, যেখানে তার সহবাসের প্রতিটি সঙ্গী থেকে সহবাস সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকত। মোগল অণুচিত্র যদি সঠিক হয়, স্বাত্মের সহবাসকালীন সময়ে তারা অনেক সময় উপস্থিত থাকত, যদিও তারা বিনয়ের সাথে উজ্জেলনায় যোচড়তে থাকা শুগল থেকে দৃষ্টি বিবর্তিত রাখত।

হারেম কিন্তু একই সাথে আরো অনেক কিছু ছিল। এটা রাজপরিবারের অনেক সদস্যদের—মা, ধালা, বোন, আঞ্চীয় সম্পর্কিত বোন, বিধবা, যাদের সাথে থাকত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া উপপত্নীরা, যাদের যৌন আকর্ষণ নিঃশেষ হওয়ায় তাদের সেখানেই থাকতে দেয়া হয়েছে—বাসাহান। হারেম একই সাথে রাজপরিবারের সভানদের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করত। বসরুর ঘরতো অনেকেই ছিলেন যাদের নিজের ঘায়ের পরিবর্তে কখনো কখনো রাজপরিবারের বয়স্ক মহিলারা লালন-পালন করতেন।

আকবর তার ৫,০০০ মহিলার বিশাল হারেমের পরিচালনা আর নান্দনিকতা বজায় রাখতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেছিলেন এবং তার প্রচলিত নিয়ম-কানুন তার বংশধররা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছে। ক্ষমতাসীন স্বাত্মের আশ্মিজানই রীতি অনুযায়ী হারেম নিয়ন্ত্রণ করতেন, তার অনুবর্তী থাকতেন স্বাত্মের প্রধান মহিলা আর অন্য জ্ঞারা। তাদের পরে, হারেমের কর্মকাণ্ড অসংখ্য দণ্ডের ঘারা পরিচালিত হতো, প্রতিটির দায়িত্ব প্রচুর বেতনপ্রাপ্ত ‘কুমারী রমণীদের’ ওপর ন্যস্ত থাকত। হারেমের অন্যতম শুরুত্তপূর্ণ দায়িত্ব ছিল হিসাবরক্ষকের—একজন ‘চতুর আর মিথিদিঙ্গুণ লেখক’—যে প্রাত্যহিক খরচ নিয়ন্ত্রণ করত আর প্রতি বছরের স্বাজট নিরূপণ করত। হারেমের কোনো রমণী যখন কোনো কিছু কেনার ইচ্ছা করত সে ‘তহবিলদার’-এর কাছে আবেদন করত, যে হিসাবরক্ষকের কাছে তার অনুমতি লাভের জন্য অনুরোধটা উপস্থাপন করত। গৃহকার্য বজ্জ্বাল রাখার সাধারণ ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হতো তখন হারেমের মহিলা জ্যোতিষীদের সাথে আলোচনা করা হতো। হারেমের কোনো মহল থেকে যখন একটি মূল্যবান মোতি হারিয়ে যায়, একজন জ্যোতিষী সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে, বা গল্পটা এমনই যে, তিনি দিনের ভেতরে ধূসর তুকের অধিকারী একজন রমণী সেটা খুঁজে পাবে, যে স্বাত্মের হাতে সেটা তুলে দেবে। মহিলা আধিকারিক, পরিচারিকা আর ভৃত্যদের বিশাল প্রাধান্য পরম্পরার একেবারে নিচের ধাপে ছিল মহিলা অবক্ষরকের দল, যারা ভূগর্ভস্থ সূড়ঙ্গ, যেখানে মলযুক্ত গিয়ে জমা হতো সেসব পরিষ্কার করত।

আগ্রার লালকেন্দ্রার হারেম ছিল বারান্দা, উদ্যান, বৃক্ষশোভিত পথ এমনকি সাঁতারের জন্য জলাশয় বিশিষ্ট, প্রশস্ত আর খোলামেলা। প্রতিটি কামরা আর হলঘর আসবাবপত্র দিয়ে রুচিশীলভাবে সজ্জিত, যেখানে নরম গদির ওপর শ্রীশকালে রংবেরঙের নকশা করা রেশমের গালিচা আর শীতকালে পশমের গালিচা বিছানো থাকত। হারেমের অভ্যন্তরের মেঝের কোনো অংশ অনাবৃত থাকত না। দরজা আর জানালা মার্জিতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মখমল আর উজ্জ্বল রঙের রেশমের পটি বাঁধা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকত। আকবরের প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় সুগন্ধি প্রস্তুতকারী কারখানায় প্রস্তুতকৃত সুগন্ধি বাতাস সুরভিত করে

রাখত। রত্নখচিত ধূপাধার থেকে তিতিমাছের অঙ্ক থেকে প্রাণ গন্ধদ্বয়, গোলাপজল, ঘৃতকুমারী গাছের নির্যাস আর চন্দন কাঠ পাতন করে তৈরি করা ধূপের চিন্তকৰ্ষক সুবাস ভেসে আসত। সুগন্ধি সাবান আর পিছিলকারী অনুলেপন হারেমের রমণীদের তাদের তৃক সতেজ আর শীতল রাখতে সাহায্য করত। আরো ছিল গোলাপ ফুল থেকে মমতাজের পিতামহী, আসমত বেগমের উষ্টুবিত আতর, জাহাঙ্গীর যাকে তার রাজত্বকালের সেরা আবিক্ষার বলেছিল এবং বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে ‘তিনি যখন গোলাপ জল তৈরি করছিলেন, পাত্রের উপরিভাগে একটি গাঁজলার সৃষ্টি হয় সেখানে জগ থেকে গরম গোলাপ জল ঢালতে। তিনি এই গাঁজলা একটু একটু করে সংগ্রহ করেন...এর সুগন্ধি এতটাই শক্তিশালী যে, হাতের তালুতে যদি এক ফোঁটা ফেলে ঘষা হয় এটা পুরো সমাবেশকে সুবাসিত করে তুলবে এবং মনে হবে যেন অসংখ্য লাল গোলাপের কুঁড়ি সেই মুহূর্তে প্রস্ফুটিত হয়েছে। অন্য আর কোনো সুগন্ধি এর সমকক্ষ নয়। এটা ডগু হৃদয়ে আশা জাগিয়ে তোলে এবং ঝাঁস আত্মাকে প্রাণবন্ত করে।’

স্বী আর উপপত্নীরা তাদের নিজস্ব সংসার পরম্পরার সংযুক্ত মহল আর কক্ষে গড়ে তুলেছিল। ডুর্গভূষ্ম সিঁড়ি আর গলিপথের একটি গোপন ব্যবস্থা বায়ু চলাচল নিশ্চিত করার সাথে সাথে হারেমের অধিবাসীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণেও সহায়তা করত। স্বার্ট সমস্ত একান্তকায় দ্রুত আর নীরবে চলাচল করে, কখনো এখানে কখনো অন্য ক্ষেপণাশ আবির্ভূত হলে, এটা তাকে অপার্থিব শক্তির মহিমা দান করত। আক্ষেপের রাজত্বকালে গড়ে তোলা মহিলা গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে তিনি সব কিছু জানতে পারতেন। হারেমের ডেতরের নিয়মানুবর্তিতা ছিল নির্মম আর কঠোর। জাহাঙ্গীরের এক প্রাক্তন উপপত্নী হারেমের এক খোজার সাথে ফিটনষ্টি করার সময় ধরা পড়লে একটি কাঠের সাথে দুপা বেঁধে তাকে একটি গর্তে দাঁড় করিয়ে বগল পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হয় এবং পানি আর খাবার ছাড়া সূর্যের নিচে সেভাবেই রেখে দেয়া হয়। আলোচ্য ঘটনার অভিযুক্ত খোজাকে ‘হাতির পদদলিত করার সাজ’ দেয়া হয়। নপুংসকরণের ফলে যে যৌন আকাঙ্ক্ষা সব সময় নষ্ট হয় না এই বাস্তবতার শিকার।\*

স্বার্টের জন্য রাজকীয় হারেমের চেয়ে নিরাপদ কোনো স্থান আর নেই, যেখানে তিনি একাধারে প্রভু আর অতিথি হিসেবে আহার করতে আর নিন্দা যেতে পারেন। এটা অনেকভাবেই বাল্যকালের, এমনকি সম্ভবত গর্ভের,

\* যৌনাঙ্গ আর অঙ্গকোষ সম্পূর্ণ অপসারণের মাধ্যমে নপুংসকরণ করা যায়- যার মানে প্রস্তাবের জন্য একটি পালকের প্রয়োজন হবে- বা আরো স্বাস্থ্যসম্মত আর সহজে কেবল অঙ্গকোষ অপসারণের মাধ্যমেও করা যায়। ভিটোয়ায় যুগের এক পর্যটক রিচার্ড বার্টনকে শেষোক্ত প্রকৃতির এক খোজার স্তৰি বলেছিল যে তার স্বামীর মাঝে, প্রলম্বিত যৌন-উদ্দীপনার পরে, এক ধরনের কামোডেজনা জাগিয়ে ধীর্ঘপাত, সম্ভবত মৃত্যুলিঙ্গের এক প্রকার তরল ঘটানো সম্ভব।

নিরাপত্তার মাঝে ফিরে যাওয়া বোঝায়। একজন বিশেষ বিশ্বস্ত ভূত্যের কাছে তার পান করার পানি সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়, যে মুখবদ্ধ করা পাত্রে পানি সংরক্ষণ করে এবং তার পাত্রের সব খাবারই তার ঠেট স্পর্শ করার আগে অন্য কেউ পরীক্ষা করে। হারেমে উৎসাহী তরুণ প্রেমিকদের গোপনে প্রবেশ করা, যারা প্রতিরোধ করে সেই একই প্রহরীরা সম্ভাব্য আঁততায়ীর বিরুদ্ধেও ভালো প্রতিরোধ গড়ে তৃলতে সক্ষম। হারেমের অভ্যন্তর দীর্ঘাস্তি, শক্তিশালী দৈহিক কাঠামোর অধিকারী তীর আর ধনুকে বিশেষ পারদশী রমণীদের দ্বারা সুরক্ষিত—তুর্কি, উজবেক আর আবিসিনিয়ার রমণীদের এ ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম রয়েছে। নির্মতার জন্য তাদের ধ্যাতি দায়িত্বে অবহেলা করলে তারা যে ভয়ংকর শাস্তি ভোগ করবে সেটার মাঝে বেশ ভালোভাবেই প্রতিফলিত হয়। তারা হারেমের বয়স্ক আধিকারিক, খাজাস্বারার কাছে জবাবদিহি করে এবং এসব মহিলা যোদ্ধাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাহিনীটা স্বয়ং সন্ত্রাটের মহল পাহারা দেয়।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রধান দরজা ব্যক্তিত আর সব প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়, যেখানে সারা রাত মশাল জ্বলে। হারেমে প্রবেশের সন্নিহিত পথগুলো খোজার দল পাহারা দেয়। ইংরেজ পর্যটক পিটার মানডি বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘অভিজাত লোকেরা...খোজাদের বিশ্বাস করে তাদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন, যার ভেতরে অন্যতম জনপ্রিয় রমণীদের, তাদের সম্পত্তি পাহারা দেয়াটা...’ কেউ কেউ, চিনেও অনেক ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটত, উন্নতির পথ হিসেবে নিজেরাই খোজা হয়। জন্মদের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, কখনো তাদের পিতা-মাতার নির্দেশে খেঞ্জ করা হতো। এই সময়ের এক বয়স্ক রাজকীয় খোজা পরবর্তী সময়ে নিজের পিতা-মাতার সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল, যারা তাকে ‘এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ অধিগম্য সুখ’ থেকে বঞ্চিত করেছে।

খোজা প্রহরী ছাড়াও, দিনের চরিত্র ঘন্টা রাজপুত যোদ্ধাদের একটি দল পাহারার দায়িত্ব পালন করত, যাদের সহায়তা করতে আরো যোদ্ধার দল আর রাজকীয় বাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হতো। রাজকীয় হারেমে প্রবেশ করা তাই মোটেই সহজ ছিল না। কোনো অভিজাত ব্যক্তির স্ত্রী যখন হারেমে কারও সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে হারেমের আধিকারিকদের কাছে আবেদন করে, উন্নরের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। যাদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হতো, তারা যদি প্রহরীদের কাছে অপরিচিত হতো তাহলে প্রবেশের সময় খোজা প্রহরীরা তন্মুক্ত করে তাদের তল্লাশি নিত, ‘আলোচ্য রমণীর সামাজিক র্যাদা বা অবস্থান কোনো কিছুর তোয়াকা না করে।’ ভেনিসের পর্যটক নিকোলাই মানুচি অভিযোগ করেছিলেন, ‘এই বেবুনদের হাত আর মুখ একই সাথে কাজ করে, প্রাসাদে প্রবেশকারী রমণী আর মালপত্র সব কিছুই চরম লম্পটের মতো তারা তল্লাশি করে; তাদের মুখের ভাষা অশ্বীল আর আদিরসাত্ত্বক গঁজের দারুণ ভক্ত।’ হারেমের অভ্যন্তরে মহিলার ছফ্ফবেশে যেন কোনো পুরুষ প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য

লোকদেখানো এই তপ্পাশি করা হতো। ইউরোপীয় চিকিৎসকদের অনেকেই, যারা হারেমের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেছিল, বাইরের তোরণঘারে আনা অসম্ভব এমন অসুস্থ রমণীর চিকিৎসা করতে, নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছে। ফ্রান্সোয়া বার্নিয়ের বর্ণনা করেছেন কীভাবে একটি কাশ্মীরী শাল দিয়ে প্রথমে তার মাথা ঢেকে দেয়া হয়েছিল, ‘আমার পা পর্যন্ত বিশাল একটি গলবন্ধের ন্যায় সেটা ঝুলতে থাকে এবং হারেমের একজন খোজা হাত ধরে এমনভাবে আমাকে নিয়ে যায়, যেন আমি একজন অঙ্গ শোক।’

অনেক ভাষ্য থেকে জানা যায়, শল্যবিদদের গর্ভপাত ঘটাবার কথা বলা হতো। ঈর্ষাবিত স্ত্রীরা, উদ্ধিগ্ন যে তাদের স্বামীর ভালোবাসায় উপপত্তি আর ক্রীতদাসীরা অনুপ্রবেশ করতে পারে, শল্যবিদদের এসব কারণে বেশ ভালো রকমের অর্থ প্রদান করত। একটি ভাষ্য থেকে জানা যায় কীভাবে এক রাজতনয়া ‘এক মাসে (তার স্বামীর) হারেমের আটজন রমণীর গর্ভপাত ঘটিয়েছিল, কারণ তার নিজের সন্তান ছাড়া সে আর কারও সন্তানকে বেঁচে থাকতে দেবে না।’

কসরতবাজ, অনুকর্তা আর নর্তকীর দল হারেমের মহিলাদের মনোরঞ্জন করত, যারা জর্দি দেয়া পান মুখে দিয়ে গল্প করত, পাশা খেলত এবং বৃক্ষাঙ্গুলিতে পরিহিত অঙ্গুরীয়ে স্থাপিত মুক্তা-বাঁধানো, সুন্দরুক্তি আয়নায় নিজেদের চেহারার তারিফ করত। কিন্তু তারা অলস আত্মরাতিতে মগ্ন থেকে তাদের পুরোটা সময় অতিবাহিত করত না। রাজকুমারী হারেমে নূরের মতো বিশ্বাশী, সুশিক্ষিত আর উচ্চ মহলে যোগাযোগ করেছে এমন মহিলারা, তাদের পুরুষ আত্মীয় বা মধ্যস্থতাকারী হিসেকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা আধিকারিকদের সাহায্যে সাফল্যের সাথে ব্যবস্থা পরিচালনা করত। তারা সত্রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও অনেক সময় জাহাজ ভাড়া, ক্যাট্টেন নিয়োগ করে বাইরের পৃথিবীর সাথেও বাণিজ্য করত এবং ভারতবর্ষের দ্রব্য আরবে এবং আরো দূর-দূরান্তে রঙানি করতে। তারা তাদের প্রাপ্ত ভাতা আর উপটোকন ব্যবহার করত তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থের জোগান দিতে কিন্তু সেইসাথে ভোগ করার জন্য তাদের যে জোয়ারি দেয়া হতো তার আয় এবং বকেয়া শুক মওকুফের মতো সুবিধাদিও তারা ব্যবহার করত। তারা বিচক্ষণতার সাথে তাদের ব্যবসার লভ্যাংশ পুনরায় বিনিয়োগ করে বিপুল পরিমাণ বিন্দের অধিকারী হতো, কিন্তু একই সাথে ভোজসভা, সমাবেশ এবং উৎসবে দরাজ হাতে খরচ করত এবং সেইসাথে ছিল দরবার জীবনের অবিচ্ছেদ্য বাহ্য উপটোকন প্রদান। তারা নতুন ইমারত নির্মাণ এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হতে দান করত। এক ডাচ নূর সম্পর্কে লিখেছেন, ‘তিনি চারপাশে প্রচুর ব্যয়বহুল ইমারত নির্মাণ করেছেন—সরাইখানা বা বণিক এবং পর্যটকদের জন্য বিশ্বামৈর স্থান এবং এমন সব প্রমোদ-উদ্যান আর প্রাসাদ যেমনটা পূর্বে কখনো নির্মিত হয়নি।’ এই মহিলা প্রেমের মতো বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরদাশত করতেন না।

১৬১৩ সালের ৩০ মার্চ, মমতাজ এক কল্যাসন্তানের জন্ম দেন। ‘মাঙ্গলিকতার বাগিচার প্রথম ফসল’ এই রাজতনয়ার নাম রাখা হয় হূর-আল-নিসা। মমতাজের দরবারের বিলাসিতাপূর্ণ জীবন, সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যার সাথে খেলা করার সময়, অবশ্য শীঘ্ৰই সমাপ্ত হয়। জাহাঙ্গীর আরো একবার সামরিক অভিযানের ব্যাপারে মনোযোগ দেন, যা ধসের বিদ্রোহের ফলে তিনি বাধ্য হয়ে মূলতবি রেখেছিলেন এবং ১৬১৪ সালে খুররমকে ডেকে পাঠান। মেওয়ারের (উদয়পুর) রানাকে, রাজস্থানের শাসকদের ভেতরে সবচেয়ে পরাক্রমশালী, যিনি পাহাড়ে অবস্থিত একটি শক্ত ঘাঁটি থেকে যোগলদের বিরোধিতা করা বজায় রেখেছিলেন, পরাত্ত করার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়। মমতাজ যদিও পুনরায় সন্তানসন্তুষ্টবা, তার পরও তিনি এই অভিযানে খুররমের সঙ্গী হন এবং এটাই তাদের বিবাহিত জীবনের ধারায় পরিণত হয়। তিনি সামরিক অভিযানে মেয়েদের কখনো না নিয়ে আসতে তার পূর্বপুরুষ বাবরের পরামর্শ দৃঢ়তার সাথে উপেক্ষা করেন। তার এক দিনপঞ্জি রচয়িতা মন্তব্য করেছেন, ‘তিনি কখনো রাজকীয় কামরার এই আলো নিজের কাছ থেকে পৃথক হতে দেননি স্বদেশে কিংবা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করেন।’ দুর্ভাগ্য এবং কঢ়ের মাঝে এবং কখনো সম্মুহ বিপদের ভেতরেও তিনি সন্মাটের পাশেই অবস্থান করেছেন এবং তাদের এই যায়াবুর জীবনেই তিনি তাদের চৌক্ষ সন্তানের ভেতরে বারোজনকেই গর্তধারণ ক্ষেত্রে প্রসব করেছেন।



## চতুর্থ অধ্যায়

### চম্পতি যুবরাজ

দক্ষিণাত্যের বঙ্গুর মালভূমির পীড়াদায়ক সুলতানদের পরাজিত করে মোগল নিয়ন্ত্রণ দক্ষিণমুখী প্রসারিত করার একটি পূর্ব লক্ষণ হিসেবে জাহাঙ্গীর মেওয়ার বিজয় করতে চেয়েছিলেন এবং তারপর আরো উভয়ে মধ্য এশিয়ায় ‘আমার পূর্বপুরুষদের কৌলিক রাজ্য’, বিশেষ করে সেই পুণ্যস্থান, তৈমুরের হারিয়ে ফেলা রাজধানী সমরকল, পুনরুজ্বার। জাহাঙ্গীর আগ্রার ৩০০ মাইল পশ্চিমে আজমীরে রাজদরবার স্থানাঞ্চলিত করেন এবং মেওয়ার আর তার পুত্রের অভিযান স্থানের নিকটে এসে উপস্থিত হন।

খুররম রাজস্থানের পাহাড়ি এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে একের পর এক সামরিক ঢোকি স্থাপনের মাধ্যমে তার অভিযান শুরু করেন। ভবিষ্যতের শাহজাহানের পোড়ামাটি নীতি এতটাই সিদ্ধিম আর আপসহীন ছিল যে তার নিজের সৈন্যরাও অনেক সময় খাদ্য বিপর্যস্ত থেকেছে এবং এমন ক্ষয়ক্ষতির মুখ্যমুখ্য হতে মেওয়ারের রানা বশ্যতা স্থাপন করেন। খুররম শহরদের ভেতরে সবচেয়ে গর্বিত এই মুসাতকে অপদৃষ্ট না করার সিদ্ধান্ত নেন। রানাকে কোনো ভূখণ্ড সমর্পণ করতে কিংবা জাহাঙ্গীরের সামনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন জানাতে তিনি বলেন না। তিনি কেবল অনুরোধ করেন যে রানা যেন তার সন্তানকে স্মার্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে পাঠান। রানার ছোট ছেলে করণ সিং দরবারে উপস্থিত হলে, জাহাঙ্গীর সেখানে অক্ষপণভাবে তাকে উপটোকন প্রদান করে এবং ‘বন্য প্রকৃতির আর পাহাড়ে বসবাসকারী’ এই ছেলেটার মাঝে বাস্তববুদ্ধির অভাব দেখে কোতুক বোধ করে যদিও কিছুকাল পূর্বে মোগলদের ক্ষেত্রেও এই বর্ণনা একদম সঠিক ছিল।

বাইশ বছর বয়সী খুররম যোদ্ধা আর কূটনীতিক হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন এবং তার আক্রাজান যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেখানে সাফল্য লাভ করেন। আকবর মেওয়ারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য দুবার

জাহাঙ্গীরকে আদেশ দিয়েছিলেন এবং প্রতিবারই তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। বিজয়দৃষ্ট খুররম দরবারে উপস্থিত হয়ে, তার পিতাকে ৬০,০০০ রূপি মূল্যের দুতিময় একটি ছুনি উপহার দেয়। জাহাঙ্গীর ছুনিটা বাহতে ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু অনুভব করেন সে জন্য ‘দুটো বিরল আর আলোকোজ্জ্বল অনুরূপ মোতি’ প্রয়োজন ছুনিকে উজ্জ্বলতর করতে। অমাত্যদের একজন, ইস্পিত বুরাতে পেরে, চমৎকার একটি মোতি খুঁজে বের করেন, কিন্তু খুররমেরও তখন মনে পড়ে, আকবরের সাথে তার ছেলেবেলার দিনগুলোতে তিনি ‘পুরাতন একটি পাগড়িতে অবিকল এই আকার আর আকৃতির একটি মুক্তা’ দেখেছিলেন। অমাত্যরা সম্মানসূচক পাগড়ির অলংকার খুঁজতে শুরু করেন এবং জাহাঙ্গীরকে লেখেন ‘ধৌঁজার পরে ঠিক এই আকৃতি আর আকারের একটি মুক্তাবিশিষ্ট পাগড়ির সঙ্কান পাওয়া গেছে... রত্নকারের বিস্মিত হয়েছে।’ খুররমের বাল্যকালে যেমনটা দাবি করা হয়েছিল তার আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি স্পষ্টতই ঠিক তেমনই তীক্ষ্ণ, কিন্তু এ ঘটনায় একই সাথে মূল্যবান রত্নের প্রতি তার প্রবল অনুরাগের প্রকাশ ঘটে, যা পরবর্তীকালে মূল্যবান রত্ন বিষয়ে তাকে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম বিশেষজ্ঞের মর্যাদা দান করে।

খুররমের নতুন পরিবারের সদস্য সংগ্রহীকৃত লাভ করতে শুরু করে। মেওয়ার অভিযানের সময়, ১৬১৪ সালের প্রাতিম মমতাজের গর্ভে তাদের জাহানারা নামে আরো একজন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং পরবর্তী বছর, ১৬১৫ সালের ৩০ মার্চ তাদের প্রথম পুত্র দারা শকেহ জন্মগ্রহণ করে। পুরো দরবার বিশ্যটি উদ্যাপন করে। এক ইতালিয়ান পর্যটক লক্ষ করেন, ‘মহলে যখন কোনো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে মহিলারা ভীষণ আনন্দিত হয় এবং তাদের এই আনন্দের স্মারক হিসেবে প্রচুর খরচ করে’, কিন্তু ‘যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে তখন পুরো দরবার আনন্দে শামিল হয়, যা কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়... বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় আর সংগীতের আয়োজন করা হয়...।’ আমাদের আলোচিত এই দম্পতি আরো একবার শাস্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন উপভোগের জন্য খুব অল্প সময় পান। পরের বছর, ১৬১৬ সালে, জাহাঙ্গীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে খুররমকে যেতে বলেন তার বড় ভাইকে সরিয়ে সেখানে অবস্থানরত রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে। তার মুক্তি ছিল এই যে, ‘দাক্ষিণাত্য অভিযানের নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব আমার পুত্র সুলতান পারভেজের অধীনে আমি যেমন আশা করেছিলাম তেমন সুচারুরূপে পালিত হয়নি, তাকে ডেকে পাঠানোই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে এবং তারপর বাবা খুররমকে, যে স্পষ্টতই অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন, রাজকীয় বাহিনীর অগ্রভাগে প্রেরণ করে আমি নিজে তার পেছনে অগ্রসর হব।’

মোগলরা তাদের সাম্রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের শাধীন মুসলমান সালতানাতগুলোকে—আহমেদনগর, বিজাপুর আর গোলকুণ্ড—একটি হমকি হিসেবে বিবেচনা করত। এই রাজ্যগুলো কখনো নিজেদের ভেতরে লড়াই করত কিন্তু তাদের উভয়ের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নিজেদের একটি সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তোলার ঝুঁকি সব সময় রয়ে যেত। মোগল নিরাপত্তার জন্য বিষয়টি শুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যে, তারা মোগল অধিরাজ্য মেনে নেবে—এটা এমন একটি ব্যাপার, যার প্রতি সংগত কারণেই তাদের প্রবল অনীহা ছিল। মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি মহাসংকট হিসেবে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো আগেও বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমানেও তাদের ভূমিকা অপরিবর্তিত রয়েছে। এক প্রাঙ্গন আবিসিনিয়ান শ্রীতদাস এবার শক্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, মালিক আঘার, যিনি আহমেদনগরের সুলতানের, যার রাজ্যের কিয়দংশ আকবর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, নিজ যোগ্যতাবলে উচ্চপদ লাভ করেছেন। মালিক আঘার হত ভূখণ্ড পুরুষদ্বার করতে চতুরতার সাথে একটি কার্যকর গেরিলা যদ্ব পরিচালনা করেছেন এবং বিজাপুরের ধনাড় সুলতানকে নিজের মিত্রে পরিণত করেছেন।

মহতাজ আর তার স্বামী একটি বিশাদময় সমষ্টি এই নিয়োগের সংবাদ লাভ করেন। ১৬১৬ সালের শীশের সূচনালগ্নে তাদের বড় ঘেয়ে হ্র-আল-নিসা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ কর্ম। মহতাজের আবেগের কথা কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি কিন্তু সেটা কল্পনা কর্তৃতে খুব একটি বেগ পেতে হয় না, বিশেষ করে তিনি তখন আবারও আটোসের গর্ভবতী। খুররম ‘ভীষণভাবে শোকাঞ্জ’ এবং জাহাঙ্গীরও নাতনির মৃত্যু সংবাদে বিহ্বল হয়ে লেখেন, ‘আমি যদিও এটা লিখতে ভীষণ অভিজ্ঞানী, আমার হাত আর হাদয় ভারী হয়ে আছে। আমি যখনই লেখনী হাতে তুলে নিই, আমার নিজেকে কেমন বিহ্বল মনে হয় এবং অসহায়ভাবে ইতিমাদ-উদ-দৌলাকে এটা লেখার আদেশ দিই।’ ইতিমাদ-উদ-দৌলা, শিশুটির প্রপিতামহ, দরবারের সুলতান ভাষায় বিশাদময় কাহিনীটি যথাযথভাবে বর্ণনা করেন কীভাবে ‘কচি মেয়েটার প্রাণ পাখি তার দেহের খাচা ছেড়ে বেহেশতের উদ্যানে ঢলে গেছে।’ ক্রন্দনরত জাহাঙ্গীর দুই দিন একা থাকেন এবং তারপর আদেশ দেন, বুধবার, শিশুটির মৃত্যু দিন, পরবর্তী সময়ে ‘মৃত্যু দিন’ হিসেবে পালিত হবে। জাহাঙ্গীর তৃতীয় দিন খুররমের মহলে যান কিন্তু ‘কোনোমতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না।’

তিনি সঞ্চাহের কম সময়ের মধ্যে অবশ্য পরিবারটির বিষাদের তীব্রতার উপশম হয়। জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘আসফ খানের কন্যার (খুররমের স্ত্রী) গর্ত থেকে মূল্যবান একটি মুক্তা পৃথিবীতে অঙ্গুত্ব লাভ করে। এই মহান আশীর্বাদ লাভ করে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় জোরে ঢেল বাজানো হয় এবং

মানুষের জন্য আনন্দ আর উপভোগের ধার অবারিত করে দেয়া হয়।' মমতাজের গর্ভে তাদের বিতীয় পুত্র শাহ সুজা জন্মগ্রহণ করে।

মমতাজ সন্তান প্রসবের কষ্ট থেকে আরোগ্য লাভের সাথে সাথে খুরুমের সঙ্গী হবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন যেহেতু যুদ্ধের জন্য তিনি পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তাণ্ডি নদীর তীরে অবস্থিত, উচ্চল রঙের ছিট কাপড় আর আফিমের জন্য বিখ্যাত বুরহানপুর শহরে তিনি এবার ঘাঁটি স্থাপন করবেন এবং মোগল অভিযানের নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে শহরটা বহুদিন ধরেই দাক্ষিণাত্যের অবাধ্য রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা ক্ষয়াটে অধিত্যকার একটি বন্ধ্যা ভূপ্রকৃতির অন্যপাশে আরো দক্ষিণে অবস্থিত। ১৬১৬ সালের ৩১ অক্টোবর, দিনটা জ্যোতিষীরা খুরুমের বুরহানপুর যাত্রার জন্য নির্ধারিত করে। তিনি তার আবাজানের পরিদর্শনের জন্য নিজ বাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থান করে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসেন। দারুণভাবে সজ্জিত প্রায় ৬০০ হাতি আর ১০,০০০ অশ্বারোহী, সোনালি রঙের বলমলে কাপড়ে সজ্জিত হয়ে আর পাগড়িতে সারসের আনন্দলিত সাদা পালক পরিহিত অবস্থায় তাদের স্ম্রাটকে অভিবাদন জানান। জাহাঙ্গীর তার পুত্রকে চুন্দ করেন, যার পরনে সেদিন ছিল 'নভোমগুলের মতো জুলজুল করতে থাকা হৈবুল্লাহ' এবং পুত্রকে তিনি সেদিন অনেক উপহার দেন, যার ভেতরে ছিল রত্নসজ্জিত পর্যাণে সজ্জিত ঘোড়া, জাহাঙ্গীর নিজে যার নাম দিয়েছিলেন 'স্পন্দিঙ্গুপদ'।

খুরুমের উদীয়মান সৌভাগ্য ইংরেজ রাজনৃত স্যার টমাস রো নথিবদ্ধ করেছেন। 'এটা সত্যি,' তিনি লিখেছেন, 'সবাই স্ম্রাটের চেয়েও তাকে বেশি ভয় পেত' এবং 'সবাই এখন অত্যধিক ক্ষমতাবান ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।' রো নিজে তরুণ যুবরাজের ভক্ত ছিলেন না, যাকে তিনি 'লোভী আর জুলুমবাজ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি এমনই উদ্ধত 'লুসিফারও, যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।' ইংরেজ বণিকদের অভ্যর্জনাচিত আচরণ সম্পর্কে খুরুম তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, 'সুরা পান করে উন্নত হয়ে রাস্তায় ঝগড়া করা, আর ওক্ত দণ্ডের কথায় কথায় তরবারি বের করা।' বাণিজ্য সুবিধা অর্জনে রোর প্রয়াস যুবরাজ বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং তার লোকেরা ইংল্যান্ড থেকে রোর নিয়ে আসা উপহারসমূহী জন্ম করে, যা তিনি নিয়ে এসেছিলেন জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহভাজন হতে সহায়ক হবে ভেবে। বস্তুতপক্ষে গুটিকয়েক উপহারসমূহী, যা স্ম্রাটের প্রীতির কারণ হয়েছিল। মোগলদের কাছে, অবশ্যই একে একটি দূরবর্তী আর প্রতিহত দীপ মনে হয়েছিল, যেখানে হিন্দুস্তান থেকে কেউ গমন করেছে এমন কোনো নজির নেই। তার ভেতরে ছিল একটি ইংলিশ ঘোড়ার গাড়ি এবং কিছু

চিত্রকর্ম। ১৬১৬ সালের নওরোজ বা নববর্ষের জন্য, জাহাঙ্গীর তার সিংহাসনের পেছনে অবস্থিত বর্ষিতাখ্শ ইংরেজ রাজপরিবারের প্রতিকৃতি দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর যেমন প্রতিকৃতি দিয়েছিলেন, তিনি খুররমের বাহিনীকে দাক্ষিণাত্য অভিযুক্তে অনুসরণ করেন, আজমীর থেকে নিজের দরবারকে বুরহানপুরের একশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি উঁচু পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত মান্দুর পাহাড় দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। রো তার সঙ্গী হন। ইংল্যান্ডে প্রেরিত রাজদূতের শাশিত বার্তায় কখনো কখনো মোগল অশিষ্টচার সম্বন্ধে অবজ্ঞা উঠলে উঠেছে। তিনি একজন রমণীর ন্যায়, যে নিজের কাছে সংকল্প করেছে ‘কাপবোর্ডের সব সেটের সাথে তার কারুকাজ করা পাদুকার সাথে রূপার প্লেট...সব কিছু প্রদর্শন করার’, তাদের জাহির করার প্রবণতা পছন্দ করতেন। তাকে এবারের জমকালো প্রদর্শনী যদিও ঘৃথহীনভাবে মুক্ষ করেছে। তিনি বিদায় নেয়ার পূর্বে, জাহাঙ্গীর দৃতিময় রত্নে সজ্জিত এবং দুজন খোজা পালকের ঝালর আন্দোলিত করা অবস্থায় তিনি প্রাসাদের ব্যালকনিতে উপস্থিত হন উপহার আদান-প্রদান করতে। রো বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘তিনি রেশমের দড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে দেন, যা তিনি দান করবেন...তাকে যা দেয়ে হয়, একজন সম্মানিত বৃক্ষা, সুলকায় বেচে আকৃতির, তুকে ভাঁজ পঢ়েছে এবং একটি আংটা থেকে প্রতিমার ন্যায় ঝুলত্ব অবস্থায়, আবেক্ষণ্য দড়ির সাহায্যে একটি গহ্বরে টেনে তোলেন...।’

রোর ধারণা, তিনি জাহাঙ্গীর আক্ষয়কজন স্তুর সাথে নূরজাহানকে এক পলকের জন্য দেখতে পেয়েছেন, এসব কর্মকাণ্ড অবলোকন করছেন : ‘একপাশে অবস্থিত একটি জানালায় রয়েছে তার দুই প্রধান মহিয়সী, যারা কৌতুহলের কারণে লতাপাতার ঝোঁকারিতে, যা জানালার সামনে ঝুলছে সেখানে ছোট ছিদ্র সৃষ্টি করেছেন আমাকে দেখতে। আমি প্রথমে তাদের আঙুল দেখতে পাই, এবং ভালো করে তাকিয়ে দেখতে প্রথমে একটি চোখ, এখন আরেকটা দেখতে পাই; আমি মাঝে মাঝে তাদের সম্পূর্ণ মুখ্যবয়ব অনুমান করতে সক্ষম হই। তারা দুজনই চলনসই ফর্সা, মাথার কালো চুল পরিপাটি করে বাঁধা; কিন্তু আমার কাছে যদি অন্য কোনো ধরনের আলো না থাকত, তাদের হীরক আর মুকাই যথেষ্ট ছিল তাদের দৃষ্টিগোচর করতে। আমি যখন মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাই তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল এবং তারা এতটাই উৎফুল্প ছিল যে, আমার মনে হয় তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে।’

রো বর্ণনা করেছেন কীভাবে, বিদায়ের মূহূর্ত যখন ঘনিয়ে আসে, জাহাঙ্গীর ‘সিঁড়ি’ দিয়ে নিচে নামার সময় ‘পাদিশাহ সালামত’, ‘সন্মাট দীর্ঘজীবী হন’ এই হৰ্ষব্রন্দিতে চারপাশ, কামানের গর্জনের মতো, মুখরিত হয়ে ওঠে...।’ একজন

পরিচারক তার ‘অতিকায় হীরক খণ্ড আর চুনির্বচিত’ তরবারিটা কোমরে বেঁধে দেয়। তার মাথার পাগড়ির একপাশে ‘আখরোটের মতো বড়’ একটি চুনি খালি ঝুলছে, যখন পাগড়ির অন্যপাশে ‘একই রকম আকৃতির হীরক খণ্ড’ ঝুলতে দেখা যায় এবং মধ্যখানে রয়েছে হৃদয়-আকৃতির একটি পান্না। জাহাঙ্গীরের পরনের সোনার জরির কারুকাজ করা জোকাটা ‘বিশালাকৃতি মুজা, চুনি, আর হীরকের ছড়া দিয়ে জড়ানো’ একটি পরিকরের সাহায্যে আটকানো রয়েছে...। ইংরেজ রাজনৃত কৃতজ্ঞচিত্তে তাকিয়ে দেখেন জাহাঙ্গীর পারস্যের মখমলে আবৃত চার ঢাকার যে ইংলিশ ঘোড়ার গাড়ি নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন তারই একটি বিলাসবহুল রেগিমেন্ট আরোহণ করে ধটখট শব্দ তুলে যাও করেছেন। নূরজাহান মূল গাড়িতে, ‘সদ্যই বিলাসবহুলভাবে আছাদিত আর পরিপাঠি করা’ আরোহণ করে তাকে অনুসরণ করেন। জাহাঙ্গীর ব্যয়বহুল করে এটাকে বকঝকে করে তুলেছেন কারণ ইংল্যান্ড থেকে দীর্ঘ, স্যাতসেঁতে, নোনা সমুদ্রযাত্রার সময় গাড়িটার মূল আসন, গদিসহ সব কিছু ক্ষয়কর ছাঁকে আক্রান্ত হয়েছিল।

রো সেইসাথে মোগলদের চৌকস প্রণালীবদ্ধকরণ দেখে মুঝ হন, যা ছোটখাটো একটি শহরের সমতুল্য সফরসঙ্গী নিয়ে স্যাটেটে অঞ্চল হতে সাহায্য করে। তার নিজস্ব উপাসনালয়ের ধর্ম্যাজক মনে ক্ষেত্রেছিল এটা অনেকটা *ambulans respublica*, ভাষ্যমাণ রাষ্ট্র। এক লক্ষের অধিক ঝাঁড়ের দল মুছে ভঙ্গিতে, ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করতে করতে রস্তাখাবাই কাঠের মালবাহী শকটগুলো টেনে নিয়ে চলেছে। জাহাঙ্গীর যখন আহায়ী শিবির স্থাপন করেন সেটা বিশ মাইল পরিধির একটি এলাকা দখল করে। শিবিরের কেন্দ্রস্থলে জাহাঙ্গীরের নিজের অবস্থানের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। রো আহায়ী বাসস্থানটা যেপেছিলেন এবং দেখেছিলেন সেটার ব্যাস প্রায় তিনশ গজ। রোর কাছে এটা ছিল ‘আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার ভেতরে অন্যতম বিশ্বয়’। যদিও তিনি পচনক্রিয়া শুরু হওয়া তিনশ বিদ্রোহীর ছিল মন্তকের বোঝা নিয়ে হেলতে দুলতে হাজির হওয়া একটি উট দেখে বিব্রত বোধ করেন, জাহাঙ্গীরের জন্য কান্দাহারের সুবেদারের পাঠানো নিঃসন্দেহে একটি বিচক্ষণ উপহার।

জাহাঙ্গীর নিজে যখন খুররমের পশ্চাতে ব্যস্ততাহীনভাবে দক্ষিণে অঞ্চলের হচ্ছের, নূর শিকারি হিসেবে তখন নিজের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। জাহাঙ্গীর গর্বের সাথে নথিবদ্ধ করেন যে, ‘নূর দুটো বাধের প্রতিটিকে এক শুলিতেই ঘায়েল করেছে এবং আরো দুটোকে চারটা শুলিতে ঘায়েল করেছে... আজ পর্যন্ত নিশানাবাজির এমন নির্দশন কেউ দেখেনি যে হাতির পিঠের ওপরের হাওদার ভেতর থেকে ছয়টা শুলি করা হয়েছে এবং একটিও লক্ষ্যজ্ঞ হয়নি।’

খুরমও এমন কাজ করেন যে, তার আবাজানও গর্ব করতে পারেন। আরেকটা সংক্ষিপ্ত আর চতুরতার সাথে পরিচালিত অভিযানে, যুবরাজ কিছু দিনের জন্য হলেও বিজাপুরের সুলতান আর মালিক আষারের বিদ্রোহ দমন করেন। রোর পুরোহিত যুদ্ধমান বাহিনীর মাঝে যুদ্ধের নাটকীয়তা দেখেছিলেন যেখানে ‘আচ্যের ইসব যুদ্ধ প্রায়ই অবিশ্বাস্য সংখ্যক মানুষের ভেতরে সংঘটিত হয়... তারা যখন যুদ্ধে অবর্তীণ হয় নাকাড়া আর লম্বা বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্র থেকে যুদ্ধের উপযোগী বাজনা সৃষ্টি করে। সম্মুখ সমরে অবর্তীণ উভয় বাহিনীই সাধারণত উচ্চও আক্রমণের সাথে যুদ্ধ শুরু করে...’ খুরম তার প্রতিপক্ষকে তারা যে মোগল ভূখণ্ড অধিকার করেছিল সেখান থেকে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য করেন এবং তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আর সেই তাদের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, এখন থেকে ভবিষ্যতে তারা জাহাঙ্গীরের ভাষায় ‘অনুগত আর শান্ত’ থাকবে।

জাহাঙ্গীরের কাছে যখন খুরমের বিজয়ের সংবাদ পৌছায় তিনি ‘ঢাকে আনন্দের বাদ্য বাজাবার আদেশ দেন’ যে ‘ঝামেলাবাজ যারা বিদ্রোহ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল তারা নিজেদের অক্ষমতা আর অসহায়তা শীকার করে নিয়েছে।’ ১৬১৭ সালের অক্টোবরে খুরম খেলির ভাষ্য অনুসারে ‘বিশ্ময়কর সাফল্যে অভিযন্ত’ হয়ে ফিরে আসেন। ক্ষেত্রে নিজে যুবরাজের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন, অক্ষেত্রে কারণে তখনো রক্ষক্রণ বঙ্গ না হওয়ায়’, এমন একটি অবস্থা যা ইতিমধ্যে ‘বিশ সপ্তাহ যাবত’ বজায় রয়েছে। খুরমের কারণে জাহাঙ্গীরের পুলকবোধ তার স্মৃতিকথায় পরিষ্কার লেখা রয়েছে : ‘আমায় সম্মান প্রদর্শন করার আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হতে আমি তাকে জানালার কাছে আসতে বলি যেখানে আমি বসে ছিলাম এবং পিত্ত্বেহ আর ভালোবাসার আধিক্যে সহসা আক্রান্ত হয়ে আমি সাথে সাথে উঠে দাঁড়াই এবং তাকে আমার বাহুর ভেতর ঢেনে নিই। সে আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আর সম্মান যতই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে, তার প্রতি ততই আমার যমত্ববোধ বাড়তে থাকে।’ সন্তুষ্ট তার প্রিয় পুত্রের উদ্দেশে মূল্যবান রত্ন আর সোনার মোহর ভর্তি বারকোশ উৎসর্গ করেন এবং ঘোষণা করেন, আজ থেকে সে ‘শাহজাহান’—পৃথিবীর অধিশ্঵র—হিসেবে পরিচিত হবে। জাহাঙ্গীর আরো আদেশ দেন, ‘এখন থেকে আগামীতে দরবারে আমার সিংহাসনের পাশে তার জন্য একটি আসনের বন্দোবস্ত করা হবে, এমন সম্মান... আমাদের পরিবারে পূর্বে কেউ কখনো পায়নি’ এবং তাকে সম্মুক্ত গুজরাট প্রদেশের সুবেদার নিয়োগ করেন।

নূর এই বিজয় উপলক্ষে আয়োজিত এক ভোজসভার জন্য হতবুদ্ধি করার মতো ৩০০,০০০ রূপি ব্যয় করেন, যেখানে তিনি শাহজাহানকে রত্নখচিত আলখাল্লা,

ঘোড়া আর হাতি উপহার দেন এবং মমতাজ আর তার পরিবারের অন্য মহিলাদের সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করেন।<sup>\*</sup> একটি চিত্রকর্মে খোলামেলা ভবনবিশিষ্ট একটি উদ্যানে গালিচার ওপর আয়োজিত ভোজসভা অঙ্কিত হয়েছে। নূর তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা জাহাঙ্গীরের দিকে একটি পাত্র এগিয়ে দিচ্ছেন, চিত্রকর্মে তার মাথার চারপাশে একটি জ্যোতিশক্ত রয়েছে। ধর্মপ্রাণতা বোঝাতে, জ্যোতিশক্তের এই ব্যবহার, মূলত জাহাঙ্গীরের শৈলিক প্রবর্তন, যা জেসুইট শিল্পীরীতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।<sup>\*</sup> শাহজাহানকে তার পিতার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে দেখা যায় এবং জাঁকজমকপূর্ণ বন্ধ পরিহিত অলংকার সজ্জিত একদল রঘুণী বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। রঘুণীদের ভেতরে একজন সন্তুবত, মমতাজ, নিজের স্বামীর সৌভাগ্যের গর্বিত অংশীদার। বিজয় উপলক্ষে আয়োজিত এই ভোজসভার মাত্র মাসখানেকে পূর্বেই মমতাজের গর্ভে তাদের পঞ্চম সন্তানের জন্য হয়, আরেকজন কন্যা, যাকে আমরা রোসম্নারা হিসেবে চিনি।

শাহজাহানের বাবার চোখে একজন মোগল যুবরাজের ভেতরে যে শুণাবলি কাজিক্ত তার সবই মৃত্যু ছিল। জাহাঙ্গীর এক জায়গায় লিখেছেন, ‘এই সন্তানের প্রতি আমার প্রশ়্ন্য এতটাই সীমাহীন যে, অস্মিন্তাকে প্রীত করার জন্য সব কিছু করতে পারি এবং সে বাস্তবিকই চমৎকার একটি ছেলে এবং আকর্ষণীয় শুণাবলির অধিকারী একজন মানুষ, আরও আমি সন্তুষ্ট যে সে তার অল্প বয়সে যে বিষয়েই আগ্রহী হয়েছে তাতেই গুপক সাফল্য লাভ করেছে।’

জাহাঙ্গীর অবশ্য তার পুত্রের কাছে আরো কিছু একটি প্রত্যাশা করতেন—আরো দার পরিহার করা, যা রোসম্নারা ভূমিষ্ঠ হবার দিনই তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। নববধূ ছিল জাহাঙ্গীরের খান খানান বা প্রধান সেনাপতির নাতি যাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন বলে মনঃস্থির করেছিলেন। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুসারে এই বিয়েটা একেবারেই ‘রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত’ এবং নববধূও ‘নামে মাত্র এই কীর্তিমান সম্পর্কের অধিকারী হতে পেরেই সন্তুষ্ট ছিল।’ তিনি অবশ্যই তার গর্ভে সুলতান আফরোজ নামে এক পুত্রসন্তানের পিতা হন। এই সন্তান অবশ্য কখনো মমতাজের সন্তানদের সমর্যাদা বা আন্তরিকতার

\* মূল্য তুলনা ভীষণ কঠিন একটি কাজ, কিন্তু আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, এটা মোটামুটি ধরে নেয়া যায় যে, এক রূপি বা দুই রূপি দিয়ে একটি ভেড়া পাওয়া যেত এবং একটি রেশেমের একটি সাধারণ কাগড়ের দাম ছিল এক থেকে পাঁচ রূপির ভেতরে, যা থেকে অপব্যয়ের একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়।

\* জ্যোতিশক্তের ধারণার উন্নত মূলত এশিয়ায়, পারস্যে আর ভারতবর্ষে যখন এর ব্যবহার মুশ্ত হয়েছে তখন বাইজেন্টাইনদের মাধ্যমে এটা ইউরোপে প্রচলিত হয়।

অধিকারী হয়নি। শাহজাহানের দিনপঞ্জির রচয়িতারা এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কেবল নথিবদ্ধ করেন যে, ‘মঙ্গলময় মৃহুর্তে যেহেতু এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়নি, মহামান্য স্বাট তাকে নিজের সাথে কখনো রাখেননি...।’ রাজপরিবারে তার গুরুত্বহীনতার কথা আমরা পরে অবশ্য জাহাঙ্গীরের লেখা একটি ঘটনা থেকে জানতে পারি। ১৬২০ সালে, মমতাজের দ্বিতীয় পুত্র, শাহ সুজা, নানা অসুস্থতায় প্রায়ই আক্রান্ত এক ঝুঁগণ সন্তান, পুনরায় অসুস্থ হয় ‘এবার এমন ভয়ংকর বমি শুরু হয় যে পানি পর্যন্ত গলা দিয়ে নামতে পারে না’ এবং দরবারের জ্যোতিষীরা হতবিহুল পিতা-মাতাকে বলেন, এহ-নক্ষত্র তার মৃত্যুর বারতা নিয়ে এসেছে। অন্য আরেকজন জ্যোতিষী অবশ্য ডিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি ভবিষ্যত্বাণী করেন, তার পরিবর্তে ‘অন্য আরেকজন পুত্র মৃত্যুবরণ করবে।’ জাহাঙ্গীর পরে বিগলিত চিত্তে লিখেছেন, ‘জ্যোতিষীর কথাই সত্যি হয়েছিল : শাহ সুজা বাস্তবিকই আরোগ্য লাভ করেছিল। অল্পবয়ক সুলতান আফরোজ ছিল সেই হতভাগ্য, যে মৃত্যুবরণ করে।’ সংক্ষিপ্ত উল্লেখের পরই ইতিহাসের গতে হারিয়ে গেছে।

১৬১৮ সালে, স্বাট শাহজাহানকে যে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করছেন সে সম্বন্ধে আরো ইঙ্গিত প্রদান করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি তার রাজত্বকালের প্রথম বারো বছর যে রোজনামাটা লিপিবদ্ধ করেছেন সেটা একটি খণ্ডে সংকলিত করা হবে এবং বাঁধাটী করে অনুগ্রহভাজন বক্সের জন্য এর অনুলিপি তৈরি করা হবে বা তিনি যেমন আত্মাভিমানী ভঙ্গিতে লিখেছেন ‘শাসন কার্য পরিচালনায় শাসনকর্ত্তর সহায়িকা হিসেবে এটা অন্য দেশে প্রেরণ করা হবে।’ তিনি অবশ্য ছার্বিশ বছর বয়সী শাহজাহানকে প্রথম খণ্টা উপহার দেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমি তাকে সব দিক থেকে আমার প্রথম সন্তান হিসেবে বিবেচনা করি।’ শাহজাহানের আশ্চর্জান যোধা বাঁসি কয়েক মাস পর ইন্দোকাল করলে তিনি তার পুত্রের জন্য প্রকাশ্যে নিজের ভালোবাসা আর উদ্দেগ প্রদর্শন করেন। জন্মের পরই যদিও শাহজাহানকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল তবু তিনি তার প্রতি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। বস্তুতপক্ষে তিনি তার সমস্ত জীবনই তার পরিবারের অন্তরঙ্গ রমণীদের প্রতি গভীর আবেগ বোধ করেছেন। তার শোক এতই ব্যাপক ছিল যে, জাহাঙ্গীর ‘তার প্রাণাধিক পুত্রের মহলে নিজে গিয়েছিলেন।’ ‘তাকে সম্ভাব্য সব উপায়ে সাম্ভুনা দেয়ার চেষ্টা’ করার পর এবং এর পরও তার শোক প্রশংসিত হয়নি বুঝতে পেরে জাহাঙ্গীর নিজে তাকে সাথে করে প্রাসাদে নিয়ে এসে তার দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করেন।

শাহজাহান আর মমতাজের সন্তানদের প্রতি জাহাঙ্গীর এতটাই ভীষণভাবে আকৃষ্ট ছিলেন যে, এমন বিকাশমান পরিবারের প্রতিদিনকার স্বাভাবিক

টানাপড়েনও তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। তিনি শাহ সুজার অসুস্থতার আরেকবার উল্লেখ করেছেন : ‘আমার পুত্র শাহজাহানের প্রিয়তম সন্তান, শাহ সুজা... যাকে আমি যারপরনাই পছন্দ করি, শৈশবের মৃগীরোগ হিসেবে পরিচিত একটি রোগে আক্রান্ত হয়। সে দীর্ঘ সময় অচেতন ছিল। এই রোগ সম্বন্ধে যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা যে চিকিৎসা বা পথ্য প্রয়োগ করুক না কেন কোনো ফল হয় না...’ মমতাজ এ সময় পুনরায় গর্ভবতী হওয়ায় দুই বছর পূর্বে শুটি বসন্তে তার বড় কন্যার মৃত্যুর ঘটনাটা নিচয়েই তাকে সব সময় তাড়িত করেছে। আশঙ্কা আর উদ্বেগে জঙ্গরিত জাহাঙ্গীর মনে মনে মানত করেন ছেলেটা যদি এবারের মতো বেঁচে যায় ‘আমি আমার হাতে কোনো জীবিত প্রাণীর’ কোনো ক্ষতি করব না। বাচ্চা ছেলেটা এর পরই ধীরে ধীরে সুস্থ হতে শুরু করে এবং জাহাঙ্গীর তার মানত অনুযায়ী শিকার করা ছেড়ে দেন।

১৬১৮ সালের ৩ নভেম্বরের রাতে, মমতাজ তাদের তৃতীয় পুত্রের জন্ম দেন। হিন্দুস্তানকে দক্ষিণাত্য থেকে উভরে যে পর্বতমালা পৃথক করেছে সেই উচ্চ পর্বতের একটি ছোট গ্রামে মমতাজের প্রসববেদনা শুরু হয় যখন তিনি জাহাঙ্গীর, শাহজাহান আর অবশিষ্ট দরবারের সঙ্গী হয়ে আগ্রা ফিরে আসছিলেন। কয়েক দিন পর, রাজকীয় জোড়াবায়াড়া মালওয়া প্রদেশের রাজধানী উজ্জয়নীতে পৌছালে যথাযথ অনুষ্ঠানিকতার সাথে নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হবার ঘটনাটা উদ্ঘাপন করা হয়। শাহজাহানের মহলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর উপস্থিতি থাকেন, তার পুত্র এই অনুষ্ঠানের সময় ‘আমার সামনে সেই মাসলিক সন্তানকে হাজির করে এবং পঞ্চাশটা হাতি আর রত্নখচিত অলংকার আর মূল্যবান রত্ন পরিপূর্ণ বারকোশ উপটোকন হিসেবে পেশ করে... আমাকে নবজাতকের নামকরণ করতে অনুরোধ করে।’ তিনি এই নবজাতকের নাম রাখেন আওরঙ্গজেব।

তিনি মাসকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই, মমতাজ পুনরায় গর্ভবতী হন। মমতাজ তাদের বিয়ের প্রথম সাত বছরে সমান সংখ্যক সন্তানের জন্মান্তর করেছেন এবং এরপর আরো সাতটি সন্তানের তিনি জন্ম দেন। স্বামীর প্রতি তার এমন অনুরক্তি আর গর্ভবতী হবার ক্ষমতা সমসাময়িকদেরও বিস্মিত করেছে।

১৬২০ সালের মার্চ মাসে, জাহাঙ্গীর, নূর, শাহজাহান আর মমতাজ নীল ফুল আর ধূসর-গোলাপি খুবানি ফুলে ছেয়ে থাকা কাশীরের উপত্যকায় এসে পৌছান। আগ্রা থেকে তাদের এখানে আসতে পাঁচ মাসের অধিক সময় লেগেছে এবং যাত্রাপথের শেষ পর্যায়গুলো জাহাঙ্গীর যাদের বর্ণনা করেছেন

‘পাহাড় এবং গিরিপথ, দৱী আৰ চড়াই উতোৱাই পৰিপূৰ্ণ’ ভীষণ বিপদসংকুল, এবং ঝঁড়ি ঝঁড়ি বৃষ্টি, যা আচমকাই তুষারকণায় পরিণত হয়। একটি দিন ছিল বিশেষভাবে ভয়ংকর, সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ দিয়ে ভ্রমণের সময়, রাজপরিবারের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্ৰী বোঝাই হাতি আৰ ঘোড়াৰ পাল যাত্রার ধকলে দুৰ্বল হয়ে ‘মাটিতে চারপাশে আছড়ে পড়তে শুল্ক কৰে এবং সেতাবেই নিখিৰ হয়ে পড়ে থাকে।’ সেদিনই কেবল পাঁচশটা হাতি মাৰা যায়। সবাৰ জন্যই অভিজ্ঞতাটা ছিল প্রাণান্তকৰ কিন্তু গৰ্ভবতী মমতাজেৰ জন্য অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি যাত্রাকালীন সময়েই ১৬১৯ সালেৰ ডিসেম্বৰ মাসে উমিদ বকশ নামে আৱেকটি পুত্ৰসন্তানেৰ জন্ম দিয়েছিলেন। (বিদেশিৱা মোগল রঘুনন্দেৰ প্রাণশক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছেন।) একজন বিদেশিৱা ভাষ্য অনুসৰে, ‘তাৰা <মনে হয়> সন্তান জন্ম দেয়াৰ সময় অন্যান্য নশুৰ মানুষদেৱ চেয়ে কম কষ্ট পায় : দিনেৰ শেষে সন্তান জন্ম দেয়াটা তাদেৱ জন্য মোটেই বিৱল নয় এবং পৱেৱ দিন সকালেই নবজ্ঞাতককে কোলে নিয়ে তাৰা পুনৱায় যাত্রা শুৱ কৰে।’

কিন্তু কাশীৱেৰ এই স্নিফ পৱিবেশে মমতাজ স্বাস্থ্য পুনৰুদ্ধাৰ কৰতে পাৱেন, যদিও স্বপ্নসুবৰ্জন এই গ্ৰামীণ পৱিবেশ সামান্য স্বেচ্ছায়েৰ জন্য বিপৰ্যস্ত হয় যখন ছোট্ট শাহ সুজা প্ৰাসাদে খেলাৰ সময় একটি খেলালা জানালা দিয়ে গলে বাইৱেৰ একটি উঁচু দেয়ালে আছড়ে পড়ে। দেয়ালেৰ নিচে একটি ছেঁড়া তোষক আৰ একটি লোক বসে থাকায় ভাগ্যকুলৈষ্য যায় সে বেঁচে যায়। যুবরাজেৰ মাথা তোষকে আছড়ে পড়ে আৱ অৱৰ দুই পা লোকটাৰ পিঠে আঘাত কৱায় সে যাত্রা সে বেঁচে যায়। প্ৰাসাদৰক্ষীদেৱ অধিপতি ‘দ্রুত দৌড়ে যায় এবং যুবরাজকে তুলে বুকেৱ কাছে জড়িয়ে ধৰে এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপৱে উঠতে আৱস্থ কৰে।’ বিভাস্ত যুবরাজ বাৱবাৰ কেবল একটি কথাৰ পুনৱাৰৃত্তি কৰতে থাকে, ‘আমায় আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?’

ডাল হুদেৱ ‘স্ফটিক স্বচ্ছ’ পানিতে ভাসমান শিকারায় রাজপরিবাৰ অলস সময় অতিবাহিত কৰে আৱ লাল পঞ্চফুল তুলে। হুদেৱ পানিতে নৌকায় অলসভাবে ভেসে বেড়াৰ সময় তাৰা স্থানীয় কৃষকদেৱ ভাসমান দীপে তাদেৱ চাষ কৱা শসা আৱ তৱমুজেৱ যত্ন নেয়া তাকিয়ে দেখে এবং প্ৰথম বসন্তে জন্ম নেয়া জাফৱান উৎপন্নকাৰী ক্ষেত্ৰে কোমল বেণুনি আভাৱ প্ৰশংসা কৰে। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জাহাঙ্গীৰ বৰ্ণনা কৱেছেন কীভাৱে ‘যতদূৰ দৃষ্টি প্ৰসাৱিত কৱা যায়, প্ৰতিটি ক্ষেত্ৰ, প্ৰতিটি ফুলেৰ বাগান, ফুলে ফুলে ছেয়ে রয়েছে...বেণুনি রঙেৰ ফুলটাৰ পাঁচটা পাপড়ি রয়েছে যাৰ ভেতৱে জাফৱান উৎপাদনকাৰী তিনিটি গৰ্ভমুও রয়েছে, আৱ সেটাই বিশুদ্ধতম জাফৱান।’

কাশীরের সৌন্দর্যে মুক্ষ হয়ে তিনি ছন্দময়, আবেগপূর্ণ ভাষায় লেখেন :

পুস্প উদ্যানের রূপসী নারী (ফুলগুলো) অসাধারণ  
তাদের গওষয় প্রদীপের ন্যায় জুলজুল করে;  
তাদের বেঁটায় প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুঁড়ি  
অনেকটা যেন প্রিয়তমের বাহুর কালো বাজুবন্ধ !  
মহিমাকীর্তনে বিনিদ্র লালচে বাদামি বর্ণের নাইটিংগেল  
সুরা-পানকারীদের বাসনা উক্তে দেয়;  
প্রতিটি বরনার পানিতে হাঁসের দল মাথা তিজিয়ে নেয়  
যেন সোনালি কাঁচি রেশম কাটছে;  
সদ্য ফোটা গোলাপ-কুঁড়ি আর ফুলের বাগিচায়  
গোলাপের ঝাড়ে বাতাস বয়ে যায়,  
পর্ণীবালার ছলের বেগুনি বেণী,  
ফুলের কুঁড়ি হৃদয়ে একটি অবিচ্ছেদ্য বক্সনের জন্ম দেয় ।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ্বার পর থেকেই কাশীরে উদ্যান নির্মাণ শুরু করেছিলেন এবং নতুন একটি উদ্যান নির্মাণে অধ্যাদ্যার তিনি শাহজাহানের সাহায্য কামনা করেন—ডাল হৃদের তীরে আঞ্জি যৈথানে বিখ্যাত শালিমার গার্ডেন অবস্থিত স্থানে নিচের অংশে একটি ইতিমাদ কানন নির্মাণ ।\* যুবরাজ পরম্পরার সংযুক্ত জলপ্রপাতের সারি ব্যবহৃত করে পাহাড়ের বরফগলা পানি একটি প্রশস্ত কেন্দ্রীয় জলের নহরের ভেতরে দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে এনে, তারপর পপলার আর চিনার গাছের সারির ভেতর দিয়ে সেই পানি এসে হৃদের ফেলার বন্দোবস্ত করেন। জাহাঙ্গীর বিশ্ববিমুক্ত ভঙ্গিতে লেখেন, তার কল্পনাশ্রয়ী ধারণাগুলো ফলে, উদ্যানগুলো কাশীরের সবচেয়ে সুন্দর আর নৈসর্গিক দ্রষ্টব্যে পরিণত হয়।

এই দিনগুলো অবশ্য ছিল স্বাট আর তার প্রিয়তম পুত্রের ভেতর অবিশ্বস্ত সম্প্রতির মাঝে অতিবাহিত শেষ কয়েকটি দিন। শাহজাহান আর মমতাজকে যে শক্ত পারিবারিক বন্ধন আগলে রেখেছিল তার বুনেট আলগা হতে আরম্ভ করে। নূর শাহজাহানের সাথে নিজের ভাইবির বিয়ের শুরুর বছরগুলোতে সব সময় চেষ্টা করেছেন তার স্বার্থ রক্ষা আর পৃষ্ঠপোষকতা করতে। তারা দুজন যখন মমতাজের পিতা, আসফ খান আর তার দাদাজান ইতিমাদ-উদ-দৌলার

\* বাগানটার স্মৃতি-জাগানিয়া নাম ষষ্ঠ শতাব্দী এক শাসকের সময় থেকে বিদ্যমান, যিনি এখানে একটি মহল নির্মাণ করেছিলেন, যার নাম রেখেছিলেন ‘শালিমার’, যার মানে ‘ভালোবাসার বাসস্থান’।

সাথে একত্র হন, তারা চারজন একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। শাহজাহানের প্রতি স্ম্রাটের অনুগ্রহ বৃক্ষি পাবার সাথে সাথে, জাহাঙ্গীরের ওপর নূরের নিজের নিয়ন্ত্রণ ও বাড়তে থাকে। জাহাঙ্গীরকে তার স্বভাবজাত আলস্য আর প্রেয়োবাদে উন্নতরোম্পর আচ্ছন্ন করার পেছনে মূল কারণ ছিল সুরা আর আফিমের প্রতি তার মারাত্মক দুর্বলতা। সুরা আর মাদকের প্রভাবে জাহাঙ্গীর প্রায়ই যে অচেতন থাকতেন সেটা সমসাময়িক ভাষ্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। স্ম্রাটের অন্যতম প্রিয় সুরাপানের সঙ্গী, টমাস রো, বর্ণনা করেছেন কীভাবে রাজকীয় মন্ত্রীদের সাথে সঙ্গ্যার মন্ত্রণা সভাগুলো প্রায়ই ‘একটি তন্ত্রালুতার কারণে বাধাপ্রাণ হতো, যা বাকানলের ঘোর থেকে মহামান্য স্ম্রাটকে সমাবিষ্ট করে রাখত।’ তিনি প্রায়ই যেখানে-সেখানে স্টোন শয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। তার পরিচারকরা কয়েক ঘণ্টা পর তাকে যথাযোগ্য শুক্রা প্রদর্শনপূর্বক জাগিয়ে তুলত এবং থাবার নিয়ে আসত কিন্তু ভীষণ টলমলিত থাকায় যেহেতু তার পক্ষে নিজে খাওয়া অসম্ভব ছিল, ‘অন্যরা তার মুখে খাবার তুলে দিত।’\*

জাহাঙ্গীরকে প্রণয়জনিত কারণে নূর প্রশংস্য দিতেন এবং তার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন। একটি ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারি তিনি কীভাবে তাকে বসনমুক্ত করার সময় ‘তিনি যেন একটি কাঞ্চা ছেলে ঠিক সেভাবে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।’ জাহাঙ্গীরের দুর্বলতা আর মাদকজনিত বিভাস্তি একই সময়ে নূরকে তার অবিস্মরণীয় প্রতিভাব স্বাক্ষর রাখার একটি সুযোগ দান করে। তার বিয়ের সাথেই স্ম্রাটেই তার ক্ষমতার আস্তীকরণ শুরু হয়েছিল। ১৬১৫ সালে স্যার টমাস রো প্রথম যখন প্রথম দরবারে আগমন করেন, তার প্রভাব তত দিনে এতটাই বৃক্ষি পেয়েছিল যে তিনি তার প্রমাণপত্রগুলো হারেমে তার কাছে পাঠাবার আদেশ দিতে পেরেছিলেন, যাতে তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেগুলো পরীক্ষা করতে পারেন। স্ম্রাটের ওপর নূরের প্রভাব

- 
- জাহাঙ্গীরের একারই কেবল এই মাদকাসক্তির সমস্যা ছিল না। পিটার মানডি, যিনি কয়েক বছর পরেই ভারতবর্ষে আগমন করবেন, লক্ষ্য করেছেন, ‘যেখানে প্রচুর পশ্চিম ক্ষেত্র রয়েছে, যা থেকে তার দেশের লোকেরা যাকে আফিম বলে সেই ওপিয়াম তারা প্রস্তুত করে, যা আরো অন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। তারা তাদের ঝুঁটিতে বীজটা গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেয়... খোসা পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে সেটা থেকে তারা পোষ্ট নামে এক ধরনের সুরা প্রস্তুত করে। পানিটা চেপে আর ছেকে নিয়ে তারা এটা পান করে যা মদোন্তুত করে। তারা একইভাবে বিশেষ প্রজাতির একটি গাছ ভাঙ (গোজা) যার একই ধরনের মাদকতা সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে, আর এ জন্য তারা মাতাল লোককে সাধারণত হয় আফিমি (আফিম-ঘোর), পোস্তি (আফিম-মাতাল), ভাঙ্গি (মাদকাসক্ত) বলে...’

রো সঠিকভাবে আর দ্রুত অনুমান করতে পেরে, ইংল্যাণ্ডে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন যে রাজমহিষী ‘তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার মর্জি অনুযায়ী তিনি তাকে দিয়ে যা খুশি তা-ই করাতে পারেন।’ ‘খোশমেজাজি আর স্বভাবত ইন্দ্রিয়পরায়ণ’, জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্য পরিচালনার ফলস্থিতির, একথেয়ে দায়িত্ব তার প্রাণবন্ত, যোগ্য আর উচ্চাকাঞ্চকী ছীর হাতে ক্রমেই সন্তুষ্টিশে সমর্পণ করতে আরম্ভ করেন।

নূর এবার সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগ শুরু করেন—স্বাধীনভাবে রাজকীয় ফরমান অনুমোদন করেন এবং জাহাঙ্গীরের নামে সেগুলো জারি করার সময় রাজকীয় সিলমোহরের পাশে তার নিজের নাম, ‘নূরজাহান, রানি বেগম’, যুক্ত হয়। তিনি মোগল প্রশাসনের প্রাণশক্তি হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন পদে নিয়মিত নিয়োগ, পদোন্নতি আর পদব্রহ্মণের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। একজন সমসাময়িক ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন, ‘তার প্রাক্তন আর বর্তমান সমর্থকরা বেশ ভালোভাবেই পুরস্কৃত হয়েছে...স্মাটের নিকটে অবস্থানরত বেশির ভাগ অম্বাত্যই তাদের পদোন্নতির জন্য তার কাছে ঝণী...ভীষণ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, কারণ স্মাটের আদেশ বা অনুদান প্রভৃতির কার্যত কোনো নিচয়তা থাকে না যতক্ষণ সেটা রানি বেগমের অনুমতিপ্রাপ্ত লাভ করছে।’ নূরের নামে মোহরও প্রর্বতন করা হয় এবং শাহি, স্মাজী খেতাব দ্বারা জাহাঙ্গীরের অন্য স্বীকৃতির থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাকে ছিন্নিত করা হয়। তিনি কেবল একটি অধিকারই কথনে লাভ করেননি স্বার্জি সেটা হলো মসজিদে শুক্রবারের জুমার নামাজের পূর্বে সার্বভৌম ক্ষমতার বিবৃতি হিসেবে কথনে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়নি।

শাসন পদ্ধতির প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ নূর তার স্বামীর প্রতিনিধিষ্ঠকরূপ যখন অংশগ্রহণ করছেন, শাহজাহান তখন জাহাঙ্গীরের সামরিক অভিযান পরিচালনায় ব্যস্ত। তাদের উভয়ের স্বার্থ কিছু সময়ের জন্য একে অপরকে সংগত করে, কিন্তু শাহজাহান একটি সময় নূরের বাড়তে থাকা কর্তৃতু সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠেন এবং তার অভিলাষের বিষয়ে শাহজাহান সন্দিক্ষণ হয়ে পড়েন। ১৬১৭ সালে ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধা দেয়ার বিষয়ে তাদের মাঝে তর্কাতর্কির সৃষ্টি হয়—তাদের ভেতরে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে মতান্বেক্য প্রকাশ পায়। অবশ্য তাদের উভয়ের জন্যই এর চেয়েও অনেক বেশি শুরুতর বিষয় হিসেবে ক্রমেই সামনে এসে দাঁড়ায়, জাহাঙ্গীর যখন ইন্দ্রেকাল করবেন তখন কী হবে? নূর তত দিনে রাজসিংহাসনের জন্য শাহজাহানের মতো বুদ্ধিমান, ক্রমেই স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠা অভ্যর্থীর পরিবর্তে নমনীয় একজনকে খুঁজতে শুরু করেছেন—তিনি জাহাঙ্গীরের মাধ্যমে যেমন শাসনকার্য করতে পারেন তেমনি একজন লোককে খুঁজছিলেন। তার পরিবার আর

রাজসিংহসনের ভেতরে আরেকটা বন্ধনের চেয়ে সেটা অর্জনের আর কি উত্তম  
পথ হতে পারে?

কোনো কোনো বিবরণ এমনটা বলতে চেষ্টা করে যে, নূর আসলে তার  
একমাত্র সন্তান লাডলির—তার প্রথম স্বামী শের আফগানের ওরসজাত  
কন্যা—সাথে শাহজাহানের বিয়ে দেয়ার একটি চেষ্টা করেছিলেন। এটা অবশ্য  
আপাতদৃষ্টিতে খুব একটি বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয় না। তার ভাইঝি  
মমতাজ স্পষ্টত আর নিশ্চিতভাবেই শাহজাহানের প্রিয়তমা প্রধান স্ত্রী ছিলেন  
এবং তার গর্ভ থেকে এক ঝাঁক সন্তান জন্ম নিয়েছে, যাদের ভেতরে পুরুষ  
উত্তরাধিকারীও রয়েছে। নূরের প্রথম ইচ্ছা ছিল সম্ভবত এর পরিবর্তে  
শাহজাহানের সংভাই যুবরাজ খসরুর সাথে লাডলির বিয়ে দেয়া। তিনি হয়তো  
ভেবেছিলেন আংশিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী যুবরাজকে নিয়ন্ত্রণ করা  
শাহজাহানের চেয়ে অনেক বেশি সহজ হবে। কিন্তু বিয়েটা যদিও খসরুকে  
বন্দিদশা থেকে যেখানে তিনি বর্তমানে অঙ্গীণ রয়েছেন মুক্তি দিলেও, তিনি  
সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাণ ভাষ্য অনুসারে, প্রস্তাব  
প্রত্যাখ্যানের পেছনে মূল কারণ ছিল স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা যে বীতিমতো  
জোর করে তার সাথে বন্দিদশা বরণ করেছে এবং ‘অন্য যেকোনো আরাম-  
আয়েশের সুবিধা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে কেবল তার স্বামীর দুর্দশার সঙ্গী  
হবার’ অভিধায়ে। লাডলিকে বিয়ে কর্তৃ আর সেইসাথে নিজের মুক্তি নিশ্চিত  
করতে তার নিঃস্বার্থ অনুরোধ সংকেত সূরের প্রস্তাব গ্রহণ না করার বিষয়ে খসরু  
অনড় থাকেন।

এই আলোচনা অবশ্য নূরের কৌশল সম্পর্কে শাহজাহান আর মমতাজকে  
সচেতন করে তোলে। ইতিমাদ-উদ-দৌলার এখন পর্যন্ত একান্নবর্তী পরিবারের  
মাঝে ফাটলের বিভাট জন্ম নিতে শুরু করে। বর্তমান শাসকের স্ত্রী এবং  
যেকোনো সুন্ময় যুবরাজের, যে হয়তো তার স্ত্রীলভিক্ষ হবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা  
তাঢ়িত শাশুড়ি হিসেবে নূরের উচ্চাশা এবং ইতিমধ্যে সিংহাসনের সবচেয়ে  
শক্তিশালী দাবিদারের স্ত্রী আর তার একাধিক সন্তানের স্নেহময়ী জননী হিসেবে,  
মমতাজের অভিধায়, এবার পরম্পরারের প্রতিপক্ষ হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করে।  
নিজের আপন খালার পরিবর্তে, যিনি অটীরেই শাহজাহানের বিরুদ্ধে  
জাহাঙ্গীরের শক্রভাবাপন্ন মনোভাব নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করবেন, তার স্বামীর  
প্রতি ছিল মমতাজের ঘ্যথহীন আনুগত্য। মমতাজের আবরাজান আসফ খান  
উত্তৃত পরিস্থিতির কারণে নিজেকে আরো বেশি জাটিল একটি অবস্থানে নিজেকে  
আবিষ্কার করেন। আসফ খান তার সন্ত্রাঙ্গী ভগিনীর অনুগত সমর্থক আর  
দরবারে তার মুখ্যপাত্র হলেও তাকে নিজের এবং তার কন্যার ভবিষ্যৎও  
বিবেচনা করতে হবে। বয়োবৃন্দ ইতিমাদ-উদ-দৌলাকে, জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী

হিসেবে তার আস্থার অধিকারী থাকার পাশাপাশি নিজ কন্যা আর নাতনির পরম্পরবিবেদী স্বার্থের মাঝে সংঘাত পরিহার করতে, নিজের সমস্ত দক্ষতার ব্যাপক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

রাজপরিবার কাশীরের অবস্থান করার সময়েই এসব চাপা উভেজনা তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একান্ন বছর বয়সী জাহাঙ্গীর 'শাস-প্রশাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হন... বুকের বাম দিকে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি খাসনালিতে কেমন একটি পীড়িত আর সংক্রামক অনুভূতি। পূরো ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে।' 'উষ্ণতাদায়ক চিকিৎসা-ক্রম' সামান্যই স্বত্ত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয় এবং 'আবহাওয়ায় বিদ্যমান জলকণার কারণে' সম্ভবত এই অসুস্থতা দেখা দিয়েছে এমন বক্ষমূল ধারণা থেকে জাহাঙ্গীর কাশীর ত্যাগ করে কোনো উষ্ণ আর শুক এলাকায় যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। নূর তার স্বামীর এমন শারীরিক উপস্থিতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি যদি জামাতা হিসেবে খসরুর ভূমিকা নিশ্চিত করতে না পারেন তাহলে আরেকটা সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৬২০ সালের ডিসেম্বরে, স্ম্রাট তার পারিষদবর্গ নিয়ে সে সময় লাহোরে অবস্থান করছিলেন, নূর তার কন্যার সাথে জাহাঙ্গীরের উনিষ্ঠ পুত্র অলস, আমোদপ্রিয় শাহরিয়ারের বাগদান করতে তাকে রাজি করান। নূর বিশ্বাস করেছিলেন শাহরিয়ারের পক্ষে তার কর্তৃত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। সমসাময়িক ভাষ্য অনুসারে, যদিও সে ছিল 'যুবরাজের ভেতরে সবচেয়ে সুদর্শন' তার মাঝে 'দুর্বলচিত্ত আর জড়বুদ্ধির' সরু ছক্ষণই প্রকট হতে আরম্ভ করেছিল। রাজনীতির পাশাখেলায় উন্নত পরিস্থিতিতে আপাতদৃষ্টিতে তার চেয়ে আদর্শ চরিত্র আর হতে পারে না।

শাহজাহানের কাছে বিয়ের বাগদানের এই প্রস্তাবটা, যার সাথে জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী হিসেবে তার অবস্থানের প্রতি একটি পরোক্ষ হৃষকি জড়িত, তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়ে এসে পৌছে। সেবারের শরৎকালে, রাজদরবারে আবারও সংবাদ এসে পৌছে, জাহাঙ্গীর পরবর্তী সময়ে যেমন লিখেছেন, 'শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করা দূরাত্মার দল দাক্ষিণাত্যে আবারও বিদ্রোহের নিশান উভেজিত করে।' বিজাপুর আর আহমেদনগরের সুলতান আর সেইসাথে তাদের নতুন মিত্র গোলকুণ্ডার সুলতান, মোগলদের সাথে তাদের সঙ্কীর্তির সব শর্ত অস্বীকার করেন এবং বুরহানপুর আর অন্যান্য শহরে অবস্থিত রাজকীয় সেনাবাহিনীকে ৬০,০০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে চারপাশ থেকে অবরোধ করেন। জাহাঙ্গীর আরো একবার শাহজাহানকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টত, বস্তুতপক্ষে একমাত্র অবলম্বন। খসরুর যদি নির্বুত স্বাভাবিক

দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হতো, তার ওপর আঙ্গা রাখাটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ; পারভেজ যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে একেবারেই অযোগ্য এবং সেইসাথে সুরাসক্ততার পরিবারিক কুঅভ্যাস ভালোই রঞ্জ করেছিল; অন্যদিকে সদ্যোযুবক শাহরিয়ার সামরিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ আর যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার জন্য তার ব্যবসও অল্প।

নূর যখন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ঠিক সে সময়ে দরবার থেকে হাজার মাইল দূরে যুদ্ধ করতে যাবার কোনো ইচ্ছাই শাহজাহানের ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি যখন দূরে দাক্ষিণ্যাত্যে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকবেন তখন যদি জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন, সিংহাসনের ওপর নিজের দাবি আরোপ করার জন্য তিনি তখন বেকায়দা একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যেহেতু আকবাজানের আদেশ পালন করা ভিন্ন তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই, তিনি কেবল একটি দাবি জানাবেন। আর সেটা হলো, তার সৎভাই খসরুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাহাঙ্গীর তাকে দেবেন, যিনি বিদ্রোহ দমন অভিযানে তার সঙ্গী হবেন। তিনি এভাবে সিংহাসনের একজন সন্তোষ্য দাবিদারকে অস্তত নজরদারির ভেতরে এবং অন্যান্য আঘাতী গোষ্ঠীর নাগালের বাইরে রাখতে পারবেন।

জাহাঙ্গীর সম্মত হন এবং অট্টমবারের মতো ভোগ্যবত্তী মমতাজ আর শাহজাহান সর্বাধুনিক গাদাবন্দুক সংজ্ঞিত ১০০০ স্টোক তবকি, ৫০,০০০ তোপচি, ধূসর হাতির বিশাল একটি বহর এবং দুর্বৃষ্টি খসরু আর তার অনুগত দ্বীকে সাথে নিয়ে আরো একবার দক্ষিণে দ্যাক্ষিণ্যাত্যের উদ্দেশে রওনা হন। শাহজাহান তার আকবাজানকে আর কোনো পিন দেখতে পাবেন না, যিনি মহোল্লাসে একদা তার মাথায় সোনার মোহর বর্ষিত করেছিলেন। শাহজাহান কয়েক মাসের ভেতরেই, জাহাঙ্গীর তার রোজনামচায় কুকুর ভঙ্গিতে যেভাবে লিখেছিলেন, ‘বদমাশ’ হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করেন, তিনি তখন আর মোটেই বিশ্বস্ত বা প্রিয়তম নন এবং নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ শক্তি। খসরুর সাথেও তার আকবাজানের আর কথনো দেখা হবে না—এক বছরের ভেতরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জ্যাকবীয় প্রতিশোধের বিয়োগাত্মক নাটকের সব উপাদানই শুরু হতে যাওয়া পারিবারিক উপাখ্যানে উপস্থিত থাকবে, যার মূল কৃশীলব, ভবিষ্যদ্দশী স্যার টমাস রো কর্তৃক বাছাই করা, হিসেবে আবির্ভূত হবে ‘একজন মহানুভব যুবরাজ, তার পত্রিকা পত্নী, একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, একজন কুটিল চরিত্রের শৃষ্টি সৎমা, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সন্তান, একজন ধূর্ত প্রিয়পাত্র...।’



AMARBOI.COM

## পঞ্চম অধ্যায়

### পর্দার অন্তরালে অপেক্ষমাণ স্বার্ট

শাহজাহান আরো একবার দাক্ষিণাত্যে তার আকরাজানের শক্তদের মুখোয়ারি হবার জন্য দ্রুত অগ্রসর ছন, ছয় মাসাধিক কালব্যাপী পরিচালিত একটি অভিযানের মাধ্যমে তাদের পরামর্শ করেন এবং এবার আরো কঠোর দণ্ডাদেশ আরোপ করেন। সময় তখনো, জাহাঙ্গীর যেমন লিখেছেন, ‘কৃতজ্ঞতা আর বিজয়ের’ মাত্রায় সমাহিত। শাহজাহান দক্ষিণে যখন তার অবস্থান সুদৃঢ় করছেন, স্বার্ট তখন আগ্রায় নূর আর তার ভাই, মমতাজের পিতা কর্তৃক আয়োজিত ‘রাজকীয় বিনোদন’ উপভোগ করছেন, যেখানে তারা ‘অনেক মূল্যবান রত্ন আর বিশ্যায়’র উপকরণ তার সামনে উপস্থিত করেছেন। কাশীরে জাহাঙ্গীর যে প্রাণান্তকর শ্঵াসকষ্টের সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিলেন সেটা এখন অনেকটাই আরোগ্য লাভ করায় এসব আত্মোজন আজকাল তাকে উৎফুল্ল করে তোলে। তিনি সেইসাথে ধ্রুতির আকৃষ্ণ বস্তু সম্পর্কে তার নিজের পর্যালোচনা শুরু করার মতো সুস্থও হয়ে ওছেন; জেত্রার ‘চূড়ান্ত অন্তু’ উপস্থিতি সম্পর্কে আর বাংলা থেকে তার দরবারে উভলিঙ্গের একজন খোজা উপস্থিতি হতে তিনি নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৬২১ সালের জুন মাসে, বহুদূরে দাক্ষিণাত্যের গুমোট বর্ষায় মমতাজ তাদের অষ্টম সন্তান জন্ম দেন, একটি মেয়ে সুরায়া বানু নামে যাকে সবাই চেনে। সময়টা আনন্দঘন হওয়া উচিত হলেও বহুদূরে অবস্থিত যোগল দরবার থেকে যেসব সংবাদ শাহজাহানের কানে এসে পৌছে তাতে তার অস্বস্তি অন্মেই বাড়তে থাকে। তিনি জানতে পারেন, তার নবজাত কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার কিছুদিন পূর্বেই আগ্রায় লাভলি আর শাহরিয়ারের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমাদ-উদ-দৌলার মহলে পরবর্তী সমতোয় একটি ‘আনন্দের ভোজসভা’র আয়োজন করা হয়েছিল জাহাঙ্গীর যেখানে নুরের কুশলী দৃষ্টির সামনে নিজের ছোট ছেলেকে খিলাত আর খেতাবে ভরিয়ে দেন। বার্তাবাহকরা এর চেয়ে

উদ্বেগজনক সংবাদ আগ্রা থেকে বয়ে নিয়ে আসে যে, জাহাঙ্গীর পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—ডয়ংকর খাসকটের আক্রমণে আক্রান্ত হওয়ায় বাতাসের জন্য তাকে হাঁসফ্যাস করতে দেখা গেছে। ‘রোগের প্রকোপ মাত্রা ছাড়ালে’ উট আর ছাগলের দুধ পান করে তিনি নিজেকে সুস্থির করতে চেষ্টা করেন এবং সেই প্রচেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয়, হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পুনরায় সুরার কাছে ফিরে যান। খোলাখুলি তিনি স্বীকার করেন, ‘আমার অভ্যাস না থাকা সম্ভেও সুরা পানের মাঝে আমি আমার উপশম খুঁজে পেয়েছি, আমি দিনের বেলায় এই আলোর শরণাপন্ন হই এবং অভ্যাসটাকে ক্ষমেই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যাই।’ চারপাশে আবহাওয়া উত্তঙ্গ হয়ে ওঠার সাথে সাথে যখন তার পরিস্থিতির অবনতি হওয়া শুরু হয়, বিস্ময়ের কিছু থাকে না। উদ্বিগ্ন নূর শুক্রবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ‘আমার সুরাপানের মাত্রা হ্রাস করতে সচেষ্ট হয় আর আমার জন্য উপশমকারী এবং উপযুক্ত পানীয় প্রস্তুত করতে চেষ্টা করে...সে ধীরে ধীরে আমার সুরা পানের পরিমাণ কমিয়ে নিয়ে আসে এবং আমার নাগাল থেকে শিষ্টাচারবর্জিত দ্রব্য আর অনুপযুক্ত খাবার দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।’

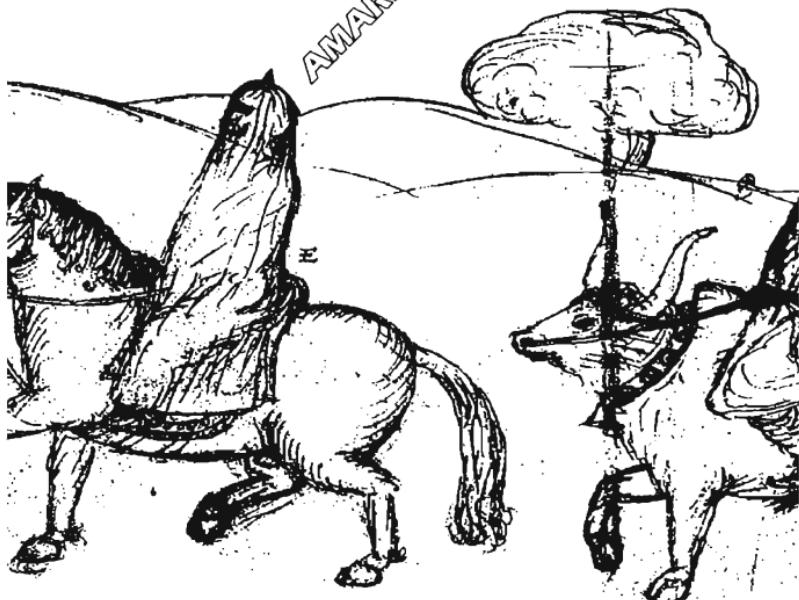
সচরাচর মাতাল অবস্থায় থাকা পারভেজ তাঁর চেয়ে সামান্য কম মাতাল আবকাজানের শ্যায়ার কাছে দৌড়ে যায় ‘দাক্ষিণ্যবান আর আন্তরিক পুত্র’ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে, কিন্তু বহু মাইল দূরে মাক্ষিণ্যাত্যে অবস্থানরত শাহজাহান আর মহতাজ উদ্বিগ্নিচ্ছাত্যে অপেক্ষা করাঁছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। রাজদরবারে এদিকে শীঘ্রই আসে পারিবারিক নাটকের দৃশ্য অভিনীত হতে শুরু করে। প্রথম দৃশ্যে, নূরের আমিজান, মহতাজের পিতামহী, গোলাপের আতরের সুগন্ধির আবিষ্কারক, বর্ধক্যজনিত রোগে ইতেকাল করেন। তিনি মাস পর, স্মার্ট নিজের ভগ্ন-স্থান্ত্য পুনরুদ্ধারের আশায় যখন উত্তরের অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলের উদ্দেশ্যে শোকার্ত নূরকে নিয়ে অহসর হচ্ছিলেন, ইতিমাদ-উদ-দৌলা, তার ‘সাম্রাজ্যের শীল’, এবার অসুস্থ হয়ে শ্যাশ্বারী হন। বৃক্ষ মানুষটা তার সারা জীবনের সঙ্গী স্ত্রীকে হারিয়ে মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। জাহাঙ্গীর তার রোজনামাচায় লিখেছেন কীভাবে ‘তিনি জীবন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়ে দিন দিন সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলছিলেন! নূরের উদ্বেগ দেখে অভিভূত হয়ে, যা ‘আমি একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না’ জাহাঙ্গীর রাত জেগে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে সঙ্গ দেন অন্যদিকে তার দরবারের বয়োজ্যেষ্ঠ অমাত্য ‘নিজের মৃত্যুযন্ত্রণার মুহূর্তে’ চেতন-অচেতনের মাঝে বারবার হারিয়ে যেতে থাকেন। ১৬২২ সালের জানুয়ারি মাসে, পারস্য থেকে তাদের বিপজ্জনক যাত্রায় নিজের পুরো পরিবারকে নিরাপদে পরিচালিত করার চার দশক প্রায় ৪৪ বছর পরে ইতিমাদ-উদ-দৌলা ইতেকাল করেন।

জাহাঙ্গীর তার মতো এমন ‘আন্তরিক আর জ্ঞানী সহচর এবং বিজ্ঞ আর দক্ষ উজিরের’ মৃত্যুতে যারপরনাই দৃঢ়ত্ব হন। নূর সেনহয়ী পিতার সাথে সাথে নিজের বিজ্ঞ পরামর্শদাতাকে হারাবার শোকে কাতর হন। তিনি আগোয় তার স্মৃতির উদ্দেশে সাদা মর্মরের একটি মকবরা তৈরির পরিকল্পনার মাঝে সাম্ভূনা ঘুঁজে পেলেও সেই মুহূর্তে তাকে কিছুতেই প্রবোধ দেয়া সম্ভব ছিল না। মমতাজের পিতামহ আর পিতামহীর মৃত্যুতে তার প্রতিক্রিয়ার কথা কোথাও নথিবন্ধ হয়নি, কিন্তু তিনি নিচ্ছয়ই বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হবার সাথে সাথে আশঙ্কিতও হয়েছিলেন এই ভেবে যে, পরিবারের প্রধানের নিয়ন্ত্রক প্রভাব দূরীভূত হবার ফলে নূর কীভাবে এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। নূরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নিজের সমগ্র পরিবারের স্বার্থের মাঝে একটি ভারসাম্য আনয়নে সক্ষম এমন একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন ইতিমাদ-উদ-দৌলা। তার অবর্তমানে মমতাজের নিজের ভবিষ্যৎ আর সেইসাথে তার স্বামী এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎও এখন অনেক বেশি অনিচ্ছিত হয়ে উঠে বে।

ইতিমাদ-উদ-দৌলা মারা যাবার সংগ্রাহকানকে পর, আরো একটি মৃত্যুসংবাদ—এবারেরটা অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত—দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ডগু-স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া জাহাঙ্গীরের রোজনামচাম্ব একটি সাধারণ পত্রিকা দেখতে পাওয়া যায় : ‘খুররমের (শাহজাহান) কাছ থেকে পাওয়া একটি বার্তায় জানতে পারলাম যে পেটের শূল বেদনায় স্বাক্ষর হয়ে খসরু মৃত্যুবরণ করেছে।’ শাহজাহান তাকে যেখানে অস্তীর্ণ করে রেখেছিলেন সেই বুরহানপুর দুর্গেই তিনি আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুমুখে প্রতিষ্ঠিত হন। মৃত্যুসংবাদ বহনকারী বার্তায় যদিও শাহজাহানের প্রধান অমাত্যদের স্বার স্বাক্ষরই ছিল বার্তার বিষয়বস্তুর যথার্থতা নিশ্চিত করতে, খসরুর মৃত্যুর সময়টা, ঠিক যখন জাহাঙ্গীরের নিজের বেঁচে থাকার বিষয়টিই সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তে খসরুর মৃত্যুটা বিস্মায়ক বস্তুতপক্ষে অমঙ্গলসূচক। মোগল দরবারে সেই মুহূর্তে উপস্থিত সব ভিন্নদেশি অতিথি কার্যত একটিই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, শাহজাহান সিংহাসনের জন্য আসন্ন হয়ে ওঠা লড়াইয়ের সন্তান্য প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে নিজের ছত্রিশ বছর বয়সী সৎভাই খসরুকে হত্যা করেছেন।

অভিযোগটা বাতাসে ভাসতেই থাকে। কয়েক বছর পর এক অগাস্টিনিয়ান ভিক্ষু লিখিত একটি রোমাঞ্চকর বিজ্ঞারিত বর্ণনা পুরো বিষয়টির প্রতীকস্বরূপ বিবেচনা করা যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন শাহজাহান কীভাবে, ‘এই বর্বরেচিত পরিকল্পনার মূল রচয়িতা আর বাস্তবায়নকারী’ খসরুকে হত্যা করার জন্য এক ক্রীতদাসকে আদেশ দিয়ে নিজের জন্য অন্যত্থুতা তৈরির উদ্দেশে ‘শিকারের অজুহাত দেখিয়ে’ তিনি ঘটনাস্থল থেকে দূরে চলে যান : ‘আমাদের এই হস্তারক কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গভীর রাতে যুবরাজের কামরায় এসে উপস্থিত

হয়। যুবরাজকে বিভ্রান্ত করতে সে দরজায় এমনভাবে করাঘাত করে, কথা বলে যে সে তার আকর্ষণের কাছ থেকে তার জন্য বার্তা নিয়ে এসেছে এবং কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ, যা মোগল স্ন্যাটদের অপরাধ মার্জনা এবং ক্ষমাশীলতা প্রদর্শনের উদ্দেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ইঙ্গিতবহু। হতভাগ্য যুবরাজ এই আনন্দদায়ক সংবাদ শনে, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো আসলে কী অশুভ সংবাদ নিয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে একেবারেই অসন্দিগ্ধ হয়ে কক্ষের দরজা খুলে দেয় নিজের আকশ্মিক মৃত্যুকে বরণ করতে। হস্তারকের দল কক্ষে প্রবেশ করেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার মুখ্যাবরোধ করে এবং তার গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়ে তার শ্বাস রোধ করে। খসরু মারা গেলে তারা তার মৃতদেহটা শয়ার ওপর শুইয়ে দেয় এবং মৃতদেহটা সেখানেই রেখে তারা চলে যায় আর যাবার সময় কক্ষের দরজা বাইরে থেকে যত্নের সাথে এবং শক্ত করে এমনভাবে আটকে দিয়ে যায় যেন তারা কিছুই করেনি।' আরেকটা ইউরোপীয় ভাষ্য অনুসারে, খসরুর পতিত্রতা জ্ঞান কয়েক ঘণ্টা পর তার কক্ষে প্রবেশ করেন : '...তার স্বামী নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে রায়েছে বলে মনে করে। তাকে নড়াচড়া করতে না দেখে সে তার মুখে হাত দেয় এবং তখনই কেবল বুঝতে পারে তার দেহে প্রাণ নেই এবং শীতল। খসরুর জ্ঞান চিন্তার করে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বের হয়ে আসে...'।'



মানডির করা প্রমণরত মোগল রমণীর ক্ষেচ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

শাহজাহানের নিজস্ব ঐতিহাসিকদের একজন নিতান্তই সাদামাটাভাবে লিখেছেন, ‘খসরু অস্তিত্বের পিঞ্জর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এর পরিবর্তে অনস্তিত্বের কারাগারে অস্তরীণ হন’। এক মোগল ঐতিহাসিক, শাহজাহানের জীবদ্দশায় শেষ দিকে লিখেছেন, তিনিও শাহজাহানকে দায়ী মনে করতেন, যদিও তিনি অনেক জোরালভাবে দাবি করেছেন যে, সত্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য খসরুর মৃত্যুটা ছিল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বাস্তবিক প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, খসরু সন্দেহাতীতভাবে খুনই হয়েছিলেন, খুব সঢ়বত নিজের ভাইয়ের হাতেই। শাহজাহান পূর্বেও বেশ কয়েকবার খসরুর তত্ত্ববধানের দায়িত্ব লাভ করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রতিবারই জাহাঙ্গীর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি এবার কেবল সম্মত হয়েছিলেন যার কারণ হয় তিনি মাতাল ছিলেন, কিছু ভাষ্যে যেমন দাবি করা হয়ে থাকে, শাহজাহান যখন তাকে অনুরোধ করেছিলেন বা দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন করতে শাহজাহানকে তার প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তাকে খুশি করতে চেয়েছিলেন। নূর সঢ়বত জাহাঙ্গীরের সম্মতি আদায়ের ব্যাপারে একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার মনোযোগ যেহেতু খসরুর উপর থেকে শাহরিয়ারের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে, সেহেতু খসরু আর শাহজাহান উভয়কে দরকারি আর তাদের আকর্ষণের কাছ থেকে বিভাড়িত করার এটা একটি মৌকাম সুযোগ বলে অবশ্যই তার মনে হয়েছিল।



খসরুকে, যে ক্ষীণদৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও স্মার্টের জ্যোষ্ঠ সন্তান আর তার একদল অনুগত সমর্থক থাকায়, শাহজাহানের অবশ্যই খুন করার সংগত কারণ ছিল। সর্বোপরি, খানিকটা জড়বুদ্ধির শাহরিয়ার আর মাতাল পারভেজের চেয়ে তার দক্ষতা অনেক বেশি ছিল। তার মৃত্যুতে, আর কিছু না হোক, শাহজাহানের অস্তত সুবিধাই হয়েছিল। পরিবারের অন্য প্রতিদৰ্শীদের পরবর্তী সময়ে নির্মাণাবে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার সাথে খসরুর মর্মান্তিক পরিণতির একটি মিল রয়েছে। খসরুকে হত্যার আদেশ দান করে, অবশ্য শাহজাহান এমন একটি অনেতিক কাজ করেছিলেন যা তার রাজত্বকালের পুরো সময়টায় তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে এবং তার সন্তানের মাঝে রক্তাক্ত একটি নজিরের জন্ম দেবে। প্রথমদিকের সহানুভূতিহীন এক ভাষ্যকার বিষয়টি এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তিনি ছিলেন ‘ভাইয়ের রক্তের মাঝে তিনি নিজের সিংহাসনের ভিত রোপণ করেছেন।’

খসরুর আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে শাহজাহানের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে থাকা জাহাঙ্গীর, নিজেও মনে নিয়েছিলেন। সমসাময়িক ভাষ্য পাঠ করে অবশ্য মনে হয় যে, অজ্ঞাতনামা এক মোগল অমাত্যের কাছ থেকে প্রেরিত একটি বার্তা প্রিনি ঘটনার সময় বুরহানপুরে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত, তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ঘটায়। স্মার্ট বুরহানপুরের অভিজাতদের প্রতি দ্রুত হয়ে বার্তা প্রেরণ করেন, ‘সত্যি ঘটনাটা তারা কেন তাকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে সেটা এবং সেইসাথে তার সন্তানের আভাবিক মৃত্যু হয়েছে নাকি অন্য কেউ তাকে খুন করেছে অনুসন্ধান করে দেখেন।’ তিনি খসরুর শবদেহ কবর থেকে উত্তোলন করে এলাহাবাদে উদ্যান পরিবেষ্টিত খসরুর আম্বিজানের মকবরায় পুনরায় সমাধিস্থ করার আদেশ দেন। তিনি সেইসাথে খসরুর বিধবা পত্নী আর এতিম সন্তানকে হেফাজতের জন্য তখন লাহোরে অবস্থিত রাজদরবারে প্রেরণের আদেশ দেন।

জাহাঙ্গীর অবশ্য শীঘ্রই আরো বিশাল বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন, যা ভ্রাতৃহস্তার মতো বিষয় নিয়ে চিন্তাভবনা করার জন্য তাকে সামান্যই অবকাশ দেয়। তার কাছে সংবাদ পৌছায় যে, পুনর্জায়মান পারস্যের স্মার্ট, শাহ আকবাস কাবুলের ৩০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি সীমান্ত চৌকি কান্দাহার অভিযুক্তে অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেখানের নিরাপত্তার দায়িত্বে অপর্যাপ্ত একটি সৈন্যবাহিনী রয়েছে। হ্যায়ন তার সিংহাসন পুনরুদ্ধারে শাহের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে ১৫৪৫ সালে শহরটা তাকে উপহার দেয়ার পর থেকেই এটা দুই সাম্রাজ্যের ভেতরে বিরোধের একটি উৎসে পরিণত হয়েছে। শহরটা এরপর চারবার হাতবদল হয়েছে। মালিকানার সত্যিকারের গুরুত্বের চেয়ে নীতিগত

ভাবনা জোরাল হয়ে উঠেছে। কাবুল একটি সময়ে ভারতবর্ষের বাণিজ্য পথের ওপর অবস্থিত সম্পদশালী একটি আড়ত হিসেবে বিবেচিত হলেও, পরবর্তীকালে বণিক আর তীর্থযাত্রীর দল সমুদ্রপথ বেছে নেয়ায় এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। জাহাঙ্গীর তা সত্ত্বেও শহরটার দখল বজায় রাখার ব্যাপারে উৎপন্ন বিশেষভাবে তার ডয় শহরটার করায়ন্ত্রকরণ তার সাম্রাজ্য পারস্যের অধিক্রমের হয়তো একটি ইঙ্গিত। তিনি ‘যুদ্ধাঞ্চ আর অন্যান্য উপকরণ, অর্থ, হাতি, কামান, গোলন্দাজ’ বিশিষ্ট বিশাল একটি বাহিনী সমবেত করেন এবং ১৬২২ সালের মার্চ মাসে এর সাথে যোগ দিতে শাহজাহান আর তার অধীনস্থ বাহিনীকে দাক্ষিণাত্য থেকে আসতে আদেশ করেন।

শাহজাহান আর মমতাজের জন্য কঠিন আর অরুদ্ধদ একটি সময়ে এই আদেশ এসে পৌছে। দুই বছর পূর্বে ‘ভূর্বৰ্গ-সদৃশ্য কাশী’র অভিযুক্তি পার্বত্য পথে ভূমিষ্ঠ হওয়া তাদের পুত্র উমাইদ বখশ, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ‘আদি-অত্তীন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাও করেছে’, বাচ্চা ছেলেটার মৃত্যু সংবাদ নথিবদ্ধ করার সময় দিনপঞ্জির রচয়িতারা সুললিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া তাদের বিভীষ্য সন্তান। শাহজাহান তা সত্ত্বেও নিজের বাহিনীর পুরোভাগে অবস্থান করে রওনা দেন, সাথে রয়েছেন শোকার্ত আর আবারও গর্ভবতী মমতাজ বরাবরের মতোই অনগতভাবে পরিবারের অন্য মেয়েদের সাথে পর্দা ঘেরা হাওদা, গরুর গাঢ়ি বা ক্ষেত্রের হাড় বের হয়ে থাকা পোজরের পাশে ঝুঁড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় অনুস্মরণ করছেন। তিনি বুরহানপুরের ১০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মানচূর পাহাড়ি দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু তার পরই যাত্রা বিরতি করেন। তিনি তার আবাজানকে অজুহাত দেন, বর্ষাকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে চান। জাহাঙ্গীর নিজেই একবার লিখেছিলেন, ‘বর্ষাকালে এই দুর্গের মতো আর কোথাও তাজা বাতাস আর মনোরম পরিবেশযুক্ত স্থান নেই’ সেইসাথে রয়েছে বিশালাকৃতির ত্রুদ দ্বারা চারপাশের আলো-বাতাসপূর্ণ ভবনগুলো। শাহজাহান অবশ্য এই ক্ষণট পছন্দ করেছিলেন জাহাঙ্গীরের কাছে একাধিক দাবি পেশ করতে। কান্দাহার অভিযানের একক নেতৃত্ব তিনি তার ওপর অর্পণ করতে বলেন এবং পাঞ্চাবের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিতে বলেন। তিনি জানান, কান্দাহার অভিযুক্তে তিনি অগ্রসর হবার সময় জায়গাটা তার পেছনে অবস্থান করবে। তার কাছে এসবের ভেতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত, পঞ্চাশ বছর পূর্বে আকবর কর্তৃক দখলকৃত, রাজস্থানের রণথন্টেরের বিশাল রাজপুত দুর্গটা, যা তিনি মমতাজ আর তাদের সন্তানদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য দাবি করেন।

শাহজাহানের শর্তগুলোর ভেতরেই তার বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় যে, দরবারে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তার অর্জিত বিজয়কে বিশিষ্ট করতে কোনো নতুন সম্মান বা খেতাব—হয় রূপকর্বর্জিত বা রূপকাণ্ডী—তার ওপর চাপিয়ে

দেয়া হয়নি। কিংবা তার আক্রান্তের পাশে তাকে ডেকেও পাঠানো হয়নি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, দাক্ষিণাত্যে তিনি এত দিন ধরে ক্ষমতার যে বুনিয়াদ সুদৃঢ় করেছিলেন কান্দাহার অভিযুক্ত দীর্ঘ যাত্রা তাকে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং তাকে আক্রম্য করে তুলবে। একই সাথে এটা কোনোভাবেই তার নজর এড়িয়ে যাবার কথা নয় যে, নূরের অবস্থানের ক্ষমতা আরো অধিকতর বর্ধিত করা হয়েছে। জাহাঙ্গীর তাকে তার মরহুম আক্রান্তান্তের সমুদয় অর্থ আর জমি উপহার দিয়ে, প্রচলিত প্রথা উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রথা অনুসারে এমন সম্পদসমূহ স্মাজ্জ্যের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাতে করে মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যের ভেতর স্বাটের মর্জিমাফিক সেগুলোর বিলি-বণ্টন করা যায়। তদপেক্ষা ইঙ্গিতপূর্ণ, দরবারের আনুষ্ঠানিকতায় জাহাঙ্গীর যখন তার নিজের ঢাক বাজাবার অব্যবহিত পরেই তার ঢাক বাজাবার আদেশ দেন। শাহজাহানের কাছে এটা অবশ্যই মনে হতে পারে যে, মমতাজকে পাশে নিয়ে তিনি যখন দূরবর্তী একটি অভিযান থেকে পরবর্তী অভিযানের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফায়দা নিয়ে নূর লাভবান হচ্ছেন, সরকারের ওপর তিনি তার ইতিমধ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠা নিয়ন্ত্রণ আরো শক্ত করছেন। পরবর্তী সময়ে, শাহজাহান যখন স্বাটের অভিযানে অবিস্কৃত হন, তার আনুষ্ঠানিক দিনপঞ্জি রচয়িতারা স্বাটের অনুযায়ী থেকে বঞ্চিত হবার জন্য দরবারের অম্বাত্যদের দ্বারা করেছেন, ‘যাদের সততার মোহরে খাদ রয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তারা ঈর্ষার নিপীড়নে জর্জরিত’ এবং যারা জাহাঙ্গীরকে তার পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেইসাথে প্রকৃপিত করেছে ‘চক্রান্ত আর বিশ্বজ্যুলার স্বাক্ষর, যা পরবর্তী চার বা পাঁচ বছর হিন্দুস্তানে জুলতে থাকে।’ লেখক যদিও কোনো নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু তিনি স্পষ্টতই নূর আর তার অনুগত চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। শাহজাহানের অনুরোধের প্রতি জাহাঙ্গীরের উত্তর, নূরের ইঙ্গনে সন্দেহ নেই, ছিল অকরূপ। ‘তার প্রতিবেদন পাঠ করে, আমার প্রতিবেদনের অঙ্গনিহিত অর্থের রচনাশৈলী বা সেখানে পেশ করা তার অনুরোধ পছন্দ হয়নি এবং অন্যদিকে সেখানে অসমানের ইঙ্গিত স্পষ্ট...’ তিনি লেখেন। নূর এবং শাহরিয়ারকে দেয়া ভূসম্পত্তি শাহজাহান কর্তৃক জন্ম করার সংবাদ জানতে পেরে জাহাঙ্গীর আরো দ্রুত্ব হয়ে উঠেন এবং শাহরিয়ারের আর তার লোকেরা এমনভাবে প্রকাশ্যে ঝগড়া করে, যার ফলে ‘উভয় পক্ষের অনেকেই নিহত হয়েছে।’ তার পুত্রের ‘মন বিকৃতির শিকার’ হয়েছে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাট ‘তার কাছে তাকে আসতে নিষেধ করেন, কিন্তু কান্দাহারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তার কাছ থেকে যা চাওয়া হবে সেই পরিমাণ সৈন্য প্রেরণের আদেশ দেন। আমার আদেশের অন্যথা যদি সে করে তাহলে পরে তাকে এ জন্য অনুতঙ্গ হতে হবে।’ বিশুরু আর যিটথিটে মেজাজে, জাহাঙ্গীর পাঁচ বছর পূর্বে শাহজাহানের ছেলে শাহ সুজার ভীষণ অসুস্থতার সময় সুজার সুস্থতার পরিবর্তে তিনি শিকার ছেড়ে দেয়ার যে শপথ করেছিলেন সেটা ত্যাগ করে, লেখেন,

(‘শাহজাহানের) নির্দয় আচরণ আমাকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে, আমি আবার বন্দুকের সাথে সর্ব্ব আরম্ভ করি।’ ১৬২২ সালের আগস্ট মাসে কান্দাহার অভিযানের নেতৃত্ব ‘আমার প্রিয়পুত্র’ শাহরিয়ারকে অর্পণের সিদ্ধান্ত ছিল তার অসম্ভোষের আরো মারাত্মক ইঙ্গিতবহু। উৎফুল্ল নূর সেদিনই এক জোড়া ‘অমূল্য’ তুর্কি মোতি তার স্বামীকে উপহার দেন। সিংহাসনের সম্মান্ত্বয় উত্তরাধিকারীর ঐতিহ্যবাহী জায়গিন, হিসার ফিরোজগু, যা চৌদ বছর পূর্বে জাহাঙ্গীর পুত্র শাহজাহানকে প্রদান করেছিলেন, তার কনিষ্ঠ পুত্রকে অর্পণ করেন। স্মার্টের অভিধায়ের এর চেয়ে স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ আর হতে পারে না।

শাহজাহান নিজের সীমা অতিক্রম করার বিষয়ে নির্ভুলভাবে আঁচ করতে পেরে তার আকাজানের কাছে দৃঢ় প্রকাশ করেন এবং ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে বিমৃঢ় হয়ে পড়েন। জাহাঙ্গীর লেখেন, ‘আমি তাকে কোনো গুরুত্বই দিই না এবং তাকে কোনো ধরনের অনুযোগ দেখাই না।’ বহু বছর পূর্বে খসরুর বিরুদ্ধে তিনি যেমন নিজের ঘনকে শক্ত করে ফেলেছিলেন, তিনি এবার তেমনই তার পুত্রদের ভেতরে সবচেয়ে প্রতিভাবান আর একদা সবচেয়ে প্রিয়তম পুত্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। দুর্দেব-নির্ধারিতই বোধ হয়, তিনি তার আকাজান, আকবরের বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহ মন্তব্যিত করেছিলেন শাহজাহানের এখন প্রায় সেই বয়স—তিশ বহুবৃদ্ধি এই বিষয়টি সম্ভবত তারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

১৬২২ সালের শেষ দিকে মহতাজ একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন কিন্তু নামকরণ করার সুযোগ পাবার পূর্বে প্রেরিত প্রেরিতকাতক শিশুটি মৃত্যুবরণ করে। সন্তান মৃত্যুজনিত বিষাদ এবং তিনি যদি নিচায়ক কোনো পদক্ষেপ না নেন তাহলে তার পরিবারের কী হবে সেই সমক্ষে ত্রুট্যেই বাড়তে থাকা থয়, সম্ভবত শাহজাহানের পরবর্তী পদক্ষেপের পেছনে কাজ করেছে—প্রকাশ্য বিদ্রোহ। বিদ্রোহ একটি বিপজ্জনক যুদ্ধকোশল যা সর্তক চিন্তাবন্ধন ছাড়া তিনি হয়তো প্রয়োগ করতেন না, কিন্তু শাহজাহান জানতেন তার আকাজানের ক্ষমতা ত্রুট্যেই ছাঁস পাচ্ছে এবং তার নিজের মতো আরো অনেকেই স্মার্টের ওপর নূরের প্রভাবে স্ফুর্ক ছিলেন এবং তার অনুকূলে সমর্থন ঘোষণা করতে হয়তো বাধ্য হবেন। তিনি একই সাথে নিচিতভাবে জানতেন যে, দাক্ষিণাত্য আর গুজরাটের, তিনি সেখানকার সুবেদার, আমির আর ওমরাহদের আনুগত্যের ওপর নির্ভর করতে পারেন। ১৬২৩ সালের জানুয়ারি মাসে শাহজাহান অবশ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহতাজ আর তাদের সন্তানদের এবং সমর্থকদের একটি বাহিনী নিয়ে মানদু থেকে উত্তর দিকে আগ্রার উদ্দেশে রওনা দেন। বিদ্রোহের জন্য তহবিল প্রয়োজন আর কান্দাহার অভিযান অর্থায়ন করতে আঘা দুর্গ থেকে লাহোরে রাজকীয় তহবিল প্রেরণের যে সংবাদ তার শুশ্রারো নিয়ে এসেছিল তার অভিধায় হলো সেই তহবিল দখল করা। কিছু ভাষ্য অনুসারে, মহতাজের আকাজান, আসফ খানই ছিলেন সংবাদদাতা, যিনি গোপনে তহবিল চালানের বিষয়টি সম্বন্ধে তাকে অবহিত করেছিলেন।

আসফ খান নিশ্চিতভাবেই বাড়তে থাকা উদ্বেগের সাথে ঘটনাবলির উপর নজর রাখছিলেন। তিনি তার আক্ষণ্যের সম্পদের কিছুই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেননি—তার ভগিনী নূর সব কিছু পেয়েছেন। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, জাহাঙ্গীরের প্রশংসনের বলয় থেকে তার জামাতাকে নিজের জামাতার দ্বারা উচ্ছেদ করতে নূরের নির্লজ্জ কৌশল প্রয়োগের অর্থ একটিই যে তার প্রিয়তমা কন্যা মমতাজ নন বরং তার মেয়ে লাডলিই স্মাজী হবেন। আসফ খান অনেক বেশি দক্ষ আর কুশলী অম্বাত্য হবার কারণে তখনই প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকেন, কিন্তু পরবর্তী স্ম্রাট হিসেবে তিনি যে যুবরাজকে দেখতে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী তাকে খানিকটা গোপন সহায়তা প্রদান করাই তার কাছে সম্ভবত বিচক্ষণ মনে হয়েছে।

রাজকীয় তহবিল প্রেরণের সংবাদ যে শাহজাহান জানতে পেরেছেন এবং আগ্রা অভিমুখে এগিয়ে আসছেন সেই সংবাদ জাহাঙ্গীরকে আরো ত্রুট্য করে তোলে যিনি ঘোষণা করেন যে তার বিদ্রোহী সন্তান ‘সর্বনাশের পথে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে।’ তার মনে লোডের আগুন জ্বলে উঠেছে’, তিনি ক্রোধে উন্মুক্ত হয়ে উঠেন এবং তিনি ‘তার হাত থেকে আত্মসংযমের লাগাম পড়ে যেতে দিয়েছে।’ জাহাঙ্গীর তাকে মোকাবিলা করতে দক্ষিণ দিকে বাঁক নেন, ‘কান্দাহারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম’ বাতিল করেন, যা গত জুনেই চিঠি চালাচালির মাধ্যমে, যেভাবেই হোক শাহ আকবাসের দখলে ছল গেছে। জাহাঙ্গীর প্রথাগত শিষ্টাচারের বাড়াবাড়িতে তরা একটি সৰ্বায় শাহকে ‘সিদ্ধত্বপ্রাপ্ত আর ভাবীকথনের চমৎকার পরিচর্যাকারী’ হিসেবে সমোধন করেন কিন্তু পুরো চিঠিতে সৃষ্টি অপমানের হল মিশিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাতে চান তিনি লোভী আর ধনসম্পদ আঁকড়ে ধরতে উদ্বোধন। জাহাঙ্গীর শাহ আকবাসকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি কান্দাহারের মতো ‘নগণ্য একটি গ্রামে’ গেছেন? নিশ্চিতভাবেই এটা তার মর্যাদার সাথে মানানসই নয়।

‘আমার নিজের দুর্ভোগের কথা আমি আর কী বলব?’ জাহাঙ্গীর তার পথভ্রষ্ট সন্তানকে শায়েস্তা করতে রওনা দেয়ার সময় রোজনামচায় অভিযোগ লিখে রাখেন। ‘যদ্রুণ আর দুর্বলতার মাঝে, উক্ত আবহাওয়ায় যা আমার আশ্বের জন্য ভীষণভাবে অনুপযুক্ত, আমাকে এর পরও অবশ্যই ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে এবং সক্ষম থাকতে হবে আর এভাবেই এমন অবাধ্য পুত্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হবে।’ তিনি আদেশ দেন, শাহজাহানকে এখন থেকে বাদোলত—‘বদমাশ’—বলে সমোধন করা হবে এবং তার পুত্রের অকৃতজ্ঞতার জন্য তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন : ‘তাকে প্রদর্শিত অনুগ্রহ আর সহানুভূতি বিবেচনা করে আমি বলতে পারি, আজ পর্যন্ত কোনো স্ম্রাট তার পুত্রকে এত কিছু দেননি।’

জাহাঙ্গীর আগ্রায় শাহজাহানের আক্রমণ সময়মতো প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। তার ছেলে শহরে মুঠরাজ করে কিন্তু দুর্গ কিংবা কান্দাহার অভিযানে প্রেরণের জন্য অপেক্ষমাণ তহবিল দখল করার প্রয়াস সফল হয় না। জাহাঙ্গীরের

মন্ত্রীবর্গ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে দুর্গ থেকে অর্থ তহবিল প্রেরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা এর পরিবর্তে দুর্গের লাল পাথরের বুরুজগুলো আর পুরু তোরণধারের শক্তি বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগ নিবন্ধ করেন, যা আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদের সাহায্য করবে। শাহজাহান সাফল্যের অভাবে আশাহত হলেও হতোন্দয় না হয়ে তার বাহিনীকে চক্রকারে ঘুরিয়ে উত্তরে দিয়ে অভিযুক্ত পরিচালিত করেন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে আওয়ান রাজকীয় বাহিনীকে মোকাবেলা করতে। অনেকেই তখনে বিদ্রোহের সমীপরেখায় দ্বিধাদন্তে দুলতে থাকে, তরুণ আর তেজস্বী শাহজাহান তার বর্ষায়ান পিতার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবেন বলেই যেন প্রতীয়মান হয়।

১৬২৩ সালের ২৯ মার্চ, দুই বাহিনীর, ৫০,০০০-এর অধিক হবে সম্মিলিত জনবল, করকটে খোপ আর পাথর পড়ে থাকা নিচু আর মরুময় পাহাড় দ্বারা বৃত্তাবৃত্ত অনুর্বর সমভূমির মাঝে সংর্ঘ্য হয়। শাহজাহান কিংবা অসুস্থ জাহাঙ্গীর দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে অবর্তীর্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সামনের দিকে অবস্থানরত জাহাঙ্গীরের বাহিনীর অধিপতি স্বপক্ষ ত্যাগ করে ১০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে তার সাথে যোগ দেয়ার ঘটনা সত্ত্বেও শাহজাহানের বাহিনী প্রত্যাশার বিপরীতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং তার সেনাপতিদের অনেকেই নিহত হন। অদ্টের পরিহাস, রাজকীয় বাহিনীর একটি অংশের নেতৃত্বে ছিলেন আসফ খান কিস্ত জাহাঙ্গীর সেনিন বীরত্বের জন্য যাদের পুরস্কৃত করেছিলেন তাদের ভেতর তিনি ছিলেন না। স্বার্ট হয়তো ইতিমধ্যে আসফ খানের স্বার্টকারের আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণে বিব্রতবোধ করতে শুরু করেছিলেন।

রাজস্থানের ভেতর দিয়ে শাহজাহান আর মমতাজ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পালিয়ে যান, মেওয়ারের (উদয়পুর) মস্তুন রানা করণ সিংহের কাছে, সেই বন্য পাহাড়ি বালক, শাহজাহান তার পিতাকে প্রাণস্থ করার পর নয় বছর পূর্বে যার দরবারে আগমন জাহাঙ্গীরকে দারুণ আনন্দ দিয়েছিল। তারা অঙ্গায় একটি আশ্রয়স্থল খুঁজে পান। তরুণ রানা, দরবারে অবস্থানের সময় শাহজাহানের সাথে যার স্বর্য গড়ে উঠেছিল, চার মাসের জন্য তার অতিথিদের একটি চমৎকার গম্বুজবিশিষ্ট মর্মরের মহল—গুল মহল—খাকতে দেন, যা তিনি সম্প্রতি উদয়পুরে ঝিকমিক করতে থাকা স্বচ্ছ পানির হৃদে অবস্থিত দ্বীপে নির্মাণ করেছিলেন। শাহজাহান, মমতাজ আর তাদের ছয় সন্তান সেখান থেকে চারপাশের পর্বতের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন তীব্রতর হচ্ছিল তখন খানিকটা হলেও স্বত্ত্ব খুঁজে পান।

লৌকিকতার স্বার্থে, ১৬২৩ সালের মে মাসে, জাহাঙ্গীর শাহজাহানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের দায়িত্ব তার বিভীয় পুত্র পারভেজের ওপর ন্যস্ত করেন, কিন্তু এর আসল সেনাপতি ছিলেন তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত আর ছেলেবেলার বন্ধু মহবত খান, যিনি শাহজাহানেরও শিক্ষক ছিলেন এবং মোগল দরবারে সমৃদ্ধি লাভকারী পারস্যের আরেকটা পরিবারের সদস্য। জাহাঙ্গীরের আদেশ ছিল অন্ন কথায় নির্মম। শাহজাহানকে ধাওয়া করবেন মহবত খান এবং তাকে জীবিত

অবস্থায় বন্দি করবেন বা সেটা করা যদি কঠিন হয় তাহলে তাকে হত্যা করবেন।

অবশ্য নূর ছিলেন শাহজাহান আর মমতাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক আর কৃতসংকল্প প্রতিপক্ষ। নূর যদিও তার আকাজানের পরামর্শ থেকে বঞ্চিত এবং তার ভাই আসফ খানের আনুগত্য সম্বন্ধে অনিচ্যতা বৃদ্ধি লাভ করলে তিনি জাহাঙ্গীরের অধিষ্ঠাত্র আছা আর অনুরাগিক লাভ করেন। নূরের বয়স তখন চালিশের কোটার শেষের দিকে। এক ইংরেজ পর্যটক লক্ষ করেছেন, ‘স্মাট আর তার অম্যাত্যরা নিজেদের রমণীদের যত্ন নেন, কিন্তু তাদের বয়স ত্রিশ অতিরিক্ত করার পর এতে খুব সামান্য লাভ হয়’, সেখানে স্মাটের ওপর তার প্রভাব সত্যিই লক্ষণীয় এবং তার সৌন্দর্যের দীপ্তির সাথে তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয়, বৃদ্ধিদীপ্ত ও ঝজু বৈশিষ্ট্য এ জন্য দায়ী। তিনি বন্ধুত্বক্ষে সেই বছরের সেক্টেম্বরে দাদি হন সুদর্শন কিন্তু জড়বুদ্ধির শাহরিয়ার আর তার কন্যা লাডলি যখন একটি কন্যার জন্ম দেন। নাতনি জন্মাণ করার ফলে কোনো সন্দেহ নেই শাসন করার আকাঙ্ক্ষা তার আরো জোরাল হয়েছিল।

জাহাঙ্গীরের বাড়তে থাকা শারীরিক দুর্বলতার ফলে নতুন ক্ষমতা লাভ করা নূরের জন্য সহজ হয়েছিল। নিজের রোজনামাচা নিয়মিত লেখাই যখন তার কাছে রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠেছিল সেই সময় নূর তার দায়িত্বের বোধা প্রহণ করায় তিনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। স্মিন্স শীকার করেছেন, ‘দুই বছর পূর্বে শুরু হওয়া অসুস্থতা এবং যা এখন্মো ঠিক হয়নি, আবেগ আর বৃদ্ধি ঠিকমতো সমন্বয় হয় না। আমি এখন আর শুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর তার প্রতিক্রিয়া ঠিকমতো মনে রাখতে পারিনি না।’ তিনি তার এক অম্যাত্য মুতামদ খানকে যে ‘আমার মেজাজের বাইরে পরিচিত এবং আমার কথা বুঝতে পারে’ আদেশ করেন এখন থেকে সেই শুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির নথি রাখবেন এবং সাব্যস্ত করণের জন্য তার কাছে জমা দেবেন। ১৬২৩ সালের শ্রীমে জাহাঙ্গীরের মহিমাময়ী হিন্দু জননীর মৃত্যুর ফলে ত্রুটেই নির্ভরশীল হয়ে ওঠা স্বামীর ওপর নূরের কর্তৃত নিশ্চিতভাবেই জোরাল হয়েছিল।

মেওয়ার থেকে দক্ষিণে দক্ষিণাত্ত্বের দিকে শাহজাহান আর মমতাজ যখন অগ্রসর হন তারা শীঘ্ৰই তাদের প্রতি নূরের শক্রতার গভীরতা সম্বন্ধে জানতে পারেন। যুবরাজের বাহিনী বিপজ্জনকভাবে হাস পায় যখন অসংখ্য সমর্থক স্বপক্ষ ত্যাগ করে রাজকীয় বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন যমতাজ আর তার সন্তানদের জন্য একটি যথোপযুক্ত আশ্রয়স্থল তাকে নিশ্চিত করতে হবে। বুরহানপুরের নিকট, আসিরের বিশাল পাহাড়ি দুর্গ তিনি নির্বাচিত করেন যার নিয়ন্ত্রণভাবে যে গোত্রপতির অধীনে রয়েছে তার সাথে মমতাজের এক বোনের বিয়ে হওয়ায় তিনি তাদের সাহায্য করবেন বলে তিনি মনে করেন। এই বোন অবশ্য নূরের ভাইবী হবার কারণে তিনি যখন শাহজাহানের পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন তখন সেটা ভঙ্গুল করতে পদক্ষেপ নেন। গোত্রপতিকে হিঁশিয়ার করে তিনি নিজে চিঠি লেখেন : ‘সাবধান, বি-দৌলত (শাহজাহান) আর তার লোকজনকে তোমার দুর্গের

নিকটে আসার অনুমতি দেয়ার আগে হাজারবার চিন্তা করবে আর দুর্গের তোরণ এবং বুরুজ শক্তিশালী করবে আর নিজের দায়িত্ব পালন করবে আর এমন কিছু করতে যাবে না যাতে অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য অকৃতজ্ঞতা আর অভিশাপের কলঙ্ক কপালের তিলক হয়...।'

শাহজাহান তা সন্ত্রেও হৃষকি দিয়ে গোত্রপতিকে বাধ্য করেন তার দুর্গের তোরণঘার খুলতে কিন্তু তাকে আর তার পরিবারের পশ্চাদধাবনকারী রাজকীয় বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হতে থাকায় এর শক্তিশালী দেয়ালের নিরাপত্তা বেশি দিন অতিবাহিত করে না। দুর্গের নিয়ন্ত্রণ বিশ্বস্ত এক রাজপুতকে দিয়ে শাহজাহান তার পরিবার নিয়ে বুরহানপুরের বারো মাইল দক্ষিণে যান যেখান থেকে তিনি মহবত খানের উদ্দেশে সন্তুষ্য শাস্তি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। আলোচনা বখন ব্যর্থ হতে, তিনি আর তার পরিবার তাণ্ডি এবং বর্ষার বৃষ্টিতে ফুলে-ফেপে ওঠা আরো অনেক বিপজ্জনক ধরন্মোত্তা নদী অতিক্রম করে দক্ষিণে আরো দুর্গম পথে যাত্রা করে। তিনি দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় সুলতানদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু তারা ঝুঁত্বাবে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। মোগল সাম্রাজ্য যেকোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে আগ্রহী গোলকুণ্ডার শাসকই কেবল খানিকটা হলেও সহায়তা করেন, নিজের প্রাভুর শক্তি আর তার সোকজনকে নিজের রাজ্য অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব দিকে উড়িষ্যায় যেতে দেন, পাহাড় আর জলাভূমির ডেতের দিয়ে এই যাত্রাকালীন সময়ে, ভারতীয়দের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি, বৃষ্টি আর কাদায় পর্যন্ত সুলতা 'অনেক কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়' যার ফলে শাহজাহানের আরো অসুস্থ সমর্থক তাকে ছেড়ে চলে যায়।

শাহজাহানের ভাগ্য অচিরেই সম্পন্ন হয় যখন উড়িষ্যার সুবেদার, নূর আর মহতাজ উভয়ের আত্মীয় সম্মতিকৃত ভাই, তার আগমনের সংবাদে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে তিনি সব কিছু পেছনে ফেলে পালিয়ে যান। শাহজাহান সুবেদারের বিপুল ঐরুপ বাজেয়ান্ত করেন, নিজের বাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং রণহস্তী, ঘোড়া, কামান আর নতুন নিয়োগ করা সৈন্য নিয়ে বাংলা আর বিহার অভিযুক্তে অগ্রসর হয়ে বেশ কয়েকটা শুরুত্পূর্ণ শহর দখল করে সেখানকার অভিজাতদের তার সাথে মিত্রতা করতে বাধ্য করেন। ১৬২৪ সালের বসন্তকালে, শাহজাহান গঙ্গার তীরে বাংলার সুবেদার, নূরের চাচাজানকে রক্ষক্ষয়ী একটি যুদ্ধে নিহত করেন। নিহত সুবেদার গোলাপের আতরের অবিক্ষেপকরণে খ্যাতিমান নূরের আশ্চিজানের কেবল ভাই-ই ছিলেন না, তিনি একই সাথে সম্পর্কে মহতাজের নানাজানও হতেন। ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে মহতাজের পলায়নচেষ্টা মাঝেমধ্যে তার কাছে নিশ্চয়ই দাবার অস্তুত খেলার মতো মনে হতো যেখানে মূল চরিত্রের যারা হয় নিশ্চিহ্ন হয়েছে বা উন্নতি লাভ করেছে, তাদের অনেকেই তার নিকট আত্মীয়।

মহবত খান পুনরায় শাহজাহানের খুব কাছাকাছি এসে পড়েন এবং তাকে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত করেন। যুবরাজ আর তার পরিবারের কাছে এরপরে গোলকুণ্ড অভিযুক্তী আঁকাবাঁকা ফিরতি পথে গমন করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। শাহজাহান আরো একবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে এসে

অপ্রত্যাশিত একজন মিত্রকে খুঁজে পান। আহমেদনগরের মালিক আষার, জাহাঙ্গীরের পক্ষে যাকে শাহজাহান দুবার পরাজিত করেছিলেন সেই প্রাক্তন আবিসন্নিয়ান ক্রীতদাস, ‘রাজকীয় শাসনব্যবস্থার প্রতি একই বৈরিতার ভিত্তিতে’ শাহজাহানের বাহিনীর সাথে যোগ দিতে উদ্দৃষ্ট হয়ে ছিলেন। এই পোড় খাওয়া গেলিলা যোদ্ধা আপন শাস্তিসঞ্চার জন্য শাহজাহানের বিদ্রোহকে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করায় দারক্ষণ খুশি হন। তারা একত্রে একাধিক আক্রমণ পরিচালনা করে রাজকীয় বাহিনীকে পর্যন্ত করে তোলেন।

১৬২৫ সালে অবশ্য এক দিনপঞ্জি রচয়িতা যেমন উল্লেখ করেছেন, শাহজাহান ‘সহসা অসুস্থতায় আক্রান্ত হন’ এবং বুঝতে পারেন তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। মহবত খান তিন বছর ধরে রাজস্থানের মরুভূমির ওপর দিয়ে—দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে, পূর্বে উড়িষ্যা এবং বাংলায়, সেখান থেকে পেছনে আরো একবার আগ্রার অভিমুখে তারপরে আবার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত মঞ্চস্থ হওয়া ইন্দুর-বিড়াল খেলায় তাকে আর তার পরিবারকে হাজার মাইল পথ ধাওয়া করেন। শাহজাহান তার আকবাজানের বাহিনীর সাথে প্রথাগত যুদ্ধের সব সম্ভাবনা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু এর পরও যখনই তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাকে প্রতিবারই পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। একটি যুদ্ধে শাহজাহানের ঘোড়া তীরবিদ্ধ হলে তার একজন সেনাপতি যখন তাকে নিজের ঘোড়া দেন তখনই তিনি কেবল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হন। শাহজাহান আর তার সঙ্গীদের হাতকা আক্রমণ করার দক্ষতা, অস্তত মোগল মান অনুসারে, মূলত অনেকে বাত্তলাপূর্ণ পশ্চাধাবনকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়া থেকে তাদের রক্ষা করেছে।

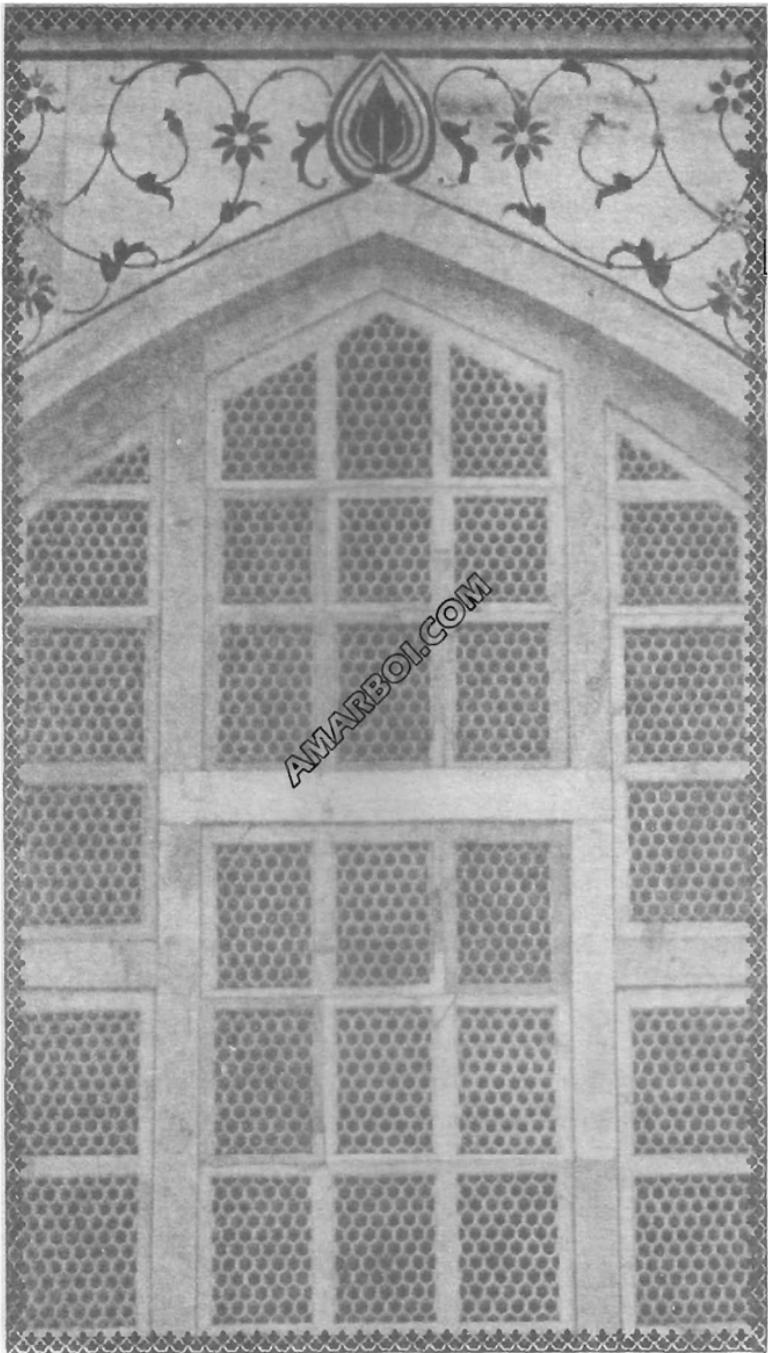
মহতাজ, এত দিন হারেমের আবৃত্তি-আয়েশে দিন অতিবাহিতকারী রমণী, এই পুরোটা সময় অবিচলভাবে তার পাশে অবস্থান করেছেন, কষ্টের অংশীদার হয়েছেন, ঠিক যেমন শাহজাহান যখন স্বার্যটের প্রিয়পুত্র ছিল তখন তার সাথে অভিযানে যাবার গৌরবের অংশীদার হয়েছিলেন। বিপদ আর কষ্টকর পরিস্থিতির মাঝে বসবাসকারী পরিবারটা খুব সামান্যই মিত্র খুঁজে পায়। তারা প্রায়ই, জাহাঙ্গীর সন্তুষ্টির সাথে যেমন লিখেছেন, নিজেদের ‘শোচনীয় অবস্থায় আবিক্ষার করেছে’, ‘ভারী বৃষ্টি আর কর্দমাক্ত পক্ষিলতার মাঝে’ বিশৃঙ্খল অবস্থায় পালাতে বাধ্য হয়েছে, যাতে ‘কোনো মালপত্র যদি পেছনে ছাড়া পড়ে তাহলে কোনো অনুসন্ধান করা হবে না এবং শাহজাহান আর তার সন্তানরা এবং তার ওপর নির্ভরশীল লোকজন তাদের জীবন বাঁচাতে পারার জন্য নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে।’ এই পরিস্থিতি আর চলতে দেয়া যায় না।

শাহজাহান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত নেন নিজেকে আর তার প্রিয়জনদের তার আকবাজানের করণ্পার সামনে সমর্পণ করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। তার পরিবারে এখন আরেকজন সদস্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৬২৪ সালে গঙ্গার তীরে যেখানে শবদাহের অস্ত্রোষ্টক্রিয়ার চিতার আগুন থেকে উঠিত ধোয়ার কূপ্তি অবিরাম আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, সেখানে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র শহর বেনারসের কাছে রোহতাসের দুর্গপ্রাসাদে জনগ্রহণকারী

পুত্র মুরাদ বকশকে। অসুস্থ আর হতাশ শাহজাহান ‘নিজের অতীত আর বর্তমানের সব তুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নিজের দুঃখ আর অনুভাপ ব্যক্ত করে’ তার আক্রান্তান্তের কাছে বার্তা পাঠান এবং উত্তরের জন্য শক্তি চিঠে অপেক্ষা করেন।

জাহাঙ্গীরের উত্তর প্রায় বিশ বছর পূর্বে খসরুর বিদ্রোহের সময়ের নির্মম প্রতিক্রিয়ার মতো ছিল না, অনেক বেশি আপসমূলক। নূর সন্তুষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শাহজাহান আর তার আক্রান্তান্তের মাঝে এতটাই বিচ্ছেদ যে মতপার্থক্যের একটি সত্যিকারের নিষ্পত্তি অসম্ভব এবং শাহজাহানের পক্ষে এখন আর মারাত্মক কোনো হৃষ্কির সুষ্ঠি করা অসম্ভব। তাকে হয়তো তার ভাই আসফ খানের বিরোধিতাও সতর্ক করে তুলেছিল। আসফ খান সন্তুষ্ট শাহজাহানের পক্ষে জাহাঙ্গীরকে নমনীয় করতে চেষ্টা করছিলেন। স্বার্ট সন্তুষ্ট তার পুত্রের সাথে শান্তি স্থাপনের সুযোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন একটি কারণেই, সেটা হলো, এমন একটি অভিযান বৰ্ক করতে, যা তাকে হাজার মাইলব্যাপী রসদ সরবরাহের রাস্তা বিস্তার করতে বাধ্য করেছে। তিনি নিজের হাতে চিঠির উত্তরে লেখেন, তিনি তার পুত্রকে কেবল ‘পূর্ণ ক্ষমাই প্রদর্শন করবেন না সেইসাথে মধ্য ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ বালাঘাটের সুবেদার হিসেবে তাকে নিয়োগ করছেন। একটি কাঁটা অবশ্য ছিল। শাহজাহানকে রোহতাস আর আসিরের দুর্গ, যা তখনো তার অনুগত বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে, অবশ্যই স্বার্টের হাতে তুলে দিতে হবে। তাকে সেইসাথে অবশ্যই দশ বছরের দারা শুকোহ আর সাত বছরের অন্তরে সজেবকে দরবারে পাঠাতে হবে মূলত পণবন্দি হিসেবে। জাহাঙ্গীর ধুক্কাটা সহনীয় করতে নিজের রত্নপ্রেমী পুত্রকে হীরকখচিত একটি রাজদণ্ডপ্রেরণ করেন।

শাহজাহান আর মমতাজের জন্য পুত্রদের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়াটা এমন পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই গভীর দুঃখজনক একটি অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের তখন পর্যন্ত জন্য নেয়া দশ সন্তানের তেতুর তিনজন ইতিমধ্যে মারা গেছে। একজন দিনপঞ্জি রচয়িতা বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘নিজের পুত্রদের প্রতি তার ভালোবাসা সত্ত্বেও’, শাহজাহান যিনি তখনে ‘তার দৈহিক দুর্বলতায়’ আক্রান্ত, তাদের নিজের আক্রান্তান্তের কাছে প্রেরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, তাদের সাথে তিনি ‘নকশা করা বন্দুক, হাতি আর রত্নপাথরের উপটোকন’ প্রেরণ করেন। পুরাতন তৈমূরীয় প্রথার ওপর শাহজাহান আর মমতাজ আঙ্গা রেখেছিলেন যে, এই বংশের যুবরাজদের রক্ত পবিত্র। অবশ্য তার সংভাই খসরুর সাম্প্রতিক ভাগ্যের কথা যে তারই তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় খুন হয়েছিল, পুনর্বিবেচনার পরে শাহজাহান অবশ্যই উৎকৃষ্টিত হয়েছিলেন।



AMARBOI.COM

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### প্রাসাদের আরাধ্য মালকিন

শাহজাহান আর আরঞ্জুমান্দ কার্যত তখন নির্বাসনে। তাদের তিন বছরের বিদ্রোহ প্রয়াস শারীরিক আর মানসিকভাবে তাদের নিঃস্ব করেছে, তাদের কাছ থেকে তাদের দুই পুত্রকে কেড়ে নিয়েছে এবং নূরের সাথে তাদের নিষ্পত্তির অযোগ্য বিরোধকে আরো প্রকট করে তোলা ছাড়া আর সামান্যই অর্জিত হয়েছে। সন্ত্রাঙ্গীর ক্রমেই মাত্রা ছাড়াতে থাকা উদ্ভিত আর স্বৈরাচারী আচরণ হয়তো অন্যদের ক্ষুক করে তুলবে, এটাই তাদের তখন একমাত্র আশা।

মহবত খান সে রকমই একজন ব্যক্তি। তার নিকটে শাহজাহান পরাজিত হওয়ায় তিনি এখন জাহাঙ্গীরের অভিজ্ঞাতদের ভেতরে সবচেয়ে প্রভাবশালী। তাকে অবশ্য এ জন্য ছাত্রিশ বছর বয়স্ক যুবরাজ পারভেজের সাথে দীর্ঘদিন একত্রে থাকতে হয়েছে, যেহেতু তারা দুজনে শাহজাহান আর তার পরিবারকে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আন্দ করার জন্য পশ্চাধাবন করেছেন। জাহাঙ্গীরের জীবিত সন্তানদের মেঝের বয়োজ্যেষ্ট হওয়ায় সিংহাসনের ওপর পারভেজের ভালো রকমের একটি দাবি এমনিতেই রয়েছে। তার অতিরিক্ত পানাসক্তি একটি দুর্বলতা বটে, কিন্তু মহবত খানের বিশ্বাস করার সংগত কারণ ছিল, তিনি স্ম্যাট হলে সে জন্যই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হবে।

পারভেজের ওপর মহবত খানের ক্রমেই বাড়তে থাকা প্রভাব, অবশ্য, নূর আর তার ভাই আসফ খান উদ্বেগের সাথে ঠিকই লক্ষ্য করছিলেন যাদের কারও পারভেজের উন্নতি দেখার কোনো আগ্রহই ছিল না। মহবত খানকে মেরুদণ্ডীন যুবরাজের কাছ থেকে পৃথক করতে তারা প্রথমেই জাহাঙ্গীরকে রাজি করান তাকে সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকের দূরতম প্রান্তে বাংলার সুবেদার হিসেবে নিয়োগ করতে। নূর আর তার ভাই একই সাথে শাহজাহানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের সময় হাতি আর ধনসম্পদ নয়-ছয় করার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করেন। মহবত খান তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে অনুমান করে স্ম্যাটের সামনে উপস্থিত হবার এবং অভিযোগের জবাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৬২৬ সালের মার্চ মাসে, মহবত খানকে ৪,০০০, বেশি রাজপুত যোদ্ধা সাথে নিয়ে কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকা থেকে প্রবাহিত সিঙ্গু নদের শাখানদী, খরস্ত্রোতা আর গভীর ঝিলম নদীর পূর্ব তীরে ধূলিধূসরিত রাজকীয় শিবিরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়, যেখানে কাবুলের উন্নত-পশ্চিম অঞ্চলে যাবার প্রাক্কালে জাহাঙ্গীর সাময়িক যাত্রাবিরতি করেছিলেন। জাহাঙ্গীর তার আগমনের সংবাদ জানতে পেরে আদেশ পাঠান যে, তাকে যাত্রা বিরতি করতে হবে এবং তার হাতির বহরকে আর সঙ্গে কয়েকজন পরিচারককে কেবল আগে পাঠাতে পারবেন। মহবত খান তখনো স্বার্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় যথাযথভাবে একটি অহ্বর্তী দল প্রেরণ করেন, যে দলে একজন তরুণ যোদ্ধা ছিলেন, যার সাথে তার কন্যার সম্প্রতি বিয়ে হয়েছিল। মহবত খানের জামাই যখন রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হন, সৈন্যরা তাকে সাথে সাথে বন্দি করে, নির্দয়ভাবে চাবুকপেটা করে এবং শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। তার বিরচন্দে একটিই অভিযোগ, তিনি স্বার্টের সম্মতি না নিয়ে বিয়ে করেছেন। শারীরিক জখমের ওপর বাড়তি অপমানের মতো, জাহাঙ্গীর নববিবাহিত দম্পতিকে মহবত খান বিয়েতে যে উপহার দিয়েছিলেন সেটা বাজেয়াঙ্গ করে রাজকীয় কোষাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।

মহবত খান যখন জানতে পারেন আসলে ~~ক্ষী~~ ঘটেছে, সেটা তার ভয়ের যথার্থতাকেই নিশ্চিত করে যে, নূর আর শার ভাইজান তাকে বরবাদ করার জন্য স্থিরসংকল্প। সে সিন্ধান্ত নেয়, ~~ক্ষী~~ একমাত্র আশা, জাহাঙ্গীরের সাথে সরাসরি দেখা করার সুযোগ লাভ ~~ক্ষী~~ এবং তাকে ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি আরোপিত অভিযোগ তার সামৃদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে অধীকার করা। জাহাঙ্গীর তার দিনপঞ্জি লেখার দায়িত্ব যে অভিজাত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করেছিলেন এবং যে নিজে একজন প্রত্যক্ষদশী, নথিবদ্ধ করেছে কীভাবে মহবত খান তার লোকজন নিয়ে ঝড়ের বেগে শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আবিক্ষার করে যে, রাজকীয় দরবারের মূল অংশ, যার ভেতরে আসফ খানের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা আর দেহরক্ষা বাহিনীর একটি বিরাট দল এবং ‘মালবাহী শকটের বহর, কোষাগার, অন্ত্রের আসল চালান এমনকি যেগুলো একেবারেই দেশীয়’, নদীর ওপর তৈরি করা নৌকার সেতুর ওপর দিয়ে ইতিমধ্যে ব্যস্ততার সাথে অতিক্রম করতে শুরু করেছে, যাতে তারা পরের দিনের যাত্রার সময় প্রস্তুত থাকে। জাহাঙ্গীর, নূর, শাহরিয়ার এবং তাদের একেবারে ঘনিষ্ঠ লোকজন যারা পরের দিন সকালে বাকি দলকে অনুসরণ করবে, তারাই তখনো নিজেদের তাঁবুতে অবস্থান করছে—অরাফ্শিত আর আক্রম্য।

এটা প্রায় অকল্পনীয় একটি পরিস্থিতি এবং স্বার্ট হৃষকি হিসেবে মহবত খানকে কতটা অকিঞ্চিতকর মনে করতেন তার একটি প্রমাণ। মহবত খান পরিণামের কথা বিবেচনা না করে সাথে সাথে একটি অভূত্বান সংঘটিত করেন। তিনি ২০০০ রাজপুত যোদ্ধাকে নৌকার সেতু পাহারা দিতে বলেন এবং যদি

প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা পুড়িয়ে ফেলবে রাজকীয় বাহিনীর তাদের প্রভূর প্রতিরক্ষায় দ্রুততার সাথে নদী অতিক্রম করা প্রতিরোধ করতে। তিনি এরপরে ধূলিধূসরিত একশ পদাতিক সৈন্যের বর্ণা আর ঢাল দ্বারা সজ্জিত একটি দলকে রাজকীয় তাঁবুর কাছে নিয়ে আসেন, যেখানে সামান্য যে কয়েকজন সৈন্য প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারা তখন তাদের ফজরের নামাজ আদায় মাত্র শেষ করেছে। জাহাঙ্গীরের দিনপঞ্জির রচয়িতা একটি বিশ্ময়কর দৃশ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। মহবত খান এখানে— সেখানে স্ট্রাটের খৌজে ঘোড়া নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন, যতক্ষণ না আড়াল থেকে রাজকীয় হামামের তাঁবুর প্রবেশপথের পাশে খোজাদের একটি দলকে তাকিয়ে থাকতে দেখেন এবং জাহাঙ্গীর ভেতরে রয়েছেন এই ভুল সন্দেহের বশবত্তী হয়ে তিনি তার পরিচারকদের তাঁবুর চারপাশের তত্ত্ব খুলে ফেলার আদেশ দেন।

হটগোলের শব্দ শুনে, জাহাঙ্গীর তার বাসস্থানের জন্য নির্ধারিত তাঁবুর অন্য একটি অংশ থেকে আবির্ভূত হয়ে সশন্ত রাজপুত যোদ্ধাদের ভিড়ের মাঝে উপস্থিত হন। মহবত খান স্ট্রাটের চোখেমুখে অবিশ্বাসের অভিযোগ ফুটে উঠতে দেখে নিজের কার্যকলাপের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। আপাতভাবে বলতে চেষ্টা করেন, যেহেতু ‘আমি নিজে নিশ্চিত হয়েছি যে আসফ খানের নিকুরণ ঘৃণা আর বিদ্যে থেকে পরিআশ পাওয়া অসম্ভব এবং সেইসাথে আমাকে লজ্জাজনক আর মর্যাদাহীনকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, আমি তাই মহামান্য জাহাপনার শরণে নিজেকে সাহসিকতা আর সাহস্যকারে নতজানু করছি। মৃত্যুদণ্ড অথবা অস্ত্র কোনো শাস্তি যদি আমার প্রাপ্য হয়, আদেশ দেন আপনার উপস্থিতিতে আমি যেন সেটা ভোগ করি।’ তিনি আক্ষরিক অর্থে যা বলেছিলেন সেটা সম্ভবত এত বিনয়ী বা তার বাচনভঙ্গি এত সুন্দর ছিল না এবং জাহাঙ্গীর যে তার বন্দি সে বিষয়ে দুজনের কারও মনেই সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। জাহাঙ্গীর তার কাঁধের ওপরে আপাতভাবে নিজের মাথায় ঘটকা দিতে দিতে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন—তার হাত দুবার নিজের কোমরের তরবারির বাটের দিকে এগিয়ে যায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পৃতিগন্ধয় সারমেয় সন্তানের নোংরা উপস্থিতি থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দেয়ার অভিপ্রায়ে। মহবত খানের প্রতি বিরুদ্ধ দিনপঞ্জির একজন লিপিকার পরে যেমন বলেছেন,—কিন্তু দুবারই তিনি নিজেকে নিরস্ত করেন। জাহাঙ্গীর এর বদলে তার প্রাক্তন বন্ধু আর বর্তমান বন্দিকর্তার প্রস্তাবে সাড়া দেন যে ‘ঘোড়া নিয়ে আমাদের বেড়াতে যাবার আর শিকার করার সময় হয়েছে; বরাবরের মতোই প্রয়োজনীয় আদেশগুলো দান করেন, যাতে আপনার দাসেরা আপনার তত্ত্বাবধানে বাইরে যেতে পারে এবং এটা যেন মনে হয় যে মহামান্য জাহাপনার আদেশে এমন সাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।’ জাহাঙ্গীর অবশ্য মহবত খানের ঘোড়ায় চাপতে অশীকৃতি জানান, কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে তার নিজের রাজকীয় স্ট্যালিয়ন নিয়ে আসতে বলেন।

দুটো তীরের যাত্রাপথের সমান দূরত্ব অতিক্রম করার পরে মহবত খান একটি রাজকীয় হাতির পিঠে স্থাপিত হাওদায় জাহাঙ্গীরকে ওঠার জন্য অনুরোধ করেন, প্রজারা যাতে সহজেই স্ট্রাটকে দেখতে পায় এবং নিজেদের বিশ্বাসকে মজবুত করে যে কোথাও কোনো কিছু বেঠিক নয়। রাজপুত যোদ্ধারা অবশ্য নেতৃত্বের পালাবদলের সময় জাহাঙ্গীরের দুজন পরিচারককে রাজপুত যোদ্ধারা হত্যা করে। তাদের বিশ্বাস যে তারা তারা নিজেদের প্রভুকে উদ্ধার করতে এসেছে। একটি ক্রমশ টানটান হতে থাকা পারিপার্শ্বিকতায়, অপহত স্ট্রাটকে দ্রুত মহবত খানের শিবিরে নিয়ে আসা হয়।

মহবত খান তার আতঙ্ক আর স্নায়বিক দৌর্বল্যতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটি বা বলা যায়, একজনকে—অবহেলা করেন। নূর তখনো রাজকীয় শিবিরের অবস্থান করছেন। তিনি যখন বুঝতে পারেন কী ঘটেছে তিনি বিদ্যুমাত্র সময় নষ্ট না করে দ্রুত নদীর তীরে পৌছান, যেখানে ঘটনাপ্রাবাহে মনে হয় মহবত খানের রাজপুত যোদ্ধারা শালীনতার কারণে কিন্তু অবিবেচনাপ্রস্তুতভাবে তাকে নদী পার হতে দেয়। নূর দ্রুত তার ভাই আসফ খানের তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হন, যিনি মহবত খানের আগমনের পূর্বেই নদী পার হয়েছেন এবং পর্দার রীতিনীতির তোয়াক্তা না করে, প্রধান অম্যাত্য আর আধিকারিকদের ডেকে পাঠান এবং নিজের জাই আর সাথে তাদেরও তৈরি ভাষায় ভঙ্গসনা করেন। ‘আপনাদের অরমেলোর কারণেই ব্যাপারটা এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং যা অকল্পনীয় ছিল তাই ঘটেছে। আগ্নাহতায়ালা এবং প্রজাদের সামনে আপনারা অপমানিত হয়েছেন।’ তার তিরক্ষারপূর্ণ বক্তৃতার পরে বিশ্বয়ের সামান্যই অবকাশের ধাকে, তারা পরের দিনই খিলম নদী পুনরায় অতিক্রম করার এবং তাদের স্ট্রাটকে উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেয়।

সমগ্র অভিযানই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মহবত খানের লোকেরা ইতিমধ্যে নৌকাসেতু জুলিয়ে দিয়েছে এবং রাজকীয় বাহিনী নদী পার হবার জন্য যে অগভীর অংশটা নির্বাচন করেছিল, জাহাঙ্গীরের দিনপঞ্জির এক রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, গভীর গর্তে পরিপূর্ণ, ‘সবচেয়ে প্রতিকূল পছন্দ।’ রাজকীয় বাহিনী নদী পার হবার জন্য পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে অসংখ্য মানুষ আর পশু আক্ষরিক অর্থেই পানিতে উল্টে পড়ে। তার চেয়েও বড় কথা, তারা যখন অপর তীরে যাবার জন্য প্রাণান্তকর পরিশৃঙ্গ করছে, তারা দেখে মহবত খানের সাত্তর বেশি রাজপুত যোদ্ধা তাদের বর্মসজ্জিত রণহস্তি নিয়ে ‘নিদ্রি বিন্যাসে’ সেখানে এসে সমবেত হয়েছে, তাদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে নাকনিচোবানি খেতে থাকা রাজকীয় বাহিনী এবার আতঙ্কে দিগ্বৰ্ভ হয়ে দিঘিদিকে ডেসে যেতে শুরু করে। সামান্য কয়েকজন গভীর পানি আর তীব্র স্তোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে যতক্ষণ না নদী পার হবার অন্যস্থানগুলোতে পৌছায় যেখানে রাজপুত যোদ্ধারা অনুপস্থিত। এই গুটিকয়েক সাহসী যোদ্ধা হাঁপাতে হাঁপাতে, ভিজে চুপচুপে আর ক্ষতস্থান

নিয়ে, তারা জাহাঙ্গীরকে সাথে নিয়ে একসঙ্গে যেখানে শাহরিয়ারকে, যে ইতিমধ্যে মহবত খানের হাতে বন্দি হয়েছে, সেই তাঁরুর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। সেই তাঁরুর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে, কিন্তু বেশির ভাগই নিহত হয়েছে। অন্যরা পালিয়ে যায়, যাদের ডেতরে আসফ খানও রয়েছেন, যিনি দ্রুত আকবরের নির্মিত একটি দুর্বেদ্য দুর্ঘের নিরাপত্তার মাঝে পালিয়ে আসেন।

রাজপুত যোদ্ধারা প্রায় দুই হাজার রাজকীয় সৈন্যকে হত্যা করে এবং আরো দুই হাজারের পালিতে সলিল সমাধি হয়। তাদের দেহ ঘোড়া আর হাতির মৃতদেহের সাথে হিম শীতল, ঘুরপাক খেতে থাকা, রক্তের ছোপছোপ দাগযুক্ত পালিতে একসাথে ভাসতে থাকে। রাজপুত যোদ্ধারা যথারীতি ভীতিকর প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রধানিত হয়েছে। ইউরোপীয় এক ভাড়াটে সৈন্যের ভাষ্য অনুসারে যার তাদের সাথে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে, ‘তারা সবাই আফিম সেবন করে এবং যুদ্ধের দিন তারা স্বাভাবিক মাত্রার দ্বিগুণ সেবন করে। তারা তাদের ঘোড়াকেও ধানিকটা পরিমাণ আফিম দেয় তাদের ক্লান্তি সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে... তাদের অনেকেই সোনার বাজুবন্ধ পরিধান করে, যাতে তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্র মৃত্যুবরণ করে তাহলে যারা তাদের মৃতদেহটা খুঁজে পাবে তারা যেন সেটার সংকুলে বন্দোবস্ত করে।’

নূর উচু একটি হাওদায় অধিষ্ঠিত অবস্থায় তার নাতনিকে কোলে নিয়ে এবং বাচ্চার আয়াকে পাশে বসিয়ে, নদী অতিক্রম করে আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তাকে লক্ষ্য করে নিষিক্ষণ বৃষ্টির মতো তীরের ঝড় সহ্য করেন এবং রাজপুত যোদ্ধারা তার হাতিকে লক্ষ্য করে বর্ণ নিষ্কেপ করলে সেগুলো প্রাণীটার পুরু চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করে। বাচ্চা মেয়েটা যখন—বা অন্য আরেকটা ভাষ্য মতে, আয়াটা—বাহুতে আঘাতপ্রাপ্ত হলে, নূর নিজ হাতে সেটা টেনে বের করেন এবং ছুড়ে ফেলে দেন আর সেটা করতে গিয়ে তার পরনের কাপড় রক্তে ডিজে যায় এবং রাজপুতদের তাদের আক্রমণের যথোচিত জবাব দিতে তীরভর্তি তিনটা তৃণীর তিনি তাদের ওপর শেষ করেন। তার হাতির মাহুত আহত প্রাণীটাকে নদীর অগভীর অংশ থেকে সরে নদীর গভীর অংশে যাবার জন্য তাড়া দেয় যেখানে জষ্ঠটা সাঁতার কাটতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত নূর আর তার দল রাজপুত যোদ্ধার উপস্থিতি মুক্ত নদীর দূরবর্তী তীরের একটি অংশ আয়ন্তে আনে। নদী পার হবার সময় রক্তাক্ত বিশৃঙ্খলা আর তার ভাই পালিয়ে গেছে জানতে পেরে, নূর মেনে নেন তার পক্ষে এখন আর তার স্বামীকে উদ্ধার করা অসম্ভব এবং মহবত খানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, বন্দি জাহাঙ্গীরের সাথে অবস্থান করতে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আসফ খানকে কয়েক দিনের ডেতরেই তার পাহাড়ি ডেরা থেকে টেনে বের করা হয় এবং কিছুদিন শিকল পরিয়ে রাখার পর তিনিও রাজকীয় বন্দিদের সাথে যোগ দেন।

রাজপরিবারের সাথে, বস্তুতপক্ষে সমগ্র রাজকীয় পরিবার-পরিজন, রাজপুত যোদ্ধাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু তখনো একজন অনুগত প্রজার ভান করা বজায় রাখায়, মহবত খান ২০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাবুলের উদ্দেশে যাত্রা করেন, জাহাঙ্গীরের মূল গন্তব্যস্থলের সাথে যার মিল রয়েছে। ১৬২৬ সালের মে মাসে রাজকীয় পরিপার্শ্ব যথন খাইবার গিরিপথের অন্যপাশে মাটির দেয়াল বেষ্টিত প্রাচীন শহর অতিক্রম করে, সাধারণ মানুষের কাছে সব কিছুই স্বাভাবিক বলে মনে হয়, যখন জাহাঙ্গীর দারুণভাবে সজ্জিত একটি হাতির ওপর থেকে বিস্ময়বিমূর্খ আর শ্রদ্ধাবান জনতার উদ্দেশে সোনার আর রূপার মুদ্রা ‘রীতি অনুযায়ী’ ছিটিয়ে দেয়।

কাবুলে অবস্থানের সময় পরবর্তী অবস্থিতির মাসগুলোয় এই বিচিত্র ভনিতা বজায় থাকে। মহবত খান আবেগের বশে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই জাহাঙ্গীরকে বন্দি করেন এবং আগামদৃষ্টিতে নিজে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার কোনো ভাবনা তার ভেতরে কাজ করছিল না। তিনি সম্ভবত নিজের এই ইঠকারী কাজের জন্য অনুত্ত কিন্তু এখান থেকে বের হবার কোনো উপায় তিনি খুঁজে পান না। জাহাঙ্গীর ইতিমধ্যে নূরের যত্নশীল নির্দেশনায় শান্তি আর নিরবচ্ছিন্নতার ছলনায় নিজের ভূমিকা ভালোমতোই পালন করেন, প্রজাদের উপস্থিতিতে মহবত খানের অনুরোধ উন্নয়নভাবে মেনে নেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মহবত খানকে পুনরায় আক্রমণ করেন যে, তার কোনো ক্ষতি করার অভিপ্রায় স্বার্যের নেই এবং নূরের ওপর নিজের পূর্ববর্তী সন্দেহের দায়ভার চাপিয়ে দেন। জাহাঙ্গীরের দ্বোজনামচার রচয়িতার ভাষ্য মতে, স্বার্যের তার সেনাপতিকে এমনকি সম্মতনও করে দেন যে, ‘তোমায় আক্রমণ করার অভিপ্রায় বেগমের রয়েছে। হঁশিয়ার।’ মহবত খান এমন আহ্বার পরিচয় পেয়ে স্বত্ত্বাবধি করে। তিনি নিজেকে বোধ হয় এমনই বোঝান যে, মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী স্তুর জোয়াল থেকে মুক্তি লাভ করে জাহাঙ্গীর খুশি।

নূর নীরবে আর ধৈর্যের সাথে মহবত খানের কাছ থেকে জোর করে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পুনরায় কেড়ে নেয়ার সুযোগের জন্য প্রতিক্ষেপ করেন। তার নিজস্ব রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনী রয়েছে, যা মহবত খান তাকে সাথে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই বাহ্যিক উপস্থিতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে আর বিরোধ পরিহার করতে। জাহাঙ্গীরের রোজনামচার লেখক যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, নূর তাদের মন জয় করার চেষ্টা করতেন, নিশ্চিত করতে যে, তিনি ‘তার রণকুণ্ড যোদ্ধাদের প্রশংসিত আর তাদের মন মেজাজ ভালো’ রাখতে পারে, খুব সম্ভবত ঘূরের প্রলোভনে তাদের স্বপক্ষ ত্যাগে নিরুৎসাহিত করতে। তিনি তার দ্বোজাদের সহায়তায় সেইসাথে গোপনে অর্থের বিনিয়য়ে বিপুল সংখ্যক ভাড়াটে পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈন্যের আনুগত্য ত্রয় করেন। ১৬২৬ সালের আগস্ট মাসে যখন আসন্ন শরতের শৈত্যপ্রবাহ এড়াতে রাজকীয় পরিপার্শ্ব পুনরায় কাবুল থেকে রুক্ষ খাইবার গিরিপথের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ-

পূর্বে লাহোরের প্রীতিকর উষ্ণতা অভিযুক্তে ফিরতি পথে পাঁচশ মাইল দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে, তখন তিনি তার কাজিক্ষত সুযোগ পান। নড়েস্বর নাগাদ তারা খিলম নদীর কাছাকাছি পৌছে যান, যেখানে মহবত খান তার সুযোগসঙ্গানী অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। নূরের পরামর্শে, জাহাঙ্গীর তার সেনাপতিকে বলেন, তিনি তার স্মাজীর অশ্বারোহী বাহিনী পরিদর্শনে আগ্রহী এবং তাকে নিজের বাহিনী সাথে নিয়ে আগে যাত্রা করতে বলেন নূরের মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে মহবত খানের হিন্দু রাজপুত যোদ্ধাদের ভেতরে, ‘যাতে কোনো ধরনের ঝগড়ার সূত্রপাত থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।’

নূর যেমন আশা করেছিলেন, অনিচ্ছিত আর ক্রমেই বিচলিত হয়ে ওঠা মহবত খান যা অব্যাহতিহীন একটি সংকটে পরিণত হয়েছিল, সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ নিতে পারেন। জাহাঙ্গীরের রোজনামচার লেখকের ভাষ্য অনুসারে, তিনি ইতস্তত না করে ‘তাকে যা করতে বলা হয়েছে করে’ এবং নিজের লোকদের নিয়ে রওনা হন। রাজকীয় বাহিনীর সাথে তার নিজের ব্যবধান বাড়তে থাকলে, সুশ্রা঵ অগ্রহাত্মা ক্রমেই আড়ষ্ট হড়োহড়িতে এবং তারপরে অমনোযোগী পলায়নে পর্যবসিত হয়। মহবত খান বাড়তি সতর্কতা হিসেবে সাথে করে কয়েকজনকে বন্দি করে নিয়ে যান, যাদের ভেতরে ছিল আসফ খান আর তার পুত্র। নূরের ক্ষমতা সম্পর্কে তার এতটাই ভয় ছিল যে, তিনি যখন মহবত খানকে তাদের মুক্তি দেয়ার আদেশ দেন তিনি তাঁকেরেন যখনই তার মনে হয় যে তিনি নিজের আর প্রতিশোধপরায়ণ স্মাজীর মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব আরোপ করছেন। নূর আধুনিক যুগে ক্ষেত্রের সাথে আলোচনা করার মতো, তাকে আক্ষরিক অর্থেই মানসিকভাবে পরামুক্ত করেছে।



শাহজাহান আর মমতাজ, আবারও গর্ভবতী, দক্ষিণে প্রায় হাজার মাইল দূরে, সেবারের গ্রীষ্মকালের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে যখন খবর আর শুঁজবের মাঝে, দুটোই তাদের কাছে বেশ কয়েক দিনের পুরাতন হওয়ায় পর পৌছাবার কারণে, পার্থক্য নির্ণয় করা দুর্ক হয়ে পড়ে। তাদের প্রধান দুচিন্তা ছিল অবশ্যই তাদের বন্দি দুই শিশুপুত্রের সন্তান্য বিপদ সম্পর্কে, যারা মহবত খানের অভ্যুত্থানের পরই তাদের দাদাজানের শিবিরে পৌছায়। মহবত খানের হাতে জাহাঙ্গীর বন্দি হবার কারণে একই সাথে শাহজাহানের সামনে তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নতুন সন্তানবনার সুযোগ সৃষ্টি করে। মহবত খানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রথমবার অবগত হবার পরে, শাহজাহান এক হাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করেন এবং ১৬২৬ সালের জুন মাসে জাহাঙ্গীরের সহায়তায় যাত্রা করেন—বা তার অত্তত এমনই ভাষ্য। তিনি আর মমতাজ অবশ্য যখন উত্তর দিকে দীর্ঘ আর কষ্টকর দ্রুণ করছিলেন তখন স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনায়

তাদের বাহিনীর লোকবল হ্রাস পায় এবং নিজেদের তারা, জাহাঙ্গীরের রোজনামচার রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, ‘মারাওক বিপর্য আর দারিদ্র্যের’ মাঝে দেখতে পান। শাহজাহান উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিক্কে অবস্থিত একটি বদর অবরোধ করার চেষ্টা করে নিজের জন্য একটি ঘাঁটির বন্দোবস্ত করতে সেখানের শাহরিয়ারের প্রতি অনুগত সুবেদার তার অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিলে তার পরিকল্পনা ভেঙ্গে যায়। অধিকস্তুতি তার দৌর্বল্যকর অসুস্থিতা, যা তার নিজের বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল এখন তাকে ব্রিত্ত করে। তিনি একটি পর্যায়ে এতটাই দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, কেবল খাটিয়ায় শুয়েই ভ্রমণ করতে পারতেন। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, তিনি আর মহতাজ রাজকীয় শিবিরে পৌছাবার আগেই, মহবত খান পালিয়ে যান এবং জাহাঙ্গীর আর নূর আবারও সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ নেন।

শাহজাহানের দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হবার কারণে আতঙ্কিত হয়ে আর তার আবাবাজানের জন্য কেবল উৎকর্ষার চেয়েও শাহজাহানের অভিধ্রায় আরো বেশি কিছু এমন সন্দেহ করে, নূর তাকে ফিরে যাবার আদেশ দেন। সমসাময়িক একজনের ভাষ্য অনুসারে, তিনি তাকে পত্র মারফত জানান যে, ‘তার অগ্রযাত্রা মহবত খানকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, যার বাহিনী এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে এবং যুবরাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরে পৌঁছে দিন বদলের জন্য প্রতিক্রিয়া করলেই বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে।’ শাহজাহান পারস্যে পালিয়ে যাবার কথা বিবেচনা করেন কিন্তু, শাহ আবাসেন্দুর কাছ থেকে কোনো রকম উৎসাহ না পেয়ে তিনি মহতাজকে নিয়ে অনুগ্রহ ভঙ্গিতে দক্ষিণে ফিরে যান। নূর এসব সন্দেহে তার অভিধ্রায় নিয়ে উঞ্চনো সন্দিহান থাকেন। তিনি দুই শক্তকে পরম্পরের মুখোমুখি দাঁড়াকরিয়ে তাদের নিঞ্চিয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে, মহবত খানকে আদেশ দেন শাহজাহান আবারও অগ্রসর হবার প্রয়াস নিলে তার পথরোধ করতে। মহবত খান অবশ্য এতটাকু বোঝার মতো বৃদ্ধিমান যে, সম্মাটকে বন্দি করার কারণে নূর তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবেনই। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তার পূর্বের লোকজন আর একসময়ের প্রতিপক্ষের সাথে যোগ দিলেই কেবল তার স্বার্থ ভালোভাবে রক্ষিত হবে।

মহবত খানের এমন চিন্তার পেছনে ১৬২৬ সালের অক্টোবরে শাহজাহানের আটাত্রিশ বছর বয়সী সংভাই পারভেজের মৃত্যু, নিঃসন্দেহে আরেকটা কারণ। সুরার প্রতি তার আসক্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, ‘যাবারের প্রতি ধীরে ধীরে তার মাঝে একধরনের অনীহা জন্ম নেয়।’ জাহাঙ্গীরের রোজনামচার লেখক বিষণ্ণ ভঙ্গিতে লিখেছেন, ‘তিনি মূর্ছা যাবার রোগে আক্রান্ত হন, যখন চিকিৎসকরা জলস্ত কাঠের টুকরো সহায়তা নেন এবং তার কপাল আর কপালের দুই পাশে পাঁচটি টুকরো রাখেন।’ পরিচর্যার এমন রীতি সন্দেহে, বা হয়তো এ জন্যই, তিনি অবশ্যে বুরহানপুর দুর্গে, যেখানে খসরুকে হত্যা করা হয়েছিল,

মৃত্যুমুখে পতিত হন। কয়েকজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক অনুমান করেন সংভাইয়ের মৃত্যুতে শাহজাহানের হয়তো কোনো হাত থাকতেও পারে, কিন্তু খুব সম্ভবত সুরার প্রতি বংশগত দুর্বলতাই এ ক্ষেত্রে দায়ী।

ঘটনা যা-ই হোক না কেন, পারভেজের মৃত্যুর ফলে এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে, তার দুই জীবিত পুত্রের মাঝে—শাহজাহান এবং তার অন্নবয়স্ক সংভাই, নূরের জামাতা, শাহরিয়ার—রাজসিংহাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিতা হবে। সেইসাথে এটাও স্পষ্ট যে, সেই বিরোধের শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। খাসকচ্ছে, হাঁপরের মতো দম নেয়া জাহাঙ্গীর ক্রমেই বৃদ্ধ হচ্ছেন। ‘কাশীরের বর্ষব্যাপী অতুলনীয় উদ্যানে’ কিছুকাল অবস্থানও তার স্বাস্থ্য উদ্বারে ব্যর্থ হয় এবং জাহাঙ্গীর সমভূমির উষ্ণতায় দেহমনের ক্লান্তি নিয়েই ফিরে আসতে, তার এমনকি গত চল্লিশ বছর ধরে সেবন করা আফিমের প্রতিও অরুচি জন্মে। তিনি বোধ হয় আঁচ করতে পারেন যে তার মৃত্যু আসন্ন। তার রোজনামচার রচয়িতার ভাষায় ‘নিরাশার সৌরভ’ তার ভেতর থেকে ক্ষরিত হতে থাকে। কৃষ্ণসার মৃগ শিকারের সময় পাহাড়ের ছড়া থেকে কুকুরের পালের এক রক্ষকের পড়ে যাবার দ্রুত্যে জাহাঙ্গীরের কাছে অগুড় লক্ষণ বলে মনে হয়, ‘মৃত্যুর ফেরেশতা যেন তিনি এইমাত্র দেখতে পেয়েছেন।’ তিনি দিন পঞ্চাশি ১৬২৭ সালের ২৮ অক্টোবর, সমভূমির ওপরে পাহাড়ের তার তাঁবুর ভেঙ্গের ভোরের প্রথম আলোর ধূসর কিরণ প্রবেশ করতে শুরু করলে, আটকে বছরের বৃদ্ধ ‘পৃথিবীর অধিকারী’ তার শেষ, কষ্টসাধ্য নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন। তিনি কোনো উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করে যাননি।

শোকার্ত, স্তম্ভিত নূর অভিজাতদের একটি সভা আহ্বানের চেষ্টা করেন কিন্তু সামান্য কয়েকজন এতে সাড়া দেয়। একটি নিষ্ঠুর কিন্তু পরিষ্কার সংকেত যে তার স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথেই তার ক্ষমতার অবসান হয়েছে। আসফ খান নিজের বোনকে কৌশলে পরাভূত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেন। ‘নূর মহলের কাছে অন্নবয়সী যুবরাজের নিরাপদ নয়’ এই অজুহাতে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য, তিনি তার নাতি দারা শুকোহ আর আওরঙ্গজেবকে সরিয়ে নেন। তিনি অনেক ভাবনা চিন্তার পরে এমন একজন অভিজাতের কাছে তাদের বিশ্বাস করে সমর্পণ করেন, যার সাথে তার এবং নূরের আরেক বোনের সাথে বিয়ে হয়েছে, যে বোনটা তাদের প্রীত কুলার জন্য ‘তাদের চারপাশে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াত।’ তিনি নূরকে তার তাঁবুতে প্রহরাধীন অবস্থায় রাখেন। আদেশ দেন যে কেউ যেন তার সাথে দেখা করতে না পারে এবং কাছে যাবার জন্য তার বারংবার অনুরোধ উপেক্ষা করা হয়।

আসফ খান, অবশ্য জটিল একটি পরিস্থিতির মাঝে অবস্থান করছিলেন। তার কন্যা মমতাজ আর শাহজাহান অনেক দূরে অবস্থান করছেন। তিনি যদিও

কালবিলখ না করে আর গোপনে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুসংবাদ তাদের জানাতে একজন বিশ্বস্ত হিন্দু বার্তাবাহককে নিজের সিলমোহরযুক্ত আঢ়ট দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাদের দ্রুত উন্নত দিকে যাওয়া করতে তাগাদা দিয়েছেন, তিনি জানেন শাহজাহানের কাছে পৌছাতে তার বার্তাবাহকের প্রায় বিশ দিন সময় লাগবে। আসফ খানকে, ইত্যবসরে নিশ্চিত করতে হবে যে, সেই সময় লাহোরে অবস্থানরত শাহরিয়ারকে কোনোভাবেই যেন সন্দ্রাট হিসেবে ঘোষণা করা না হয়। শাহরিয়ার লাহোরে এই আশায় গিয়েছিলেন যে, পাঞ্চাবের আবহাওয়ায় তার রোগের—সম্ভৱত কুঠ—উপসর্গ লাঘব করবে, যা কাশ্মীরে অবস্থানের সময় তাকে আক্রমণ করেছিল এবং ‘তার সম্মানহনির কারণ হয়েছিল’—তার দাঢ়ি, গোফ, জ্ব., চোখের পাপড়ি এবং দেহের বাকি সব চূল উঠে যাওয়ার ঘটনাকে সমসাময়িক সময়ে ভাবেই সুবচন প্রয়োগে বোঝানো হতো। এভাবে দেহের সব চূল উঠে যাবার ঘটনাকে লজ্জাজনক হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই, আসফ খান সমস্যার একটি ধূর্ত সমাধান খুঁজে বের করেন। তিনি তার সাথী অভিজাতদের বোঝান যে, শাহজাহান আর শাহরিয়ার দুজনেই দরবারে অনুপস্থিত থাকায়, শূন্যতা পরিহারের একমাত্র পথ হলো দাওয়ার বকসকে, খসরূর অঞ্জবয়সী এক ছেলেকে, যাকে নূর ‘বাড়তি সতর্কতা’ হিসেবে সম্প্রতি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন, সিংহাসনে আধিষ্ঠিত করা। আসফ খান এই চাল দিয়ে নিশ্চিত করেন যে, শাহরিয়ার যখন সিংহাসনের জন্য নিজের দাবি জানাবে—যা সে নিশ্চিতভাবেই করবে—তখন সে বিদ্রোহী আর জবরদস্থলকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবে। শাহজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে রাজকীয় বাহিনী সমবেত করা থেকে এটা তাকে বিরত রাখবে। আর দাওয়ার বকস, সে ছিল, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে তার রোজনামচার রচয়িতা লিখেছেন, ‘কোরবানি দেয়ার জন্য একটি ভেড়া।’ শাহজাহানের আগমন পর্যন্ত কেবল তাকে জবাই করা বিলম্বিত হবে। একজন ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক ধারণা করেন, তার সামনে ‘আশা কিংবা সুযোগ সামান্যই ছিল।’

দাওয়ার বকস ছিল একজন বুদ্ধিমান যুবক, যে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার প্রতি জাহাঙ্গীরের মতোই অবিষ্টতা ধারণ করত। জাহাঙ্গীরের রোজনামচার লেখকের বর্ণনা অনুসারে, সে বহু বছর আগে তার দাদাজানকে উপহার দিয়েছিল ‘একটি বাঘ, যার একটি ছাগলের প্রতি অস্বাভাবিক ভালোবাসা ছিল, যে তার সাথে একই ঝাঁচায় বাস করত। তারা এমনভাবে একসাথে সংসর্গ আর সঙ্গমে অভ্যন্তর ছিল যে, মনে হবে তারা বুঝি একই প্রজাতির প্রাণী।’ দাওয়ার বকস প্রথমদিকে সন্দিক্ষ ছিল, বিশেষ করে তার আবকাজানের পরিগতি সম্পর্কে অবহিত থাকায়, যে তাকে ‘একটি অলীক শাসকের দায়িত্ব’ গ্রহণ করতে জোর করে বাধ্য করা হচ্ছে। অবশ্য আসফ খানের মিষ্টি কথা আর তার দুক্ষর্মের

সঙ্গীদের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের ঘারা তারা অবশ্যে তাকে নিজেদের পথে নিয়ে আসতে পারে। ছেলেটা, কার্যত একজন বন্দি, ঘোড়ায় চেপে এবং আসফ খান আর তার শীর্ষস্থানীয় অভিজ্ঞাতদের ঘারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় শাহরিয়ারকে মোকাবিলা করতে লাহোরের উদ্দেশে রওনা দেয়ার পূর্বে, তাকে সন্ত্রাট হিসেবে ঘোষণা করার অনুমতি তাদের দেয়। নূর, তার মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে, এক দিন পরে যাত্রা করেন। আসফ খান কঠোর আদেশ জারি করেন, মৃতদেহ সমাধিস্থলে পৌছানো পর্যন্ত যাত্রাপথের প্রতিটি শুধু পদক্ষেপে তিনি যেন শবাধারের সঙ্গে থাকেন।

লাহোর, শাহরিয়ার বন্ততপক্ষে নূরের কাছ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত আর লাগসই চিঠি—শেষ চিঠি বন্দি হবার আগে সে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল—ঘারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তার স্ত্রী, নূরের কন্যা, লাডলির অনুরোধে, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেও সিংহাসন দাবি করে, শহরের রাজকীয় কোষাগার থেকে চুরি করা সত্ত্বে লাখ রূপি ব্যবহার করে সমর্থন ক্রয় করে এবং একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। আসফ খানের বাহিনী অবশ্য লাহোর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তারা দ্রুত তার অনভিজ্ঞ বাহিনীকে পরাজিত করে। এক তুর্কি ঝীলাদাস যুদ্ধেজ্জ্বল থেকে শহরের ঠিক বাইরে অনিচ্ছিতভঙ্গিতে বিচরণ করতে থাকা শাহরিয়ারের কাছে পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে দৌড়ে আসে। যুবরাজ লাহোর দুর্গে আশ্রয় নেয়, যার শীঘ্রই আক্রমণকারী বাহিনীর নিকট প্রস্তুত ঘটে। হারেমের শরণস্থল থেকে এক খোজা চুলহীন, ভয়ে কাঁপতে থাকা শাহরিয়ারকে টেনে-হিচড়ে বের করে আনে। আসফ খান তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং দুই দিন পর দৃষ্টিহীন করে দেন। দাওয়ার বকস, ইত্যবসরে দুর্গ প্রাসাদের শক্ত ঘাঁটিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বেশি দিন এটা তার দখলে থাকে না।

১৮ নভেম্বর দাক্ষিণাত্যের উত্তরে জুনারে শাহজাহানের কাছে আসফ খানের প্রেরিত বার্তাবাহক পৌছায়। শাহজাহান বার্তাবাহকের আগমনের সংবাদ জানতে পেরে হারেম থেকে দ্রুত বের হয়ে আসেন, যেখানে তিনি মমতাজের সাথে আলাপ করছিলেন। বার্তাবাহক শাহজাহানের সামনের মাটিতে নিজেকে অভিবাদন প্রকাশের ভঙ্গিতে শায়িত করে, সেখানে চুম্ব খায় এবং সে যা বলার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছে সেই গল্লের প্রমাণ হিসেবে আসফ খানের আংটি তার হাতে তুলে দেয়। শাহজাহান শালীনতা আর শিষ্টাচার অনুযায়ী চার দিনের শোক পালন করেন, কিন্তু ছেলেবেলায় আকবর মারা যাবার সময় কিংবা আট বছর পূর্বে যখন তার অত্যন্ত প্রিয় আমিজান মারা যান তখন তিনি যেমন মানসিক

যত্নগা অনুভব করেন সে রকম গভীর দৃংখের কোনো লক্ষণ আপাতভাবে প্রতীয়মান হয় না। পিতা আর পুত্রের মধ্যকার ভালোবাসার বক্ষন বহু পূর্বেই এক পাশে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিপর্যস্ত বলি আর অন্য পাশে সন্দেহের টানাপড়েনের মাঝে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

শাহজাহান অটিরেই উত্তরমুখী অভিযানের পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। শাহজাহান এবং মমতাজ, যিনি এই শুরুত্তপূর্ণ সময়ে আবারও গর্ভবতী, তার জ্যোতিষীদের ঘারা বিবেচিত মঙ্গলময় দিনে সিংহাসনে নিজের দাবি কায়েম করতে, মহবত খানের রক্ষীবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তারা যখন পথে রয়েছেন, শাহজাহান আসফ খানের কাছ থেকে শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে ‘বিজয় আর সাফল্যের শুভ সংবাদে পূর্ণ’ একটি বার্তা লাভ করেন এবং অনুয় করেছেন যে, ‘পৃথিবীকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে উদ্ধার করতে তার মহিমাপূর্ণ সফরসঙ্গীদের দ্রুততার ভানায় ভর করে অঞ্চল হওয়া উচিত।’ অন্যভাবে বলতে গেলে, তাকে দ্রুত অঞ্চল হতে ছাঁশিয়ার করছেন।

অল্লবয়সী পুতুল স্ট্রাটের সুতা কাটার সময় ঘনিয়ে আসে। শাহজাহান যত কম সম্ভব ভাগ্যের ওপর ভরসা করার সিদ্ধান্ত নেন। আগ্রার কাছাকাছি পৌছে, লাহোরে অবস্থানরত আসফ খানকে তিনি তার স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি পাঠান ‘যদি খসরুর সন্তান, দাওয়ার ~~বৃক্ষ~~, তার অপ্রয়োজনীয় ভাই (শাহরিয়ার) এবং যুবরাজ দানিয়েলের (~~বৃক্ষকাল~~ পূর্বে মৃত জাহাঙ্গীরের ভাই) পুত্রদের (দুজন), সবাইকে পৃথিবী থেকে~~বিতাড়িত~~ করা গেলে এর ফল হয়তো ভালোই হবে।’ তার শুঙ্গ-আবাজা~~বৃক্ষ~~ খুশি মনে, শাহজাহানের কাছ থেকে বার্তা পাবার মাত্র দুই দিন পরেই ~~প্রয়োজনকেই~~ হত্যার আদেশ দেন এবং বাড়ি সতর্কতা হিসেবে দাওয়ার বকসের ছেট ভাইকেও অন্য হতভাগ্যদের সঙ্গী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাদের সম্ভবত খাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল।\*

এক সংভাই, দুই ভাতিজা এবং দুজন আত্মায়সম্পর্কিত ভাইকে এভাবে নির্মমভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় দেয়ায় রাজকীয় সিংহাসনের জন্য তৈয়ার বংশীয় নিকটাত্মীয় প্রতিপক্ষের সবাইকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। শাহজাহানের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন দিনপঞ্চি রচয়িতা তার এই পদক্ষেপের পক্ষে সাফাই দেয়ার চেষ্টা করে বলেন, এটা ছিল হত্যা করার কিংবা নিজে নিহত হবার একটি প্রশ্ন। ‘আত্মরক্ষণ, মানবিক মানসিকতার প্রথম নীতি, যা প্রায়ই সহস্রয় যুবরাজদের নৃশংস শাসকে রূপান্তরিত করে এবং সে জন্যই প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ এমন সব পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়, যা হয়তো তাদের আত্মা ঘৃণা করে।’ একটি প্রাচীন মোগল প্রবাদে এই উভয় সংকট নিখুতভাবে ফুটিয়ে

\* অন্য সৃত অনুসারে, দাওয়ার বকস ব্রহ্মগঙ্কে পারস্যে পালিয়ে যান। জ্যা- ব্যাপটিস্ট ত্রেভার্নিয়ে, বিখ্যাত ফরাসি মণিকার, সেখানে তাকে দেবেছেন বলে পরবর্তী সময়ে দাবি করেন।

তোলা হয়েছে—‘তখন তঙ্গ’, ‘সিংহাসন বা শবাধার?’ অবশ্য, তৈমুরী বংশীয় যুবরাজদের নিরাপদ্মার পালিত নীতির এ অবমাননা এবং তার আগে খসরুর হত্যাকাণ্ডের কর্মফল শাহজাহানের কাছেই ফিরে আসে।

শাহজাহানের নিজের এবং তার বিশাল পরিবারের ভবিষ্যৎ সাময়িকভাবে যদিও নিচিত বলে মনে হয়। তাদের অঞ্চল্যাত্মা আচরেই গৌরবনীগু শোভাযাত্রায় পরিণত হয়, যখন তারা যেসব প্রদেশ দিয়ে অতিক্রম করছে সেখানকার সুবেদার এবং স্থানীয় গোপ্তার তাড়াহড়া করে এসে অভিবাদন জানান এবং উপহার দেন। ইংরেজ করণিক, পিটার ম্যানডি, যিনি সেই সময়ে ভারতবর্ষে অবস্থান করছিলেন, ফরাসি মণিকার ত্রেভার্নিয়ে ১৬৩৮ সালে যিনি প্রথমবার এখানে আগমন করেন এবং ভেনিসের পর্যটক নিকোলাই মানুচি ১৬৫৬ সালে যিনি সেখানে পৌছান, সবাই পুরো যাত্রাপথে নানা সম্ভাব্য নটকের ভীষণ বর্ণময় বিবরণ লিখেছেন, যা একাধিক কষ্টকল্পিত শক্তির কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। এমনই একটি গল্পের ভাষ্য অনুসারে, বিজাপুরের রাজা সিংহাসন দাবি করতে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করতে শাহজাহানকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু শাহজাহান গোপনে ছাগলের রক্ত গলধংকরণ করেন, যা রাজার সামনে মৃত্যুর রঙিন উদ্দীপক দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে তিনি বমি করেন। মমতাজ তখন ‘তার স্বামীর মৃতদেহ তার আপন দেশে সমাধিস্থ করার জন্ম বয়ে নিয়ে’ যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাকে অনুমতি দেয়া হয় এবং ‘কালো দিয়ে আবৃত একটি শবাধারে’ খুবই জীবন্ত শাহজাহানকে উন্মুক্ত পাচার করা হয়, ‘দুঃখের সমস্ত প্রতীক দিয়ে সাজিয়ে এবং তার সব স্বেক্ষণ বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে কাঁদতে পথ চলতে থাকে।’ অনুযানসংক্ষিপ্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুগামীরা আগার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, আসক খুন্দ শোকার্ত দলটার সাথে এসে মিলিত হন এবং শবাধার ভেতে ফেলার আদেশ দেন, যারপর ‘কল্পিত পরলোকগত’ শাহজাহান, ‘নিজেকে উঁচু করে এবং সমবেত বাহিনীর সবার চোখের সামনে আবিভূত হন।’

ঘটনা যা-ই হোক না কেন, ১৬২৮ সালের ২৪ জানুয়ারি, শাহজাহানের জ্যোতিষীদের দ্বারা অনুমিত একটি অনুকূল দিনে, শাহজাহান আর তার পরিবার দীরে দীরে দুলতে থাকা হাতির বহরের একটি চমকপ্রদ শোভাযাত্রা নিয়ে আঘাত উপস্থিত হয়, সমবেত জনতার উদ্দেশে ‘ডানে-বামে সূপীকৃত মোহর বর্ষিত করে’ তাদের উৎফুল্ল চিংকার রাজকীয় নাকাড়ার শুরুগঢ়ীর গর্জনের নিচে চাপা পড়ে যায়। আসক খান যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ‘চিরনবীন আগার উঁচু আর নীচু শ্ৰেণী তাকে এমন একটি অভ্যর্থনা প্রদান করে, যার সাথে আগের কোনো শাসককে দেয়া অভ্যর্থনার তুলনা হয় না।’ লাহোরে যেহেতু ইতিমধ্যে শাহজাহানের নামে খুতবা পাঠ করা হয়েছে, তার এখন কেবল দুর্গের অভ্যন্তরে দেওয়ানি আমের দরবারে ব্যক্তিগত দর্শনাথীদের সামনে সিংহাসনে আরোহণ করাই বাকি রয়েছে। ১৬২৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটা মনোনীত করা হয়, সেদিন আকবরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার বাহাসুরতম বার্ষিকী এবং সেইসাথে বাবরের ১৪৫তম জন্মদিন।

শাহজাহান যেসব অহংকারী উপাধি নিজের বলে দাবি করেছেন তার ভেতর রয়েছে ‘পৃথিবীর অধিশ্঵র’, ‘বিশ্বাসের অগ্নিকুলিঙ্গ’ এবং ‘ঐঙ্গলময় সংযোগের দ্বিতীয় প্রভু’—তৈমূরের একদা গর্বিতভাবে ব্যবহৃত উপাধির সরাসরি আত্মসাংকরণ। শাহজাহান একই রকম গর্বিত বোধ করতেন যে, তিনি মহান তৈমূরের সরাসরি অধিষ্ঠিত দশম শাসক।

অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান, যা আক্ষরিক অর্থেই নতুন স্বাটের মাথায় বর্ষিত রত্নের কারণে জুলজুল করে, যা মমতাজ এবং হারেমের অন্য রমণীদের দ্বারা প্রেরিত। শাহজাহান রেশমের সম্মানজনক আলখাল্লা, রঞ্জিত তরবারি, নিশান, নাকাড়া এবং সূর্পীকৃত সোনা, রূপা আর রত্নপাথর তার অভিজাতদের দান করেন এবং এসবের বদলে তাদের উপহার গ্রহণ করেন। তিনি তার শুণুর-আবাজান আসফ খানকে, যিনি লাহোর থেকে অঞ্চলবয়সী দুই যুবরাজকে নিয়ে ফিরে আসছেন আর সে কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, তার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। আসফ খানের আবাজান ইতিমাদ-উদ-দৌলা যে ভূমিকা জাহাঙ্গীরের জন্য পালন করেছিলেন এবং মহবত খানকে আজমীরের সুবেদার এবং রাজকীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে বহাল করেন। অনুষ্ঠান শেষে শাহজাহান তারপরে রেশমের পর্দাশোভিত হারেমে ফিরে এসে, পঁয়াশ্রিং বছর বয়স্ক মমতাজ, ‘সময়ের রানি’কে, যিনি এত বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করার পরও সব সময় তার সাথে ছিলেন, তাকে পুরস্কৃত করেন। তিনি তাকে দুই লক্ষ টুকরো মেঝা, ছয় লক্ষ টুকরো রূপা এবং বাংসরিক দশ লক্ষ রূপি ভাতা প্রদান করেন।

কয়েক দিন পরে, মার্চ মাসের গ্রেজিয়ার দিকে, মমতাজের আবাজান আসফ খান এবং তার আবাজান দারু প্রকোহ আর আওরঙ্গজেবকে নিরাপদে তার কাছে ফিরিয়ে দিলে তিনি তার অঞ্চলবয়সী দুই ছেলের সাথে পুনরায় মিলিত হন, যাদের কাছ থেকে দুই বছরের বেশি সময় তিনি বিছিন্ন ছিলেন। শাহজাহানের রাজকীয় দিনপঞ্জির রচয়িতা, যা অবশ্যই দারুণ আবেগঘন একটি ঘটনা ছিল সেটাকে আবেগহীন ভাষায় বর্ণনা করেছেন : ‘মহামান্য স্বার্গী সুমহান যুবরাজস্বয়ের এবং তার শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতার আগমনের সংবাদ শ্রবণ করে ভীষণভাবে আনন্দিত হন। স্বাটের অনুমতি নিয়ে, তিনি রাজকুমারী জাহানারা বেগম ও রাজপরিবারের অন্য সন্তানদের সাহচর্যে নিজের মহাপ্রাণ পিতা-মাতাকে শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে যান; অন্যদিক থেকে যুবরাজস্বয় এগিয়ে আসেন মহামান্য স্বার্গীকে বহনকারী পালকির সাথে মিলিত হতে। তারা একটি স্থানে মিলিত হন...যেখানে এই উপলক্ষে আগেই তাঁর স্থাপন করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিনের বিছেদের পরে সবাই একে অপরকে দেখে আবেগাপূর্ত হয়ে পড়ে।’

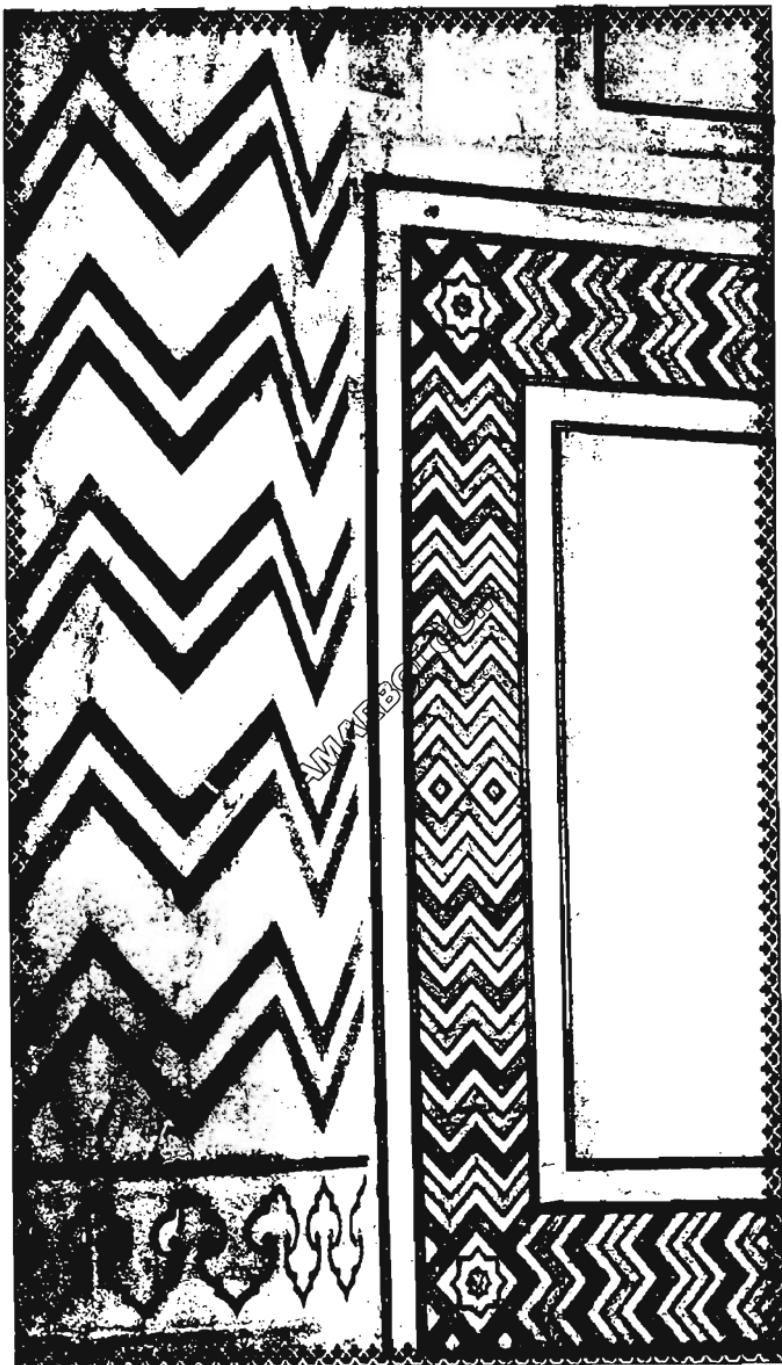
পরের দিন, অভিজাতদের অভিজাত দ্বারা সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, আনন্দিত এবং দুচিত্তামুক্ত স্বার্গী এবং তার সন্তানেরা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মিছিল করে প্রবেশ করে যেখানে লালকেশ্বার ঝরোকা বারান্দায় যুবরাজস্বয় উৎসুক্ষ জনতার সামনে উপস্থিত হলেও তাদের দুচিত্তামুক্ত আশ্মিজান সেখানে ছিলেন না।

পাদশাহনামার একমাত্র অলংকৃত পাত্রলিপিতে, শাহজাহানের রাজতুকালের সরকারি দিনপঞ্জিতে একটি চমৎকার চিত্রকর্ম রয়েছে, যা উইন্সর ক্যাসলের রয়েল লাইব্রেরিতে রানির ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে, সেখানে বেগুনি রঙের আলখাল্লা পরিহিত রত্নসজ্জিত স্বারাটকে তার ছেলেদের সম্মানণ জোনাতে দেখা যায়, যুবরাজেরাও কমলা রঙের কোট, সোনা আর সবুজ জেড পাথরের অলংকারের একই রকম বাহলের সাথে সজ্জিত তাদের গলায় মুকার ছড়া শোভা পায়। দিনপঞ্জিতে বলা হয়েছে, ‘শাহজাহান ‘নিজের সন্তানদের চোবের সামনে ভীষণ আনন্দিত হন, যারা সবাই তার প্রিয়তম স্ত্রীর গর্ডে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।’

এই দিনগুলো আনন্দ আর প্রীতিময় হওয়া উচিত। মহতাজ প্রত্যাগত যুবরাজস্বয়কে তাদের নতুন ভাই, যাকে তারা কখনো দেখেনি পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন—পনেরো মাস বয়সের সুলতান লুফত আল্লাহ, শাহজাহানের সাথে নির্বাসনের অনিষ্টিত দিনগুলোতে যার জন্ম। মোলো বছর আগে তার বিয়ের পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া এগারো সন্তানের ভেতরে আটজন জীবিত এবং এখন তারা সবাই আপাতদাস্তিতে প্রাণবন্ত। শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের মাত্র তিনি মাসের ভেতরেই যদিও এই পরিস্থিতি বদলে যায়। ১৬২৮ সালের এপ্রিলের শেষ নাগাদ, মহতাজের সন্তান জন্ম দেয়ার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বে, তাদের সাত বছর বয়সী কন্যা সুরাইয়া বানু শুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তারপর, ১৬২৮ সালের মে মাসের ৯ তারিখে, দরবারের একজন দিনপঞ্জিকার উল্লেখ করেন্তে যে, ‘আকাশে মঙ্গলময় এক তারকার আবির্ভাব হয়েছে’—মহতাজের গর্ডে শাহজাহানের আরো একজন পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার অষ্টম পুত্র, সুলতান দৌলত আফজা।

এ ঘটনার কারণে যদি পূর্ববর্তী দশকসমূহ প্রশংসিত হয়েও থাকে সেটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ব্যাপী। পাঁচ দিন পুরো, ‘সবাই যখন এই পৃথিবীর নিয়ামতসমূহ উপভোগ করছে’ এবং শাহজাহান সবার মাঝে উদার হতে দান করছেন উচ্চপদস্থ অমাত্য থেকে শুরু করে ‘পাণড়ি পরিহিত ধৰ্মীয় পণ্ডিত, যোগ্য ব্যক্তি এবং গায়ক আর নর্তকী’ এবং তার প্রাণপ্রিয় মহতাজকে উপহারে ভরিয়ে দিচ্ছেন, খুদে সুলতান লুফত আল্লাহ, ‘বেহেশতের একগুঁয়ে ইচ্ছার কারণে’, সহসা ‘অন্য পৃথিবীর শরণে’ প্রস্থান করেন।

সেই সময় মানুষ যদিও শিশুস্থূল আপাতভাবে উচ্চহারের সাথে পরিচিত ছিল, রাজপরিবারে একজন নবজাতকের মৃত্যু সব সময় গভীরভাবে শোকাহত করে এবং রাজতুকাল শুরু হবার শুরুতে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটো শিশুর মৃত্যু নিচিতভাবেই মনে হয় একটি খারাপ সংকেত। ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকরাও অস্বিভিবোধ করেন নতুন রাজত্ব কী বয়ে আনতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে। অবশ্য তাদের উদ্বেগের কারণ ভিন্ন। একজন লেখেন, ‘বর্তমান শাসকের প্রকৃতি অনুসারে, এখনই কোনো মন্তব্য ব্যক্ত করা অসম্ভব যদিও এটা আগে থেকেই অন্যাসে বলা যায় যে, এত অপরাধের মাধ্যমে সূচিত রাজত্ব অবশ্যই অগুভ লক্ষণযুক্ত হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং এত নিরপরাধের রক্ত ঝারিয়ে যে সিংহাসনের অধিষ্ঠান, অবশ্যই সেটা নিরাপত্তাহীন প্রতিপন্ন হবে।’



## সপ্তম অধ্যায়

### ময়ূর সিংহাসন

জাহাঙ্গীর তার শেষের বছরগুলোয় নানা সমস্যায় জর্জিরিত থাকা সত্ত্বেও কখনো অসফল ছিলেন না। তিনি যদিও মোগল ভূখণ্ড উপ্পেখ্যমোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেননি, বস্তুতপক্ষে পারসিকদের কাছে কান্দাহার হারিয়েছেন, তিনি দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনে অনিচ্ছুক সুলতানদের উচ্চাকাঞ্চকা নিয়ন্ত্রণ করেন, রাজস্থানে বিক্ষিণ্ঠ প্রতিরোধ আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাম্রাজ্যকে তুলনামূলকভাবে সুস্থিত করে যান। তার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল আপন সুলতানদের বিদ্রোহ—তার রাজত্বের সূচনালগ্নে অবৈর্য খসরুর হঠকারিতা এবং রাজত্বের শেষপ্রাপ্তে বি-দৌলত'—'ভাগ্যপূর্ণভিত্তি' শাহজাহান।

অবশ্য ১৬২৮ সালে শাহজাহান যখন মমঙ্গেজকে পাশে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তার তখন ছিলিশ বছর বয়স, নিজের যৌবনের উত্তমাংশে এবং অন্তর্যাত্মী সংঘাতের কোনো ডয় নেই। তিনি তার আবাসাজানের থেকে একেবারেই সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী। উভয়ই যদিও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি, গভীরভাবে সৌন্দর্যগ্রাহী আর বিলাসিতার কদর বুঝতে সক্ষম হলেও, শাহজাহান অনেক বেশি তেজস্বী আর আত্মসংযমের অধিকারী। জাহাঙ্গীরের মতো নন, তিনি যুক্তক্ষেত্রে অনেক আগেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন এবং তার মতো সুরার প্রতি অত্যধিক আসক্তি ছিল না। শাহজাহানের ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার আবাসাজানের অনুরোধ সত্ত্বেও তরুণ বয়সে তিনি কেবল কালেভদ্রে পান করতেন, 'উৎসবের সময় এবং মেঘাছন্ন দিনে' এবং ১৬২০ সালে সুরাপান পুরোপুরি বর্জন করেন।

তার রাজত্বের প্রথম বছরের একটি প্রতিকৃতিতে—তার অর্জনসমূহ উদ্যাপন করতে ভাবমূর্তি-সচেতন শাহজাহানের নিযুক্ত করা অসংখ্য চিত্রকর্মের একটি—নতুন স্মাটের মুখপার্শ্ব উজ্জ্বল সবুজের প্রেক্ষাপটে প্রদর্শন করে। তার কালো, নিখুঁতভাবে ছাটা গৌফ আর শৃঙ্খল একটি শক্তিশালী চমৎকার মুখরেখার

অধিকারী মুখ্যবয়বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মুক্তার বিশাল কানের দুল এবং গলার আর কজির চারপাশে আর তার কমলা রঙের পাগড়ি আটকাতে ব্যবহৃত নানা ধরনের রত্নবিজড়িত মুক্তার মালার গোছা তার পৌরুষকে খর্ব করার চেয়ে বরং আরো বেশি শুরুত্বারোপ করে। শাহজাহানকে ডান হাতে তার তরবারির বাট আঁকড়ে ধরা অবস্থায় যখন তার বাম হাতে রয়েছে রাজকীয় সিলমোহর, যেখানে তৈমূর পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষদের নাম খোদাই করা রয়েছে, দেখতে কোনো সন্দেহ নেই তিনি সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন, পৌরুষ আর নিয়ন্ত্রণের প্রতিকৃতি মনে হয়।

শাহজাহান, মহতাজ আর তার সন্তানেরা আগ্নার লালকেল্লায় পরবর্তী আঠারো মাস শাস্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে। রাজকীয় হারেমের জাঁকালো আবাসি স্থানসমূহ মহতাজকে নিশ্চিতভাবেই অভ্যর্থনা জানায়। শাহজাহানের বিশ্বস্ত ‘ভ্রমণকালীন সঙ্গী’ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে তার ইতস্তত ভ্রমণের পরে, তিনি অবশ্যই এখন তার ‘স্বগৃহে সান্ত্বনা উৎস’। ব্যক্তিগত খোজা সহকারী এবং শতাধিক মহিলা পরিচারিকা পরিবেষ্টিত অবস্থায়, বিলাসবহুল আসবাবে সজ্জিত কক্ষসমূহে যেখানে তার ফুপুজান নূর একসময় কর্তৃত করেছেন, তিনি এখন নিরুৎসুক হতেই পারেন।

শাহজাহান স্থাপত্যকলা কেবল পছন্দই করতেন না, সেইসাথে তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, ডবনাদি নির্মাণের অকল্প গ্রহণ তার রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধামযুক্ত ভয় জাগ্রত করতে আর তার পূর্বপুরুষদের থেকে তার রাজত্বকালকে স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি দেয়ার একটি উপায়। তিনি তাই আগ্না দুর্গকে কীভাবে নতুন রূপ দিয়ে প্রিখানের জনসাধারণের কক্ষগুলোকে আরো আকর্ষণীয় আর ব্যক্তিগত কক্ষগুলোকে আরো বিলাসবহুল করা যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেন। তিনি বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নেন আকবরের সময়ের বেলে পাথরের ভারী অবকাঠামোর বদলে খোলামেলা ‘আকাশস্পশী’ হলঘর তৈরি করবেন, যার মেঝে সাদা মার্বেলের হবে এবং প্রশংস্ত আভিনায় থাকবে গোলাপ-জলের প্রস্তুবণ।

তার ব্যক্তিগত কক্ষ থেকে যমুনা দেখা যায়, সেখানে ফুলের নকশা করা, মার্বেলের সূক্ষ্ম অঙ্গপটের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো এমনভাবে ছাইয়ে প্রবেশ করে যে, সূর্যকিরণের রুক্ষতা হ্রাস পেয়ে কোমল আভায় পরিণত হয়। মোগলরা তাদের তাদের জীবনের বেশির ভাগ সময় কোমল আলোয় অতিবাহিত করে। সূর্যের আলো গ্রীষ্মকালে যখন বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাদের পরিচারকেরা রেশমের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে আলো ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। বাতাসের শীতল প্রভাব বৃক্ষি করতে তারা খিলানাকৃতি গবাক্ষগুলো টাট্টি, কাশ ঘাসের শেকড় বোলানো পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়ে, নিচে তারা পানির ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত করে সুগান্ধি বাতাসের একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে। শীতকালে তারা

রাজকীয় কঙ্গলোয় মৰমের বুটি দেয়া কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে বাতাসে কখনো বেড়ে যাওয়া শীতের প্রকোপ ভেতে প্ৰবেশ কৱতে বাধা দেয়।

মহতাজেৰ সাথে ‘বেহেশতেৱ ন্যায়’ কাশীৱে অনাগত দিনগুলোয় ভ্ৰমণেৰ সন্তুষ্টবনা আঁচ কৱতে পেৱে শাহজাহান শালিমাৰ উদ্যানেৰ কলেবৰ বৃক্ষিৰ আদেশ দেন। তিনি কাশীৱে সুবেদাৱকে বিশেষ কৱে আদেশ দেন এক গম্ভুজবিশ্বষ্ট একপাৰ্শ্ব উন্মুক্ত সাদা মাৰ্বেলেৰ বৰ্তমান ভবনেৰ ঠিক উল্টোদিকে কালো মাৰ্বেলেৰ অনুৰূপ আৱেকটা ভবন নিৰ্মাণ কৱতে। আপেল, নাশপাতি, আঙুৱ আৱ আখৰোট গাছ এবং পানিৰ বৃত্তাকাৰ জলাধাৱেৰ মাঝে উদ্যানেৰ নতুন অংশেৰ নাম হবে ফয়েজ-বকস, ‘নিয়ামত দাতা’। যমুনা নদীৰ তীৱেৰ মহতাজ তাৱ নিজেৰ জন্য চতুৰ্যুক্ত একটি আনন্দ উদ্যান নিৰ্মাণ কৱতে শুক্ৰ কৱেন—যতদূৰ জানা যায়, এটাই তাৱ ঘাৱা গৃহীত একমাত্ৰ স্থাপত্য প্ৰকল্প এবং সম্ভবত এই একটিৱ অন্যই তিনি সুযোগ আৱ সময় পেয়েছিলেন।\*

হারেমেৰ পাশে তাৱ সন্তানদেৱ নিজেদেৱ আৰাসিক কক্ষ রয়েছে এবং তাৱ দিনেৰ অধিকাংশ সময়ই তাৱ সাথে কাটায়। তিনি তাৱ বড় মেয়েৰ জাহানারার, যিনি একজন দিনপঞ্জি রচয়িতাৰ ভাষ্য অনুসাৱে, ‘ব্যক্তিগতভাৱে ছিলেন বিচৰণ, প্ৰাণবন্ত, উদার আৱ মাৰ্জিত ব্যভাৱে’ এবং যার সাথে তাৱ নিজেৰ চেহাৱাৰ মিল ছিল, তাৱ প্ৰতিই বেশি অনুৱেজ্জ ছিলেন। যমুনাৰ তীৱেৰ একটি প্ৰাসাদোপম অট্টালিকায় মহতাজেৰ পিতা আৰা বাস কৱতেন এবং আসফ খান, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদাধিকাৰী হওয়ায়, প্ৰতিদিন শাহজাহানেৰ দৰবাৱে উপস্থিত থাকতেন। দৰবাৱেৰ একজন স্বাক্ষৰকাৰ অনুযায়ী, শাহজাহান সিংহাসনেৰ আৱোহণেৰ কিছুদিন পৱেই আসফ খানকে ‘চাচাজান’ বলে সাদৱ সন্তানণ কৱতে শুক্ৰ কৱেন, সবাইকে তাৱ প্ৰতি ঈৰ্ষ্যাপূৰ্বত কৱে তোলেন।

শাহজাহানেৰ তাৱ শ্বশু-আৰাজানেৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ আৱেকটা নিৰ্দশন হলো তিনি যখন তাৱ সাথে মহতাজ আৱ সন্তানদেৱ নিয়ে দেখা কৱতে যেতেন তিনি সৱাসিৰ তাৱ বাসায় গমন কৱতেন। আসফ খান যথাযথভাৱে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন কৱতেন : ‘মহামান্য স্বাটোৱ পায়েৱ নিচে একটি গালিচা বিছিয়ে দিতেন এবং তাৱ মাথাৰ ওপৱ মোহৱ বৰ্ষিত কৱতেন’ এবং ‘মূল্যবান রত্ন, রত্নখচিত অলংকাৰ, কাপড়, সোনা আৱ রূপাৱ অলংকাৰ সজ্জিত কিবচাকি ঘোড়া আৱ পাহাড়েৱ মতো দেখতে হাতি এমন চমৎকাৰ সব উপহাৱ দিতেন।’ রাজপৰিবাৱ সেখানে বেশ কয়েক দিন নাচ-গান আৱ বিশাল ভোজসভাৱ আয়োজন কৱে আনন্দে দিন অতিবাহিত কৱত।\*

\* মহতাজেৰ নদীৱৰতীৱৰতী উদ্যান, বৰ্তমানে জাহারা বাগ নামে পৱিচিত, রামবাগেৰ দক্ষিণে অবস্থিত, যা একদা তাৱ ফুপিজানজান নূৰ চাষাবাদ কৱতেন।

\* আসফ খানেৰ সুৰম্য অট্টালিকা আপাতদৃষ্টিতে ১৮৫৭ সালেৱ সিপাহি বিদ্ৰোহেৰ সময় ব্ৰিটিশ কৰ্তৃপক্ষ কাশান দেগে উড়িয়ে দেয় যখন তাৱা আগামীতে সিপাহিদেৱ

নূর অবশ্য এই ঘনিষ্ঠ পারিবারিক চক্রের অস্তর্ভুক্ত ছিলেন না। উচ্চাশা আর আবেগ শেষ হতে, তিনি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ জন্য প্রয়োগ করে নিজের পরাজয় মেনে নেন এবং লাহোরে নিজের কন্যা লাডলি, যাকে তিনি মহতাজের পরিবর্তে স্মাজীর করার অপ্র দেখেছিলেন, তার সাথে লোকচক্ষুর অস্তরালে নিজেকে গুটিয়ে নেন। শাহজাহান দ্বারা তার জন্য বরাদ্দকৃত ২০০,০০০ রূপি ভাতা সম্বল করেই তিনি জীবনযাপন করতে থাকেন। তিনি যমুনার পূর্বতীরে তার আবাজান ইতিমাদ-উদ-দৌলা এবং আম্বাজানের জন্য যে ছোট কিঞ্চ চমকপদ সমাধিসৌধ নির্মাণ করতে প্রক করেছিলেন এবং যার নির্মাণকার্য তার পতনের বছরেই সমাপ্ত হয়েছিল সেটার অনুস্মৃতির মাঝেই দূরবর্তী নির্জনতায় কোনো সন্দেহ নেই পরিত্তি খোজার চেষ্টা করতেন।

সমাধিসৌধটা নির্মাণের ঐতিহ্য অনুসারে প্রাচীর দেয়া উদ্যানের অভ্যন্তরে শীতল প্রবাহিত জলের নহর আর দুই পাশে সারিবদ্ধ ঝাকড়া গাছের কাঠামোর মাঝে অবস্থিত ছিল। তিনি গম্ভীরের একটি আচ্ছাদনের নিচে দৃঢ়তিময় মার্বেলের নিচু আর বর্গাকার নামনিক একটি কাঠামো তৈরি করেছিলেন এবং কাঠামোটার চারপাশে অট্টভূজাকৃতি খিনারসদৃশ উচু স্তুপ ছিল, যাদের ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া শীর্ষদেশে পঙ্খফুলের পাপড়ি উৎকীর্ণ। মেঝে আর দেয়ালে ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো অল্লম্প্যের রত্নধূমপ্রে—টোপাজ, নীলকান্তমণি, আকীক, রঙিমাত কর্নেলিয়ান আর জ্যাসপ্রস্ট দিয়ে কোথাও জ্যামিতিক নকশা আর অন্যান্য স্থানে ফুলের মার্জিত প্রাকৃতিক আকৃতি জটিলভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। এই সমাধিসৌধ এবং ~~প্রায়~~ সমসাময়িক কালে দিয়িতে নির্মিত আরেকটা কাঠামো যাকে চৌষট খামো বলা হয়। সাদা মার্বেলে পুরোপুরি আবৃত প্রথম মোগল স্থাপনা, যা তাজমহলসহ শাহজাহানের নির্মিত অন্যান্য ভবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ঐতিহ্য অনুসারে, এত দিন পর্যন্ত সাদা মার্বেল কেবল বেহেশতের স্মারক হিসেবে ইসলামের কামেল পুরুষদের সমাধিসৌধের জন্যই সংরক্ষিত ছিল।<sup>\*</sup> একটি ছোট নিভৃত কাঠামোর চেয়ে দারুণভাবে রত্নখচিত অলংকরণের সামগ্রিক প্রভাবই মুখ্য হয়ে গঠে।

নূর এরপর তার স্বামীর জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণে নিজেকে ব্যাপৃত করেন, যিনি বাবরের ন্যায় খোলা আকাশের নিচে সমাধিস্থ হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। লাহোরের বাইরে বিশাল দিলকুশা উদ্যানে, যা তিনি জাহাঙ্গীরের সাথে তার সুখের দিনগুলোতে নির্মাণ করেছিলেন এবং যেখানে তার অসংখ্য সুখস্মৃতি রয়েছে, একটি স্থান নির্বাচন করেন। একটি মাঝুলি নকশা নির্বাচন করা হয় : একটি বেদির ওপর অন্যত্র সমাহিত জাহাঙ্গীরের

---

সাথে তাদের মোকাবিলার সময় নিজেদের গোলাবর্ষণের আওতা পরিকার করতে বেশি উদ্যোগ ছিল।

\* ১৪৪০ সালে নির্মিত দুর্গশহর মানডুর সুবেদার হোসাই শাহের সাদা মার্বেলের সমাধিসৌধটাই একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল।

স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি প্রস্তরখণ্ড, যা আবার একটি অতিকায় আয়তাকার মধ্যের ওপর স্থাপিত, যার চারপাশে চারটি মিনার রয়েছে। এখানেও জাটিল নকশার কারুকাজ রয়েছে তবে ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধের তুলনায় অনেক বেশি সংযত তাদের সৌন্দর্য।\* নূর কাহেই, তার মৃত স্বামীর সমাধিসৌধের অনুকরণে নিজের জন্যও একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ শুরু করেন। তিনি সমাধিসৌধের চারপাশের উদ্যানে অজস্র সুগন্ধি গোলাপ আর মিষ্টিগন্ধযুক্ত ঝুঁই ফুলের গাছ রোপণ করেন।

শাহজাহান ইত্যবসরে অভূতপূর্ব মহিমার আভা প্রতিপালন করা অব্যাহত রাখেন, যা একটি সময়ে তার রাজত্বের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। তার দাদাজান আকবরের ন্যায়, তিনিও তার রাজত্বকালের মূল ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন এবং তিনি যথেষ্ট যত্নের সাথে রচয়িতাদের নির্বাচিত করেন, নিয়মিত বিরতিতে তাদের পরিবর্তনও করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত তাদের রচনা আবেক্ষণের পরই কেবল সেগুলোকে স্বীকৃতি দিতেন।\* সেই সময়ের স্থাবকতাময় আর পুন্নিত ভাষায় লিখিত হলেও, রচনাগুলো নিঃসন্দেহে তার দরবারের জ্ঞানুশ বর্ণনা করে।

এ ছাড়া রয়েছে বিশ্বিত হত্বাক ইউরোপীয় পর্যটকদের ভাষ্য। ইংরেজ রাজনৃত স্যার টমাস রোর কাছে জাহাঙ্গীরের দরবারকে মাঝে মাঝে কিছুটা অশিষ্ট মনে হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালের সাথে তুলনায় এই সময়কে নিঃসন্দেহে মূর্ক মনে হবে। প্রথমদিকের প্রকজন দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসূরে, 'রাজত্বের শেষার্ধে, প্রিয় সুলতানার (নূর), জৌলুশময় প্রদর্শনী শাহজাহানের দ্বারা প্রদর্শিত মহিমার বিশালতার কাছে হারিয়ে যায়।'

- \* শাহজাহানও হয়তো তার আবকাজানের সমাধিসৌধ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
- \* শাহজাহানের রাজত্বকালের সবচেয়ে শুরুস্থপূর্ণ রাজকীয় দিনপঞ্জি রচয়িতা ছিলেন মির্জা আমিনা কাবাওয়ানি, যিনি শাহজাহানের যুবরাজ থাকা কালীনসময়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন; আবদুল হামিদ লাহোরি শাহজাহানের রাজত্বে প্রথম ছার্কিশ বছরের বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন, পাদশাহনামা; মাহমুদ ওয়ারিস, লাহোরির শিষ্য যিনি লাহোরির পরে শাহজাহানের রাজত্বের বিশেষ বছর পর্যন্ত ভাষ্যকারের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ইনায়েত খান, শাহজাহানের গ্রাহণারের আধিকারিক যিনি তার পূর্বসূরিদের রচনার একটি চৌকস সারসংক্ষেপ লিখেছেন। মাহমুদ সালিহ কামবো, যদিও দরবারের রাজকীয় ঐতিহাসিক ছিলেন না তিনি মহাকেজরখানার একজন সদস্য ছিলেন কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বের অন্যদের রাজকীয় ঐতিহাসিকদের রচনাপঞ্জিকে আকর হিসেবে ব্যবহার করে এবং তার সাথে নিজের স্মৃতিকথা যোগ করে রাজত্বের একেবারে অস্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত একটি বিবরণ লিখেছেন।

শাহজাহানের প্রথম কাজই ছিল রাজকীয় কোষাগারের রত্নের সবচেয়ে জমকালো সংগ্রহ প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত তথত-ই-তাইস, বা ‘ময়ুর সিংহাসন’ নির্মাণের আদেশ দেয়া। তার সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাতটি কোষাগার থেকে তিনি নিজে সভ্যিকারের সমর্থনারের মতো রত্নপাথর নির্বাচিত করেন। আগ্রার কোষাগারেই কেবল ৭৫০ পাউন্ড পরিমাণ ওজনের মুক্তা, ২৭৫ পাউন্ড পরিমাণ পান্না এবং প্রবাল এবং পোখরাজ আর অন্যান্য কম দাম রত্নপাথর ছিল অগণিত পরিমাণে। আট ফিট দীর্ঘ, ছয় ফিট প্রশস্ত আর বারো ফিট উচু সিংহাসনটা নির্মাণে সময় লাগে সাত বছর এবং প্রয়োজন হয় ১,১৫০ কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ সোনা। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিক লাহোরির ভাষ্য মতে, ‘চাঁদোয়ার বহিরাবরণ ছিল কলাই করা, যার মাঝে মাঝে ছিল রত্নখচিত, ভেতরের দিকে চুনি, গান্টে আর অন্যান্য রত্নপাথর ঘনভাবে বসানো হয়েছিল আর বারোটা পান্নার তৈরি মিনারের ওপর এটা স্থাপিত ছিল। প্রতিটি স্তম্ভের ওপর প্রভৃতি রত্নখচিত এক জোড়া করে ময়ুর এবং প্রতি জোড়া ময়ুরের মাঝে ছিল চুনি, হীরক, পান্না আর মুক্তাখচিত একটি গাছ। সিংহাসনে আরোহণের তিনটি ধাপ স্বচ্ছ পানির মতো দেখতে রত্ন দিয়ে সজ্জিত ছিল।’

বাদশা সোলেমানের সিংহাসনের লোককাহিনী থেকে সম্ভবত নকশার ধারণাটা নেয়া হয়েছিল। সোলেমানের সিংহাসনের প্রেরণাশে দণ্ডয়মান চারটা সোনার তৈরি তালগাছ—যার দুটোর মাথার প্রোমার তৈরি দুগল আর অন্য দুটোর মাথায় সোনার তৈরি ময়ুর শোভাপ্রেত—কীভাবে এর সাথে সম্পর্কিত। ইসলামে প্রচলিত একটি বীক্ষিত অনুযায়ী, ময়ুর একসময় বেহেশতের প্রবেশদ্বারের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। পাখিটা শয়তানকে খেয়ে ফেলে কিন্তু তারপর পেটের ভেতরে করে শয়তানকে বেহেশতে নিয়ে আসে, সেখানে শয়তান তার পেট থেকে পালায় এবং আদম আর হাওয়ার জন্য ফাঁদ তার পাতে।\*

ফরাসি মণিকার জ্যা-ব্যাপটিস্ট ব্রেভার্নিয়ের ১৬৬৫ সালে প্রথম যখন সিংহাসনটা দেখেন তিনি কেবল একটি ময়ুরের বর্ণনা দেন, ‘নীলা আর অন্যান্য রঙিন রত্ন দিয়ে উঁচু করে নির্মিত পেখম, দেহটা সোনার ওপর মূল্যবান রত্নখচিত, বুকের সামনে একটি বিরাট চুনি বসানো, যেখানে ৫০ ক্যারাট বা

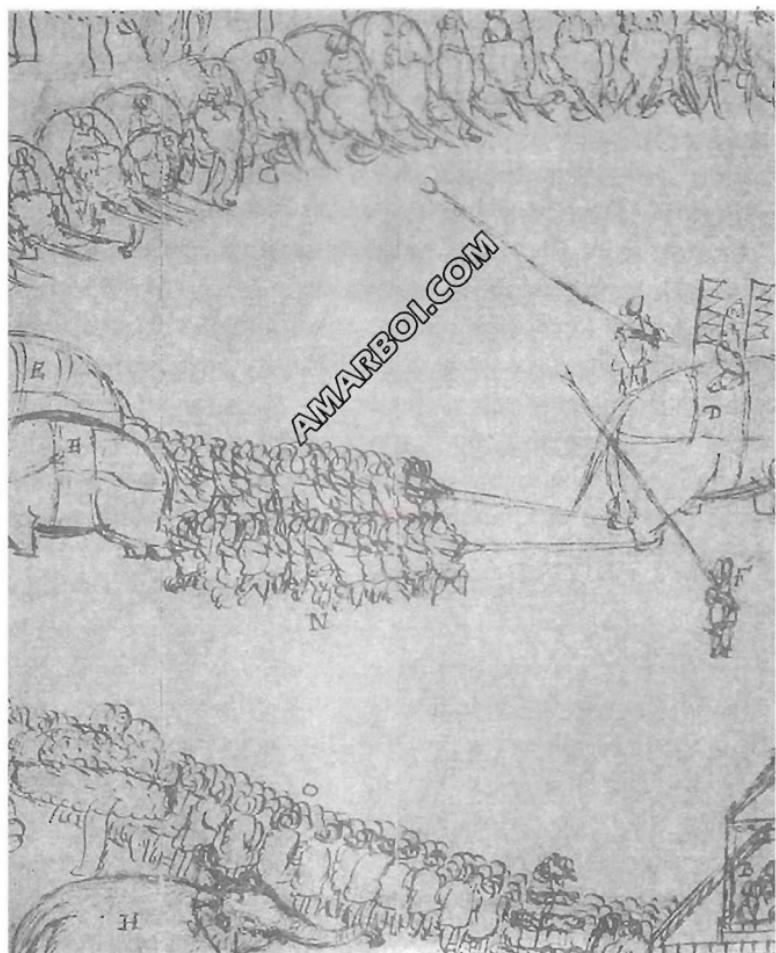
\* পান্না, সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যিকারের রত্নপাথর, মুসলমানেরাই সবচেয়ে বেশি কদর করত যারা সবুজকে মনে করে ইসলামের রং। তা ছাড়া ভারতে ধর্মীয় আর জ্যোতিষত্ত্ব সম্বন্ধীয় শুক্রত্বের কারণে পান্নাকে অনেক আগে থেকেই অভ্যর্থনা করা হয়। ৫০০০ বছর পূর্বে মিশরে প্রথম পান্না আবিষ্কৃত হয় এবং রোমানরা ক্লিওপেট্রার খনিগুলোতে হামলা করেছিল এর সঙ্কানে। শাহজাহানের সময়কালে উত্তর আমেরিকা থেকেও পান্না আসতে শুরু করেছিল।

সেই রকম ওজনের নাশপাতি আকৃতির একটি মুক্তা ঝুলছে।' মূল সিংহাসনের অন্যান্য ভাষ্যের সাথে দাহোরির বর্ণনার খুব সামান্য তারতম্যই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যা-ই হোক না কেন, সিংহাসনটা একটিমাত্র শিল্পকর্মে সংযুক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রত্নের একটি সংগ্রহ ধারণ করত। ব্রেভার্নিয়ের তার জহুরির চোখ দিয়ে সিংহাসনটা যাচাই করে ১০৮টি বৃহদাকৃতি ছুনি, যার কোনোটিই একশ ক্যারাটের কম হবে না আর কমপক্ষে ১১৬টি ত্রিশ থেকে ষাট ক্যারাটের পান্না দেখেছিলেন।

মোগল ঐশ্বর্য আর প্রতাপ দিয়ে দর্শনার্থীদের মধ্যে ভয়মিশ্রিত সম্ম সৃষ্টির একটি সুযোগ করে দিত বিভিন্ন উৎসবগুলো। শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম নওরোজ উৎসব উদ্যাপিত হয়েছিল ১৬২৮ সালের মার্চ মাসে। দরবারের একজন ঐতিহাসিক লিপিবন্ধ করেছেন কীভাবে আগ্রার লালকেঢ়ার ভেতরে 'তাঁরু স্থাপনে দক্ষ তিনি হাজার কারিগর যন্ত্রবিজ্ঞানের হাজার ধরনের উভোলক যন্ত্র যুক্ত' একটি অতিকায় তাঁরু স্থাপন করেছিল। বাবরের আমলের কার্যকর আবাসিক স্থাপনা হিসেবে রাজকীয় তাঁরুগুলো তাদের গুরুত্ব হারিয়েছে সেগুলো এখন চাঁদোয়া আর শামিয়ানাযুক্ত জটিল অত্যাধুনিক একটি স্থাপনা। শাহজাহানের বিশাল তাঁরুকে দিনপঞ্জির রচয়িতারা প্রশংসা করে বলেছেন 'বেহেশতের মহান তাঁরু' কিংবা 'মেঘমণ্ডলীর জটলা।' তাঁরুগুলো সোনা বা রূপার খুটির ওপর সোনার জরির কারুকজ্জি করা মথমলের। তার নিচে রয়েছে 'রূপার মাচাযুক্ত ছেট তাঁরু, যেঙ্গুরের আছাদন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সোনার জরির কারুকাজ করা মংসুল এবং বিচিত্র রঙের গালিচা আর অলংকৃত কাপেটি দিয়ে : সিংহাসন আর্জু অন্যান্য আসন পাতা রয়েছে এবং রোদের হাত থেকে বাঁচাতে মুক্তাখচিত পর্দা ব্যবহৃত হয়েছে।' দরজা আর দেয়াল 'গুজরাটের সোনার জরি দেয়া কাপড় এবং ইউরোপের পর্দা আর চিন এবং তুরস্ক থেকে নিয়ে আসা মথমলের কাপড় আর ইরাকের সোনার জরিযুক্ত কাপড় দিয়ে সজ্জিত...'

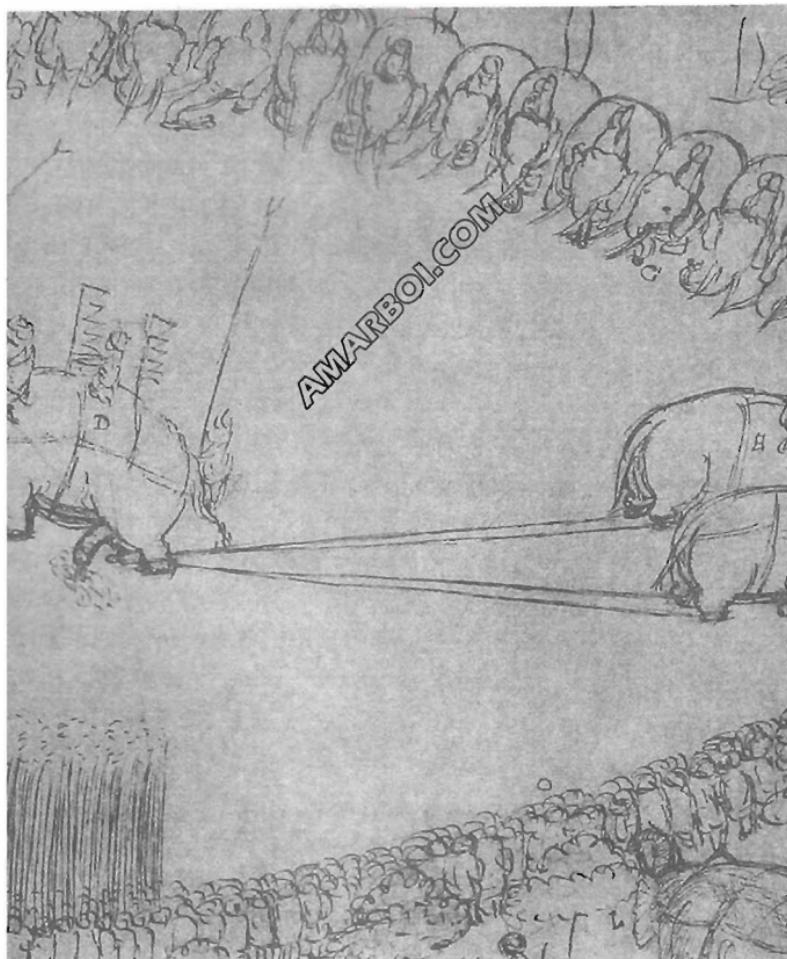
শাহজাহানকে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানানসই রীতিতে চিন্তাকর্ষক হতে হবে। তিনি এখন আর তার পূর্বপুরুষের মায়ুলি মুক্তাখচিত হেরনের পালক পাগড়িতে পরিধান করেন না বরং সেখানে এখন তার পছন্দের রত্নগুলো প্রদর্শনের জন্য ফুল-পাতার আকৃতিতে তৈরি গহনা শোভা পায়। অল্লবয়সী যুবরাজ হিসেবে তার আবাজানের দরবারে ইউরোপীয় অতিথিদের নিয়ে আসা হেরনের পালকের তৈরি শিরোভূষণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এখন সেগুলো প্রতিমান হিসেবে বেশ কাজে আসে। তার রাজত্বকালে পাগড়ির আকৃতিতেও বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি মাথায় এখনো একই রীতিতে মাত্র চার আউল্স ওজনের হালকা কাপড় পেচান হয় কিন্তু একই কাপড়ের তৈরি বিপরীত রঙের একটি বন্ধনী মাথায় ভালো করে পাগড়িকে এঁটে

বাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। জাহান্মীরের ন্যায়, শাহজাহানও কারুকাজ করা রেশমের আজানুলমিত আলখাফ্টা পরিধান অব্যাহত রাখেন এবং শীতকালে স্যাবলের পশমের আস্তরণযুক্ত পুরু কোটের ওপর মার্জিত ভঙ্গিতে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে রাখতেন। গ্রীষ্মকালে, সূক্ষ্ম মসলিন কিংবা স্যাটিনের তৈরি খাটো আস্তিনযুক্ত বহিবাস পরিধান করতেন। অবশ্য ইংরেজ অশ্বারোহীর মতো ভাববিলাসী হবার প্রত্যাশায় তিনি তার কাপড় ফিটখানেক চওড়া রিবন দিয়ে বাঁধার রীতি গ্রহণ করেন, যার কিছুটা অংশ অবহেলাপূর্ণ ভঙ্গিতে আলগা ঝুলে থাকত।



পটোর মানডির হাতির লড়াইয়ের ক্ষেচ।

নওরোজের পরে তখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎসব ছিল স্মাটের জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে তার ওজন নেয়া। উৎসবটার মূল অবশ্য হিন্দু ঐতিহ্যের অন্তর্গত, যা হমায়ুন কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। আকবর দুই দফা ওজন নেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে একে আরো পরিশীলিত করেছিলেন—সৌরবছর অনুযায়ী জন্মদিনে একবার প্রজাদের জন্য ওজন করা হতো অন্যবার চান্দমাস অনুযায়ী জন্মদিনে একান্ত অনুষ্ঠানে, শেষেরটা সাধারণত হারেমের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হতো। (স্মাটের ভূমিষ্ঠ হ্বার দিনই কেবল সৌর আর চান্দুবছর অনুযায়ী জন্মদিন একটি তারপরে প্রতিবছর এগারো দিন করে তাদের ভেতরে দূরত্ব



সৃষ্টি হতে থাকে ।) ২৭ নভেম্বর ১৬২৮, তার রাজত্বকালে চান্দ্রবৎসর অনুযায়ী প্রথম জনুদিন, সোনা আর অন্যান্য বিভিন্ন দ্রব্যের বিপরীতে শাহজাহানের ওজন নেয়া হয়। আকবর আর জাহাঙ্গীর, সৌরবৎসর অনুযায়ী জনুদিনেই কেবল সোনার বিপরীতে নিজেদের ওজন করাতেন, কিন্তু জৌলুশের দিক দিয়ে তার সব পূর্বপুরুষকে ছাপিয়ে যেতে বক্ষপরিকর শাহজাহান দুটো অনুষ্ঠানেই সোনার বিপরীতে নিজের ওজন নির্ণয়ের প্রথা প্রবর্তন করেন।

অগাস্টিনিয়ান ফ্রায়ার সেবাসতিয়েন ম্যানৱিকে, শাহজাহানের ওজন নির্ণয়ের আনুষ্ঠানিকতার পরবর্তীকালের একজন প্রত্যক্ষদর্শী, বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘নিখুঁতকারুকাজ করা আর পৃথিবীর সব মূল্যবান আর দামি জিনিসে ঠাসা একটি ব্যক্তিগত কক্ষের মাঝে...সোনার শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় সোনার তৈরি একটি দাঢ়িপাণ্ডা ঝুলছে, যার কিনারাগুলো নানা মূল্যবান রত্নখচিত। মহামান্য স্বার্ট বিভিন্ন রঙের নানা বহুমূল্য পাথর বসানো সাদা স্যাটিনের আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় সামনে এগিয়ে আসেন, পাথরগুলোর রং যেমন একদিকে মানুষকে গ্রীত করবে তেমনি তাদের আকৃতি তাদের একই সাথে বিশ্মিতও করবে...দাঢ়িপাণ্ডার কাছে পৌছে...স্বার্ট একদিকের পাণ্ডায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসেন এবং সাথে সাথে আধিকারিকেরা রূপার মোহর ভর্তি থলি নিয়ে এগিয়ে এসে অন্য পাণ্ডায় সেঞ্জে রাখতে থাকে, যতক্ষণ না দুই পাশের ওজন সমান হয়। এই ওজন মেঝে শেষ হলে, তারা রূপার মোহর ভর্তি থলিগুলো সরিয়ে নেন...তারা এরপরে সোনার মোহর আর মূল্যবান পাথর ভর্তি থলি দিয়ে দ্বিতীয়বার তার ওজন নেন। এটা সমাপ্ত হতে তারা সোনা, রূপা আর রেশমের সুতামিশ্রিত সুতির মূল্যবান কাপড়ের গাঁইট দিয়ে তৃতীয়বারের মতো স্বার্টের ওজন নেন। চতুর্থ ও শেষবারের মতো তারা ওজন পরিমাপের জন্য নানা ভোজ্য দ্রব্য যেমন ময়দা, ঘি, চিনি ও সাধারণের ব্যবহার্য মোটা সুতির কাপড় দিয়ে স্বার্টের ওজন নেন।’ কোষাগারের আধিকারিকেরা সর্তর্কার সাথে প্রথম তিনিবারের ওজনের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করেন এবং নির্ণীত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ শেষবারের ওজন নেয়ায় ব্যবহৃত সাধারণ দ্রব্যাদির সাথে দরিদ্রদের ভেতরে দান হিসেবে বিলিয়ে দেয়া হয়। ফ্রায়ার অবশ্য শাহজাহানের ‘অতোষণীয় ধনপিসাসা’ সমক্ষে সমালোচনার ভঙ্গিতে লিখেছেন, দরবারের সমস্ত উচ্চপদস্থ অমাত্যের কাছ থেকে তিনি যে বিপুল পরিমাণ উপহার লাভ করেন সেটা তার এই দানশীল উদারতাকে বহুগুণে ছাপিয়ে যায়।

উৎসব শেষে প্রায়ই হাতির লড়াইয়ের আয়োজন করা হতো। হাতিগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নামকরণ করা হতো—উদাহরণস্বরূপ : ‘মঙ্গলময় প্রবর্তক’, ‘পর্বত বিনাশক’, ‘সদাসাহসী’। যমুনা নদীর কাছে সমতলের ওপর

চার ফিট চওড়া আর ছয় ফিট প্রশস্ত মাটির তৈরি একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। আগো দুর্গের নিজ নিজ আবাসন এলাকা থেকে স্মাট আর রাজপরিবারের মহিলারা, যেয়েদের এলাকাগুলো অবশ্যই পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকত, মাটির দেয়ালের বিপরীত পাশ থেকে পরম্পরারের দিকে ধেয়ে আসা বিশালাকৃতি হাতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, ‘প্রতিটি হাতিতে দুজনের বেশি মাহুত থাকত, হাতির দুই কাঁধের ওপর বিশাল লোহার ছঁক দিয়ে প্রাণীগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বসে থাকা লোকদের ভেতরে কেউ যদি ছিটকে পড়ে যায় তার স্থান যেন তারা সাথে সাথে নিতে পারে’ একজন ইউরোপীয় পর্যটক মন্তব্য করেছেন। মাহুতেরা প্রাণীগুলোকে স্বাক্ষরতাপূর্ণ শব্দ দিয়ে বা তাদের ভীতু বলে পরিহাস করে খেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করত এবং নিজেদের গোড়ালি দিয়ে তাদের তাগাদা দিতে থাকত যতক্ষণ না হতভাগ্য প্রাণীটা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষকে ভীষণভাবে আক্রমণ করত। সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি অভিযাতের মাত্রা ছিল প্রচণ্ড এবং হাতিগুলো তাদের গজদাঁত, মাথা আর খুঁড় দিয়ে পরম্পরাকে যেমন ভয়ংকরভাবে আঘাত করত আর ক্ষত সৃষ্টি করত এটাই বিস্ময়কর যে, এর ফলে তাদের কদাচিং মৃত্যু ঘটত...’ লড়াই এতটাই বিপজ্জনক ছিল যে, হাতির লড়াইয়ের দিন মাহুতরা তাদের পরিবারের কাছ থেকে ‘মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির ন্যায় শৈল বিদায় নিয়ে যয়দানে উপস্থিত হতো।’

বাহিক্য জোনুশের ওপর ভীষণ সিভরশীল এমন একটি দরবারে মোগল রীতিনীতি আনুষ্ঠানিক আর জাতিতে হবে এটাই স্বাভাবিক। সমসাময়িককালের ইউরোপে সবচেয়ে পরিশীলিত আর নিয়ন্ত্রিত ফরাসি রাজদরবারের সাথে বাস্তবিকপক্ষে মোগল দরবারের ভীষণ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ফরাসি আর মোগল দরবারে স্মাটের কক্ষের দরজায় করাঘাত করাকে ভীষণ অশ্বীল বিবেচনা করা হতো। ক্রাসে, সভাসদদের কাছ থেকে আশা করা হতো তারা তাদের বামহাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে স্মাটের দরজায় আঁচড় কাটবেন; আগ্রায়, তারা হাঁটু মুড়ে বসে নিজেদের হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে দরজায় শুন্দার সাথে আলতো আঘাত করত। উভয় দরবারেই সব অমাত্যের ব্যক্তিগত মর্যাদা নির্খুতভাবে গণনা করা হতো। ক্রাসে, স্মাটের উপস্থিতিতে একজন অমাত্যের আসন গ্রহণের জন্য নির্ধারিত চেয়ারের উচ্চতা তার মর্যাদার মাত্রা দ্যোতক হিসেবে কাজ করত; শাহজাহানের দরবারে, স্মাটের উপস্থিতিতে বসার অনুমতি লাভ করাই ছিল ভীষণ সম্মানের বিষয়, যা খুব অল্প কয়েকজনকেই দেয়া হতো, যার পেছনে কাজ করত স্মাট প্রভু আর বাকি সবাই তার দাস এমন একটি মনোভাব। যুবরাজরাও তাদের আকাজানের কাছ থেকে এই সম্মানের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত বসার অনুমতি পেত না।

শাহজাহান এবং চতুর্দশ লুই, যিনি ১৬৪৩ সালে ফরাসি সিংহাসনে আরোহণ করেন, উভয়েই তাদের দীর্ঘ রাজত্বকালের বেশির ভাগ সময়ই প্রজাদের সামনে জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর প্রদর্শনে ব্যয় করেছেন। স্মাট চতুর্দশ লুইয়ের দিন প্রকাশ্য আনুষ্ঠানিকতার একটি ধারাবাহিকতার ঘারা নিয়ন্ত্রিত হতো : তিনি যখন ঘুম থেকে উঠে, ভারমুক হয়ে প্রকাশ্যে পোশাক পরিধান করতেন তখন পালিত হতো lever, তিনি যখন শিকারের পর পোশাক পরিবর্তন করতেন, প্রার্থনার জন্য সর্বসাধারণকে নিয়ে গির্জায় যেতেন, আর বিদেশি রাষ্ট্রদ্বন্দ্বের সাথে দেখা করে আবেদনপত্র গ্রহণ করতেন তখন debouter, প্রজাদের সামনে তিনি যখন আলখাল্লা খুলে রেখে ঘুমাতে যেতেন তখন coucher। শাহজাহানের দিন শুরু হতো সকাল হবার দুই ঘণ্টা পূর্বে, 'রাতের আকাশে তখনো তারারা দৃশ্যমান', যখন তিনি আগ্রা দুর্গের রাজকীয় হারেমের সুগন্ধি বাতাসে জেগে উঠে অঙ্গু করে ফজারের নামাজ আদায় করতেন। সূর্যোদয়ের পরে, ঝরোকা-ই-দর্শন, যমুনা নদীর বালুকাময় তীরের ওপর প্রসারিত 'দর্শনের বারান্দা'য়, তার প্রজাদের সামনে দর্শন দিতেন। শাহজাহানের দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতা তার পাঠকদের সতর্কতার সাথে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'প্রয়াত স্মাট আকবরের রাজত্বকালে প্রবর্তিত, দর্শনদাসের এই রীতির অভিপ্রায় ছিল, স্মাটের প্রজারা একই সাথে আকাশ আলোকিত করা সূর্য আর বিশ্বজয়ী স্মাটকে দর্শনের সুযোগ লাভ করে এবং সেইসাথে এ দুই জ্যোতিক্ষের আলীবাদ তারা কোনো প্রকার ব্যৱস্থা বিপন্তি ছাড়াই লাভ করতে পারে।' স্মাটের প্রাত্যহিক দর্শনদান প্রথম দর্শন নামে পরিচিত। একটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এর উৎপন্নি, যার আক্ষরিক মানে 'মৃতি বা সাধুপুরুষ দর্শন'—যা 'নির্যাতিত আর নিপীড়িত জনগণকে' সুযোগ করে দেয় 'তাদের প্রত্যাশা আর চাহিদা খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতে।' দুর্গের দেয়ালের বাইরে সমবেত প্রজারা যখন তাদের স্মাটের দিকে তাকিয়ে থাকে, শাহজাহান তখন হয়তো তার মনোরঞ্জনের জন্য যমুনার তীরে 'ভয়ংকর খুনি বুনো হাতির পালের' প্রদর্শনী, সৈন্যদের কুচকাওয়াচ কিংবা কসরতবাজ এবং দড়াবাজদের উষ্টু কীর্তি দেখেছেন।

শাহজাহান, এরপরে পুরু গালিচা পাতা প্রকাশ্য দর্শনের দেহলির দিকে এগিয়ে যান যেখানে 'দেয়ালের মতো' স্থির আর পরিপূর্ণ নীরবতায়, চোখ মাটির দিকে রেখে তার অমাত্য আর অধিকারিকেরা তার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। সিংহাসন থেকে প্রতিটি মানুষের দূরত্ব সতর্কতার সাথে তার মর্যাদা অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। সকাল আটটার কিছুক্ষণ আগে, শাহজাহান যখন হারেমের ভেতর থেকে একটি দরজার নিচে দিয়ে বের হয়ে এসে দরবার কক্ষের যে বর্ধিতাংশে সিংহাসন রয়েছে সেদিকে এগিয়ে যেতে থাকেন, তখন তৃঝর্বনি আর নাকাড়ার

শব্দ ‘পৃথিবীর অধিশ্বর’-এর আগমনের সংকেত ঘোষণা করে। সিংহাসনের পেছনের দেয়ালের ওপর পাথরের জাফরি কাটা জালির পেছনে অবস্থান করে মহতাজ তার স্বামীকে নানা আবেদন বিবেচনা করতেন, প্রতিবেদন গ্রহণ করতেন, পছন্দনীয় নানা উপহার সামগ্রী পর্যবেক্ষণ করতেন আর রাজকীয় পতঙ্গশালা থেকে হাতি আর ঘোড়া নিয়ে এসে তাদের পরীক্ষা করতেন আর যদি প্রাণীগুলোকে দেখে মনে হয় যে তারা অপুষ্টিতে ভুগছে তাহলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্তদের শাস্তি দিতেন দেখে আর শুনে। শাহজাহানের নিকটবর্তী হতে আগ্রহী সব লোকেরই ডান হাতের উল্টা পিঠ মেরোতে ঘষতে আর ডান হাতের তালু কপালে ঠেকিয়ে ক্রমাগতভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাতে জানাতে অহসর হতে হতো। স্ম্রাটের কাছে পৌছাবার পরে, লোকটাকে এবার আরো নিচু হতে হয় এবং নিজের ডান হাত মাটিতে স্থাপন করে এর উপরিভাগ চুম্বন করতে হয়। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে তিনি তার কপাল মাটিতে স্পর্শ করবেন বলে আশা করা হতো কিন্তু শাহজাহান এ প্রথা, যা আসলে আকবরের শাসনামলে প্রবর্তিত হয়েছিল, মুসলিম চিন্তাবিদদের সাথে আলোচনার পর, যারা মনে করে যে এর সাথে নামাজের সময় করা সেজদার প্রচুর মিল রয়েছে আর সে জন্য এটা সেজদাহতায়ালার প্রতি কটাক্ষপূর্ণ মেনে নিয়ে তুলে দিয়েছেন।

স্ম্রাট প্রায় দুই ঘণ্টা পর তার রাজ্যেজ্যষ্ঠ পরামর্শদাতাদের সাথে নিয়ে ব্যক্তিগত মন্ত্রণালক্ষে প্রস্থান করেন্তে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে। বিদেশি রাজ্যদ্বন্দ্বের দর্শন দিতে আর বুধবার ‘ডগ্রুহদয় নিপীড়িত ব্যক্তিদের’, শাহজাহানের দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতারা ন্যায়বিচার প্রার্থীদের এ বিশেষণেই সম্বেদিত করেছে, ন্যায়বিচার করতে। শাহজাহান, যিনি নিজে একজন দক্ষ চারুলিপিকর ছিলেন, তার প্রদণ কিছু আদেশ নিজেই লিখতেন। অন্যগুলো তার ‘দক্ষ সচিবরা’ লিপিবদ্ধ করতেন আর স্ম্রাট নিজে সেগুলোর ভূলভূতি সংশোধন করতেন। এরপর এগুলোকে পাঠানো হতো ‘হারেমের সচিবের কাছে বহুল প্রশংসিত রাজকীয় সিলমোহর দিয়ে আদেশপ্রাণ্ডলোকে অলংকৃত, যা মহামান্য স্বার্গজী মুমুক্ষু আল-জামানির কাছে রাখিত রয়েছে।’ মহতাজ এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রগুলো প্রেরণের আগে আরেকবার পর্যালোচনার সূযোগ পেতেন। শাহজাহান সেইসাথে তাকে নিজের আদেশ প্রদান করতে আর রাজকর্মচারী নিয়োগের অধিকার দিয়েছিলেন। ১৬২৮ সালের অক্টোবর মাসে জারি করা একটি আদেশে আমরা দেখি একজন লোককে তার পূর্ববর্তী অবস্থান ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ করছেন, যা অন্য আরেকজন জোর করে কেড়ে নিয়েছিল। তিনি সেইসাথে পুনর্বহাল হওয়া ব্যক্তিকে আদেশ করছেন ‘মহামান্য স্ম্রাটের প্রবর্তিত আইন আর

প্রবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, সাধারণ জো আর কৃষকদের প্রতি যেন এমন আচরণ করে যাতে তারা স্মাটের প্রতি কৃতজ্ঞ আর সম্প্রস্ত থাকে...এবং সরকারি খাজনার একটি টাকারও যেন অপচয় না হয় বা হারিয়ে না যায়।' মমতাজের বৃত্তাকার মার্জিত সিলমোহরে ফার্সি কবিতার দুটো পঙ্কজি উৎকীর্ণ ছিল :

পরম করম্মাময় আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে মমতাজ মহল এই নশ্বর পৃথিবীতে  
আল্লাহতায়ালার প্রতিচ্ছায়া শাহজাহানের সহচর হয়েছেন ।

মমতাজ নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী ছিলেন—সব নথিপত্র পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে গঠে যে, শাহজাহান শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার পরামর্শ কামনা করতেন। মমতাজ অবশ্য কর্তৃত্বব্যৱক, উজ্জ্বল নূরের থেকে একেবারেই ভিন্ন বীতিতে নিজের প্রভাব খাটাতেন। তিনি তার ছেলেবেলা থেকে যে লোকটাকে চেনেন আর ভালোবাসেন সেই লোকটার সাথে তার সম্পর্কের প্রকৃতি এবং তার চরিত্রের নমনীয়তা আর বিচক্ষণতাও একটি কারণ ছিল। জাহাঙ্গীর নূরের ঝুঢ় কর্তৃত্বের সামনে প্রকাশ্যে আর স্পষ্টভাবে ঝুঢ়ে যাতা স্বীকার করায় বিদেশি পর্যটক আর নিজ দরবারের অমাত্যদের কাছে তাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছিল এটাও হয়তো সচেতনভাবে তাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। এক অখ্যাত দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুযায়ী, মহবত খান তার বিদ্রোহের আগে অভিযোগ করেছিলেন, পৃথিবীতে আর কোনো স্মাট 'তার নিজের স্ত্রীর অভিপ্রায়ের প্রতি এতটা অনুবর্তী নন' এবং তিনি এর সাথে আরো যোগ করতে পারতেন, সেইসাথে নিজের অমাত্যদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি একেবারেই বেখেয়াল। এই একই দিনপঞ্জি রচয়িতা মন্তব্য করেছেন, 'স্মাটের মনমানসিকতার ওপর নূরজাহান বেগম এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে মহবত খানের মতো দুইশজন লোক যদি এই মর্যাদা তাকে ক্রমাগত পরামর্শ দিতে থাকেন, তাদের শব্দচয়ন স্মাটের মনে কোনো স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারবে না।'

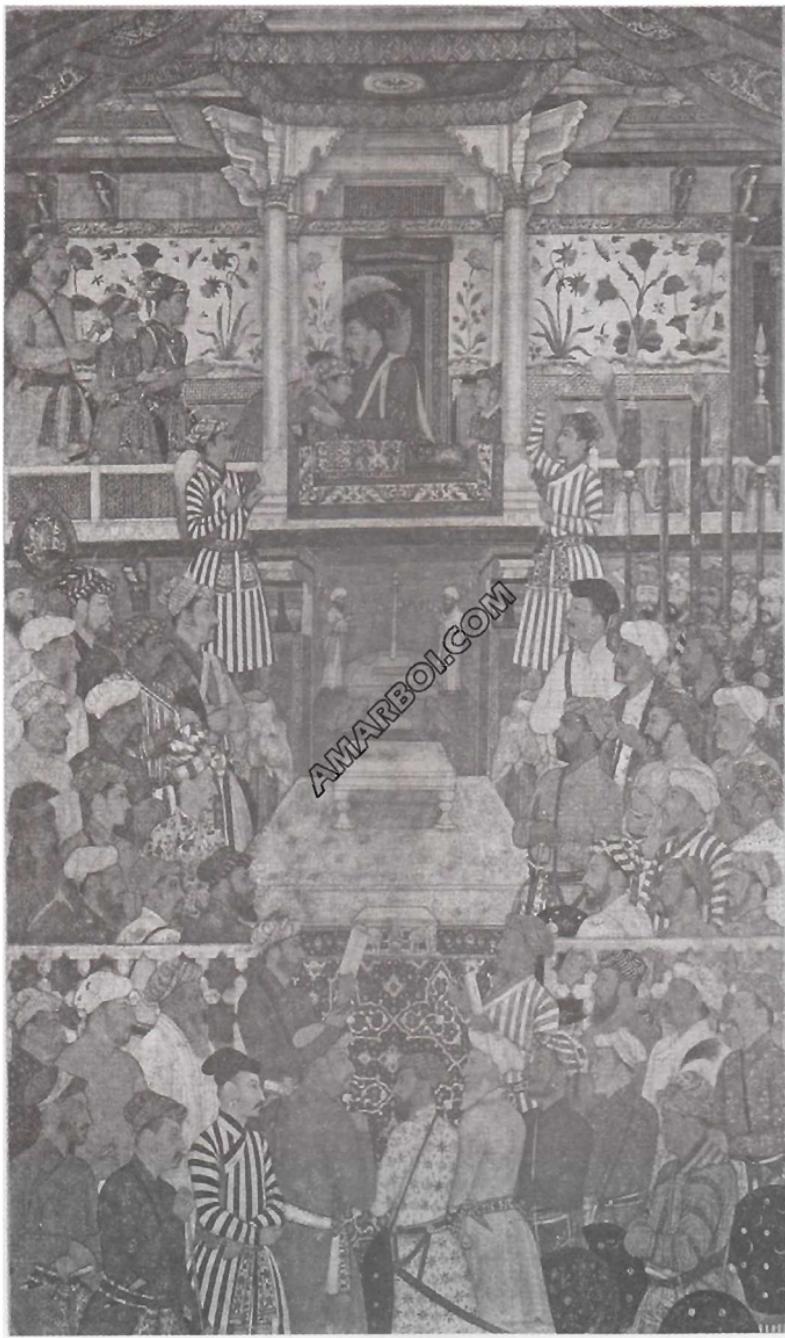
নূর অবশ্য জাহাঙ্গীরকে যখন বিয়ে করেন তখন তিনি একজন পরিণত বয়স্ক, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বিধবা। তিনি জাহাঙ্গীরকে সত্যিই ভালোবাসতেন এই বিষয়ে যদিও সামান্যই সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, সেইসাথে এটাও অবশ্য স্পষ্ট যে, ক্ষমতার প্রতিও তার সমান ভালোবাসা ছিল। নূর তাকে প্রশ্ন দিয়েছেন, আগলে রেখেছেন আর পালন করেছেন, কিন্তু এসব ছাপিয়ে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা হলো তিনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তার সিদ্ধান্তকে অন্যায়ে প্রভাবিত করতেন এবং শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে তিনি নিজেই সিদ্ধান্তগুলো



মমতাজ মহল

রত্নপ্রেমী শাহজাহান উষ্ণীষে পরিধান যোগ্য  
একটা অলঙ্কার পর্যবেক্ষন করছেন।

দি বিন্দি অভি চুনয়ার প্রাঠক খ্রক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~



সম্রাট হিসাবে অভিযন্ত হবার পরে সম্ভান্দের সাথে শাহজাহান পুনরায় মিলিত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

নিতেন। মমতাজ কখনো শাহজাহানকে নিয়ন্ত্রণ করতেন না। তিনি ছিলেন সব দিক থেকেই আক্ষরিক অথেই তার সঙ্গী। নির্বাসিত আর পলাতক জীবনে যে শারীরিক, মানসিক আর বুদ্ধিবৃত্তিক বক্ষন তাদের টিকে থাকতে সহায়তা করেছিল সেই একই বক্ষন এখন সন্ত্রাট আর সন্ত্রাঞ্জী হিসেবে তাদের সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করছে। মমতাজ কখনো নূরের মতো ছিলেন না, তিনি সব সময় কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলেছেন এবং স্বামীর সন্ত্রাঞ্জী ছিল তার একমাত্র কাম্য। রাজদরবারের এক সভাকবি বিষয়টিয় উদ্বেলিত হয়ে লিখেছেন :

তার আচরণের কারণে কখনো কোনো অসন্তোষ  
সন্ত্রাটের মনের মণিকোঠায় স্থান পায়নি।

তিনি সব সময়ই চেষ্টা করেছেন রাজাকে তৃণ করতে  
রাজাদের রাজার মেজাজ মর্জি সম্বন্ধে তার ছিল পরিপূর্ণ জ্ঞান।

রাজার সহচরী হিসেবে নিজের অগাধ ক্ষমতা সন্তোষ  
তিনি সব সময় তার প্রতি আনুগত্য আর অনুবর্ত্তিতা প্রদর্শন করেছেন।

তৃতীয়ত, রাজপ্রাসাদে সাম্রাজ্যের গোপ্যসমত অন্দরমহলে সন্ত্রাটের নির্বাচিত মন্ত্রণাপরিষদের বৈঠকে, যেখানে সুরক্ষার কক্ষে প্রজাদের সামনে দর্শনদানের পরে এবং মমতাজের দেখা প্রয়োজন এমন সব নথিপত্র হারেমে প্রেরণ করে, শাহজাহান কেবল ‘কতিপয় সৌভাগ্যবান রাজপুরুষ আর তার মুষ্টিমেয় পরীক্ষিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের’ই ডাকতেন, যাদের ভেতরে অবশ্যই মমতাজের আবাজান আসফ থান ছিলেন।

শাহজাহান অবশ্য, দুপুরের দিকে সন্ত্রাঞ্জী আর রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলার, যাদের ভেতরে তার কন্যা জাহানারা আর এগারো বছর বয়সী রোসন্নারাও থাকত, সাথে হারেমের নিরাপত্তার মাঝে দুপুরের আহারের জন্য যখন পুনরায় মিলিত হতেন তখন তিনি তার সাথে সারা দিনের দরবারিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করতেন। পুরুষ গালিচা পাতা মেঝেতে আসন পিঁড়ি হয়ে আহার করার পূর্বে, পরিষ্কার হয়ে নিতেন, মেঝেতে তখন আহারের জন্য সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া চামড়ার টুকরো দিয়ে সূরক্ষিত করা হয়েছে।

সন্ত্রাটের আহারের জন্য পরিবেশিত পদগুলো বর্ণাত্যতা আর চমৎকারিতার একটি রসনাবিলাসী মিশ্রণ। মোগলরা ভারতবর্ষে পারস্য, মধ্য এশিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব মিশ্রিত রঞ্জনপ্রণালী নিয়ে এসেছিল। আখরোট আর কিশমিশের সাথে সাথে ঘুবানি আর অন্যান্য শুকনো ফলের ব্যবহার আফগানিস্তান

ଆର ପାରସ୍ୟ ଥେକେ ଏସେଛିଲ । ମଧ୍ୟାପ୍ରାଚ୍ୟ ଆର ସେବାନେର ଯାଯାବର ଐତିହ୍ୟେର କାହିଁ ଥେକେ ତାରା ଧାର କରେଛିଲ ଶିକବିଜ୍ଞ କରେ ଡେଡ଼ା, ହୟ ପୁରୋଟା ବା କାବାବ (ଏଟା ଏକଟି ଉଦ୍ଦୂ ଶବ୍ଦ) ହିସେବେ, ସେଁକା ବା ଝଲସାନୋର ପଞ୍ଜତି । ମଧ୍ୟ ଏଶ୍ଯା ଥେକେ କନ୍ଦ ଜାତୀୟ ସବଜିର ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ କରା ହେଁଛିଲ, ଯାର ଭେତରେ ଛିଲ ଗାଜର ଆର ଶାଲଗମ, ଏଇ ସବଜିଗୁଲୋର ସାଥେ ଗୋଲମରିଚରେ ଡୁଙ୍ଗା, ଡେଡ଼ାର ମାଂସ ଆର ମାଖନ ସହଯୋଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହତୋ ପୋଲାଉ ଶୀତେର ତୈତ୍ରିତା ପ୍ରତିରୋଧ କରତେ ଯା ଶକ୍ତି ଜୋଗାତ । ମୋଗଲରା ଟକ ଆର ମିଟିର ବୈପରୀତ୍ୟ ଦାରୁଳ ଉପଭୋଗ କରତ, ଏଥିନ ଯା ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟେର ସାଥେ ଓତ୍ପ୍ରୋତଭାବେ ଜଡ଼ିଯେ ରହେଛେ । ତାରା ପ୍ରାୟଇ ଚିନି ଆର ଲେବୁର ରସ ତାଦେର ରାନ୍ନା କରା ପଦଗୁଲୋତେ ଯୋଗ କରତ ଏବଂ ମିଟିର ଶାଦ କାଟାତେ ଲବଣ ବ୍ୟବହାର କରତ ।

ମୋଗଲରା ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଭାରତବର୍ଷେର, ବିଶେଷ କରେ ହିନ୍ଦୁଦେର ନିରାମିଷ ରଙ୍ଗନପ୍ରଣାଲୀର, ପ୍ରଭାବ ଆର ରକମାରି ଶାଦେର ସାଥେ ନିଜେଦେର ଅପ୍ରିଭ୍ୟୁତ କରେ ନେୟ । ଯାର ଭେତରେ ଛିଲ ଦିଇୟେର ଆର ନାନା ଧରନେର ଡାଲ ଜାତୀୟ ଶ୍ୟେର ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର । ମୁସୁର ଡାଲ ଆର ଚାଲେର ସାଥେ ମାଖନ ଆର ନାନା ଧରନେର ମସଲା ଦେୟା ଏକଟି ପଦ ଶାହଜାହାନେର ଭୀଷଣ ପ୍ରିୟ ଛିଲ—ଭାରତୀୟ କୃଷକଦେର ମାଝେ ଖିଚୁଡ଼ି<sup>\*</sup> ନାମେ ପରିଚିତ ପଦଟିର ଆରେକଟୁ ଉନ୍ନତ ସଂକରଣ । ଭାରତର ରଙ୍ଗନରୀତିର କାହିଁ ଥେକେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯା କିଛୁ ତାରା ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲ ତାକୁ ଭେତରେ ଛିଲ ମୁଖେ ଜଳ ଆନା, ମୁଖେର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳେ ଦେୟା ତେତୁଭେବେ ବ୍ୟବହାର, ଯାର ଶାଦ-ଗନ୍ଧେର ସାଥେ ଅନ୍ୟ କୋନୋ କିଛୁରେଇ ସାଦୃଶ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାବର ଏବଂ ଖାବାରେର ରେ ଆର ଗନ୍ଧେର ଜନ୍ୟ ହଲୁଦେର ବ୍ୟବହାର । ନତୁନ ନତୁନ ବିଜଯ ମୋଗଲ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାଯାର ନତୁନ ନତୁନ ପଦ ଯୁକ୍ତ କରତେ ଥାକେ । କାଶୀର ଅଧିକୃତ ହବାର ପରେ ଫଳମୂଳ ଆର ସବୁଜ ଶାକମବଜି ଯେମନ ଓଳକପି ଆର ପାଲି ଶାକ ପ୍ରଭୃତିର ସାଥେ ସାଥେ ପାତିହାସେର ମତୋ ଜଳଚର ପାଥି ଅନେକ ବେଶ ମାତ୍ରାଯ ତାଦେର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାଯ ଯୁକ୍ତ ହତେ ଥାକେ ।

ଶାହଜାହାନ ଆର ମମତାଜେର ସମୟକାଳେଇ, ନତୁନ ଦୁନିଯାର ନାନା ଉପାଦାନ, ଯେମନ ଆଲୁ, ବର୍ତମାନେ ଯା ଭାରତେର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟବରସ୍ତ୍ର-ବଣିକରା ଆମ୍ରେରିକାସ<sup>\*\*</sup> ଥେକେ ଭାରତବର୍ଷେ ଆନତେ ଶୁରୁ କରେ । ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ଏଲାଟ, ଦାରୁଚିନି, ମୌରୀ, ଧନେ ଆର ତାଜା ଆଦାଇ ଛିଲ ପ୍ରଧାନ ସବ ମସଲା । ତଥିନୋ ଶୁକନୋ ମରିଚ—ନତୁନ ଦୁନିଯା ଥେକେ ଆଶ୍ରମ ଆରେକଟା ମସଲା—ଭାରତେ ଆସେନି, ତବେ ଅଚିରେଇ ପୌଛେ ଯାବେ । ରାନ୍ନାର ପ୍ରଣାଲୀ ଛିଲ ଜଟିଲ ଆର ସୃଷ୍ଟି । ଏକ ଇଂରେଜ ଭାବୁଲୋକ ଏମନକି ରାନ୍ନାର ସେଇ କୌଶଳଓ ରଣ୍ଟ କରେନ, ଯେଥାନେ ଏମନଭାବେ ଚାଲ

\* ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଡିଏନ୍‌ଏ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାୟ ଦେଖା ଗେଛେ, ଦକ୍ଷିଣ ପେରମ ଏକଟି ହାନୀଯ ଆଲୁର ଜାତ ଥେକେଇ ସାରା ପୃଥିବୀର ସମ୍ପତ୍ତ ଜାତେର ଆଲୁର ଚାଷ ଶୁରୁ ହେଁଛି ।

\*\* ଖିଚୁଡ଼ି ମୂଳତ ଜନପ୍ରିୟ ଇଙ୍ଗ-ଭାରତୀୟ ପଦ କେଡ଼ିଗ୍ରିର ଆଦିରୂପ, ଯା ସିନ୍ଧ ଡିମ ଆର ତାପା ମାଛେର ସାଥେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହୟ, ଆସଲ ରୂପ ଥେକେ ଯା ଅନେକାଂଶେଇ ବଦଳେ ଗୋଛ ।

সিঙ্ক করা হতো ‘এতটাই চাতুর্যের সাথে, যেখানে মসলা মিশ্রিত অবস্থায় প্রতিটি চালের দানা একটিও জোড়া না লেগে সব আলাদা ঝরবারে থাকত এবং এসব কিছুর মধ্যে থাকত একটি সিঙ্ক মুরগি।’ আন্ত মুরগির ভেতরে কীভাবে অন্য মাংস, ডিম, ধনেপাতা আর আদার পুর দেয়া হতো সেসব উন্নত রক্ষনপ্রণালী আজও টিকে আছে। দমপেক্ত—খুবানি দেয়া মুরগি কিংবা গরুর মাংস প্রথমে আগুনে ধীরে ধীরে সিঙ্ক করে তারপর টকদই আর মাখন দিয়ে দমে দেয়া হয়—ছিল আরেকটা দারুণ জনপ্রিয় রান্না। দম শব্দের ভারতীয় অর্থ ‘শ্বাসপ্রশ্বাস’ এবং মোগল রাঁধুনিরা পরিবেশনের ঠিক আগমহূর্তেও তাদের পদগুলোকে দমে রাখত বা অল্প আঁচে আগুনের ওপর রাখত, যা আধুনিক সেফদের কাছে দারুণ প্রয়োজনীয় একটি কৌশল। কিছু রক্ষনপ্রণালীতে পদগুলোয় ধোয়া দিতে ঢাকনাযুক্ত তাপনিরোধক একটি পাত্র থাদে পূর্ণ করে তার মাঝে গনগনে কয়লা রাখা হতো, তারপর পনেরো মিনিটের জন্য পাত্রটাকে বায়ুনিরোধক করে বন্ধ করে দেয়া হতো যাতে ধোয়ার গুঞ্জ খাবারের মাঝে প্রবাহিত হতে পারে।

রাজকীয় রক্ষনশালা ছিল একটি আলাদা স্বাধীন বিভাগ। রাঁধুনিরা খাবারগুলোকে এখানে এমন একটি পর্যায়ে রাখত যে স্মার্ট আদেশ দেয়ার এক ঘটার ভেতরে একশ পদের রান্না পরিবেশন করা যায়। ভোজসভার জন্য খাদ্যব্য সজ্জনায় সোনা আর রুপার তবক্ক ব্যবহৃত হবার সাথে সাথে শুকনো ফল আর নানা ধরনের ওষুধি তৃণলতা ব্যবহৃত হতো। সোনা আর রুপার তৈরি তশতরিতে খাদ্য পরিবেশিত হতো। এবং কখনো বিশেষ এক ধরনের জেড পাথরের তশতরি ব্যবহৃত হতো বলা হয়ে থাকে, যা বিশের বি঱ংক্ষে প্রতিষেধকরূপে কাজ করত। বুয়া, দিপ্পির নিহত সুলতানের মাতা, বাবর নতুন ভারতীয় রান্নার স্বাদ পরবর্তী করার সময় বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যাচাষ্টা করেছিল এবং বিষপ্রয়োগের ব্যাপারে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। রাঁধুনিরা যখন রান্না করত কানাতের তিরক্ষণী ব্যবহার করে তখন কৌতুহলী চোখের দৃষ্টির সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হতো। রাঁধুনিরা তাদের পোশাকের আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে আর প্রান্তদেশ গুঁজে রেখে উন্নুন আর পাত্র থেকে পরিবেশনের জন্য খাবার তশতরিতে তুলত কেবল এটা নিশ্চিত করতে যে, তারা যেন কোনো ধরনের বাড়তি দ্রব্য খাবারে মিশ্রিত করার সুযোগ না পায়। রাঁধুনিরা যারা স্মার্টের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রস্তুত করেছে তারা প্রথমে, তারপরে তাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং সবশেষে রক্ষনশালার প্রধান বাবুটি সেটার স্বাদ নিত।\*

\* পুরাতন দিপ্পির জনাকীর্ণ সড়কে অবস্থিত করিমের রেঙ্গোরা মোগল বাবুটিদের বৎস্থধরদের দ্বারা পরিচালিত, যারা দাবি করে যে, ‘রাজকীয় খাবার প্রস্তুত করা তাদের বৎস্থানক্রমিক পেশা’।

হারেমে খাবার নিয়ে যাবার আগে, প্রতিটি খাবারের তশতরি আলাদাভাবে কাপড় দিয়ে মোড়া হতো এবং রঞ্জনশালার প্রধান বাবুর্চি সেখানে প্রতিটি পদের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে তাতে নিজের সিলমোহর দিতেন, যাতে কেউ কোনো তশতরি বদলে দিতে না পারে। তারপর রাঁধুনি আর অন্য পরিচারকরা হারেমে খাবার ভর্তি পাত্রগুলো বয়ে নিয়ে যেত। অবাস্তুত উপদ্রব দূরে রাখতে খাদ্য বহনকারীদের সামনে আর পেছনে প্রহরী আর রাজদণ্ডবহনকারী লোক থাকত। রঞ্জনশালার প্রধান এই দলটার সঙ্গে ধোকাত আর হারেমের প্রবেশ দ্বারে খাবার পর্ব সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় প্রহরীরা তাকে চোখে চোখে রাখত। হারেমে উপণীত হবার পর, পুনরায় খাবার পরিষ্কার করা হতো, এই দফায় হারেমের খোজা প্রহরী আর যেয়ে পরিচারিকারা কাজটা করত শাহজাহান আর মমতাজ মহলের সামনে। এরপরই কেবল তারা খাবার পরিবেশন করত।

তারতবৰ্ষ আর মুসলিম দুনিয়ায় প্রচলিত রীতি হলো ডান হাতের (বাম হাত কখনো ব্যবহার করা হয় না) আঙুল দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা। পরিচারিকার দল আরো খাবার নিয়ে আসতে বা মাছি তাড়াতে মোড়ার লেজের চুল দিয়ে প্রস্তুত ঝাড়ন নিয়ে দাঁড়িয়ে ধোকাত, বছরের কোম্পনি কোনো সময় যাদের উপদ্রব এড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠত। আহার পর্ব সমাপ্ত হলে, কলাই জাতীয় ডালের মস্ত গুঁড়া দিয়ে তেলচর্বি পরিষ্কার করে তারপর হাত ধোয়া আর কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা হতো।

মধ্য এশিয়ার আপেল আর স্নাশপাতি, পারস্যের আর মধ্য প্রাচ্যের ডালিম, কমলাগেন্দু, খেজুর আর ডুমুরের পাশাপাশি মোগলরা ভারতীয় ফলেরও কদর করতে শুরু করে। বাবর পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেন যে, ‘আম যখন ঠিকমতো পাকে সেটা সত্যিই খেতে উপাদেয়’, যদিও তিনি অভিযোগ করেছেন, ভালো আম অল্লাই পাওয়া যায়। তার উপরস্থিরি কলা, চিনির শিরায় ডোবান আপেলের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং নথিপত্র থেকে যতটুকু জানা যায়, এমনকি কাঁঠালও বাদ যায়নি, বাবর যাকে নাকচ করে দিয়েছেন এই বলে যে, ‘অবিশ্বাস্য ধরনের কৃৎসিত আর তার চেয়েও বাজে স্বাদ—ফলটা দেখতে আক্ষরিক অর্থেই ভেড়ার অতিভোজনে ঠাসা পাকস্থলীর মতো পেট থেকে বের করা নাড়িভুঁড়ির মতো দেখতে (এবং) বাড়াবাড়ি ধরনের মিষ্টি স্বাদ।’ জাহাঙ্গীর লিখে গেছেন কীভাবে তার আকবাজান আকবর, ‘ফরাসিদের বন্দরে প্রাণ’, নতুন দুনিয়া থেকে আমদানি করা আরেকটা ফল, আনারসের চাষ করেছিলেন। ফলটার স্বাদ আর গন্ধ অসাধারণ। ‘আঘায়... প্রতিবছর কয়েক হাজার আনারস উৎপন্ন হয়।’

রঞ্জনশালার লোকজন সবচেয়ে সেরা উপকরণটা সংগ্রহ করতে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করত। শাহজাহান সিংহসনে আরোহণের দিশ বছর পূর্বে, আবুল ফজলের প্রস্তুত করা একটি তুলনামূলক তালিকা থেকে জানা যায়, একটি পাতিহাস যা প্রায়ই কাশীর থেকে কিনে নিয়ে আসা হতো, অন্যায়ে একটি আন্ত ভেড়ার মূল্যের অর্ধেক হতে পারে, যখন কাবুল থেকে খাইবার গিরিপথ দিয়ে আমদানি করা সেরা জাতের তরমুজের দাম এর চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে।

পানীয় জল আর বরফের জন্য পৃথক একটি দণ্ডরই ছিল। বর্তমান সময়ের খনিজ পানির রসজ্জের ন্যায়, প্রত্যেক মোগল স্ম্রাট ভিন্ন ভিন্ন শাদের পানীয় জল পছন্দ করতেন। আকবর পছন্দ করতেন গঙ্গার পানি এবং তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন সেখানেই দূষণ কিংবা অবৈধ হস্তক্ষেপ পরিহার করতে সিল করা চামড়ার মশকভর্তি পানীয় জল প্রতিদিন ভিত্তির দল পৌছে দিত। জাহাঙ্গীর এটা ঝুঁতুরুতে ছিলেন না কিন্তু বিচক্ষণতার সাথে জলাধারে সামান্য সময়ের জন্য রক্ষিত এমন পানীয় জলের পরিবর্তে বহুমান উৎস কিংবা বরনা থেকে সংগৃহীত পানিই পান করতে পছন্দ করতেন। শাহজাহান যমুনার ‘গলিত তুষার’ বলে তিনি যাকে অবহিত করতেন কেবলই সেই পানিই পান করতেন। গ্রীষ্মকালে তিনজনই শীতল পানীয় জল আর শরবত পান করতে পছন্দ করতেন। উচ্চর-পশ্চিমের পাহাড়ি এলাকা থেকে নৌকা, গরুর গাড়ি আর বাহকদের দ্বারা বরফ নিয়ে আসা হতো এবং মাঝে মাঝে শীতলকারী উপাদান হিসেবে যবক্ষার বা সোরাও ব্যবহৃত হতো। রাজপরিবারের সদস্যরা ধূসর, গোলাপি রঙের ক্ষটিকের বা সাদা অথবা সবুজ জেড পাথরের পানপাত্র থেকে পান করত।

শাহজাহান মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হবার পরে বিশ্রাম নিতেন, কিন্তু তার নিয়োজিত ঐতিহাসিকরা অনেকটা সাধুমন্দন্যতায় দাবি করেছেন, কার্যদিবসের এই পর্যায়ে কখনো যৌনক্রিয়াকে প্রশ্রয় দিতেন না। ‘মহামান্য স্ম্রাট—অন্যান্য তুচ্ছ নৃপতির মতো ছিলেন না—এমনকি পরিত্র জেনানামহলেও দৈহিক লালসা আর ইন্দ্রিয় সুখকে প্রশ্রয় দেয়া থেকে বিরত থাকতেন এবং দরিদ্রদের অনুরোধ অনুমোদনে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।’ মমতাজ দরিদ্র নিঃশ্ব মেয়ে যৌতুক, কাপড় আর গহনার অভাবে দুর্দশার মধ্যে যয়েছে বা খাসজমি মঞ্চের কিংবা ভাতার অভাবে কষ্টে থাকা এতিম আর দুঃস্থ বিধিবাদের আর্জিগুলোর প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পারস্যের অধিবাসী তার প্রতিভাধর বক্তু সাতী আল-নিসা খানানের ওপর নির্ভর করতেন, যাতে তিনি তার স্বামীর সামনে বিষয়গুলো উত্থাপন করতে পারেন, যিনি তারপর তাদের অভাব অভিযোগ দূর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ দেবেন। সাতী, দরবারের

ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘তার অভিজাত আদব-কায়দা, বাগিচা, আত্মবিশ্বাস আর অসাধারণ কর্মকুশলতার’ কারণে মমতাজের বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। মমতাজের মেয়ে জাহানারাকে, কোরআনে বৃৎপন্ন, সাতী ফার্সিতে সাহিত্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দিত, মমতাজ নিজেও ফার্সিতে সাহিত্য চর্চা করতেন।

স্বাট মধ্যাহ্নের বাকি সময় আর বিকেলের প্রথমভাগে অসমাঞ্ছ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতেন, পুনরায় দরবারে এবং দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদে নামাজের জন্য উপস্থিত হতেন। রাত প্রায় আটটার সময়, তিনি সাক্ষ্যকালীন আহার আর রাতের মনোরঞ্জন—‘তারের মূর্ছনা বা সুন্দর গান’, কখনো মমতাজের সাথে একহাত দাবা খেলতেন যার ঘুঁটিগুলো সোনা, রূপা, চন্দনকাঠ বা হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বা রতিক্রিয়ার জন্য হারেমে ফিরে আসতেন। সন্ধ্যার এই সময় নাগাদ, রাজকীয় আবাসস্থল শত সহস্র মশাল, প্রদীপ আর মোমবাতির কোমল আভায় আলোকিত হয়ে উঠত। রাজপরিবারের আগন্তের উৎস, অজিনগিরি বা অগ্নি-গাত্রে একটি পবিত্র কম্পিত শিখা, দরবারের একজন আধিকারিক রক্ষণাবেক্ষণ করত। প্রতিবছর সূর্য যখন মেষরশির ১৯ ডিশেতে আগমন করত তখন আলো আর আগন্তের প্রতি আকবরের ভালোবাসার কারণে তার প্রবর্তিত একটি কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে শিখাটা বছরে একবার প্রজ্ঞালন করা হতো। পরিচারকরা একটি দৃতিময় সাদা পাথর সূর্যের উষ্ণ শিখায় উন্মুক্ত করত। তারা এরপর সুতির মসৃণ এক টুকরো কাপড় তঙ্গ পাথরের পাশে স্থাপন করত যতক্ষণ না কাপড়ের টুকরোটায় আগন জুলে ওঠে।

প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময়, রাজকীয় পরিচারকরা কর্পূরের গন্ধমুক্ত বারোটা মোমবাতি প্রজ্ঞালন করত। এবং সেগুলোকে সোনা আর রূপার তৈরি মোমদানিতে রেখে স্বাটের সামনে নিয়ে আসত। দরবারের একজন গায়ক তখন উচ্চস্থরে আশ্বাহর প্রশংসা শুরু করতেন এবং মঙ্গলময় রাজতৃকাল অব্যাহত থাকার জন্য দোয়া করতেন। সমস্ত প্রাসাদকে এরপর আলোকিত করা হতো। কিছু মোমবাতি ছিল বিশালাকৃতির। আকবর একটি মোমদানির উজ্জ্বাল করেছিলেন, যেখানে পাঁচটা পিলসুজ ছিল, যার প্রতিটি একেকটা প্রাণীর আকৃতির আর মোমদানিটা তিন ফুট উঁচু একটি উপস্থিতের ওপর দণ্ডয়মান থাকত। নয় ফুট বা তার চেয়েও লম্বা, সাদা মোমবাতি সেখানে জুলত আর পরিচারকরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে মোমবাতিগুলোর সলতে নির্বাপিত করত।

চন্দ্ৰকলা অনুযায়ী প্রাসাদের আলোকসজ্জায় তারতম্য ঘটত। প্রতি চন্দ্ৰ মাসের প্রথম তিন রাত্রি, যখন চাঁদের আলোর সময়কাল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত তখন কাঁসা,

পিতল বা তামার বিশালাকৃতি দিয়া, অগভীর পাত্র সরিষার তেলে পূর্ণ করে সেখানে আটটি শিখা প্রজালন করত। প্রাসাদের সংযোগ স্থাপক পথ আর দরদালানের দেয়ালে অবস্থিত কুলঙ্গিতে পরিচারকরা সেই দিয়াগুলো স্থাপন করত। চন্দ্ৰ মাসের চতুর্থ দিন থেকে শুরু করে দশম দিন পর্যন্ত তারা প্রতি রাতে ক্রমাগ্রামে একটি করে সলতে কমাতে থাকত, যাতে করে দশম রাতে চাঁদের আলো যখন সবচেয়ে দুর্তিময়, তখন দিয়ায় যেন কেবল একটি সলতে জুলে। পুরো প্রক্রিয়াটা এভাবেই ঘোড়শ রাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত থাকত। এবার তারা কেবল পুনরায় প্রতি রাতে একটি সলতে বাড়াতে থাকে।

কোমল আলোকসজ্জায় হারেমের ইন্দ্ৰিয়গ্রাহ্য অনুভব বাঢ়িয়ে দেয় যেখানে পরিশ্রান্ত নতুন স্ম্রাট দীর্ঘদিনের শেষে বিশ্রাম নেন। বিয়ের ঘোলো বছর এবং বারোজন সত্তান জন্ম দেয়ার পরও, শাহজাহানের কাছে মমতাজের অনন্য ঘোনাবেদন তখনো স্পষ্টতই আটুট। তার বয়স এখন ত্রিশের শেষ ভাগে, যে বয়সে অধিকাংশ স্ত্রী আর রক্ষিতাকে ঘোন সংস্গরের পক্ষে রীতিমতো বৃদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু ফুপুজান নূরের মতো তার সৌন্দর্যও নিশ্চয়ই আটুট ছিল। স্ম্রাটের শ্যায়সঙ্গিনী হতে নিজের দেহ পরিষ্কার এবং এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে কৰ্তৃপক্ষ অবশ্য প্রসাধনের দুর্দান্ত সাজসরঞ্জামের ওপর নির্ভর করতেন, যাত্র ভেতরে রয়েছে কালো চুলের দীপ্তি বাড়াতে নানা ধরনের ফুলের পুঁতি, বীজ আর তেল দ্বারা প্রস্তুতকৃত মিশ্রণ, কালো অ্যান্টিমনি সালফাইড গুঁড়া—কাজল—চোখের প্রান্তদেশ রঞ্জিত করতে এবং দেহের উষ্মাঞ্চিত কেশ অপসারণের জন্য শৰ্খ ভন্দ্য আর কলার রসের মিশ্রণের ব্যবহার।\*

মমতাজের কাছে সেইসাথে অবশ্য সবচেয়ে চিন্তাকর্ষক পোশাকের সহজলভ্যতাও ছিল—চুনি লাল বা গোলাপ-বেইন বা ধূসর কমলা থেকে রংধনুর আভাযুক্ত মসৃণ রেশম বা স্বচ্ছ, মাকড়সার জালের মতো পাতলা মসলিন, যা বয়নের সূক্ষ্মতার কারণে ‘প্রবাহিত জলস্তোত’, ‘জমাট বাযুপ্রবাহ’, এবং ‘সাঁবের শিশিরকণা’ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। আঁটসাঁটো পাজামা বা সালওয়ার—মেয়েদের পাওয়ালা অন্তর্বাস এসব কাপড় দিয়ে প্রস্তুত করা হতো, যা মুক্তার গাঁট দিয়ে বাঁধা থাকত—বুকের সাথে চেপে বসা চোলি বা কাঁচুলি, যা বুকের সামান্য অংশই আবৃত করত এবং বিজয় সংকেত আকৃতির গলাবিশিষ্ট পেসভাজ, বুকের কাছে থেকে শুরু হয়ে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা স্বচ্ছ

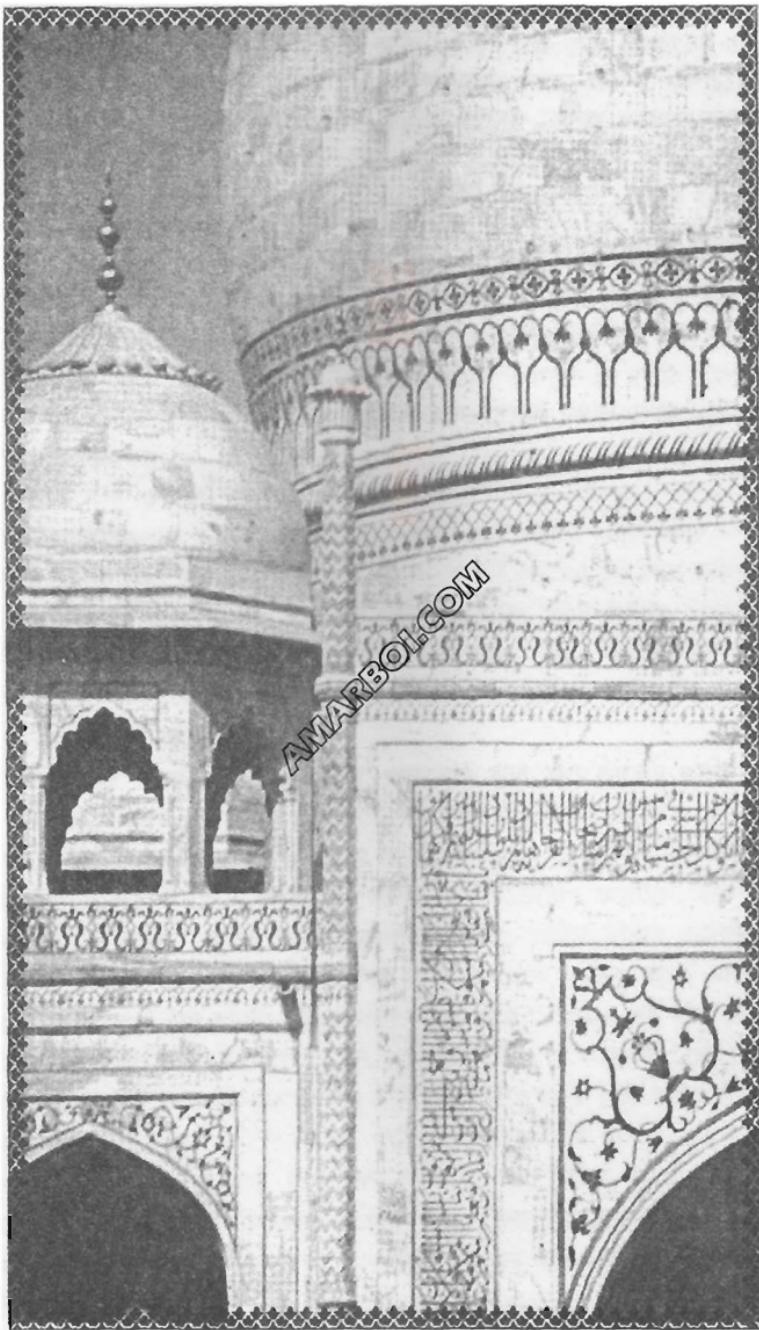
\* মোগলদের রূপচর্চার অনুষঙ্গ সমসাময়িক কালের ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, যেখানে শরীরের অবাঞ্চিত কেশ অপসারণের জন্য মেয়েরা বিড়ালের বিষ্ঠার সাথে প্রস্তাবের মিশ্রণ ব্যবহার করত এবং ইন্দুরের চামড়া দিয়ে চোখের নকল পাপড়ি তৈরি করত।

ঢোলা কোট। মোগল রমণীদের পোশাক-পরিচ্ছন্দ তখনো যদিও ভীষণভাবে তুকি প্রভাবযুক্ত, তারা চূল বাঁধার ক্ষেত্রে দ্রুত হিন্দু রীতি গ্রহণ করে। চূল খোলা অবস্থায় দুই পাশে ছেড়ে রাখার বদলে তারা চূলের গোছা বৃত্তাকারে পাকাতে শুরু করে ‘মাথার পেছনে একটি সমতল প্যাড তৈরি করে, যেখান থেকে কয়েক গোছা বাঁকানো চূল বের হয়ে থাকে।’ মমতাজ সব সময় মাথায় সোনালি নেকাব দিয়ে আবৃত রাখত বা অস্ট্রিচের পালক আন্দোলিত উজ্জ্বল রেশমের উষ্ণীয় পরিধান করত। স্বাটোরে প্রিয়তম স্ত্রী হিসেবে যিনি আবার রঞ্জপাথরের প্রতি আগ্রহী, তার কাছে চমৎকার আর সুনির্মিত রঞ্জ থাকা অসম্ভব ছিল না। রাজকীয় হারেমের একজন রমণীকে চিকিৎসা করার সুযোগ লাভকারী এক ইউরোপীয় চিকিৎসকের কাছ থেকে আমরা সামান্য ইঙ্গিত পাই তিনি আদতেই কী পরিধান করতেন। চিকিৎসক অভিযোগ জানান, ‘তারী বালা বা মুক্তার কবজি বন্ধনীর কারণে, যা সাধারণত নয় কি বারো বার কবজিতে পেচানো থাকত’, তিনি তার রোগীর নাড়ি ঠিকমতো নির্ণয় করতে পারছেন না। স্বাটোর ঘোন সংগোষ্ঠী বিধান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মমতাজ নিশ্চয়ই কোনো কৌশল ব্যবহার করত ক্রমাগতভাবে গৰ্ভধারণ করার ফলে তার শীথিল হয়ে পড়া যোনিপথ, মদন-মন্দির বা ভালোবাসার মন্দিরের প্রবেশ-ঘার তার আনন্দবর্ধনের জন্য সংকীর্ণ করতে। তিনি হস্তভোজ তার যোনিপথের দুই পাশের তুকে ডালিমের রস বা দুধের সাথে পদ্মমল্লোর পাপড়ি বাটা, কপূরের সাথে মধু মিশ্রিত সুগন্ধি মিশ্রণ সৃষ্টিভাবে প্রয়োগ করতেন। মেয়েদের যৌনত্বপুরুষ অনুভবের প্রয়োজনীয়তার দিকেও লক্ষ্য স্থাপন করতে এবং বিভিন্ন ধরনের ঘোন উদ্দেজনাবর্ধক মিশ্রণ ছিল মেয়েদের রাগমোচনে সহায়তা করতে। কেউ তাদের যোনিপথের অভ্যন্তরে বড় মৌমাছি থেকে প্রাণ মধুর সাথে আদা আর কালো গোলমরিচের গুঁড়া মিশ্রিত করে প্রয়োগ করতেন। অন্য সব ঘোন উদ্দেজনাবর্ধক মিশ্রণ রতিক্রিয়ার দুই ঘন্টা পূর্বে প্রেমিকের লিঙ্গে প্রয়োগ করা হতো; বলা হতো লিঙ্গের আকৃতি বৃক্ষি করে আর উদ্দেজনা বাড়িয়ে দিয়ে এসব মিশ্রণ মেয়েদের যৌনসুখের তুঙ্গে নিয়ে যেত। পুরুষদের দ্রুত বীর্যপাত রোধ করতেও অনেক ধরনের পদ্ধতি ছিল, কেউ আফিম গিলে ফেলতেন এবং পুরুষকে স্ট্যালিয়নের মতো যৌনশক্তি দান করতে পারে এমন সব কার্যকর কামোদ্দীপক বস্ত্রও ছিল। সম্মিলিতভাবে ‘আশ্বের শক্তিশাল’ নামে পরিচিত একজাতীয় ঘোন উদ্দেজনা সৃষ্টিকারী উদ্দীপক ভীষণভাবে জনপ্রিয় ছিল।

তিনি আর মমতাজ যে পদ্ধতিরই সহায়তা নিয়ে থাকুক, শাহজাহান রতিক্রিয়া শেষে তার প্রিয় বইসমূহ থেকে, যার ভেতরে ছিল বাবরের রোজনামচা বা তৈমূরের অভিযানের বর্ণনা, সুকচ্ছের অধিকারী মহিলাদের দ্বারা, যারা তিরঙ্গরণীর আড়ালে অবস্থান করত, উচ্চ স্বরে পাঠ করা শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে পছন্দ করত।

শাহজাহান যতটা আশা করেছিলেন বা কামনা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক দ্রুত যুদ্ধযাত্রার জন্য তার নিজের ডাক আসে। মোগল সাম্রাজ্য সমক্ষে এক ইউরোপীয় পর্যটক যেমন মন্তব্য করেছে, '(স্ট্রাট) যিনি মোগল শক্তির কাছে কোনো ধরনের অনীহা প্রদর্শন ছাড়াই অনুবর্তী হন যখন তার শিবির কাছে রয়েছে, যখন তিনি জানেন যে শিবির দূরে তখন সাথে সাথে তিনি অনুবর্তিতা পরিহার করেন, যা উৎসেজনা তৈরি করে মোগলদের জন্য অন্তহীন বামেলা সৃষ্টি আর ব্যয়বৃদ্ধি করেছে।' বামেলার উৎস এইবারও আবারও দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধ, বিদ্রোহী সূলভানের। ১৬২৯ সালের শেষ মাগাদ, শাহজাহান তার বাহিনী নিয়ে দক্ষিণে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। মহতাজ, তার অয়োদ্ধা গর্ভধারণের প্রায় শেষের দিকে, বরাবরের মতোই শামীর সঙ্গী হন। তিনি আর কখনো আঘা বা যমুনার তীরে মাঝ অঙ্কুরিত হতে পুর করা তার নতুন চতুরযুক্ত উদ্যান আর কখনো দেখবেন না।

AMARBOI.COM



## অষ্টম অধ্যায়

### আমার জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করবেন

ইংরেজ করণিক পিটার মানতির ভাষ্য অনুসারে আগুয়ান মোগল বাহিনী, ‘একটি রাজসিক, যুদ্ধদেহী আর দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য’, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে এমনই একটি ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী সময়ের বাধা বাধা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এ বিষয়টি দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে।<sup>\*</sup> পুরো বহরটার ভেতরে প্রথমে আবির্ভূত হতো কাঠের কামানবাহী শকটে টেনে নেয়া কামান নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনী। কামানগুলোর কোনোটার, যেমন শাহজাহান যেটার নাম দিয়েছিলেন ‘বিশ্ববিজেতা’, সেটার নলের দৈর্ঘ্য ছিল সতেরো ফিট। বিপুলসংখ্যক মালবাহী লটাড়ির পেছনে, ধূলার সমুদ্রের মাঝে, ‘জাহাজের বহরের মতো’ এগিয়ে আস্তু মালবাহী হাতির পাল, সারি সারি থৃতু নিক্ষেপকারী উট আর ধৈর্যশীল ঝঁঢ়রের দল আর ষাঁড়-টানা হাজার হাজার শকট। লটাড়ির সাথে কেওগল আর দুই পাশ তীক্ষ্ণাগ্র ভারী কুড়াল কাঁধে মজুরের দল এগিয়ে যেত। পথে যেকোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তারা প্রস্তুত।

প্রধান পদাতিকবাহিনী এরপর দৃশ্যপটে উপস্থিত হতো এবং ‘হাজার হাজার অশ্বারোহী, প্রত্যেকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, আড়াআড়িভাবে মূল দলের পাশে অঙ্গসর হতো, তাদের বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকা রেশমের নিশানে তাদের সেনাপতিদের প্রতীক গর্বের সাথে উৎকীর্ণ রয়েছে।’ তাদের পেছনে রাজকীয় হাতির বহর, মখমল আর সোনার সূতা দিয়ে বোনা কাপড়ে জমকালোভাবে সজ্জিত, সোনা আর রূপার বর্ষপাত, শিকল আর ঘণ্টার ধাতব

\* ১৯২০ সালে হলিউডের নিজস্ব চলচ্চিত্র স্ট্রাটদের বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষণ হিসেবে মোগলদের উপকথাখ্যাত শক্তি আর বিলাসবহুল ঐশ্বর্য প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয়। মূল অভিনেতাকে বর্ণনা করতে ‘তারকা’ শব্দটা আরো একল বছর পূর্বে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।

ধ্বনি করতে করতে মন্ত্র গতিতে অঞ্চল হতো। বিশেষভাবে প্রিয় জনপ্রিয় উদীয়মান সুর্যের প্রেক্ষাপটে উৎকীর্ণ ব্যাঙ্গের রাজকীয় পতাকা বহন করত। তারপর স্মার্ট যুবরাজ আর তাদের দেহরক্ষীদের এগিয়ে আসতে দেখা যেত, এই দলটার ঠিক পেছনেই নাকাড়া, তৃণ আর লম্বা বাঁশি বাজাতে বাজাতে হাতি কিংবা ঘোড়ায় আরু বাদ্যযন্ত্রীর দল অবস্থান করত এবং এরপর সবশেষে এগিয়ে আসত পশ্চাদরক্ষীর দল, ‘যাদের বর্ণাশলো, ভীষণ লম্বা, চওড়া আর ঝকঝকে হওয়ায়, সুর্যের আলোয় ভীষণ উজ্জ্বলভাবে ঝলমল করতে থাকত।’ সবার শেষে পরিচারক আর পণ্য এবং সেবা বিক্রি নিমিত্তে অনুসরণকারী লক্ষ্যধিক অসামরিক লোকজন পরিশ্রান্ত ভঙ্গিতে অঞ্চল হতো।

এই ভীতি উদ্বেক্ষকারী জমকালো শোভাযাত্রা অনেক অনুশীলনের পরই জন্ম নিয়েছে—সব মোগল স্মার্টই তাদের রাজত্বকালের এক-তৃতীয়াংশ সময় সঞ্চারমান অবস্থায় অতিবাহিত করেন, হয় যুদ্ধাভিযান পরিচালনার নিমিত্তে কিংবা সাম্রাজ্য পরিদর্শনে, আবুল ফজলের ভাষ্য অনুযায়ী যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছাতে এক বছর সময় লাগে, আয়োজিত সফরে বের হয়ে এক শিবির থেকে অন্য শিবিরের দিকে এগিয়ে চলেন। স্মার্টের সঙ্গে, তার সিংহাসন এবং রাজকীয় নথিপত্র আর দলিল সঙ্গে বেজ থেকে শুরু করে—যার পরিমাণ এতই বিশাল যে সেগুলো বহন করতেই অসংখ্য মালবাহী শক্তির প্রয়োজন—স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলে, রূপাল জারি দিয়ে তৈরি কাপড়ের সম্মানসূচক আলখাল্লা, উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য রত্নখচিত তরবারি পর্যন্ত, প্রশাসনিক বহুবিধ খুটিনাটি অনুষঙ্গ থারে। এক মোগল সেনাপতির বিবেচনা অনুযায়ী, ‘সেনাবাহিনীর সাথে যদি কোথাগুর থাকে, সেনাবাহিনীকে (রসদ সরবরাহের জন্য) অনুসরণকারী বাণিকদের মাঝে এক ধরনের নিরাপত্তাবোধও জন্ম নেয়।’

স্মার্ট হালকা জলখাবারের জন্য কখনো সাময়িক যাত্রাবিরতি করবেন এবং তার অভিপ্রায় আগেই বুঝে নিয়ে সব কিছু সেভাবেই প্রস্তুত রাখা হতো। স্মার্টের সাথে রাজকীয় রঞ্জনশালা সে জন্য সব সময় একত্রে ভ্রমণ করত, সোনা, রূপা আর চিনামাটির বাসনপত্র খচেরের পিঠের দুই পাশে ঝোলানো খুড়িতে যত্নের সাথে মুড়ে রাখা হতো এবং রাজপরিবারের পানীয় জল আর রসদপত্র বিষপ্রয়োগকারীদের ভয়ে সব সময় কড়া পাহারায় রাখা হতো। তন্দুর—মোগলরা তাদের যায়াবর দিনগুলোতে মাটির তৈরি যে তগু ভাটি বা চুল্লি ব্যবহার করত এবং তাদের দ্বারা ভারতবর্ষে এর প্রচলন হয়—ভ্রমণের কালে দ্রুত খাবার প্রস্তুত করার, বিশেষ করে রুটি, মাংস আর ডাল রান্নার একটি কার্যকর মাধ্যম। \*

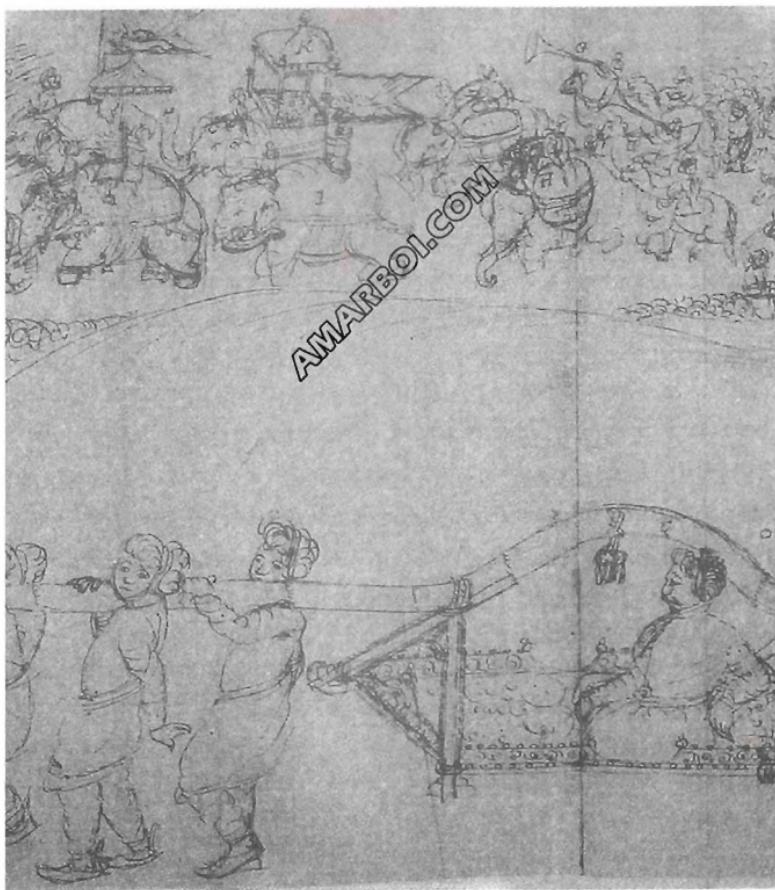
\* মোগলরা ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তের গভীরে প্রবেশ না করার কারণে বোঝা যায় কেন সেখানে তন্দুর খুব একটি দেখা যায় না।

শাহজাহান কখনো চমৎকার সব ঘোড়ায় আরুচ হয়ে যাদের মাখন আর চিনির মিশ্রণে প্রস্তুত বিশেষ ধরনের খাবার দিয়ে সব সময় শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে রাখা হতো, ভ্রম করতেন, তখন রোদের কবল থেকে বাঁচতে তার মাথার ওপর থাকত রেশমের তৈরি ছাতা। তিনি ঘোড়ায় ঢড়ে ভ্রমণ করে ঝাল্ট হয়ে পড়লে, তখন হয়তো তার নিজের রাজকীয় হাতির, ‘বাকি সব হাতির তুলনায় দায়ি সাজসজ্জায় সজ্জিত’ পিঠে আরোহণ করতেন এবং সোনার জরি দিয়ে তৈরি কাপড়ের চাঁদোয়ার নিচে বসতেন। সম্রূপহত বিদেশিদের কাছে, এটা ছিল, ‘এখন পর্যন্ত সবচেয়ে আকর্ষণীয় আর জমকালো ভ্রমণ রীতি, কোনো কিছুর পক্ষেই ঘোড়ার সাজসজ্জা আর স্ত্রাটের ব্যবহৃত প্রতীক অলংকারের জাঁকজমক আর প্রাচুর্যকে ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।’ বিকল্পরূপে, তাকে কখনো আবার বহন করা হতো, ‘চলমান সিংহাসনে...কাচের জানালা আর রং ও গিল্টি করা শুভ্যুক্ত বহনযোগ্য আসনের চমৎকার একটি নির্দশন...এই পালকির চারটা সুগোল দণ্ড টকটকে লাল মখমল কিংবা বুটিদার রেশমের ওপর সোনা আর রেশমের সুতার সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কাপড় দিয়ে আবৃত থাকত। প্রতিটি সুগোল দণ্ডের শেষ প্রান্তে দুজন শক্তিশালী আর মার্জিত পোশাক পরিহিত লোক অবস্থান করত, তত্ত্বাবধায়নে ফিল্মেজিত ব্যক্তি যাদের ডিন্ন আটজন লোক ধারা নিয়মিত বিরাটিতে অব্যাহৃত দিত।’

‘রাজকীয় সৈন্য আর দরবার রাজসিক স্মরণ নিয়মিতভাবে অগ্সর হতো, প্রায়ই অতিক্রান্ত দূরত্ব দিনে দশ মাইলের বেশ হতো না। এক টুকরো দড়ির সাহায্যে আধিকারিকরা প্রতিমন্ত্রের অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য পরিমাপ এবং লিপিবদ্ধ করতেন। ভেনিসের শৰ্পটিক নিকোলো মানুচি, যিনি কয়েক বছর পরে এই পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, বর্ণনা করেছেন কীভাবে পরিমাপ করা হতো “স্ত্রাট রাজকীয় তাঁবু থেকে বের হয়ে অগ্সর হতে শুরু করলে তারা রাজকীয় তাঁবু থেকে পরিমাপ করা আরম্ভ করত। সামনে অবস্থানরত লোকটা যার হাতে দড়ির এক প্রান্ত রয়েছে সে মাটিতে একটি চিহ্ন দিত এবং পেছনে অবস্থানরত লোকটা যথন এই চিহ্নের কাছে পৌছাত সে চিংকার করে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করত এবং সামনের লোকটা তখন মাটিতে আরেকটা নতুন চিহ্ন দিত এবং গণনা করত ‘দুই’। তারা এভাবে ‘তিনি’, ‘চার’ গণনা করতে করতে চলার পথের পুরোটা সময় অগ্সর হতো। আরেকজন লোক হাতে নথিপত্র নিয়ে পায়ে হেঁটে মোট দূরত্ব পরিমাপ করতে থাকত। স্ত্রাট যদি দৈবাৎ জানতে চান তিনি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছেন, তারা সাথে সাথে উন্নত দিতে পারত কারণ তারা জানে এক লিগ দূরত্ব অতিক্রম করতে তাদের দড়ির টুকরো কতবার আবর্তিত হয়।” মানুচি সেইসাথে কীভাবে সময় গণনা করা হতো সে বিষয়েও বর্ণনা করেছেন : ‘অন্য আরেকজন লোক পায়ে হেঁটে অগ্সর হতো,

বালিঘড়ি আর সময় পরিমাপ করার দায়িত্ব যার ওপর অর্পিত হয়েছে এবং  
ত্রোঞ্জের চাকতির ওপর কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে সে প্রতিবার ঘন্টার  
সংখ্যা ঘোষণা করত ।

অভিজাত মোগল রমণীরা কখনো ঘোড়ার পিঠে ভ্রমণ করার সময়, বিশেষ করে  
পার্বত্য অঞ্চলে, সাধারণের দৃষ্টি থেকে নিজেদের শুকিয়ে রাখতে মাথা থেকে  
পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সুতির পোশাকে আবৃত রাখত কেবল বাইরে দেখার  
জন্য ডাকবাত্র আকৃতির ছোট এক খণ্ড সুতার জাল থাকত । তারা অধিকাংশ  
সময় সচরাচর, জরদারি বা স্যাটিনের পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে,  
চারজন বা ছয়জন বেহারার কাঁধে স্থাপিত বাঁকানো বাঁশের দণ্ড থেকে ঝুলন্ত তৈমূরের



ল দরবারের স্থানাম্পত্তি, পিটার মানডি অঙ্কিত ।

খাটিয়ায় সটোন শুয়ে থাকত, যাদের অসমান মাটির ওপর দিয়ে ছন্দোবন্ধ  
ভঙ্গিতে দৌড়াবার প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং এভাবেই পালকে শায়িত তন্দ্রাচন্দ  
আরোহী আকমিক ঝাঁকির হাত থেকে নিরাপদ থাকে। বাঁকানো বাঁশ এই  
বহনযোগ্য পালক তৈরির খাতিরে প্রচুর ব্যয় করে বিশেষভাবে চাষ করা হতো।  
রমণীরা ইচ্ছা করলে ব্যয়বহুলভাবে সজ্জিত বলদ-টানা গাড়িতে বা এক জোড়া  
ছেট হাতি বা শক্তিশালী উটের মাঝে ঝুলন্ত প্রশস্ত পালকিতেও আরামদায়ক  
ভঙ্গিতে ভ্রমণ করতে পারত। পিটার মানডি বর্ণনা করেছেন কীভাবে পালকির  
চারপাশ আচ্ছাদিত করতে ব্যবহৃত হতো ‘এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত, শক্ত ঘাসের  
আঁচি... অনেকটা আমাদের ইংল্যান্ডের শুকনো শনের মতো, ঘাসের মাঝে মাঝে  
বালি আর মাটি ছিটিয়ে দেয়া হতো, যাতে বাইরে পানি ছিটালে, সেটা ভেতরে  
খুব শীতল একটি বাতাবরণ তৈরি করে... আর সেইসাথে কয়েক দিনের ভেতরে  
বালির অফুরন্দম ঘটে, একটি দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা ঘটত...।’



মমতাজ আর তার কন্যারা তাদের অবস্থানের পক্ষে মানানসই আরো বিলাসবহুল আর মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে ভ্রমণ করত। তারা মাঝে মাঝে ডুলির মতো দেখতে গিল্টি করা আর হাদযুক্ত শিবিকায় চলাচল করত, যা বহন করত শক্তসমর্থ দেখতে বেহারার দল এবং 'নানা রঙের রেশমের চমৎকার জালি দিয়ে সেটা আবৃত থাকত, নানা ধরনের সুন্দর অলংকৃত সঞ্চাব, শোভাবর্ধক টাসেল আর সুতার কারুকাজ দিয়ে জালিকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হতো।' তারা অনেক সময় চমৎকারভাবে সজ্জিত হাওদায় ভ্রমণ করত—চুন্দাকৃতি, ঝলমলে, আন্দোলিত আর আছাদনযুক্ত দুর্গ—পোষমানা মাদি হাতির পিঠে দড়ি আর পুলির সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে। সোনালি তারের বুননিযুক্ত তিরক্ষকরণীর ভেতর দিয়ে স্মার্জী চারপাশের অপস্যয়মাণ প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করতে করতে এগিয়ে যেতেন, সামনের রাস্তায় ধূলোর উপন্দুব হ্রাস করতে পানি ছিটাবার রীতির প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কারণ অন্যথায় বিশাল সামরিক মিছিলটার কারণে উত্থিত ধূলা তার চারপাশে শ্বাসরুদ্ধকর একটি মেঘের সৃষ্টি করত।

সর্বত্র কঠোর শিষ্টাচারবিধি বজায় রাখা হতো। মমতাজ যখন হাতির পিঠে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন তখন প্রাণীজৈক বিশেষভাবে নির্মিত একটি তাঁবুর ভেতর নিয়ে এসে সেখানে তাকে হাটু মুড়ে বসান হতো। হাতির পরিচালক বা মাহুত, নিজের মাথা মেঁটে একটি কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখত যাতে সে তার রাজকীয় যাত্রী যখন তার হাওদায় আরোহণ করবেন তখন তাকে এক ঝলকের জন্যও দেখতে না পায়। তিনি কদাচিত্ত শাহজাহানের সাথে একসাথে ভ্রমণ করতেন। রাজকীয় হারেম সশস্ত্র মহিলা দেহরক্ষী আর খোজাদের ঘৰা, যারা রত্নবৃটিত ময়ূরের পালকের তৈরি পাখা দিয়ে মাছি তাড়াত, পরিবেষ্টিত অবস্থায় বরং মাইলখানেক পেছনে অবস্থান করত।

খোজারা সেইসাথে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে সামনে অবস্থান করে এগিয়ে যেত, অপরিচিত কোনো পুরুষ হারেমের খুব কাছাকাছি আসবাব ধৃষ্টতা দেখালে তাকে তাদের হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাড়িয়ে দিতে। ফরাসি চিকিৎসক ফ্রান্সোয়া বার্নিয়ের, যিনি পরবর্তীকালে কাশীরের উদ্দেশে মমতাজের এক কন্যার জৌলুশপূর্ণ অশ্঵ারোহী শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, লিখেছেন, 'শোভাযাত্রায় অংশ নেয়া, কোনো অশ্঵ারোহী, সে যতই উচ্চপদস্থ হোক না কেন, তাকে যদি রাজকন্যার খুব কাছাকাছি পাওয়া যেত তবে তার কপালে অশেষ দুর্ভোগ ছিল। খোজাদের প্রদৰ্শনের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না এবং পথচারী যাদের তারা নিয়ন্ত্রণ করত যেকোনো ছুতোয় তাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করার সামান্যতম সুযোগ তারা নষ্ট করত না।' যাই হোক, রাজকীয় হারেম, হাওদারও 'নীলাকাশের নিচে জুলজুল করতে থাকা সোনার দীপ্তিতে'

କ୍ରପକଥାତ୍ମଳ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଅବଲୋକନ କରେ ବାର୍ଣ୍ଣିୟେର ବିଶ୍ୱଯ ଏତଟାଇ ମାଆହାଡ଼ା ଯେ ତିନି 'ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ କବିର ନ୍ୟାୟ ସଥନ ତାରା ଅଗ୍ନିଲ ଦୃଷ୍ଟି ଥିକେ ଦେବୀଦେର ଆଡ଼ାଳ କରତେ ହାତିର ଅବତାରଣା କରେଛେ, କଞ୍ଚନାର ଜଗତେ ହାରିଯେ ଗେହେନ' ।

ସ୍ମାର୍ଟ ମାଝେ ଯଥନ ହୁନ୍ଦିଯିଲେ କୋଣେ ଦୂର୍ଘ, ଦର୍ଶନୀୟ ହୁନ ବା ଦରଗା ଜିଯାରତେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଏକଟୁ ଘୁରେ ଯାବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେନ, ହାରେମେର ବହରଟା ତଥନ ସଂକଷିଷ୍ଟ ପଥେ ସ୍ମାର୍ଟେର ପୂର୍ବେହି ଅଞ୍ଚାୟୀ ଛାଉନିତେ ପୌଛେ ଯାଯା । ମମତାଜ ଏର ଫଳେ ଶାହଜାହାନକେ ରେଓୟାଜମାଫିକ ସମ୍ଭାବଣ 'ମୁବାରକ ମଞ୍ଜିଲ', 'ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋକ' ବଲେ ସ୍ଵାଗତ ଜାନାତେ ପ୍ରତ୍ତତ ଥାକତେ ପାରବେ ସଥନ ତିନି ତୂର୍ଣ୍ଣନିନାଦେର ଧାତବ ଝଙ୍କାର ଆର ନାକାଡ଼ାର ଗଣ୍ଠୀର ଶଦେର ମାଝେ ସ୍ମାର୍ଟେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଧାରିତ ଏଲାକାଯ ପ୍ରବେଶ କରବେନ ।

ସମୟକାଳ ଥିକେ ଏହି କୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନେ ଅଧିଷ୍ଠାନେ ସାମାନ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଯେଛେ । ଅଞ୍ଚାୟୀ ରାଜକୀୟ ଶିବିର ଅନେକଟା ଏକଟି ଶହରେର ନ୍ୟାୟ ଯାତାଯାତେର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଢ଼କସହ ଏକଟି ପୂର୍ବନିର୍ଧାରିତ ନକଶା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପିତ, ଯା ଆକୃତିର ବିଶାଳତାର କାରଣେ ସେ ରକମିଇ ମନେ ହତୋ । ଶିବିରେର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏକଟି ବିଶାଳ ଜନବସତିର ମତୋଇ ଛିଲ । ଏକ ମୋଗଳ ଅଭିଜାତ ଲିଖେଛେ, 'ଶିବିରେ ନାମାଜ, ରୋଜା ରାଖାର ମତୋ ଇବାଦତେର ପାଶପାଶି ଜ୍ଞାଯା ଖେଳା, ମାତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରମାତ୍ର, ପାଯୁକାମ ଆର ବ୍ୟକ୍ତିଚାରଓ ସମାନତାଲେ ଚଲତ ।' ନିମ୍ନପଦସ୍ଥ ସୈନ୍ୟ ଆର ମ୍ୟାମରିକ ଶିବିର ଅନୁସରଣକାରୀର ଦଳ ଶିବିରେ ସୀମାନାର କାହେ ଜାଟଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେଦେର ଥାବାର ରାନ୍ନା କରାର ଜନ୍ୟ ଗରୁ ଆର ଡଟେର ଗୋବର ଦିଯେ ଆଷିନ୍ ଜ୍ଞାଲାତ । ଶିବିରେ ସୀମାନାର ଭେତରେ, ମାନୁଷଜନ ଯାତେ ସହଜେଇ ପଥ ଝରୁଙ୍ଗ ପାଯ ସେ କାରଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜେର ତାବୁ ହୁଅନ୍ତରେ ଜନ୍ୟ ନିଜେର ନିର୍ଧାରିତ ହୁନ ଛିଲ, ଯା ଏକ ଶିବିର ଥିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିବିରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାକତ । ଅଭିଜାତରା ତାଦେର ତାବୁ ହୁଅନ୍ତରେ ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିତ ଯାତେ ରାଜକୀୟ ତାବୁର ଚେଯେ ସେଟା ଉଚ୍ଚ ନା ହୟ, କାରଣ ତାରା ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନନ୍ତ ସେ ରକମ ହଲେ ତାବୁ ଉପିଯେ ଦେଯା ହବେ ଏବଂ ସେଇସାଥେ ସମ୍ଭବତ ମେଓ ଧବଂସ ହେଁ ଯାବେ ।

ମମତାଜ ଆର ଶାହଜାହାନ ଅଞ୍ଚାୟୀ ଶିବିରେ ଠିକ କେନ୍ଦ୍ରହୁଲେ ଏକଟି ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗେର ନ୍ୟାୟ ପରିବେଶିତ ଏଲାକାଯ ଅବହାନ କରତେନ, ମାଝେ ବିଶାଳ ଏକଟି ଫାଁକା ହୁନ ତାଦେର ଅଭିଜାତଦେର ତାବୁର ସାଥେ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରତ ଏବଂ ପୁରୋ ଏଲାକାଟା ଗୋଲନ୍ଦାଜ ଆର ଶକ୍ତ, ଚୋଖା କାଠେର ଖୁଚାର ତୈରି ବେଡ଼ା ଦିଯେ ସୁରକ୍ଷିତ କରା । ଏକଟି ଚମ୍ବକାର ତୋରଣଗୃହ ଯୁକ୍ତ ଦେଯାଲେର ବାଇରେ ଅଂଶେ ଲାଲ କାପଡ଼ ଦିଯେ ମୋଡ଼ାନୋ କାଠେର ତଙ୍କା ଚାମଡ଼ାର ଫିତେ ଦିଯେ ବୀଧା ଥାକତ । ସ୍ମାର୍ଟେର ସବଚେଯେ ଦ୍ରୁତଗାୟୀ ଘୋଡ଼ାର ଏକଟି ଦଳକେ ଯେକୋନୋ ଜରୁରି ପରିସ୍ଥିତି ସାମାଲ ଦେଯାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ସହ ତୋରଣଗୃହେ ପ୍ରତ୍ତତ ଅବହାୟ ରାଖା ହତୋ । ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ଏଲାକାର ଭେତରେ ରାଜଦରବାରେର ସବ ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧା ବିଦ୍ୟମାନ—ବିଶାଳାକୃତି

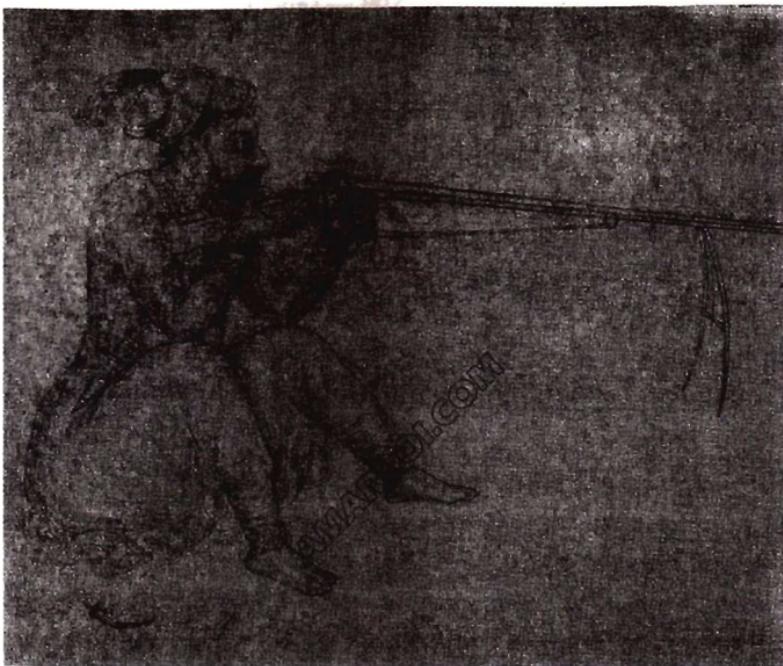
তাঁবুতে সাধারণ আর ব্যক্তিগত দর্শনদানের হলঘর সোনা আর কুপার জরি দিয়ে তৈরি কাপড় দিয়ে বালমলে করে সজ্জিত। প্রতিটি হলঘরের কেন্দ্রস্থলে চমৎকার কারুকাজ করা মঞ্চ থাকত যেখানে ফুলের নকশা করা রেশেম বা মধ্যমলের চাঁদোয়ার নিচে শাহজাহান তার দর্শনপ্রার্থীদের সামনে উপস্থিত হতেন। সামরিক মিছিলটার সাথে বরোকা অলিন্দযুক্ত বহনযোগ্য একটি কাঠের দোতলা বাসস্থানও ছিল যাতে শাহজাহান, রীতি অনুযায়ী তার শোকদের আশ্বস্ত করতে পারেন তিনি এখনো জীবিত আছেন। তিরক্ষরণী স্বারা নিখুঁতভাবে সুরক্ষিত, প্রশংস্ত আর ব্যয়বহুলভাবে সজ্জিত হারেম কাছেই অবস্থিত ছিল। হাস্মামখানা আর শৌচালয়ের ব্যবস্থা বিশেষ তাঁবুতে করা হতো—তৈমুরের সময়কাল থেকেই দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বিশেষ শুরুত্ব পেয়ে আসছে। তার যায়াবর যোদ্ধার দল সাধারণের জন্য নির্ধারিত ভায়ম্যমাণ হাস্মামে উন্ননে গরম করা পানি ব্যবহার করে যুক্তের ঘাম, রক্ত আর ধূলা ধূয়ে ফেলতে অভ্যন্তর ছিল।\*

জল নিরোধক কাপড়ের কানাতযুক্ত বিশালাকৃতির রাজকীয় তাঁবু স্থানান্তরিত করতে বিশাল কর্ম্যজ্ঞের প্রয়োজন হতো, বিশেষ করে সব কিছুই যখন দুই প্রস্তু করে ছিল। আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে<sup>১</sup> স্ম্যাট আকবরের রাজত্বকালে কাজটা করতে একশ হাতি, পাঁচশ উট ও আর চারশ গৱর্স গাড়ির প্রয়োজন হতো। দুই প্রস্তু থাকার অর্থ একটি শিল্পীর যখন স্থাপিত হয়েছে, আরেকটি তাঁবু আগেই রাজকীয় বাজার সরকারের<sup>২</sup> তত্ত্বাবধানে সামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে যিনি পরের রাতের অঙ্গুয়া শিল্পীরের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং স্ম্যাট আর স্ম্যাঞ্জীকে স্বাগত জানাবার সময় সব কিছু যেন ঠিক থাকে সেটা নিশ্চিত করবেন।

আলোকসজ্জার পরিকল্পনা, রাজপ্রাসাদের মতো বিশদভাবে, করা হতো দূর থেকে মোগল শিবিরকে দৃতিময়—আর দর্শনীয়—দেখাতে। পরিচারকের দল ঘোলোটা টানটান করে বাঁধা দড়ির সাহায্যে একশ বিশ ফিটের চেয়েও উঁচু একটি অতিকায় দণ্ড স্থাপন করত। দণ্ডের শীর্ষভাগে থাকত একটি বিশাল দিয়া, তুলার বীজ আর তেল পূর্ণ একটি পাত্র, সূর্যাস্তের পর যাতে অগ্নিসংযোগ করা হলে, রাতের আকাশের বুকে উর্ধ্বমুখী আগুনের শিখা দাউ দাউ করে

\* ভ্রমণের কালে জাহাঙ্গীরের সাথে এক খণ্ড পাথর কেটে তৈরি করা পাঁচ ফুট উঁচু, ছয় ফুট চওড়া চা পানের পাত্রের মত দেখতে একটি অতিকায় স্নানাধার থাকত। তিনি যখন স্নান করতে আগ্রহী হতেন তার পরিচারকেরা সৈধনুক্ত গোলাপ-জলে সেটা পূর্ণ করে দিত। তাকে স্নানাধারে উঠতে নামতে সাহায্য করতে বাইরে আরোহণের এবং অভ্যন্তরে অবরোহণের সিডি ছিল। আজও আগা দুর্গের প্রাঙ্গণে স্নানাধারটা দেখতে পাওয়া যায়।

ভূলত। আকাশ-দিয়া, 'আকাশের আলো' নামে এটাকে অভিহিত করা হতো। অভিজাতবৃন্দ, স্মাটের তলব পেয়ে সাক্ষৰ্ত করতে আসার সময়, মশালের আলোয় তাদের পথ খুঁজে পেত। বার্নিয়ের লিখেছেন, শিবিরের দিকে 'রাতের আঁধারে দূর থেকে তাকালে একটি মহিমাষ্ঠিত আর চিঞ্চমৎকারী দৃশ্য ভেসে উঠত, বর্ধিত তাঁবুর সারির মাঝে মশালের লম্বা সারি এই অভিজাতদের আলোকিত করে তুলেছে...।'



শিকারের সময় একটা ম্যাচলক গাদাবন্দুক দিয়ে শাহজাহান গুলিবর্ষণ করছেন।

স্মাট যদিও তার সভাসদবর্গ নিয়ে যুদ্ধ্যাত্মা করেছেন, শাহজাহান আর মমতাজের কাছে জীবন তখনো আগ্রার মতোই উৎসবমুখর। প্রতিদিনই রাজপরিবারের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গানের আয়োজন করা হয় এবং অস্ত্রায়ী শিবিরের সাথে সিংহ থেকে শুরু করে গভার পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন বন্যপ্রাণীর একটি সংগ্রহ রয়েছে, যাতে লড়াইয়ের আয়োজন করা যায়। শাহজাহান নিজেও শিকারে যেতেন। মমতাজ তার ফুপুজান নূরের মতো, অব্যর্থ নিশানাত্ত্বে ছিলেন এবং শিকারের সময় তার সঙ্গী হতেন এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না কিন্তু শাহজাহান নিচিতভাবেই শিকার করতে পছন্দ করতেন। তিনি বাজপায়ি নিয়ে শিকারে যেতেন এবং বাঘ আর সিংহ শিকার করতেন—একটি রাজকীয় প্রাধিকার। তিনি অবশ্য পোষ মানানো চিতাবাঘ দিয়েও হরিণ শিকার

করতেন, জন্মগুলোর রোমশ গলায় থাকত রত্নখচিত গলবন্ধনী, শিরক্ষযুক্ত অবস্থায় তাদের পশ্চাধাবনের স্থানে নিয়ে আসা হতো। ফ্রানসিসকে পেলসার্ট নামে হল্যাডের এক অধিবাসীর কাছে, যিনি নিজের চোখে চিতাবাঘগুলোকে শিকার করতে দেখেছেন, এটাকে মনে হয়েছে ‘এক অসামান্য ক্রীড়া রীতি’, লিখেছেন : ‘এই নির্বোধ পতঙ্গলো মানুষের উপস্থিতির সাথে এতটাই অভ্যন্তরীণ যে তাদের শাবক অবস্থায় ধরে লালন করা হোক বা প্রাণব্যক্ত অবস্থায় যেভাবেই পোষ মানানো হোক তারা বিড়ালের মতোই পোষ-মানা। চিতাবাঘগুলোকে খুবই সতর্কতার সাথে খেতে দেয়া হয় এবং প্রতিটির জন্য দুজন করে লোক রয়েছে সেই সঙ্গে খাচাযুক্ত একটি গাড়ি যেখানে তারা বসে থাকে বা যেখান থেকে তাদের প্রতিদিন শিকারের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়। চিতাবাঘগুলো যখন এমন স্থানে পৌছায় যেখান থেকে তারা হরিণ দেখতে পাবে, গাড়ির খাচা খুলে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং জন্মটা কিছু দেখতে পাবার আগ পর্যন্ত চারপায়ের ওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ির সাহায্যে গাছপালা বা ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে এগোতে থাকে, যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে জ্ঞা মুক্ত তীরের মতো লাফিয়ে উঠে দ্রুত ধাওয়া করলে সে সফল হবে, কারণ সে ক্ষেত্রে একটি সুযোগই পাবে। চিতাবাঘগুলোর বেশির ভাগই এতই প্রশিক্ষিত যে তারা কখনো বা কদাচিং শিকার ধরতে ব্যর্থ হয়।’

১৬৩০ সালের শুরুর দিকে, শাহজাহান, মমতাজ আর তাদের সফরসঙ্গীবৃন্দ বিক্ষ্যা পর্বতমালার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে এবং আগ্রার ৪৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত বুরহানপুর শহর অভিযুক্ত বৃক্ষময়, ছায়াবৃত পাহাড়ি এলাকার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। দাক্ষিণাত্য শাহজাহান আর মমতাজের কাছে ভীষণ পরিচিত—তারা তাদের সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনের এক-ত্রৈয়াৎ্শ সময় এখানে অতিবাহিত করেছেন, যার কিছু ছিল তরুণ বিজয়ী যুবরাজ হিসেবে শাহজাহানের গৌরবময় বছরগুলো আর কিছু কেটেছে বিপদসঙ্কল পরিস্থিতির মাঝে। তারা বুরহানপুরের দুর্গ-প্রাসাদ খুব ভালো করেই চেনে—মমতাজ সেখানে দুজন কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং এখানেই তাদের এক পুত্রও মৃত্যুবরণ করেছে। এই দুর্গেই শাহজাহানের সংভাই খসরুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, যখন তার আরেক সংভাই পারভেজ নিজের সুরাসঙ্গাতের কারণে এখানেই মৃত্যুবরণ করেছে। ১৬৩০ সালের মার্চ মাসে শাহজাহান আর মমতাজ যখন বুরহানপুর দুর্গ-প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখন নিশ্চিতভাবেই তাদের দুজনের মনে নানা স্মৃতি এসে ভিড় করেছিল, যার কিছু স্মিদায়ক আবার কিছু ততটা নয়।

খানজাহান লোদি, জাহাঙ্গীরের একসময়ের প্রিয় পাত্র এই অভিজ্ঞাতের স্বপক-ত্যাগের ফলে সৃষ্টি সমস্যার কারণে তারা আগ্রার বিজ্ঞ-বৈড়ব ছেড়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন। শাহজাহান তার আকবাজানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরে খানজাহান তাকে প্রতিরোধ করতে আগ্রা পাহারা দিয়েছেন এবং জাহাঙ্গীর প্রতিদানে তাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিয়োগ করেছিলেন। এই গর্বিত, স্বাধীনচেতা লোকটা আফগান লোদি সুলতানদের বংশধর যারা বাবরের কাছে পরামুক্ত হবার আগে দিল্লি শাসন করতেন। শাহজাহান যথন স্বার্ট হিসেবে অভিষিক্ত হন, খানজাহান অসুস্থতার দোহাই দিয়ে দৃষ্টিকূলভাবে নিজে আগ্রা এসে অভিবাদন জানানো থেকে বিরত থাকেন। শাহজাহান সাথে সাথে তাকে আগ্রায় ভলব করলে তিনি অবীহার সাথে তার আদেশ পালন করেন। খানজাহান দরবারে উপস্থিত হবার পর তখনো সন্দিক্ষ শাহজাহান তাকে তার সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে বলেন এবং তার কিছু জমি বাজেয়াণ করেন।

খানজাহানের কাছে শান্তির মাত্রাটা বাড়াবাঢ়ি রকমের মনে হলে তিনি ১৬২৯ সালের অঙ্গোবর মাসে রাতের আঁধারে দুই হাজার আফগান যোক্তা নিয়ে দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে আগ্রা থেকে পলায়ন করেন। শাহজাহান কালবিলম্ব না করে তার পশ্চাত্কাবন করতে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা দ্রুত অনুসরণ করে তাকে ধরে ফেলে এবং আগ্রা থেকে প্রায় চালিশ মাইল দূরে, চম্পল নদীর তীরে তার বাহিনীর মুর্মোয়ুবি হয়। এক প্রচণ্ড রক্তাক্ত যুদ্ধের পর যেখানে খানজাহানের দুই পুত্র দুই ডাইসহ তার প্রচুর অনুসারী নিহত হয়। তিনি তরা নদী সাঁতরে পার হয়ে পালিয়ে যান এবং আহমেদনগর রাজ্যের উদ্দেশ্যে অহসর হন। খানজাহানকে আগ্রায় ডেকে পাঠাবার আগে থেকেই তিনি আহমেদনগরের শাসকের সাথে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করায় তিনি তাকে তার মিত্র হিসেবে সেখানে স্বাগত জানান এবং নিজের সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

শাহজাহান বুরহানপুরে শিবির স্থাপনের মাঝে সিদ্ধান্ত নেন এবার কেবল আহমেদনগর নয়, দাক্ষিণাত্যে তার অন্য পুরান শক্তদেরও—বিজাপুর আর গোলকুণ্ড রাজ্য—সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে চেষ্টা করবে। শাহজাহান এবারের অভিযানে নিজে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবর্তীর্ণ হতে আগ্রহী নন কিন্তু দাক্ষিণাত্য মোগল বাহিনীর সর্বময় সেনাপতি হিসেবে তার উপস্থিতি ভীষণ অপরিহার্য। তার এক ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুসারে, ‘তার বাহিনীর নেতৃত্বান্বকারী সেনাপতি আর গোরূপতিদের মাঝে মতানৈক্য আর ঝগড়ার মাত্রা এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা ক্রমাগত একে অপরের সাহসী উদ্যোগ ব্যর্থ করতে চেষ্টা করতেন।’

শাহজাহান যখন তার সেনাপতি, পরামর্শদাতাদের সাথে আলোচনা করে নিজের যুদ্ধকৌশল বিবেচনা করছেন, যমতাজ তখন দুর্গের রাজকীয় আবাসিক এলাকায় তাদের ত্বরোত্তম সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। বুরহানপুরে তাদের আগমনের এক মাসের ভেতরেই তিনি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। রাজদরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতারা সাদামাটাভাবে লিপিবদ্ধ করেন, ভূমিষ্ঠ হ্বার পর পরই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছিল।



১৬৩০ সালের শেষ নাগাদ আহমেদনগর অবশেষে আত্মসমর্পণ করে। খানজাহানকে 'তার প্রাক্তন মিত্রের পরিত্যাগ করলে তিনি পাঞ্চাবের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন কিন্তু মোগল সৈন্যবাহিনী পথে তাকে বন্দি করে এবং হত্যা করে। তার কর্তৃত মস্তক বুরহানপুরে শাহজাহানের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং শহরের প্রধান প্রবেশাধারে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। অবশ্য পরবর্তী অভিযান মোটেই মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়নি। দাক্ষিণাত্যের সুলতানেরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলে যুদ্ধটা পর্যায়ক্রমিক অবরোধে পর্যবসিত হয়। এক দিনপঞ্জি রচয়িতা লিখেছেন, দুর্গগুলো শক্তিশালী, সৈন্য শিবিরের মনে আব কঠোর...’ শতবর্ষের ভেতরে সবচেয়ে তীব্র আর দীর্ঘায়িত দুর্ভিক্ষ এলাকায় আক্রমণ করতে পরিস্থিতি আরো ডয়াবহ হয়ে ওঠে। তিন বছর পুরে ছুটিকের সূচনা হয়েছিল এবং ১৬৩০ সাল নাগাদ আরব সাগরের উপকূল হতে ছলভাগের অনেক ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের ফলে অবশ্য খাদ্য ঘাটতি আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় বণিকের বর্ণনা অনুসারে ‘মানুষ এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে তারা জীবনের পরোয়া করত না, তারা আহারের সংস্থানের জন্য যেকোনো কিছু করতে ইধা করত না।’ রাজপথ আর সড়কগুলো ‘বিপুলসংখ্যক মৃত আর মরণাপন্ন মানুষের’ ভিড়ে ‘বিষাদাক্রান্ত দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল।’

পিটার মানডি, এই সময়ে উপকূল থেকে বুরহানপুরের দিকে যাত্রা করছিলেন। পথে মানুষকে পশুর বিষ্ঠা নিয়ে একে অপরের সাথে মারামারি করতে দেখেছেন যেখান থেকে তারা হজম না হওয়া খাদ্যশস্য ক্ষুধার্ত ভঙিতে খুটে খাচ্ছে। তিনি বেপরোয়া পিতা-মাতাকে নিজ সন্তান বিক্রি করতে বা দান করতে দেখেছেন, ‘যারা তাদের সন্তানকে নিতে আগ্রহী... যাতে তারা হয়তো তাদের জীবিত রাখবে, যদিও তারা নিচিত যে আর কখনো নিজের সন্তানকে তারা দেখতে পাবে না।’ বাতাসে তখন কেবল মৃত্যুর মিষ্টি গা গুলিয়ে তোলা গন্ধ। দুর্ভিক্ষপীড়িত শহর আর গ্রামে তখনো যাদের দেহে শক্তি অবশিষ্ট ছিল তারা মৃতপ্রায় নগ্ন, কক্ষালসার মানুষগুলোকে শেয়াল-কুকুরের আহারে পরিণত হ্বার

জন্য টেনে বাইরে স্তুপীকৃত করে ফেলে রাখায় পিটার মানডি কোনো কোনো  
রাতে তাঁর টাঙানোর স্থান ঝুঁজে পেতেন না।

শাহজাহান পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করেন, যা ইতিমধ্যে বুরহানপুরের  
সড়কে এসে উপস্থিত হয়েছে, যদিও সেখানের অধিবাসীদের অন্তত তাঁরি  
অমৃহাসমান পানির সরবরাহ রয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিকরা নথিবন্ধ করেন :  
‘গত এক বছরে এক ফোটাও বৃষ্টিপাত হয়নি...এবং খরার প্রকোপ ভীষণ  
তীব্র...ছাগলের মাংসের বদলে বাজারে কুকুরের মাংস বিক্রি হচ্ছে এবং মৃত  
(মানুষের) হাড় গুঁড়া করে ময়দার সাথে মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে (রুটি তৈরির  
জন্য)...দুর্গতির মাত্রা এমনই চরম আকারে ধারণ করেছিল যে, মানুষ একে  
অপরের মাংস খেতে শুরু করে এবং পুত্রের মাংস তাঁর প্রিয়জনদের কাছে  
সবচেয়ে উপাদেয় হয়ে দেখা দেয়।’ শাহজাহান তাঁর দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের  
সাহায্য করতে খাজনা মাফ করে দেন এবং তাঁর আধিকারিকদের বুরহানপুর  
এবং অন্যান্য শহরে লঙ্ঘনস্থান খোলার আদেশ দেন, যেখান থেকে ক্ষুধার্ত  
মানুষদের মাঝে রুটি আর ডাল ভাগ করে দেয়া হবে। তিনি সেইসাথে প্রতি  
সোমবার দরিদ্রদের মাঝে পাঁচ হাজার রূপি দাম করার আদেশ দেন, ‘যে  
দিনটা স্বার্টের সিংহাসনে আরোহণের দিন হিস্তিস্বে সওহের অন্য দিনগুলো  
থেকে আলাদা হিসেবে দেখা হয়।’

মৃত্যু আর দুর্গতির মাঝে, খাঁ-খাঁটুরতে থাকা প্রান্তরে যখন কেবল শকুন আর  
চিলের আনাগোনা। শাহজাহানের আর সতত গর্ভবতী মমতাজ আরো একবার  
নবাগত সন্তানের মুখ দেখার জন্য প্রস্তুত হন। মমতাজ তাঁর গর্ভাবস্থার কিছু  
সময় নিজের বড় ছেলে পনেরো বছর বয়সী দারা শুকোহ্র বিয়ের পরিকল্পনা  
করে অতিবাহিত করেন। তিনি বধূ হিসেবে দারার চাচাতো বোন, শাহজাহানের  
সৎভাই পারভেজের মেয়ের নাম প্রস্তাব করেন। রাজবংশের স্বার্থের কথা  
বিবেচনা করলে যুক্তিসংগত প্রস্তাব এবং মমতাজ সন্তুষ্ট রাজপরিবারের মধ্যে  
বিদ্যমান বিভেদ উপশেমের আশা করেছিলেন। ঘটনা যাই হোক না কেন, তাঁর  
স্বামী এবং পুত্র উভয়েই তাঁর পরামর্শকে স্বাগত জানান এবং শাহজাহান  
দিল্লিতে বার্তাবাহক প্রেরণ করে তাঁর আধিকারিকদের চমকপ্রদ এক অনুষ্ঠান  
আয়োজন করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেন।

মমতাজ যখন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন, তিনি তখন দুর্গ-  
প্রাসাদের আরাম-আয়েশ উপভোগে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তাঁর তিন তলা  
বিশিষ্ট বাসস্থানের একদিকে নদী আর অন্যদিকে মাটি খুড়ে তৈরি করা  
দৃষ্টিনন্দন উদ্যান। নদীর তীরে অবস্থিত হাতি মহলে রাখিত তাঁর স্বামীর  
রণহস্তির পালকে, সেখান থেকে তাঁর নদীতে গোসলের জন্য নিয়ে গেলে সেটা

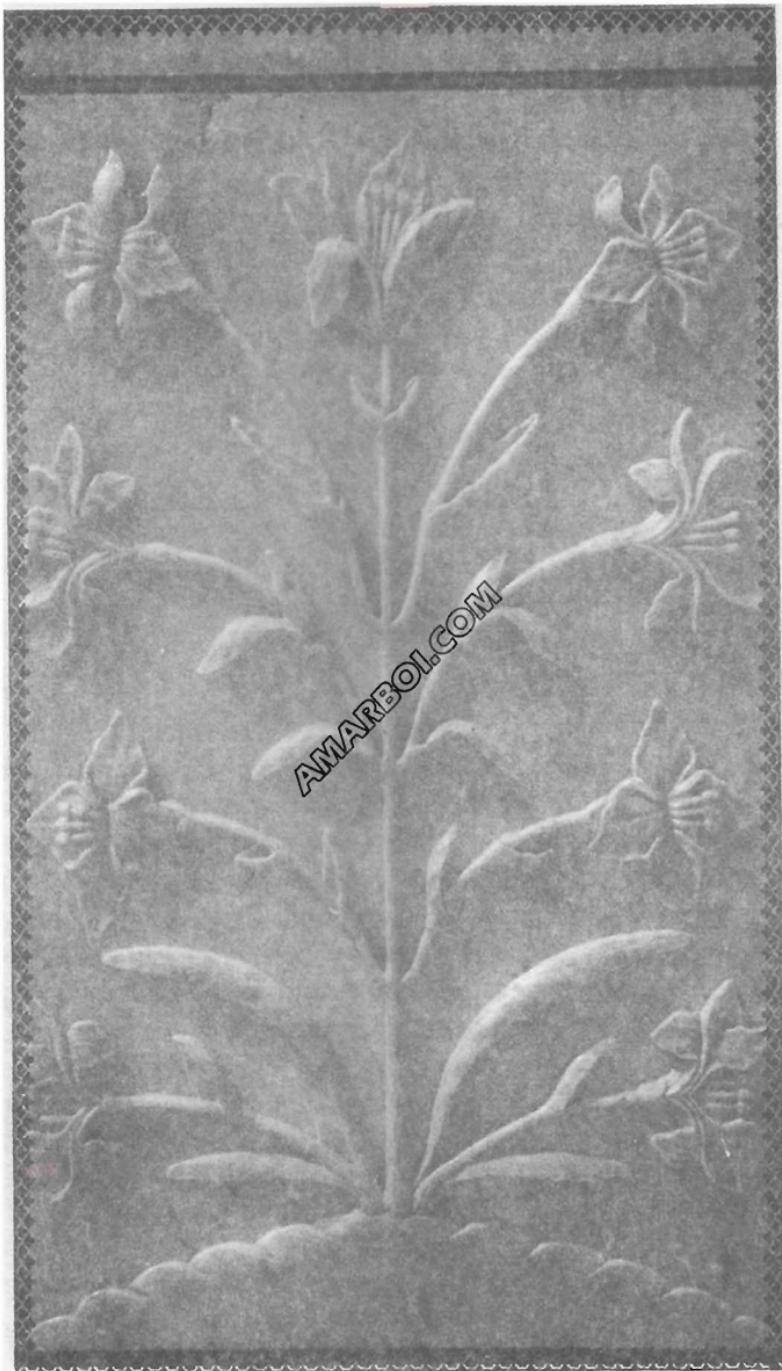
একটি চিন্তিক্ষেপের সৃষ্টি করে। মমতাজ নিজে লতাপাতার নকশা করা গম্ভীরভাবে ছাদের নিচে মার্বেলের হাম্মানে গোসল সম্পন্ন করেন। শীতল, সুবাসিত পানি মার্বেলের একটি নহর দিয়ে প্রবাহিত হয় যখন অন্য আরেকটা নহর দিয়ে সর্বদা জুলত তেলের প্রদীপের দ্বারা উষ্ণ পানি মৃদু তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হয়।

১৬৩১ সালের গ্রীষ্মকালের প্রথম দাবদাহের সময় মমতাজের গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়। তার কল্যাণ জাহানারা তার পাশেই ছিল এবং শাহজাহান পাশের একটি কক্ষে অপেক্ষা করছিলেন। রাজদরবারের জ্যোতিষীরা আরো একজন যুবরাজের জন্মের ভবিষ্যত্বাণী করেছিলেন, কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘ ত্রিশ ঘণ্টা শেষে বহু কষ্টে একটি কন্যাসন্তান, গওহোরার জন্ম হয়। আটগ্রাম বছর বয়সী স্মাজীর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে বহু পূর্বে হারিয়ে যাওয়া ফার্সি পাণ্ডুলিপির নকল থেকে পরম্পরাবিরোধী নানা ভাষ্য আমরা জানতে পারি। সর্বাধিক প্রচলিত একটি ভাষ্য অনুসারে মমতাজ যখন গর্ভযন্ত্রণার কষ্টের মাঝে ঝুক্ত হয়ে উঠেছিলেন তখন তিনি তার গর্ভের ভেতর থেকে কান্নার একটি শব্দ ডেসে আসতে শোনেন। রহস্যজনক, ক্ষীণ শব্দে আতঙ্কিত হয়ে উঠে তিনি জাহানারাকে বলেন ~~ক্ষীঢ়ে~~ গিয়ে শাহজাহানকে ডেকে নিয়ে আসতে। তার উদ্ধিখ্য স্বামী দ্রুত তার পাশে এসে উপস্থিত হতে বাঢ়া ভূমিষ্ঠ হয়। মমতাজ তাদের সভানদেশে~~নিরাপদে~~ রাখার জন্য শাহজাহানকে অনুরোধ করার আগেই ফিসফিস ~~করে~~ তাকে শেষ বিদায় জানান এবং তার বাহ্যিক মৃত্যুবরণ করেন। ভোকাইতে তখনো তিনি ঘণ্টা বাকি।

আরেকটা একই রকম কিন্তু আরো বিস্তারিত বর্ণনা অনুসারে, দেহে গর্ভবত্ত্বার লক্ষণ ভীষণভাবে প্রকট হয়ে ওঠা অবস্থায় মমতাজ তার স্বামীর সাথে শতরঞ্জ খেলার সময় উভয়েই বাচ্চার ফুলদনধনি শুনতে পান। তারা চমকে উঠে নিজেদের চারপাশে তাকালে তারা কাছাকাছি কোনো শিশুকে দেখতে অপারগ হন। তারা কিছুক্ষণ পর আবারও ফৌপানির আওয়াজ শুনতে পান এবং আতঙ্কিত হয়ে অনুধাবন করেন, মমতাজের গর্ভ থেকে কান্নার আওয়াজ ডেসে আসছে। কান্নার আওয়াজকে একটি অন্তর্ভুক্ত লক্ষণ হিসেবে ডেবে ভয় পেয়ে, তারা সাথে সাথে হেকিম, জ্যোতিষী আর অন্য বিজ্ঞানদের এই কান্নার মানে তরজমা করতে বলেন। শাহজাহান যখন আল্লাহতায়ালার করুণা লাভের জন্য দরিদ্রদের মাঝে দুই হাতে অর্থ বিতরণ করছেন, হেকিমরা স্মাজীকে বাঁচাতে আশ্রাম চেষ্টা করতে থাকেন, তার যন্ত্রণা তখন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এবং প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে এবং অঞ্চলসজল চোখে, মমতাজ বহু কষ্টে শাহজাহানের প্রতি তার শেষ ভালোবাসাপূর্ণ শব্দগুলো উচ্চারণ করেন, ‘আজ বিদায়ের বেলা সমাগত; বিচ্ছেদ মেনে নিয়ে যন্ত্রণাকে আলিঙ্গনের সময় হয়েছে। গত কয়েক দিন আমি

আমার প্রিয়তমের সৌন্দর্য দ্বারা মুক্ত হয়ে ছিলাম, এখন (আমার) রক্ষণ  
হচ্ছে, কারণ আজ বিছেদের সময় সমাপ্ত।' মমতাজ যখন ঢেকেই নিষেজ  
হয়ে পড়ছেন, তখন তিনি শাহজাহানের কাছে প্রতিফলিত চান অন্য কারো গর্ভে  
তিনি আর কোনো সন্তান জন্ম দেবেন না। তিনি সেইসাথে তার অঞ্চলসজল  
শ্বামীকে বলেন, আগের রাতে তিনি বলে 'সবুজ উদ্যানবেষ্টিত একটি সুন্দর  
প্রাসাদ দেখেছেন, যেমনটা তিনি আগে কখনো কল্পনাও করেননি' এবং তাকে  
অনুরোধ করে বলেন তার সমাধিসৌধ যেন অবিকল সেই রকমভাবে তৈরি করা  
হয়। আরেকটা ভাষ্য আরো কাব্যিকভাবে ঘোষণা করে যে, মমতাজের শেষ  
কথাগুলো ছিল : 'আমার জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করবেন, যা হবে অনন্য  
আর অসাধারণ সুন্দর পৃথিবীর বুকে যার সৌন্দর্যের কোনো খুঁজে পাওয়া যাবে না।'  
শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিকরা সাদামাটা কিন্তু মর্মস্পন্দনী কহিলী  
লিপিবদ্ধ করেন। মমতাজের পক্ষে দীর্ঘ, কষ্টকর প্রসব বেদনা এবং অবশ্যে  
কন্যাসন্তান ভূমিত্তের কালে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি সহ্য করা সম্ভব হয়নি।  
'দুর্বলতা তাকে একেবারেই কাহিল করে ফেলেছিল' এবং তিনি মারা যাচ্ছেন  
বুঝতে পেরেই জাহানারাকে পাঠিয়েছিলেন শাহজাহানকে ডেকে নিয়ে আসতে।  
'আবেগে অধীর হয়ে,' তিনি সংক্ষিপ্ত, শেষ বিদায়ের জন্য দ্রুত তার পাশে  
এসে উপস্থিত হন। ক্রন্দনরত মমতাজ 'যন্ত্রণা ভোকান্ত হৃদয়ে' তাদের সন্তানদের  
যত্ন নেয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেন এবং তার কাছ থেকে ছড়ান্ত বিদায় নেন।  
এর কিছুক্ষণ পরই, 'ঘড়িতে যখন সেই কালরাত্রির আরো তিন ঘণ্টা বাকি রয়েছে  
ধ্বনিত হয়... তিনি পরম করুণাময়েন্ম আশ্রমে নিজেকে সমর্পিত করেন।'

ইসলামি রীতি অনুসারে, মমতাজকে দ্রুত সমাধিস্থ করা হয়। মৃত মেয়ে  
মানুষের শরীর সমাধিস্থ করার জন্য প্রস্তুত করার সন্তান রীতি অনুসারে প্রথমে  
একজন স্ত্রীলোক কর্পূর মিশ্রিত শীতল জলে মৃতদেহ ভালোমতো গোসল  
করাবে, তারপর সাদা সুতির পাঁচ টুকরো কাফনের কাপড় দিয়ে মৃতদেহটা  
যুড়ে দেবে। ভূত-প্রেতের দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ভয়ের কারণে এরপরে, প্রাসাদের  
দেয়ালে সদ্য তৈরি করা একটি উন্মুক্ত স্থান দিয়ে প্রথমে মাথা রেখে পুরো  
দেহটা বাইরে বের করা হয়। এই রীতি অনুসৃত হতো যাতে যেখানে মৃত্যু  
হয়েছে সেই ভবনের ভেতরে মৃত্যুর আজাকে পথ খুঁজে ফিরে আসতে  
বাঁধা দিতে। মমতাজের মৃতদেহ এরপরে তাণ্ডি নদীর অপর তীরে  
শাহজাহানের চাচাজান দানিয়েলের তৈরি করা প্রাচীরবেষ্টিত মোগল আনন্দ  
উদ্যানে কাঠের শবাধারে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে সেখানে অঙ্গায়ী একটি  
কবরে মাথা উত্তর দিকে শায়িত করে মুখ কাবাঘরের দিকে ফিরিয়ে রেখে  
সমাধিস্থ করা হয়।



AMARBOI.COM

## নবম অধ্যায়

### যন্ত্রণার রেণুকণা

মহতাজের আকস্মিক মৃত্যু শাহজাহানকে মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলে। গত পনেরো বছর তিনি ছিলেন ‘তার রাতের কক্ষের আলোকছটা’ যার কাছ থেকে তিনি কখনো আলাদা থাকার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। অথচ তাদের সব ছাপিয়ে যাওয়া আবেগ এবং গর্ভধারণের ক্ষেত্রে তার অবিস্মরণীয় উর্বরতাই শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাহজাহানের একজন ঐতিহাসিক যেমনটা লিখেছেন, মহতাজ ছিলেন ‘সৌভাগ্যের সমুদ্রের ঝিনুক, যিনি বছরের বেশির ভাগ সময়ই গর্ভবতী থাকতেন’ যাতে করে :

তিনি মর্যাদাবান স্মাটের উরু সংযোগস্থল থেকে  
পৃথিবীতে রাজবংশের চৌদজনকে নিয়ে আসেছেন।

তাদের ভেতরে, সাতজনের বেঙ্গল নসিব হয়েছে,  
সাতজন যারা বেঁচে আছেন তারা সাত্রাজ্যের প্রদীপ শিথা।

তিনি যখন এই সন্তানদের জন্য দিয়ে পৃথিবীকে অলংকৃত করেছেন,  
চাঁদের মতো চৌদ্দের পরে তিনি ক্ষীণজ্যোতি হয়ে পড়েছেন।

তিনি যখন গর্ভের শেষ মুক্তার জন্য দান করলেন,  
ঝিনুকের মতো তিনি নিজের দেহ তারপরে নিঃস্ব করে দিলেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, উনিশ বছরের অট্মান, অনেক সময়ে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে চৌদ্বার গর্ভধারণ করাটা মহতাজের জন্য এক কথায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল।

দরবারের ঐতিহাসিক একই সাথে মানুষের সুখের বহমান প্রকৃতির জন্য, যা এমনকি স্মার্টদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, শাহজাহানের হতাশাও ফুটিয়ে তুলেছেন : ‘হ্যায়! এই স্বল্পকালস্থায়ী পৃথিবী অস্থিত এবং এখানে স্থিতির গোলাপ কন্টকাকীর্ণ মাঠের ভেতরে অবস্থিত। পৃথিবীর পক্ষিল প্রেক্ষাপটে, এমন কোনো বায়ুপ্রবাহ নেই যা থেকে যত্নগার রেণুকণা উদ্ধিত হয় না এবং পৃথিবীর এই সমাবেশে, কেউই আনন্দে কোনো আসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না, যাকে সেটা দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে থালি না করতে হবে।’ তাদের ভাষ্য অনুসারে, শাহজাহান তার মহতাজহীন প্রাধিকার অস্তিত্বের নিষ্ফলতার জন্য বিলাপ করেছেন : ‘অপ্রতিম দাতা আমাদের যদিও অশেষ দানে ভরিয়ে তুলেছেন...কিন্তু আমরা যার সাথে সেই দান উপভোগ করতে চাই সেই মানুষটাই চলে গেছে।’ শোকের প্রথম প্রহরে তিনি এমনকি সিংহাসন ত্যাগের কথাও বিবেচনা করেছেন, তার অম্বাত্যদের কাছে বলেছেন, ‘পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যদি আমাদের ওপর...পৃথিবীর দায়িত্বভার এবং সমগ্র মানবতার রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ না করতেন...আমরা তাহলে রাজত্ব পরিত্যাগ করে নির্জনতার পৃথিবীর দায়িত্ব গ্রহণ করতাম।’

শাহজাহান নিজের ‘মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ’ আর রাত্রি আলেক্টিত করা রত্নপাথর’ পরিত্যাগ করে ‘ভোরের প্রথম ভ্রান্তোর মতো ধূসর সাদা লেবাস’ পরিধান করে গভীর শোকে নিমজ্জিত হন, পরবর্তী দুই বছর এবং তারপরে প্রতি বৃথবার—মহাতাজের মৃত্যুর মিসেস তিনি এই পোশাক পরিধান করতেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের সবচেয়ে ধ্যাতিমান কবি লিখেছেন :

ক্রমাগত ঘরতে থাকা অঙ্গ তার পরিচ্ছদ সাদা করে ফেলেছিল  
হিন্দুস্তানে, সাদা হলো শোকের রং

গুরুর দিকের মোগলদের কাছে নীল আর কালো ছিল শোকের রং কিন্তু শাহজাহানের সময়ে তারা তাদের হিন্দু প্রজাদের শোকের বর্ণ আর কৃচ্ছতার প্রতীক হিসেবে—সাদাকে গ্রহণ করেছেন। রাজদরবারের অন্যরা—‘সমস্ত ভাগ্যবান যুবরাজ, কীর্তিমান আমির, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা আর স্মার্জের অভিজ্ঞাতসম্প্রদায়’—এই রং অনুসরণ করে, নিজের চমৎকার আলখাল্লার পরিবর্তে সাদা জোবা পরিধান করতে আরম্ভ করেন। স্মার্ট সেইসাথে ‘সব ধরনের আমোদ-প্রমোদ আর মনোরঞ্জন বিশেষ করে সংগীত আর বাদ্যযন্ত্র’ পূরোপুরি বর্জন করেন। তিনি নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তার মুখাবয়বে ‘অনিছাসদ্বেষ ক্রমাগতভাবে শোক, দুঃখ আর বিপর্যয়ের লক্ষণ অবিভূত হতে থাকে’, যখন ‘সর্বদা অঙ্গসজল থাকার কারণে তিনি চমশা পরিধানে বাধ্য হন।’

মমতাজের মৃত্যু খুবই প্রত্যক্ষভাবে শাহজাহানের তারণ্যের সমাপ্তির সূচনা করে। তার ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন, ‘তার মানসিক শুরুরাজিতে এই শোকাবহ ঘটনার পূর্বে দশ কি বারোটার বেশি সাদা কেশের অঙ্গিত্ব ছিল না, যা তিনি টেনে তুলে ফেলতেন, কয়েক দিনের ভেতরেই শুরুর এক-ত্রৈয়াংশ সাদা হয় যায় : এবং তিনি পাকা কেশ তুলে ফেলার অভ্যাস পরিত্যাগ করেন। এবং তিনি প্রায়ই বিষয়টি সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন যে, তার এই বয়সে শ্রদ্ধা উদ্বেককারী শুরুরাজি এই আত্ম-গ্রাসকারী ঘটনার যত্নগা আর পীড়ার মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে এত দ্রুত সাদা হয়েছে।’

স্মাট পুরো একটি সঙ্গাহ ঝরোকা বারান্দায় তার প্রথাগত দর্শনদান বা দরবারে প্রকাশ্যে বা একান্তে সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এই সঙ্গাহের শেষ নাগাদ, ২৫ জুন ১৬৩১ সাল, তিনি একটি নৌকা নিয়ে একাকী তাপ্তি নদী অতিক্রম করে মমতাজকে যেখানে সমাধিষ্ঠ করা হয়েছে সেই প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে গমন করেন, যেখানে স্ত্রীর সমাধিতে তিনি ‘আবোরে দীপ্তিময় মুক্তার মতো অক্ষবিন্দু বর্ণ করেন।’ কয়েক দিন পর, জুলাই মাসের ৪ তারিখে, সচরাচর আনন্দোচ্ছল গোলাপ-জলের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তিনি যদিও মমতাজ আর তার সন্তানদের এবং কারু আবোজানকে লিলিফুল আর কমলা ফুলের নির্যাসযুক্ত গোলাপ-জলের মুক্তারিচ্ছিত প্রথাগত পাত্র উপহার দেন, উৎসবটা সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং পুরো আয়োজনের পরিবেশটি ছিল বিষম নিরানন্দ।

মমতাজ দারুণ ধনবান এক মহিলা হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ সোনা, রূপা রত্নপাথর আর অলংকার মিলিয়ে প্রায় ১০,০০০,০০০ রূপির অধিক হিসেবে নির্ধারিত হয়। শাহজাহান এই সম্পত্তির অর্ধেক তাদের জ্যোষ্ঠ কন্যা সততেরো বছর বয়সী জাহানারাকে দান করেন এবং বাকি অংশ তাদের ছয় সন্তানের মধ্যে বিলিয়ে দেন (তাদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান, দৌলত আফজা, কয়েক মাস পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।) অল্প বয়সী হওয়া সন্দেও, সন্দর্বী, চতুর, গুণবর্তী জাহানারাই কার্যত শাহজাহানের অন্য দুই অবহেলিত স্ত্রীর পরিবর্তে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান মহিষী হিসেবে ‘বেগম সাহিবা’ উপাধি নিয়ে মমতাজের শূন্যস্থান পূরণ করেন। কয়েক মাস পর শাহজাহান তার আম্বিজানের ন্যায় জাহানারাকে রাজকীয় সিলমোহরের দায়িত্ব প্রাপ্ত করতে বলেন যাতে, ‘সেদিন থেকে, রাজকীয় অধ্যাদেশে মহান সিলমোহর সংযুক্ত করার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়।’ তার আম্বিজান যেমন করতেন, তিনিও অচিরেই নিজ অধিকারবলে আদেশ জারি করতে আরম্ভ করেন।

শাহজাহান কখনো চাননি যে বুরহানপুর ময়তাজের স্থায়ী সমাধিস্থল হিসেবে পরিগণিত হোক। তার মরদেহ কবর থেকে তোলা হয় এবং ১৬৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিষণ্ণ একটি শোভাযাত্রা রওনা দেয় মৃত সম্ভাজীকে আগ্রায় নিজগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। জাহানারা এই শোভাযাত্রায় অংশ নেননি বরং নিজের শোকার্ত্ত পিতার সেবা-গুরুত্বার জন্য তিনি থেকে যান যিনি সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিজের সামরিক অভিযান সমাপ্ত করার অভিথায়ে অবস্থান করছিলেন। স্বর্ণ নির্মিত শবাধার ময়তাজকে যেটায় বহন করে নিয়ে আসা হবে সেই শবাধারকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিয়ে আসার দায়িত্ব পনেরো বছর বয়সী শাহ সুজা আর ময়তাজের বন্ধু এবং প্রধান সঙ্গীনী, স্বাতী-আল নিসার ওপর অর্পিত হয়।

তারা যখন মন্ত্র গতিতে উত্তর দিকে দ্রমণ করে, পরহেজগার মানুষেরা উচ্চস্থরে কোরআন শরিফ পাঠ করতে থাকেন এবং পুরোটা পথ রাজকীয় পরিচারকরা দরিদ্রদের ভেতরে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় এবং স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রা বিতরণ করে। শবাধার বহনকারী দলটা আগ্রার নিকটবর্তী হতে, দরবারের এক কবি বর্ণনা করেছেন কীভাবে বিপুল একটি বিলাপের সুর চারপাশ থেকে ভেসে ওঠে :

পৃথিবী তার বাসিন্দাদের চোখে কালোঝার অক্কারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে  
শহরের পূরুষ আর মহিলারা, প্রজা থেকে তরু করে পরিচারকরা সবাই,  
তাদের মুখ শোকের নীল রঙেরঞ্জিত করে।

ময়তাজকে দ্রুত যমুনার তীরে ‘একটি ছোট গম্বুজযুক্ত ভবনে’ সমাধিস্থ করা হয়। এই দ্বিতীয় সমাধিও তার শেষ বিশ্রামস্থল হবে না। শাহজাহান যদিও তখনো বুরহানপুরেই অবস্থান করছিলেন তিনি ইতিমধ্যে তার ‘সময়ের রানি’র জন্য একটি উপযুক্ত অট্টালিকা, ‘একটি উজ্জ্বল সমাধিসৌধ’ পরিকল্পনা করেন।

শাহজাহানকে মূলত তিনটি অভিথায় অনুপ্রাণিত করেছিল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য, যা ময়তাজ মহলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ ‘তাজমহল’ হিসেবে প্রায় সাথে লোকমুখে পরিচিতি লাভ করে। প্রধান অভিথায় ছিল ময়তাজের প্রতি তার চিরস্তন ভালোবাসা এবং তাকে স্মরণীয় করে রাখতে তার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সেইসাথে রাজকীয় ক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক হিসেবে অট্টালিকা সম্বন্ধে তার ধারণা এবং স্থাপত্য আর নকশার জন্য এসবের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল গৌণ কারণ।

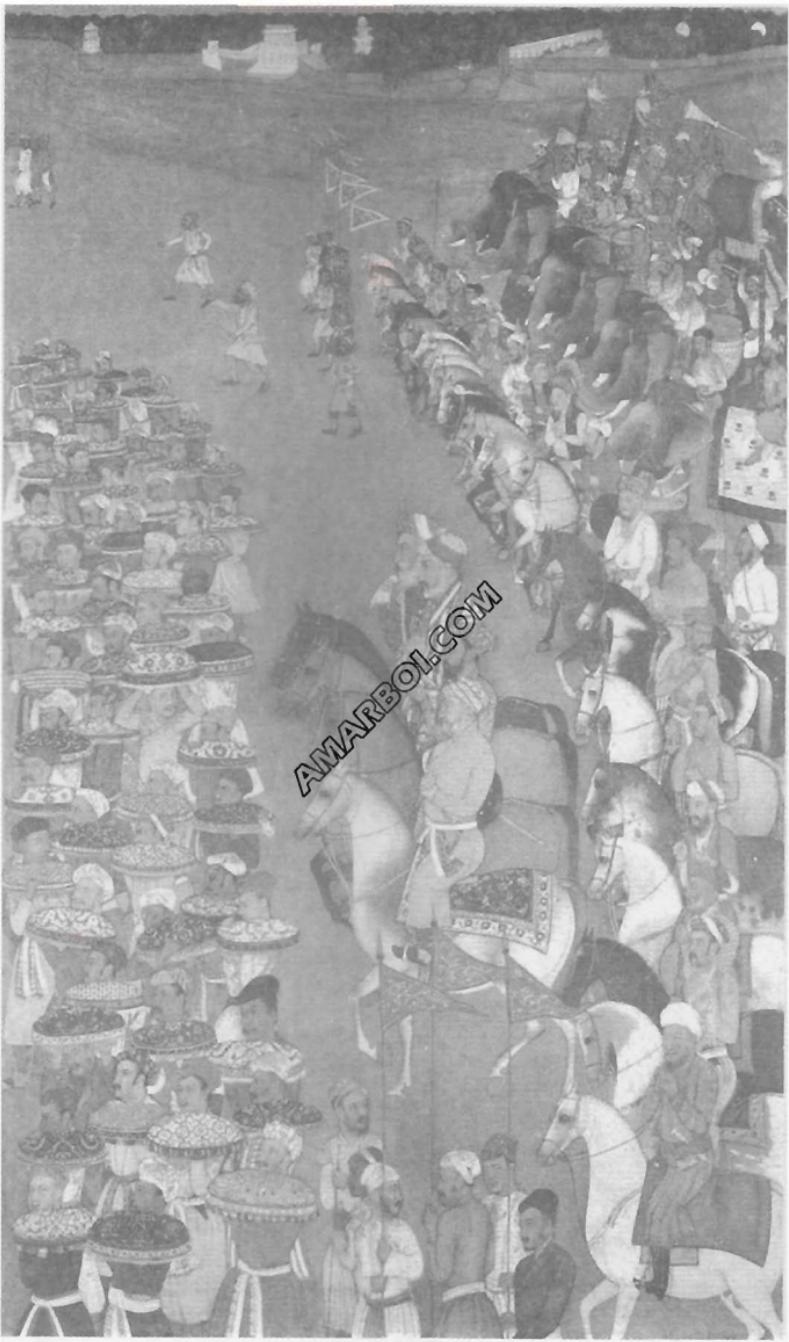
কতিপয় ঐতিহাসিক সাম্প্রতিক সময়ে মমতাজ মহলের প্রতি শাহজাহানের ভালোবাসাকে খর্ব করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একাধারে বদ্ধ আর প্রেমিক এমন একটি দম্পত্তির মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি সবই আমাদের বিপরীত ধারণাই দেয়। শাহজাহান, নিজের রাজকীয় ভাবমূর্তি সবক্ষে দারণ্ণ সচেতন, খুবই যত্নের সাথে নিশ্চিত করেছেন যে তার দরবারের ঐতিহাসিকরা যা লিপিবদ্ধ করবেন তাতে যেন তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় এবং তিনি নিজে তাদের প্রতিটি শব্দ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরেই কেবল অনুমোদন করেছেন। তিনি নিজের আচ্ছন্ন করা শোক, শোকের ‘স্থায়ী’ চিহ্ন যা ‘অনিচ্ছাসন্ত্রেণ’ তার মুখে ফুটে থাকত এবং তার ভাবমূর্তির জন্য অবজ্ঞাপূর্ণ সব কিছু সবক্ষে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য লিপিবদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি সেইসাথে তার অন্য পত্নীরা ‘পত্নীত্বের উপাধির বেশি কিছু উপভোগ করতেন না’ এবং মমতাজের জন্য তার যে ‘গভীর আর অস্তরঙ্গ অনুরাগ ছিল’ তিনি সে রকম ‘অন্য আর কারো প্রতি’ অনুভব করতেন না মমতাজ মহলের দীপ্তিময় প্রশংসায়, যা শেষ অনুচ্ছেদে মৃত্য হয়ে উঠেছে এসবই তিনি নিশ্চিতভাবে অনুমোদনের অনুমতি দিয়েছিলেন : ‘তিনি সর্বদা মহামান্য স্মাটের সাথে অস্তরঙ্গতা আর নৈকট্যের সৌভাগ্য এবং সতত সঙ্গী আর সহচরের পরিত্তির সর্বোত্তম সম্মান আর স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাদের মধ্যকার বদ্ধুত্ব আর মতোক্য এমন একটি মাত্রা লাভ করেছিল যা শাসক শ্রেণীর বা জনগণের অন্য শ্রেণীর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পূর্বে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি এবং কেবল এটা শারীরিক আকাঙ্ক্ষা থেকে নয় বরং উচ্চকোটির সদগুণ আর প্রীতিকর প্রবৃত্তি, অস্তরের আর বাইরের ভালোত্ব এবং উভয় পক্ষের শারীরিক আর আধ্যাত্মিক উপযুক্ততা থেকেই এমন প্রবল ভালোবাসা আর প্রীতি এবং সীমাহীন অনুরাগ আর ঘনিষ্ঠতার জন্ম হয়েছিল।’

শাহজাহান এমন একটি সমাজে বাস করতেন, যা ছিল একেবারেই পুরুষশাসিত, যেখানে বহুবিবাহ স্বীকৃত আর একজন স্ত্রীর জন্য আবেগ প্রকাশ করা এবং তার মৃত্যুতে এমন প্রবল শোক প্রকাশকে একজন স্মাটের গুণের পরিবর্তে তার দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করা হতো, সেখানে তার এমন আবেগের প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। পূর্ব আর পশ্চিমের অন্য শাসকেরা অবশ্য তাদের মহোত্তম আর সবচেয়ে ব্যবহৃত স্থাপত্য আর শৈল্পিক প্রয়াসে ব্যয় করেছেন—উদাহরণশৱল বলা যায়, মিশরের পিরামিড, চিনে বেইজিংয়ের কাছে জিন বা মিঙ সমাধিতে থাণ্ড টেরাকোটা সৈন্য এবং ১৬১৬ থেকে ১৬৩৬ সালের মধ্যে জাপানের নিক্ষেতে মৃত শোগানদের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত বিশাল সমাধিসৌধ। এসব স্মৃতিসৌধ অবশ্য শাসকদের সঙ্গীদের চেয়ে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই মূলত নির্মাণ করা হয়েছে।

শাহজাহানের ন্যায় একই ধরনের অনুরূপি নিয়ে ছীর মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখতে তার পূর্বে সম্ভবত অন্য আর একজন শাসক চেষ্টা করছেন তিনি ইংল্যান্ডের প্রথম এডওয়ার্ড, যিনি অয়োদ্ধা শতকের শেষ নাগাদ তার ছীর ইলেনরকে হারান যখন তিনি তার সাথে একটি রাজকীয় শোভাযাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন। তাদের বিয়েটা যদিও মূলত সম্মত করে বিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা স্পষ্টতই প্রেমপূর্ণ বিয়েতে পর্যবসিত হয়। তাদের ছত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে ইলেনরের গর্ভে তার ঘোলোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, মমতাজের গর্ভে শাহজাহানের জন্ম নেয়া সন্তানের চেয়ে দুটি বেশি। ইলেনরের শীরাধাৰ বহনকারী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবের উদ্দেশ্যে ফিরতি পথে ২০০ মাইল দীর্ঘ্যাত্মায় প্রতি রাতে যেখানেই যাত্রা বিরতি করেছিল সেখানেই এডওয়ার্ড একটি করে অলংকৃত পাথরের ঝুশ স্থাপন করেছিলেন।\*

প্রথম এডওয়ার্ডের ক্ষেত্রে, তার কর্মকাণ্ডের একটি নিয়ামক ছিল খুব সম্ভবত নিজের রাজকীয় ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য (আজকের হিসাবে তিনি প্রায় উনিশ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করেছিলেন) প্রদর্শন করা। মোগলরা এবং বিশেষ করে শাহজাহান, রাজকীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অসারতা এবং প্রজাদের নগণ্যতা প্রদর্শন করতে এবং জনগণকে স্মৃতি অভিভূত আর মুক্ত করতে অট্টালিকাসমূহের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন, ‘পরাক্রমশালী দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল, যা ভীরুকে রক্ষা করবে, বিদ্রোহীদের ভীত করে তুলবে এবং অনুগতকে প্রীত করবে... প্রকাণ মিনারও নির্মিত হয়েছিল... এবং যা মর্যাদার জন্য উপকারী, যা পার্থিব ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয়।’ শাহজাহানের দিনপঞ্জির রচয়িতা লাহোরি স্ম্যাটের স্থাপত্য প্রকল্প সম্বন্ধে লিখেছেন “...এইসব প্রমাণ আকৃতির আর চমৎকার ভবনসমূহের নির্মাণ, যা আরবী প্রবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ‘যথার্থই আয়াদের নির্দশনসমূহ আয়াদের কথাই বলবে’, মহামান্য স্ম্যাটের আল্লাহ প্রদত্ত আকাঙ্ক্ষা আর সম্মানের প্রকাণ প্রশংসনের কথা নির্বাক বাণিজ্যায় বলে (যাবে)।” তিনি তাজমহলকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন শাহজাহানের ‘আকাশশ্পর্শী আকাঙ্ক্ষায় সিক্ত একটি স্মৃতিসৌধ।’ যদিও অবশ্য সুন্দর অট্টালিকার প্রতি শাহজাহানের ভালোবাসা আর এইসব ভবনের সৃষ্টি করা দৃশ্যকল্প মূল্যায়নে তার ক্ষমতা সব কিছু তিনি যে বিশাল প্রকল্প শুরু করতে চলেছেন তার সাথে সুন্দরভাবে একাঙ্গীভূত হয়ে যায়, এসবই জুড়িহীন ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানাতে তার সংকল্পের কাছে গৌণ।

\* প্রথম এডওয়ার্ডের স্থাপিত বেশির ভাগ ক্রশই হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু চেরিং ক্রশে স্থাপিত ক্রশটা পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং লন্ডন থেকে দূরত্ব গণনা করতে এই নির্দিষ্ট স্থানটি ব্যবহৃত হয়।



AMARBOI.COM

১৬৩৩ সালে, দারা শকোহর বিবাহযাত্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~



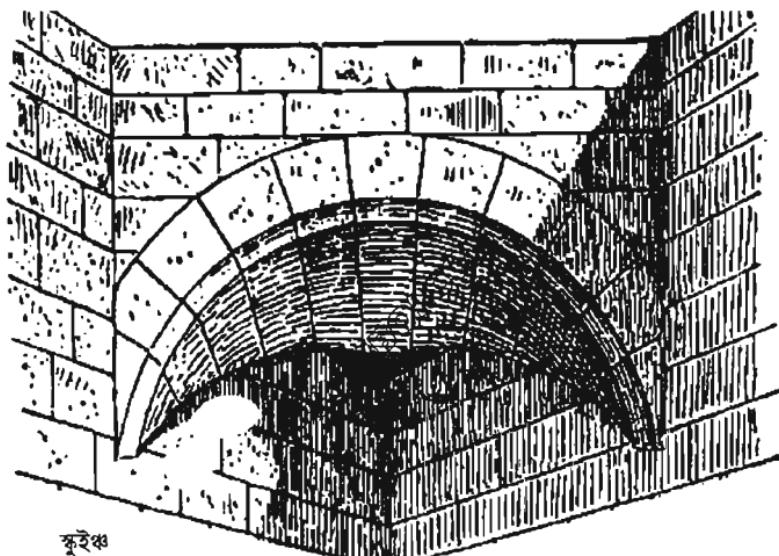
আতশবাজি উপভোগরত মোগল রমণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

অন্যথায় তিনি তার মহোত্তম ধারণার কেন্দ্রস্থলে মমতাজকে শায়িত করতেন না।

১৩

মমতাজ মহলের জন্য সমাধিসৌধের পরিকল্পনা করার সময়, শাহজাহান ভারতবর্ষে আর মধ্য এশিয়ায় উভয় স্থানে তার পূর্বপুরুষদের নির্মিত সমাধিসৌধের দীর্ঘ ঐতিহ্যের মাঝে বিবেচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এ কথা সত্য যে, চেঙ্গিস খানের আদেশ অনুসারে তার অন্ত্যটিক্রিয়ার শোভাযাত্রা যারা দর্শন করবে তারা যেন কেউ গল্প বলার জন্য জীবিত না থাকে তা পালিত হয়েছিল



কুইঞ্চ

এবং নিশ্চিতভাবেই তাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো নথিপত্র পাওয়া যায় না। তার বংশধরেরা অবশ্য সমাধিসৌধ নির্মাতা হিসেবে নিজেদের উন্নত ধারণা আর প্রাণশক্তির প্রচুর নজির পরবর্তী কালে রেখে গেছেন। যেমন চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে পারস্যের সুলতানিয়ার নিজের সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মোগল যুবরাজ উলজাতুর নিজের জন্য নির্মিত ১৬০ ফিট উঁচু ডিম্বাকৃতি গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টভূজাকৃতি সমাধি যার চারপাশে বৃত্তাকারে আটটি মিনার রয়েছে।\* মোগল স্থাপত্যরীতিতে পরবর্তী সময়ে আরো

\* আজও এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তেহরানের ঠিক বাইরে আয়াতুল্লাহ খোমেনির জন্য ইসলামের সবচেয়ে বৃহৎ সমাধি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। এটা যদিও তার উত্তরসূরিদের মতো এতটা প্রাচুর্যময় নয়। আয়াতুল্লাহর আদেশ অনুসারে নির্মাণে

পরিশীলিত হয়ে প্রতিভাত হবে এমন অনেক কিছুই এই সমাধিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

শাহজাহানের সময়ে একটি গম্বুজকে কীভাবে একটি ভবনের উপরে স্থাপন করা যাবে যার অভ্যন্তরভাগের আকার গম্বুজের আকারের চেয়ে বেশি এই অন্যতম প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা দূরীভূত হয়েছিল। পারস্যের সাসানিড সাম্রাজ্যের নির্মাতারা খ্রিস্টীয় ত্রৃতীয় শতকের দিকেই সমস্যাটার সমাধান বের করেছিল, তারা একটি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেখানে গম্বুজটার ভার বহনের জন্য দুটো দেয়ালের প্রস্পর মিলিত হবার স্থানে—স্কুইঞ্চ—আড়াআড়িভাবে তারা একটি সাধারণ খিলান ব্যবহার করে। এটা অট্টভুজের ক্ষেত্রে একটি বর্ণে পরিণত হবে। অট্টভুজের কোণে প্রয়োজন হলে আরো ক্ষুদ্রাকৃতি খিলান আড়াআড়িভাবে যুক্ত করে, ঘোলোটা পার্শ্বদেশ্যুক্ত একটি কাঠামো নির্মাণ করা যায়, যা মোটামুটিভাবে গম্বুজের বৃত্তের সমান। স্কুইঞ্চের আবিষ্কারের প্রায় সাথে সাথেই সিরিয়ায় পেনডেনচিত্ত পদ্ধতি বিকাশ লাভ করে—একটি ঘৃড়ি আকৃতির ধনুকাকৃতি ছাদ একটি বর্গাকার কঙ্কের দুই পাশের মিলিত স্থানে ওপরে একটি ভারবাহী স্তুপ দ্বারা আলঘিত করা হয়েছে। স্কুইঞ্চ আর পেনডেনচিত্তের নকশা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে নির্মাতারা যথন নির্মাণ কৌশল আর শৈল্পিক সম্ভাবনার সাথে নানা প্রযোজ্ঞা-নিরীক্ষা করা আরঝ করেন আর আয়ত্ত করতে থাকেন কীভাবে যেক্ষেত্রে আকার আর আকৃতির ভবনে ওপরে গম্বুজ সংযুক্ত করা যায়। এই নির্মাণ কৌশল পূর্ব আর পশ্চিম উভয় দিকেই ছড়িয়ে গিয়ে, কল্যাণিচ্ছাপালের সেন্ট. সোফিয়া, ফ্লোরেন্সের সাম্রাজ্য মারিয়া ডেল ফিয়োরি এবং মেটের সেন্ট পিটার্সে ব্যবহৃত হয়, যদিও পশ্চিম ইউরোপে গম্বুজের পরিবর্তে মোচাকার চূড়া আর মিনার চার্চের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হিসেবে বর্জায় থাকে।

মোগলদের পছন্দনীয় পূর্বপুরুষ, তৈমূর নিজে একজন ছিলেন একজন মহান নির্মাতা এবং পরস্পর সম্পর্কিত অনেক রাজকীয় সমাধি নির্মাণ করেছিলেন, যার ভেতরে একটি তার নিজের জন্য সমরকল্পে নির্মিত, যা সবচেয়ে চিত্তচ্যৎকারী। একটি মন্দ্রাসা কমপ্লেক্সের কেন্দ্রে সমাধিটা আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং স্থাপত্যকলায় যা ‘বৈত গম্বুজ’ হিসেবে পরিচিত। পুরু, ভীষণ ভারী একক কাঠামোর পরিবর্তে, বাইরের আর ভেতরের আস্তরণের মাঝে বিদ্যমান শৃন্যস্থানযুক্ত বৈত কাঠামো ব্যবহার করে নির্মাতারা গম্বুজের ভেতরের আর বাইরের উচ্চতার মাঝে অধিকতর ফারাক সৃষ্টিতে সক্ষম হন। অট্টালিকার অনুপাত এটা বৃদ্ধি করে এবং অবশিষ্ট ভবনকে কাঠামোগত চাপ আর বিপুল পরিমাণ ভার বহন করা থেকে বিরত রাখে। তৈমূরের সমাধিতে

---

কেবল উপযোগী নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিশালাকৃতি গম্বুজটি তৈরি করা হয়েছে কংক্রিট দিয়ে।

একটি বিশালাকৃতি, উচু, পেঁয়াজের মতো পৌজরযুক্ত গম্ভুজ রয়েছে, যার বহির্ভাগ উজ্জ্বল সবুজাত-নীল রঙের টালি দিয়ে আবৃত আর ডেতরের অংশে, একটি নিচু অর্ধ গোলাকৃতি গম্ভুজ তেলের পিপা সদৃশ একই ভিত্তি থেকে নির্মিত হয়েছে। গম্ভুজের বাইরের অংশ দৃশ্যমানতা আর রাজকীয় স্মৃতিসৌধের বাহ্যিক জাঁকজমক নিশ্চিত করে, যখন ডেতরের নিচু গম্ভুজটা অভ্যন্তরের আনুপাতিক সমতা বজায় রাখে।\*

মুসলমান শাসকরা সমাধির উপরিভাগ আকাশের দিকে খোলা থাকতে হবে, কোরআন শরিফের এই বিধানের সাথে তাল রাখতে গিয়ে হিমশিম থেয়েছেন। অনেকে তৈমুরের সমাধিসৌধের ন্যায় একটি নিচু অভ্যন্তরীণ গম্ভুজ ব্যবহার করেছেন আকাশের চাঁদোয়ার রূপক হিসেবে। সে কারণেই এসব গম্ভুজের অনেকগুলোকে তারকাখচিত হিসেবে দেখা যায়। অন্যরা বাইরের প্রবেশপথ সরদলের মাঝে একটি শূন্যস্থান রেখে দেয় যাতে সমাধির ওপরে বাইরের তাজা বাতাস প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। বাবর তার নিজের সমাধি আক্ষরিক অর্থেই উন্নত রাখতে চেয়েছিলেন। আকবর তার আক্রাজান হ্মায়নের জন্য একটি অতিকায় দ্বৈত-গম্ভুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তার নিজের সমাধিতে, যা মূলত তার নিজেরই নকশা করা হলেও জাহাঙ্গীর দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। একটি উন্নত কক্ষের মন্ত্রমুখানে তার স্মৃতিস্তুত স্থাপিত, যদিও তার মূল সমাধিস্থল সমাধির নিচে স্বচক গভীরে অবস্থিত। জাহাঙ্গীরের বিশাল, মিনারযুক্ত সমতল সমাধিসৌধের হাতে তার আর নূরের প্রিয় উদ্যানের একটিয় অবস্থিত, এখানেও তার স্মৃতিস্তুত ছাদহীন একটি কক্ষের মধ্যেখানে মূলত অবস্থিত যতিও তার সমাধিস্থল নিচে সমাধির অভ্যন্তরে অবস্থিত। (সমাধিস্তুতা বহুদিন পূর্বেই চুরি হয়ে গেছে।)



শাহজাহান একবার যখন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি মমতাজ মহল আর তার প্রতি নিজের ভীষণ ভালোবাসা আর সেইসাথে তার রাজত্বকালের ক্ষমতা আর র্যাদা স্মরণীয় করে রাখতে আগ্রহী, তার প্রথম কাজ তখন ছিল তিনি সে সৌধের প্রতিকৃতি মনে মনে দেখেছেন সেটা নির্মাণের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান পছন্দ করা। স্থান নির্বাচনের সময় তিনি যেসব বিষয়ে শুরুত্ব দিয়েছিলেন তার ডেতরে অন্যতম ছিল ব্যস্ত আগ্রা শহরের কোলাহল থেকে দূরে শাস্তিপূর্ণ একটি

\* দ্বৈত গম্ভুজের নকশার পরিবর্তিত রূপ ইউরোপেও গৃহীত হয়েছে— যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফিলিপ্পো ক্রনেলেটি ফ্রেরেগের শাস্তা মারিয়া ডেল ফিয়োরের গির্জার গম্ভুজের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন এবং ক্রিস্টোফার ওয়ার্ন লন্ডনের সেট পলস ক্যাথেড্রালের গম্ভুজের জন্য তার নকশায় এটা ব্যবহার করেছেন।

স্থান তিনি নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। স্থানটা আবার একই সাথে দূর থেকে দৃশ্যমান হতে হবে আর সেইসাথে যমুনা নদীর নিকটবর্তী, যাতে উদ্যানের সেচের আর সৌধে পানির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সহজেই পানি পাওয়া যায় আর সেইসাথে গ্রীষ্মকালে শীতল একটি পরিবেশ বজায় থাকে। স্থানটা যদি যমুনার তীরে অবস্থিত হয় তাহলে সেটা এমন একটি অবস্থানে হতে হবে যাতে বন্যা বা ভাঙ্গনের কবলে না পড়ে আবার সেইসাথে তার স্থপতিদের তাদের নকশায় নদীকে সতত পরিবর্তনশীল, প্রতিফলিত প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়, নদীর জলসীমা সেই সময় বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি উঁচু ছিল। স্ম্রাট সেইসাথে ভবিষ্যতে পাশেই নিজের জন্য একটি সমাধির স্থান বিদ্যমান থাকুক চাইতে পারেন। সর্বোপরি, আগাম লালকেপুর নিজের শাহিমহল থেকে শাহজাহান যেন সমাধিসৌধটা দেখতে পান। বুরহানপুরের দুর্গ প্রাসাদে তার মহলের জানালা থেকে আনন্দ উদ্যানের যেখানে সাময়িকভাবে মহতাজ মহলকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সেটা সরাসরি তার দৃষ্টিপথের ডেতরে অবস্থিত ছিল।

আগা দুর্গ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে এবং রাজা মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহের বাগানবাড়ির প্রান্তে অবস্থিত এবং বাবরের স্থাপিত একটি উদ্যানের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত শাহজাহানের পছন্দের স্থানটা সব মানদণ্ড সিদ্ধ করে। স্থানটা, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অস্থান দুর্গের কাছে নদীতে একটি মোটামুটি তীক্ষ্ণ ডানহাতি বাঁকের পরে স্থানকটা ভাটিতে অবস্থিত, যা একটি জলাধারের মতো সৃষ্টি করে তাজের স্মৃষ্টাব্য স্থানের নিকটে যমুনার স্রোতের বেগ অনেক হ্রাস করেছে। স্থানটা আবরণের (জয়পুর) রাজার, যিনি সানন্দে জমিটা স্ম্রাটকে দান করার অঙ্গপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইসলামি রীতি অনুসারে অবশ্য এটা বিশেষভাবে শুভত্বপূর্ণ, যে মহিলা সত্তান জন্ম দেয়ার সময় মৃত্যুবরণ করেন, যেমন মহতাজ মহল, তাদের শহীদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাদের সমাধিস্থল তাই তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শাহজাহান তাই রাজাকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি নয় বরং চারটা আলাদা আলাদা জমি প্রদান করেন। তিনি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন এবং ১৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসে যখন মহতাজের মৃতদেহ আগ্রায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় তত দিনে জমি দখল নেয়া হয়েছে। তাকে তাই এখানেই, তাজমহলের ভবিষ্যৎ নির্মাণস্থানে তাকে আবারও সাময়িকভাবে সমাধিস্থ করা হয়।

শাহজাহানকে এরপর একটি ধারণা কল্পনা করে সেখান থেকে সমাধি কমপ্লেক্সের জন্য বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করেন। তিনি এটা করার সময় স্থাভাবিক কারণেই তার আবারাজানের আর তার নিজের পূর্ববর্তী প্রকল্পে কাজ করা অভিজ্ঞ স্থপতিদের তাদের পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠান। রাজদরবারের ঐতিহাসিক লাহোরি তাজমহলের নির্মাণের বিবরণীতে মীর আবুল করিম আর মুকামাত খানের নাম উল্লেখ করেছেন নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। তাদের পদবি থেকে বোঝা যায়, তারা প্রকল্পের ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ

পরিচালনা আর সংঘটনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। মীর আবুল করিমকে শাহজাহান যখন নিয়োগ করেন তখনই তার বয়স প্রায় ষাট বছর এবং লাহোরে জাহাঙ্গীরের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পে তিনি ইতিমধ্যে কাজ করেছেন। মুকামাত খানজাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, পারস্যের দক্ষিণাধ্যুম শিরাজ থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই মুকামাত খানকে তার কর্মসংস্থান মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং তিনি মনে হয় স্থপতি বা প্রকৌশলীর চেয়ে মূলত একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। শাহজাহান তাকে দ্রুত পদনুষ্ঠি প্রদান করতে থাকেন। ১৬৪১ সালে তাকে তিনি দিল্লির সুবাদান হিসেবে নিয়োগ দেন, যেখানে নতুন শহর শাহজাহানাবাদে তিনি লালকেল্লার নির্মাণকার্য তদারক করেন।

লাহোরি তাজের স্থপতির নাম উল্লেখ করেননি। অন্য কোনো সমসাময়িক রচনাতেও স্থপতির নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোনো অট্টালিকা নির্মাণকালে দিনপঞ্জির রচয়িতাদের পক্ষে স্থপতির নামের পরিবর্তে তত্ত্বাবধায়কের নাম উল্লেখ করাটা খুব একটি অস্বাভাবিক নয়, কারণ সেই যুগে স্থপতিরা মূলত একটি দল হিসেবে কাজ করতেন এবং নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধায়কদের চেয়ে তাদের মনে হয় নিম্নপদস্থ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পচিমে ঠিক যেমন, হবু স্থপতিদের অধ্যয়নের কোনো স্থান ছিল না। তারা কাজ করতে করতে কাজ শিখতেন এবং প্রধান কারিগর থেকে ধীরে ধীরে কাজ শিখে ওপরে উঠে আসতেন।<sup>\*</sup> লাহোরি স্ববশ্য তাজমহলের স্থপতি হিসেবে কারো নাম উল্লেখ না করায় তার পরিচয় নিয়ে প্রচুর বিবাদের জন্ম হয়েছে। পর্তুগিজ পাত্রি সেবান্তিয়ান মুসলিমকে যিনি ১৬৪০ সালে আগ্রায় এসেছিলেন পরবর্তী কালে দার্তা করেন, তাজের স্থপতি হলেন ‘জেরোনিমো ডেরোনিও নামে ডেনিসের এক জন্মহীন’, যিনি পর্তুগিজ জাহাজে করে এই অঞ্চল এসেছিলেন এবং অমি লাহোরে পৌছাবার কিছুদিন পূর্বে শহরেই মৃত্যুবরণ করেন।<sup>†</sup> পরবর্তী শতকগুলোতে ইউরোপীয়রা অঙ্ক স্বদেশপ্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে এই দাবির পক্ষে প্রচুর প্রমাণ উপস্থাপন করে। তাদের এই উৎকৃষ্ট স্বদেশিকভাব খানিকটা এসেছে বিশ্বের শীকৃত বিশ্বয়ের কৃতিত্বে খানিকটা ভাগ বসাবার অভিপ্রায় আর খানিকটা এসেছে উগ্র বর্ণবাদী আবেগ থেকে যেকোনো ইউরোপীয় ছাড়া এমন সুন্দর ভবনের নকশা করা সম্ভব নয়।

ম্যানৱিকের দাবিকে অর্বাচিনের উক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মোগল স্থাপত্যরীতির ওপর ইউরোপীয় প্রভাব খুবই সামান্য। কোনো ইউরোপীয় যদি তাজের নকশা প্রণয়ন করত তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য সমাধিসৌধে যুক্ত করত। এমন কোনো কিছুই আমরা দেখতে পাই না।

\* স্যার ক্রিস্টোফার ওয়ার্নের ক্ষেত্রে বিষয়টা অস্বাভাবিক যে তিনি বিজ্ঞান অধ্যয়ন ছেড়ে স্থপতি হিসেবে পরিচিত হন, বিজ্ঞানের বিষয়েই তিনি কেবল গতানুগতিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন।

অন্যান্য সমসাময়িক ইউরোপীয় ভাষ্য বর্তমান থাকলেও ম্যানরিকেই কেবল স্থপতি হিসেবে ভেরোনিওর নাম উল্লেখ করেছেন। তাজের নির্মাণকার্য শুরু হবার সময় ইংলিশ করণিক পিটার মানডি আঘায় অবস্থান করছিলেন। ম্যানরিকের মতো নয়, মানডি ভেরোনিওকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন কিন্তু কীভাবে নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল মানডি সেই বর্ণনা দেয়ার সময় কোথাও স্থপতি হিসেবে ভেরোনিওর নাম উল্লেখ করেননি।

আঘায় প্রিস্টান কবরস্থানে ভেরোনিওকে সমাধিস্থ করার কারণে বোঝা যায় যে তার মৃতদেহ লাহোর থেকে আঘায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার সমাধির বেশ ভালোভাবেই সংরক্ষিত স্মৃতিফলকে কেবল লেখা রয়েছে, ‘এখানে জেরোনিমো ভেরোনিও অস্তিম শয়্যায় শায়িত রয়েছেন। মৃত্যু ২ আগস্ট ১৬৪০ সাল, লাহোর।’ তিনি যদি আদতেই তাজের স্থপতি হতেন তাহলে নিচিতভাবেই তার সমাধির স্মৃতিফলকে সেটার উল্লেখ থাকত। তার চেয়েও বড় বিষয়, তার সমাধিস্থল একটি বিষয় নিশ্চিত করে যে, ভেরোনিও একজন প্রিস্টান এবং শাহজাহান একটি পবিত্র স্থাপনার, যেখানে কেবল মুসলমানদেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে, নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব কোনো অমুসলিমকে প্রদান করতেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভেরোনিও পেশায় একজন জাহরি ছিলেন, স্থপতি নন। পিটার মানডি তাকে শাহজাহানের বেঙ্গলুরুক শৰ্কার হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পর্যটকগুলোকে ভীষণ একজন দক্ষ মণিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে। ম্যানরিকের জাহানীতে, যা সে কেবল লোকমুখে জানতে পেরেছে, যদি কোনো অস্তিত্বিত সত্য থেকে থাকে সেটা সম্ভবত এই যে শাহজাহান ৪০,০০০ তোলা স্বর্ণের তৈরি কলাই করা আর রত্নখচিত সোনালি তিরক্ষরণী আর বেষ্টনীর বিষয়ে ভেরোনিওর সাথে পরামর্শ করেছিলেন, যা তিনি মহাতাজের সমাধির চারদিক ধিরে দেয়ার জন্য নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সোনার বেষ্টনীর পরিবর্তে সাদা মার্বেলের তৈরি তিরক্ষরণী ব্যবহৃত হয়। কোনো চিত্রকর্ম বা সোনার বেষ্টনীর কোনো বিস্তারিত বিবরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না আর তাই ইউরোপীয় প্রভাব যদি আদৌ থেকে থাকে সেটা নির্ণয় করা অসম্ভব।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ, কর্নেল ইউলিয়াম স্লিম্যান, যিনি ভারতবর্ষে রক্ষণপাসু ঠঁগীদের দমন করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, ভারতবর্ষ সমক্ষে তার জনপ্রিয় পুস্তকে দাবি করেছেন, একজন ফরাসি অস্টিন বা অগাস্টিন দ্য বোর্ডো, তাজের স্থপতি।\* অবশ্য ভারতে অগাস্টিনের সমক্ষে অন্য আরেকটা

\* ঠঁগীরা রাজপথে বিচরণকারী একটি খুনি সম্প্রদায়, যারা বণিক বা পর্যটকদের দলে অনুপ্রবেশ করত এবং দুই কি এক দিন পর একটি হলুদ রেশমের ঝুমাল দিয়ে তাদের সঙ্গীদের কৃত্যানুষ্ঠান পালন করে খাসরোধ করে হত্যা করে, হতভাগ্য লোকগুলোর দেহ টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলত আর তাদের সর্বোচ্চ চুরি করত। ইংরেজিতে ‘ঠঁগী’ শব্দের মানে তাই নিষ্ঠুর শুণামি।

সূত্রে আমরা যা জানতে পারি তার উৎস ১৫০ বছর পূর্বে রচিত তার স্বদেশি আরেক ফরাসি মণিকার জ্যা ব্যাপতিত ত্রেভার্নিয়ের একটি পুস্তক, যেখানে তিনি দ্যুর্ঘটনার কষ্টে জানিয়েছেন যে শাহজাহান অগাস্টিনকে নিজের ব্যক্তিগত মহলের কিয়দংশ কুপা দিয়ে অলংকৃত করার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অগাস্টিন কাজ শুরু করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পুস্তক থেকেই সম্ভবত স্মিম্যান তার ভাষ্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন। প্যারিসের ফরাসি জাতীয় পাঠ্যাগারে বর্তমানে রক্ষিত একটি চিঠি এ বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে, যেখানে অগাস্টিন দ্য বোর্দো নিজের সমক্ষে বর্ণনা করার সময় বলেছেন, তিনি 'মকশা অঙ্কনকারী নন' আর স্থাপত্যের বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ, আগ্রাসহ বিভিন্ন এলাকায় মোগল দরবারে প্রচলিত ফার্সি ভাষায় লিখিত এবং তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্যাদির সতেরো শতকের মূল নথির নকল দাবি করে পরম্পর সম্পর্কিত একাধিক পাত্রলিপির আবির্ভাব ঘটে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই পাত্রলিপিগুলোকে সৌর্বের জাল বলে মনে করেন এবং তারা আরো মনে করেন যে, মূলত ব্রিটিশদের স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে এগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিশেষ করে আগ্রার একজন ইংরেজ স্কুলশিক্ষক, মূলত এর পেছনে রয়েছেন। এসব নথিগুলো তাজমহলের স্থপতি হিসেবে ওস্তাদ দৈশু নামে একজন লোকের নাম পাওয়া যায় এবং তার জন্মস্থান হিসেবে অস্ত্রায়, পারস্য, তুরস্ক বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পাত্রলিপি সমক্ষে স্টেশন এতটাই প্রবল যে খোদ ওস্তাদের অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠত যদি নাস্তারতের স্থানীয় এক ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজে পেতেন যে আগ্রায় ১৯৪৭ সালে পর্যন্ত ওস্তাদের বংশধর বলে দাবি করা একটি পরিবার বাস করত, তারা পেশায় ছিল নকশা অঙ্কনকারী। তারা মুসলমান হবার কারণে সে বইয়েই ভারত ভাগের ফলে পাকিস্তান চলে গেছে। পরিবারটির কাছে নাকি তাজমহলের সতেরো শতকের একটি নকশা রয়েছে যদিও এর কোনো সঙ্গান এখন আর পাওয়া যায় না। একই ঐতিহাসিক অবশ্য উল্লেখ করেন যে, ওস্তাদ দৈশার অবস্থান বর্ণনা করতে পাত্রলিপিতে ব্যবহৃত শব্দের মানে নকশা অঙ্কনকারী, স্থপতি নয়, আর এই কারণে ওস্তাদের অস্তিত্ব থাকলেও তিনি খুব বেশি হলে সম্ভবত অন্যের ভাবনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত নির্মাতার পরিকল্পনা কাগজে অঙ্কন করেছেন।

তাজমহলের স্থপতি হিসেবে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যে নামটা আমরা জানতে পারি সেটা ওস্তাদ আহমেদ লাহোরির, যিনি ১৬৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৩০-এর দশকে একজন গবেষক ওস্তাদ আহমেদ লাহোরির এক পুত্রের লেখা আঠারো শতকের শুরুর দিকের কবিতার একটি পাত্রলিপি আবিষ্কার করেন, যেখানে তিনি দাবি করেছেন, তার আকবাজান ছিলেন লালকেল্লা আর তাজমহল উভয়েরই স্থপতি। সমসাময়িক অন্যান্য নথিপত্র, যার ভেতরে দরবারের এক দিনপঞ্জি রচয়িতার রচনাও রয়েছে, তা থেকে জানা যায়, ওস্তাদ আহমেদ লাহোরি বাস্তবিকই লালকেল্লার স্থপতি কিন্তু তিনিই যে তাজের স্থপতি

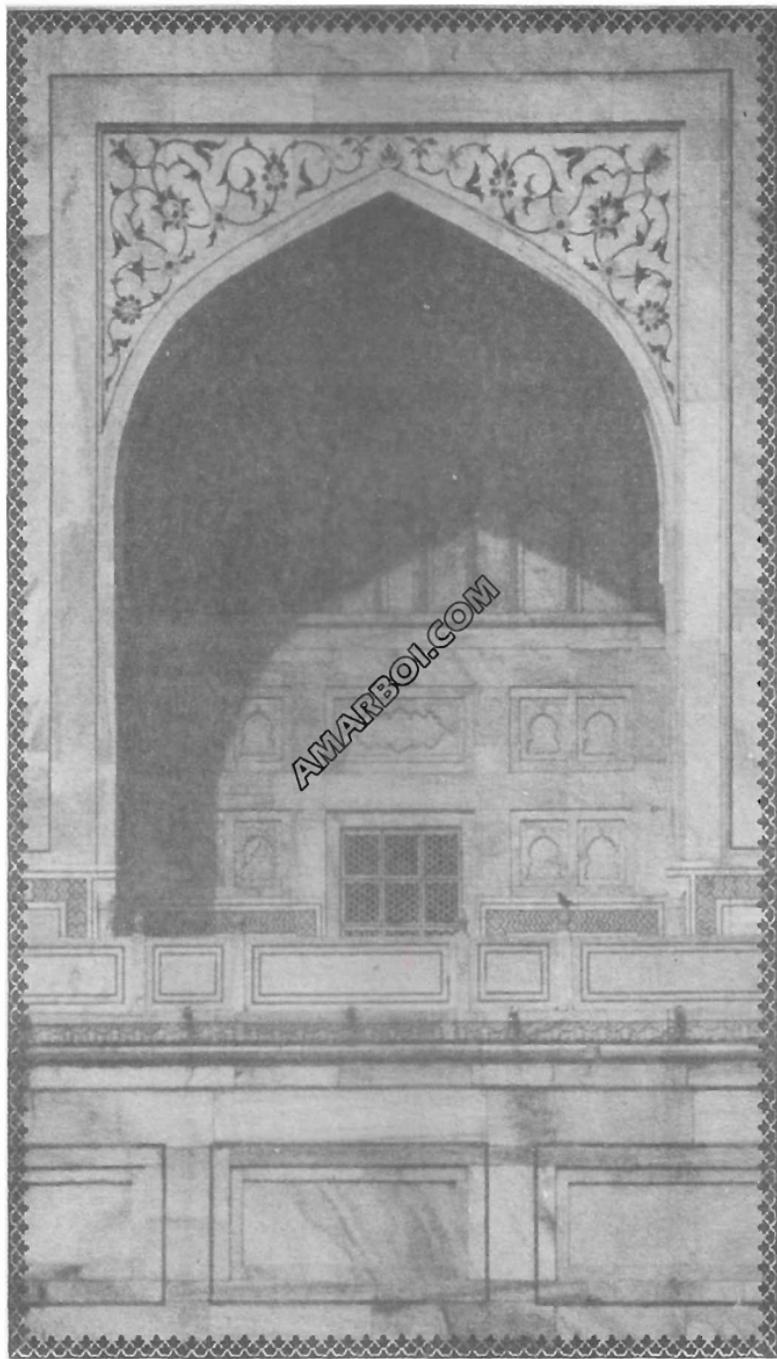
এ বিষয়ে কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। বিষয়টি অসামগ্রস্যপূর্ণ বলে মনে হয় এ কারণে যে, যদি ওস্তাদ আহমেদ লাহোরি উভয় ভবনের স্থপতি হয়ে থাকেন এবং কেবল লালকেপুর নন, তাহলে শাহজাহান কি তার দিনপঞ্জির রচিতাকে সে রকমই লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন না? ওস্তাদের পুত্র সম্ভবত বৌধগম্য কারণেই নিজের পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কেবল তার আক্রাজানকে স্থপতি হিসেবে দাবি করেছেন, যিনি সম্ভবত নির্মাণ প্রকল্পে অংশ নিয়েছিলেন, গৌরবের একটি বিরাট অংশ, যা সাথে সাথে তার পুত্রের দ্বারা সাথে সাথে তার সেরা অবদান হিসেবে শনাক্ত করা হয় এবং সেইসাথে ইউরোপীয়রাও একজন ইউরোপীয় স্থপতির কাহিনী ফেঁদে বসেন।

উনিশ শতকের বিতর্কিত পাতুলিপিগুলোয় বর্ণিত গল্পগুলো ভাববিলাসীরা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে যে শাহজাহান যখন তার সামনে পেশ করা দুর্বল নকশা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, সমাধিসৌধের একটি সম্পূর্ণ দৃশ্য নাম না জানা কোনো সুফি মরমি সাধকের স্বপ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সুফি সাধকই নকশাটা শাহজাহানের হাতে তুলে দেন, যাতে তিনি মৃত্যুপথ্যাত্মী মহতাজের পেশ করা অস্তিম আর্জি ‘একটি মকবরা, যা হবে অনন্য আর অসাধারণ সুন্দর, পৃথিবীতে যার তুলনা নেই, যা স্মার্তের মহবতের উপযুক্ত।’ অন্যরা অবশ্য তার দরবারের ঐতিহাসিক লাহোরি অট্টালিকাগুলোর নকশা প্রণয়নে শাহজাহান কীভাবে সম্পৃক্ত প্রতিক্রিয়েন সে সম্বন্ধে যা বলেছে তার ডেতরে সমস্যার একটি সমাধান হয়তো খুঁজতে চেষ্টা করেছে: ‘রাজকীয় মস্তিষ্ক, যা সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, এসব প্রভুত্বাত আর মজবুত অট্টালিকার পরিকল্পনা আর নির্মাণে অখণ্ড মনোযোগ অবদান করেছেন, যা...অক্ষুট ভবিষ্যতে যা তার সৃষ্টিশীলতা, অলংকরণ আর সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রতি চিরস্তন ভালোবাসার স্মারক হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। তিনি নিজে অধিকাংশ অট্টালিকার নকশা নিজে প্রণয়ন করেছেন এবং কুশলী স্থপতিদের দ্বারা প্রণীত পরিকল্পনা দীর্ঘ পর্যালোচনার পরে তিনি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আর পরিবর্ধন করেছেন।’ অট্টালিকাসমূহের বৃহস্পৃষ্ঠের অংশের জন্য এই বক্তব্য হয়তো একজন পৃষ্ঠপোষক বা প্রতিক্রিয়াকারী ব্যক্তির কোনো প্রকল্পে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে অতিরিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গ প্রতিভাত হতে পারে। এমনকি জাহাঙ্গীরও তার ঘোবনকালে তার দক্ষতার প্রশংসা করেছে। শোকার্ত শাহজাহান নিশ্চিতভাবেই অন্য অট্টালিকার চেয়ে নিজের স্ত্রীর মকবরার নকশা প্রণয়নে অনেক বাড়তি প্রয়াস কামনা করবেন। তিনি বাস্তবিকই হয়তো নির্মাণের প্রাথমিক ধারণা গঠন করার কালে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন বা অন্যদের দাখিল করা নকশায় প্রচুর পরিবর্তন করেছিলেন বা এমনকি সেগুলোকে পুনরায় অক্ষন করিয়েছিলেন। তিনি চাননি স্থপতিদের যে দলগুলোর সাথে তিনি পরামর্শ করেছেন তাদের ডেতরে কোনো একটি দল কৃতিত্বের দাবি করবক।

১৬৩২ সালের শ্রীশকালে, শাহজাহান আগ্রায় ফিরে আসেন। সেখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের সবচেয়ে বড় প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করেন। তার দরবারে নিযুক্ত এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, বুরহানপুরে 'তার প্রয়াত সন্মাজীর শোকাবহ মৃত্যুর' দৃশ্যপট রচিত হওয়ায় জায়গাটার প্রতি তুমেই 'মহামান্য সন্মাটের মন বিশ্বাস' হয়ে উঠে। তিনি কন্তু পক্ষে পরবর্তী বছরগুলোতে সব সময় শহরটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া তার দাক্ষিণাত্যের অভিযান সাফল্য লাভ করেনি। দুই বছরের বেশি সময়কালব্যাপী নিষ্কল যুদ্ধপ্রয়াসে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের পাশাপাশি মহামারি আর দুর্ভিক্ষের কারণেও প্রচুর লোক হারিয়েছেন, মাঝে কয়েকটা দুর্গ দখল ছাড়া আর কোনো লাভ হয়নি আর তার সৈন্যবাহিনীও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তিনি তাই সিদ্ধান্ত নেন তার এই অভিযানের দায়িত্ব তিনি অন্যদের হাতে সমর্পণ করবেন। অবশ্য শাহজাহানের প্রত্যাবর্তনের এই সময়কালের সাথে একটি বিশেষ বিষয় জড়িত রয়েছে, সেটা হলো ময়তাজের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত উরসে—মৃতদের জন্য আয়োজিত প্রথাগত বার্ষিক অনুষ্ঠান—ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার বাসনা।

পিটার মানডি সন্মাটের সফরসঙ্গীদের এবার তাদের সন্মাজীকে ছাড়াই ফিরে আসার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। 'আমাদের চোখে স্মৃত দূর দেখতে পায়, তত দূর পর্যন্ত চারপাশের সবটুকু এলাকা অগণিত হাতি, ঘোড়ার পাশাপাশি মানুষে গিজগিজ করার সাথে ছোট-বড় অসংখ্য নিশান পুরো দৃশ্যটাকে একটি কেতাদুরস্ত মাত্রা দান করে।' একটি ঝালচে ধূসর ঘোড়ায় আরুচ শাহজাহানকে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহ আনন্দসরণ করছে। জুনের ১১ তারিখে, স্তীর মৃত্যুবার্ষিকীর ছয় দিন পূর্বে, শাহজাহান একটি বদ্ধ পালকিতে চড়ে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করেন। সময়টা ছিল মধ্যরাত্রি—তার জ্যোতিষীদের দ্বারা অনুমিত সবচেয়ে মাঝলিক প্রহর।

উরস্টা ছিল নিরানন্দ কিস্তি অপব্যয়ী একটি আয়োজন। 'রাজকীয় বাজারসরকার প্রয়াত সন্মাজীর সমাধিস্থলের চারপাশের উদ্যানে আড়ম্বরপূর্ণ বসার আয়োজন করে, সেখানে চমৎকার গালিচা পেতে দেয় আর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, পানীয়, মিষ্টান্ন আর নানা স্বাদের আচার, চাটনির বন্দোবস্ত করে—কল্পনাকেও যা হার মানায়। সন্মাজের সমস্ত ধর্মপ্রাণ আর বিজ্ঞ শেখ এবং ধর্মোপদেষ্টা তারপর একসাথে সমবেত হয়ে চমকপ্রদ একটি সমাবেশের সৃষ্টি করেন।' শাহজাহান, তার সাদা শোকের আলবাল্লা পরিহিত অবস্থায়, মোনাজাতে অংশ নেন, তারপর প্রস্থান করেন। রাজকীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, 'মহামান্য সন্মাট মানুষের বিশাল ভিড় এড়াতে নিজের ব্যক্তিগত মহলে ফিরে যান।' তিনি নিঃসন্দেহে শোকার্ত মনে একাকী থাকতে চেয়েছিলেন, যা তার নির্মিতব্য বিশাল ইমারতে, একটি চিরস্থায়ী অভিব্যক্তি লাভ করতে পুরু করেছে, যার ভিত্তির জন্য ইতিমধ্যে যমুনার তীরে মাটি ঝোড়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে।



AMARBOI.COM

## দশম অধ্যায়

### নির্মাতা এই পৃথিবীর অধিবাসী নয়

শাহজাহান আর তার স্থপতিরা সিদ্ধান্ত নেন, মমতাজের ‘আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বৃত্তি মকবরা’ হবে একটি অনেক বিশাল আকৃতির ইমারত কাঠামোর কেন্দ্রস্থল। মকবরাটা, যার কেন্দ্রস্থলে তাকে ইসলামি রীতি অনুসরে—পশ্চিমে মক্কার দিকে তার মুখ সুরিয়ে রেখে, উত্তর-দক্ষিণে শায়িত করা হবে—নদীর তীরে একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মাঝে একটি মঞ্চ বা চতুরের ওপরে নির্মিত হবে। সমাধিতে মমতাজের দেহ যেভাবে শায়িত রয়েছে ঠিক সেই সরলরেখা বরাবর উত্তর-দক্ষিণে, কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা হিসেবে পানির একটি নহর প্রবাহিত হবে, যার উভয় পার্শ্বে সমিতজ্জপে মারুনসই আনুষঙ্গিক ইমারত আর স্থাপনাসমূহ নির্মিত হবে।

মকবরার সরাসরি পশ্চিম পার্শ্বে, চতুরের ওপরে তারা তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন যেখানে জিয়ারত করতে আসা মুসলিমেরা নামাজ আদায় করবে। নামাজ পঞ্জার জন্য মুসলমানদের মসজিদে যেতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ক্ষেত্রে আন শরিফে বলা হয়নি তবে তারা যেখানেই নামাজ আদায় করুক তাদের অবশ্যই মক্কার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। মসজিদে নামাজের দিক নির্দেশের জন্য পেছনের দেয়ালে একটি বর্ধিতাংশ নির্মিত হয়, যাকে মেহরাব বলে। মসজিদের বিপরীত দিকে নকশায় ভারসাম্য আনয়নের জন্য, মোগলরা নিজেরা যেভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে থাকে, এর জবাব বা ‘প্রতিধ্বনি’ হিসেবে, পরিকল্পনাকারীরা অবিকল মসজিদের ন্যায় একটি ইমারত সরাসরি মকবরার পূর্ব পার্শ্বে যোগ করেন। এই ভবনের পেছনের দেয়াল যেহেতু মক্কার বিপরীতমুখী, এটাকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়—এবং এটা সম্ভবত মুসলিমদের জন্য অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো—কিন্তু এটা নির্মাণের প্রধান উপলক্ষ ছিল একেবারেই নান্দনিক।

মকবরার মুখোয়ুষি বিপরীত প্রান্তে, প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের শেষ সীমানায় পরিকল্পনাকারীরা একটি অলংকৃত তোরণগৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এই তোরণঘারের দক্ষিণে, বাইরের এলাকাটা জিলাউ খালা, পরিচারকদের আবাসস্থল আর এর চারপাশে বাজার বসার জন্য, সমাবেশস্থল বা আঙিনা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সবশেষে এসব কিছুর পরে নির্মিত হবে অতিথিদের জন্য সরাইখানা এবং আরো বাজারের ঢাল, প্রধান পানিবাহী নহরের ঢারা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কেন্দ্রীয় সৎসরণ হিসেবে ব্যবহৃত অক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে সম্মিলনে এসব কিছু নির্মিত হবে। তোরণঘারের ও পাশের এলাকা মকবরা প্রাঙ্গণের লোকায়ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করবে, যা শ্রমিক আর পর্যটকদের পার্থিব চাহিদা আহার আর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি মকবরা প্রাঙ্গণ তাদের আত্মার পুষ্টি জোগাবে। মকবরা আর উদ্যানকে ঘিরে থাকা প্রাচীরবেষ্টিত অংশের আয়তনই হবে ১০০০ ফিট প্রস্থ আর ১৮০০ ফিট দৈর্ঘ্যের একটি এলাকা এবং বাস্তবিকই সেটা, লাহোরির শব্দচ্যুত করে বলা যায়, ‘বেহেশতের পবিত্র বাসস্থানের প্রতিনিধিত্ব করতে...বেহেশতের উদ্যানের একটি দৃষ্টিকল্প জন্ম দেয়ার জন্যই নির্মিত।’

কোনো ধারণাকে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনায় পরিবর্তিত করতে, মোগল স্থপতিদের কাছে কোনো পূর্ববর্তী নকশার শুঙ্গবিদা বা পাঠ্যবই ছিল না, যেখান থেকে তারা সাহায্য লাভ করতে পারেন। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থপতির ন্যায় তারা আচরণবিধির চেয়ে উদ্বৃত্তিগুরুত্বে দ্বারাই পরিচালিত হতেন, তারা নকশা প্রণয়নের সময় পারস্য আর কুর্দ্য এশিয়ার সুনির্দিষ্ট প্রভাবযুক্ত মোগলদের মকবরা নির্মাণের প্রথা সব সময় মাথায় রেখেছেন। তারা এই প্রথার সাথে দিল্লির সুলতানদের তিনশ বছরব্যাপী শাসন আর গুজরাট এবং মান্দুর অন্যান্য মুসলমান শাসকের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত মুসলমান স্থাপত্যের প্রয়াস অঙ্গীভূত করতে চেষ্টা করেছেন। ইমারতের শ্রমিকদের অনেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তারা হিন্দু স্থাপত্য রীতি থেকেও আশ্বেষে গ্রহণ করেছে, পাথরের ওপরে জটিল নকশা খোদাই করা এবং ছত্রী বা গম্বুজযুক্ত ছোট ঘর সেই বে-দাগ লক্ষণসমূহ।

অন্যদিকে হিন্দু স্থপতিদের ছিল মাটির গন্ধ, আণ এবং রং দ্বারা মাটির প্রকৃতি শনাক্তকরণ, চুন-সূরকি দিয়ে নির্মাণ কৌশল, ইমারতের আপেক্ষিক অবস্থান এবং ইমারত নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায় শুরু করার সবচেয়ে মাসলিক সময়ের মতো বিভিন্ন বিষয় সমস্কে গবেষণামূলক আলোচনা-গ্রন্থ। আকবর আর তার উত্তরসূরিদের আদেশে হিন্দুদের নানা শান্ত্রের যে বিপুল পরিমাণ পাঞ্চলিপি ফার্সি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল তার ভেতরে স্থাপত্যবিদ্যার এই গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং এমন কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই যে মোগল স্থপতিরা কখনো এসব

গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছিলেন। ইমারত নির্মাতাদের ভেতরে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন তারা নিচিতভাবেই স্থপতিদের ঘারা তাদের কাছে প্রেরিত নকশা অনুধাবন আর বাস্তবায়নে এসব গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন।

মোগল স্থপতিদের নকশাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন নজির অস্মেষণ করার সময়, তারা নিচিতভাবেই জানতেন যে পারস্য আর মধ্য এশিয়ায় এবং দিল্লির সুলতানদের রাজত্বকালে তাদের পূর্বসূরিরা সুলতানিয়ার স্থাপত্যের ন্যায়, মকবরা আর প্রাসাদসহ, অনেক ইমারতের নকশা করার সময় ইমারতের সর্বনিম্ন তলের নকশার জন্য অষ্টভূজাকৃতি ভূমি ব্যবহার করেছেন। ষড়শ শতকের গোড়ার দিকে পারস্যের তাবরিজ ভ্রমণকারী ইতালির এক বণিক অধুনালুঙ্গ এক প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন, যাকে ‘অস্ত্রবিষ্টি’ বলা হতো, প্রাসাদটির আটটি মহল থাকায় আমাদের ভাষায় যা আটটি অংশের নির্দশন বর্ণনা করে। জেরুজালেমের ডোম অব দ্য রক, দামেকের হাম্মামখানা এবং কলন্তান্তিনোপলের প্রাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে স্থাপত্যবিদ্যার ঐতিহাসিকরা নিম্নলোকের নকশার এ বিষয়টির প্রতি সহজত পোষণ করেছেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, এই নকশার মূল প্রাক-ইসলামিক সময়ের সাথে সম্পর্কিত, যদিও মোগল আর তাদের মুসলমান পূর্বপুরুষদের কাছে অষ্টভূজ, যা বৃক্ষের বর্গকরণের ঘারা সৃষ্ট, অনন্ত বৃক্ষের সাথে কঢ়িয়ে অবস্থান ঘারা মানুষের পার্থিব নানা বিষয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের একটি রূপক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

আবুল ফজল বর্ণনা করেছেন হৃষ্মায়ুন কীভাবে যমুনার বুকে একটি ভাসমান প্রাসাদ নির্মাণের সময় অষ্টভূজ নকশা ব্যবহার করেছিলেন। তার নির্মাণশৈলিকরা একটি অষ্টভূজাকৃতি কেন্দ্রীয় জলাধার গঠন করতে ভেলার ওপর ভাসমান দ্বিতীয়বিশিষ্ট চারটি ভবনকে ধনুকাকৃতি খিলান ঘারা যুক্ত করেছিল। (হৃষ্মায়ুন এমনকি তার এই ভাসমান প্রাসাদের জন্য উদ্যানের একটি আবহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অন্য ভেলার ওপর গাঢ়পালা পর্যন্ত রোপণ করেছিলেন।) ১৫৩০ থেকে ১৫৫০ সালের ভেতরে দিল্লিতে নির্মিত দুটো সমাধিসৌধ সম্মিলিত মোগল ভারতে অষ্টভূজ নকশা ব্যবহারের টিকে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন উদাহরণ। সমাধি দুটোতে কাদের সমাহিত করা হয়েছে সেটা অজ্ঞাত থাকার ফলে সমাধিসৌধ দুটি নির্মাণের সময় ব্যবহৃত মূল টালির রঙের কারণে তাদের কেবল সবুজ বুর্জ এবং নীল বুর্জ নামে অভিহিত করা হয়। (তাজমহলের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত সমাধিসৌধ বিশেষভাবে শুরুত্বপূর্ণ এবং এটা অনভিপ্রেতভাবে বর্তমানে নীল রঙের টালি ঘারা আবৃত রয়েছে। একটি ব্যস্ত গোলচক্করের মাঝে সমাধিসৌধটা অবস্থিত।) গমুজবিশিষ্ট দুটো ইমারতেই অষ্টভূজাকৃতি কেন্দ্রীয় সমাধি এলাকাকে চারপাশে আটটি ছোট প্রকোষ্ঠ ঘিরে

ରେଖେହେ । କୋରାନ ଶରିଫେର ଆଟଟି ଭାଗକେ ବଲା ହେଁ ଥାକେ ଆଟଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଟ ଉପହାପନ କରେ ।

୧୯୬୦ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଲ୍ଲିତେ ନିର୍ମିତ ହମ୍ମାଯୁନେର ମକବରାସହ, ମୋଗଲଦେର ନିର୍ମିତ ଅନେକ ମକବରା ଆର ପ୍ରାସାଦେର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହିସେବେ—କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଟସହ ଆଟଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଟର କାରଣେ ଥାକେ ବିଆଭିକରଭାବେ ଅନେକ ସମୟ ‘ନୟ-ପାଟେର ନକଶା’ ହିସେବେ ଅଭିହିତ କରା ହୈ—ଏହି ଅଟ୍ଟଭୂଜାକୃତି ନକଶାର ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତି ଆର ପରିବର୍ଧିତ ରୂପ ବ୍ୟବହତ ହେଁବେ । ତାଜମହଲେର କ୍ଷେତ୍ରେ, ମକବରାର ଜନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଏକଟି ଘନକେର ଧାରଣା ବେହେ ନିଯୋହେନ ଯାର, ଆଲମ୍ କୋଣଗୁଲୋ ଆଡ଼ାଆଡ଼ି କେଟେ ମେରେ ଦେଯା ହେଁବେ ଅଟ୍ଟଭୂଜ ତୈରି କରତେ, ଯେଥାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟ୍ଟଭୂଜାକୃତି ଫାଁକା ହାନେ ଅବହିତ ଶ୍ଵତ୍ସିଫଳକକେ ହି-ଶ୍ଵତ୍ସିବିଶିଷ୍ଟ ଡବନେର ଓପର ଆର ନିଚେର ଅଂଶେ ପରମ୍ପରା ସଂୟୁକ୍ତ ଆଟଟି ଶୂନ୍ୟଭାବରେ ଘରେ ରେଖେହେ । ହୃଦୟରେ ମକବରାର ଆଟଟି ସମ୍ମୁଖଭାଗେର ଜନ୍ୟ ହିତଲବିଶିଷ୍ଟ ଧନୁକାକୃତି ଖିଲାନ୍ୟୁକ୍ତ କୁଳୁଙ୍ଗିର ପରିକଲ୍ପନା କରେହେନ । ମୂଳ ଚାରଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ଖିଲାନ୍ୟୁକ୍ତ ଚାରଟି ଅତିକାଯ ପ୍ରବେଶପଥ ବା ଇବାନେର ପାଶେ ଏହି କୁଳୁଙ୍ଗିଗୁଲୋ ଅବହାନ କରବେ, ଯାର ସାଥେ ହମ୍ମାଯୁନେର ମକବରାର ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଯେହେ, ଯାର ଓପରେର ପ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵଗୁଲୋର ଚେଯେ ଉଚ୍ଚ ହବେ ।

ସବୁଜ ବୁର୍ଜ ସେଇସାଥେ ଆବାର ଭାରତେ ଠିକେ ଖେଳିବା ସବଚେଯେ ପ୍ରାଚୀନ ମୋଗଲ ଇମାରତ ଯେଥାନେ ସମରକଲେ ତୈୟିରେର ମକବରାଯ ବ୍ୟବହତ ଡବଲ ଡୋମ ବ୍ୟବହତ ହେଁବେ, ଯଦିଓ ଏହି କରେକ ବହର ପୂର୍ବେ ହିସେବର ସୁଲତାନଦେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଏକଟି ମକବରାଯ ପାରିସ୍ୟେ ଉଚ୍ଛାବିତ ଏହି ହୃଦୟତାରୀତି ବ୍ୟବହତ ହେଁଲି । ହମ୍ମାଯୁନେର ଡବଲ ଡୋମ୍ୟୁକ୍ତ ମକବରାଯ, ଅଧେର୍ ଆଞ୍ଚଲିକର ମତୋ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇରେର ଗମ୍ଭୀର ଆର ଏହି ଭେତରେର ନିଚୁ ଗମ୍ଭୀର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିଚୁ ଢୋଲ ସଦୃଶ ଭିତର ଓପର ଅବହିତ । ତାଜମହଲେ, ହୃଦୟଦେର ଅନ୍ୟତମ ଅର୍ଜନ ହିଲ, ମକବରାର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ମାର୍ଜିତ ଡବଲ ଡୋମେର ନକଶା ସୃଷ୍ଟି କରା । ଅଭ୍ୟାସରେର ଗମ୍ଭୀରଟା, ଯା ମେଘେ ଥେକେ ଆଶି ଫିଟ ଉଚ୍ଚତେ ଅବହିତ, ଅଭ୍ୟାସରେର ବାକି ଅଂଶେର ଅନୁପାତେର ସାଥେ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନୁନାଦକ ଏକଟି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେହେ । ଏକଟି ଉଚ୍ଚ ଢୋଲେର ମତୋ କାଠମୋର ଓପର ବାଇରେର କ୍ଷୀତ ଗମ୍ଭୀର ଅବହିତ ଏବଂ ହାପନାର ଅବଶିଷ୍ଟ ବିହିର୍ଭାଗେର ସାଥେ ନିୟୁତ ଅନୁପାତେ ରଯେହେ । ଶାହଜାହାନେର ନିୟୁତ ଦିନପଞ୍ଜୀର ରଚୟିତାରା ବାଇରେର ଗମ୍ଭୀରକେ ନିର୍ମାଣକାଜ ଶେଷ ହବାର ପରେ ‘ସ୍ଵଗୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ’ ଆର ‘ପେୟାରା ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ’—ନତୁନ ପୃଥିବୀ ଥେକେ ଫଳଟା ତଥନ ସଦୟଇ ଭାରତେ ଏସେହେ ହିସେବେ ବର୍ଣ୍ଣା କରେହେନ । ଅନ୍ୟରେ ପାକା ନାଶପାତି, ଦୁରୁର, ଜଲେର ବିନ୍ଦୁ, ଫୁଲେର କନ୍ଦ ଏମନକି ନାରୀର ଶତରେ ସାଥେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାଦୃଶ୍ୟ ଖୁଜେ ପେଯେହେନ ।

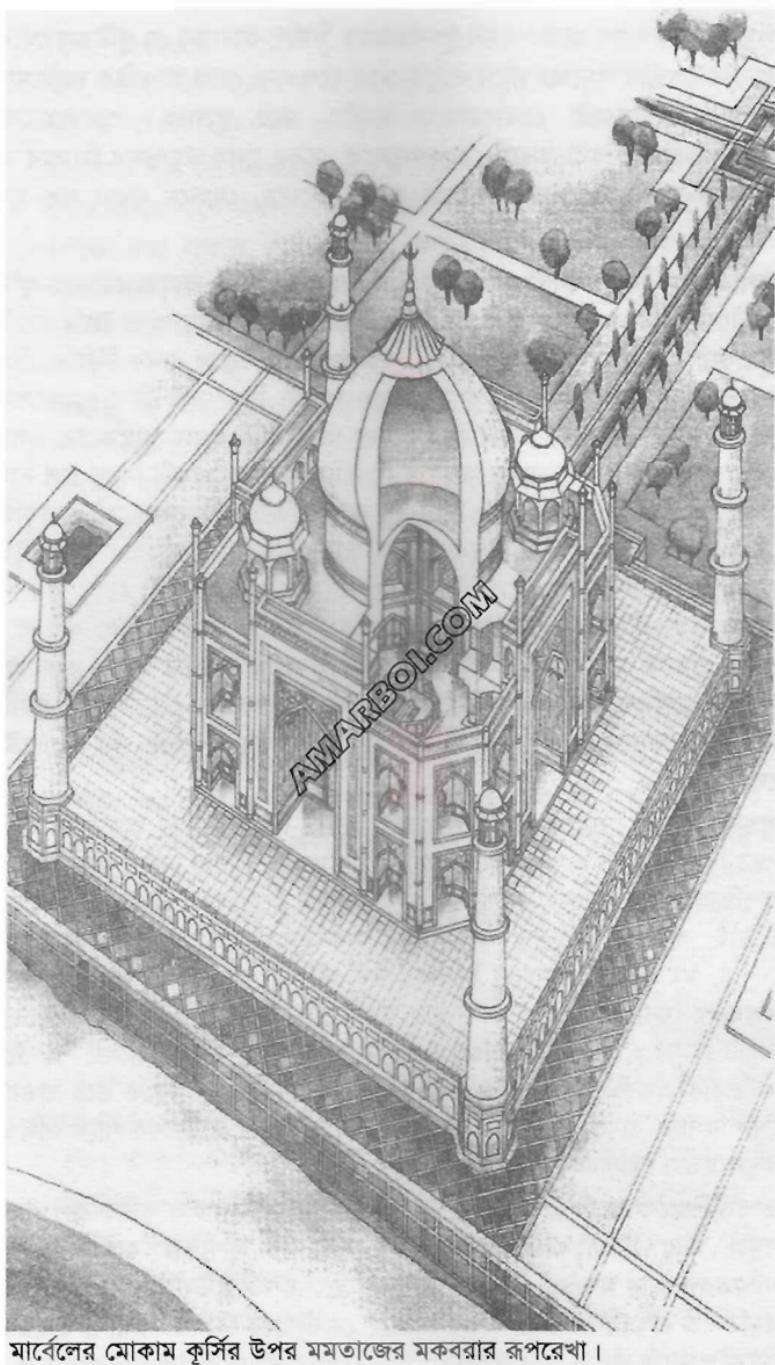
ହୃଦୟରେ ମୂଳ ଗମ୍ଭୀର ଘରେ ଚାରଟି ଗମ୍ଭୀରବିଶିଷ୍ଟ କିଓକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରେହେନ । ହମ୍ମାଯୁନେର ମକବରାଯ ଯଦିଓ ଏହି ଧରନେର ଛାତୀ ବ୍ୟବହତ ହେଁବେ, ସେଥାନେ ତାଦେର ମୂଳ ଗମ୍ଭୀର ଥେକେ ବେଶ ବିଚିନ୍ନ ବଲେ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୈ । ହୃଦୟର ତାଜମହଲେ, ମୂଳ

গম্বুজের চারপাশে এদের এমন শৃঙ্খলাবে নির্মাণ করেছেন যে দৃষ্টিল থেকে তাদের কেন্দ্রীয় গম্বুজের সাথে সংযুক্ত মনে হবে এবং ঢেঙ আকৃতির কাঠামোর আকার চিহ্নিতকারী রেখাগুলোকে নমনীয় করে তুলেছে। শাহজাহানের অলংকারণীতির কথা স্মরণে রেখে অনেকে এদের সুলভ রত্নপাথর হিসেবে বা এমনকি অঙ্গুরীয়ের ধারক হিসেবে কল্পনা করেছে, যেখানে প্রধান রত্ন মূল গম্বুজ।

স্থপতিরা নদীর পার্শ্ববর্তী মঞ্চের ওপরে মকবরাকে উঁচু করতে মোকাম-কুর্সি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন এবং এর চারপাশে সাদা মার্বেলের তৈরি চারটি বৃত্তাকার মিনারিকা যোগ করেছেন। অষ্টভূজাকৃতি ভিত্তির ওপর নির্মিত, নিচ থেকে ওপরের দিকে ক্রমাগত সরু হয়ে যাওয়া তিন তলা মিনারিকাগুলোর অভ্যন্তরে ওপরে ঘোঁষার জন্য সিঁড়ি রয়েছে আর প্রতি তলায় ব্র্যাকেটের ওপর স্থাপিত ব্যালকনিগুলো সূর্যের আলোয় মিনারিকাগুলোকে একটি বিষণ্ণ রূপ দান করে। প্রতিটি মিনারিকা ১৩৯ ফিট উঁচু আর প্রতিটির শীর্ষদেশে অষ্টভূজাকৃতি ছান্নী রয়েছে। মসজিদে আজান দেয়ার স্থান হিসেবে মিনারিকার প্রায়োগিক ব্যবহার থাকলেও, তারা মোটেই অনিবার্য নয় এবং বাস্তবিকই ডোম অব দি রকের ন্যায় ইসলাম ধর্মের গোড়ার দিকের মসজিদে এগুলো দেখা যায় না। অষ্টম শতকে দামেকের একটি মসজিদে মিনারের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় সম্ভবত মসজিদ নির্মাণের স্থানে আগে প্রেক্ষেক অবস্থিত রোমানদের একটি মন্দিরের কোনায় অবস্থিত একটি প্রাসারকে নকশায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকে।

সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ, মসজিদে অস্ত একটি মিনার নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে কিন্তু মকবরা বা অন্য ধার্মিক প্রতিষ্ঠানে তখনো মিনার নির্মাণ শুরু হয়নি। স্থপতিরা যেসব ভবনের নকশা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেগুলোর ভেতরে রয়েছে লাহোরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরের মকবরার চারপাশে অবস্থিত চারটি মিনার, মমতাজের দাদাজান ইতিমাদ-উদ-দৌলার আঞ্চায় অবস্থিত দৃষ্টিনদেশ মকবরার মিনারগুলো আর সিকান্দ্রায় আকবরের মকবরার প্রধান তোরণঘারের চারটি মিনার। তাজের মিনারগুলো নির্মিত হবার সময়, শাহজাহানের দিনপঞ্জি রচয়িতার একজন সেগুলোকে বর্ণনা করেছেন ‘বেহেশতের দিকে উঠে যাওয়া সোপানসারি’ এবং আরেকজন ‘একজন ধার্মিক ব্যক্তির আকাশের পানে উঠিত কবুল হওয়া মোনাজাত।’

স্থাপত্যশিল্পকে বলা হয় প্রকৌশল আর শিল্পকলার সম্মিলিত নান্দনিক রূপ এবং গম্বুজ আর মিনারিকাগুলোর অন্যতম প্রীতিকর দৃশ্যকল্প হলো তাদের সম্মিলিত আর মকবরা প্রাঙ্গণের অন্যান্য অংশের সাথে উভয়ের সুষম সম্বন্ধ। প্রযুক্তিগত প্রবর্তনের চেয়ে এসব বিষয়ই যোগাদের নির্মিত অন্যান্য ইমারত থেকে তাজকে অনন্য করে তুলেছে। স্থপতিদের অবশ্যই গণিত আর জ্যামিতি



মার্বেলের মোকাম কুসীর উপর মমতাজের মকবরার রূপরেখা।

সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকতে হবে। আবুল ফজল তাদের 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ-মানসিকতার অধিকারী গণিতবিদ' বর্ণনা করেছেন যাদের নকশা বিজ্ঞানের অনুরাগী হলেই কেবল অনুধাবন করা সম্ভব। মোগল অণুচ্ছিত এবং বর্তমানকালের সমরকন্দে সংরক্ষিত নির্দশন থেকে আমরা দেখতে পাই, নকশার বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যবর্তী সম্পর্ক গণনা করার জন্য এসব গাণিতিক দক্ষতা তারা ব্যবহার করত আর বর্গজালিবিশিষ্ট বিশাল কাগজে তারা তাদের নকশা অঙ্কন করত। তারা পরবর্তী কালে প্রায়ই নির্মিতব্য ইমারত দেখতে কেমন হবে সেটা প্রদর্শনের জন্য কাঠের নমুনা তৈরি শুরু করে। (তাজমহলের নির্মাণের সময় এমন কাঠের নমুনা ব্যবহারের উল্লেখ পরবর্তী সময়ের কিছু গোলমেলে নথিপত্রে দেখা যায়, কিন্তু, সমসাময়িক নথিপত্রে যদিও বিশ্বাসযোগ্যভাবে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।) স্থপতিরা মকবরার এক তলার প্রান্তদেশ মিনারিকার এক তলার প্রান্তদেশ ছুঁয়ে একই উচ্চতায় নির্মাণ করেছেন, তিন তলার গ্যালারির উচ্চতা ঢোল আকৃতির কাঠামো, যার ওপরে মূল গম্বুজ অবস্থিত, তার শীর্ষবিন্দুর সমান এবং মিনারিকার শীর্ষে অবস্থিত ছোট গম্বুজগুলো মূল গম্বুজের সর্বোচ্চ ক্ষীত অংশের সাথে একই তলে অবস্থিত হবার বিষয়গুলো সে ক্ষণে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।

তাজমহল প্রাঙ্গণের নিখুঁত ভারসাম্য স্থান অনুপাত সাম্প্রতিক সময়ে বিস্তারিত গণনা আর অতীত পর্যালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এক লেখক ধারণা করেছেন, প্রধান তোরণারের কেন্দ্রবিন্দু থেকে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি উচুতে দৃষ্টিরেখাগুলো মিলিত হয়েছে। শাহজাহানের চোখের দৃষ্টি মাটি থেকে ঠিক এই উচ্চতায় প্রসারিত ছিল যদি শাহজাহানের কাপড় থেকে শাহজাহানের উচ্চতা অনুমানে লেখকের কোনো ভুল না হয়ে থাকে। অন্যরা অনুমান করেছেন, মকবরার অষ্টভূজাকৃতি মূল কক্ষের ব্যাসরেখার সাথে সম্পর্ক রেখে, যা প্রায় আটান্ন ফিট উঁচু, বাকি প্রায় সব কিছুর মাপ নির্ধারিত হয়েছে। অষ্টভূজ, যা প্রতীকীভাবে মানুষের সাথে অনন্তের একটি সামগ্রস্যবিধান করে, মূল মকবরা প্রাঙ্গণের জ্যামিতিক নকশার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই অন্তর্নিহিত মূলসূর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, মূল মকবরার সাথে মসজিদ, অতিথিশালা, তোরণঘার ও মিনারিকা চতুর্টয়ের ভিত্তের পরিকল্পনায় বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে।

তাজের স্থপতিরা পুরো মকবরা প্রাঙ্গণ জুড়ে সমরূপ স্থাপত্য নির্দশনের ব্যবহারের মাধ্যমে পুরো নির্মাণে একটি বাড়িতি সাদৃশ্য যোগ করেছেন। স্তম্ভের ক্ষেত্রে তাদের একটি মাত্র মৌলিক নকশার ব্যবহারের বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যদিও অবস্থানের গুরুত্ব অনুসারে পরিবর্তিত অনুপাত

আর অলংকরণের মাঝায় পরিবর্তন করা হয়েছে। স্তম্ভের এমন একটি ভিন্নরূপ, ‘শাহজাহানী স্তম্ভ’ নামে পরিচিত, বহু পার্শ্বদেশ বিশিষ্ট এই স্তম্ভের ভিত্তি ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত পার্শ্বদেশের সাহায্যে নির্মাণ করা হয়েছে এবং থামাল সূক্ষ্ম খিলান দ্বারা জালের মতো অলংকৃত, যাকে মুকারনাস রীতি বলা হয়। একইভাবে স্তম্ভের দ্বারা আলমিত তীক্ষ্ণ অঞ্চলগ্রস্ত বা ‘পাইক্রাস্ট’ ধনুকাকৃতি খিলানে এবং পুরো প্রাঙ্গণে পার্শ্বদেশের অঙ্গর্যোজনায় একটিই মৌলিক নকশা অনুসরণ করা হয়েছে।\*

■

শাহজাহান নকশা অনুমোদন করার সাথে সাথে নির্মাণকাজ শুরু হয়। ঐতিহাসিক লাহোরির ভাষ্য অনুসারে, সেটা ছিল ১৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকের কোনো একটি দিন। শাহজাহান তখনো বুরহানপুরেই অবস্থান করছিলেন। প্রথমেই নির্মাণস্থল পরিষ্কার করা হয় এবং আশপাশের ছোট টিলাগুলো ‘মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে দৃষ্টিপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে’, পিটার মাতি তার ভ্রমণের সময় যতটুকু লক্ষ্য করেছিলেন। তারপর শত-সহস্র শ্রমিক মাটি পুড়ে কয়েকটি শালীর কূপ বনিয়াদ খনন করে, যার গভীরতা তদানীন্তন যমুনা নদীর তলদেশের নিচে, যা এর ওপরে নির্মিতব্য বিশালাকৃতি কাঠামোর স্থায়িত্বের মূল স্তুর্যপদ্ধতি। এই ভিতগুলোকে যমুনা নদীর পানির দ্বারা সৃষ্টি ভাণ্ডন প্রতিরোধ এবং বর্ষার মৌসুমে যেকোনো বন্যার ফলে সৃষ্টি পানির চাপ সহ্য করতে পারে। আর্থায় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস বর্ষাকাল এবং এক দিনে সর্বোচ্চ এগারো ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত একবার রেকর্ড করা হয়েছিল।

- \* শ্রীমদের এক দুপুরবেলা আমরা যখন মকবরা পরিদর্শন করছিলাম, তাজের রক্ষক আকৃতি আর আনন্দপুর্জিক বিষয়ের স্বত্ত্ব প্রাধান্য পরম্পরার মাঝে একটি চিত্তহারী, যদিও আপেক্ষিক তুলনায় নগণ্য সমরূপতার অনুপস্থিতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মকবরার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের বৃত্তাকারে কর্তৃত অংশে একটি অর্ধ-স্তম্ভের ভেতরের দিক মার্বেল দিয়ে আবৃত, যা পুরো ভবনের অন্যান্য সমরূপ শৃঙ্খল থেকে একেবারেই আলাদা। অন্য শৃঙ্খলার ন্যায় এটা পার্শ্বযুক্ত নয় এবং এর শৃঙ্খলার অন্যদের থেকে আলাদা। আমাদের কাছে এবং মকবরার রক্ষকের কাছেও এটাকে নির্মাতাদের ইচ্ছাকৃতভাবে আরোপিত বিচৃতি বলে মনে হয়েছে। তারা এটা করেছে সম্ভবত তাজকে খুত্যুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে, যেহেতু ইসলামে আল্লাহতায়ালার নির্মুক্ত সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করার প্রয়াস নেয়াকে আল্লাহতায়ালার প্রতি কটাক্ষপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পারস্যের সর্বোৎকৃষ্ট গালিচা বেনার সময় এ কারণেই বয়নে বা রঙের নির্বাচনে ধারাবাহিকতার বিচৃতি আবরাস একই কারণে দেখা যায়।

সমসাময়িক কালের মোগল অণুষ্ঠিত্বে দেখা যায়, বর্তমান সময়ের ভারতের ঘতেই শ্রমিকের দল, দাবদাহের প্রচণ্ডতায় ঘামছে, যা যে আর জুন মাসে ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট অবধি উঠতে পারে। যাদের মাঝে পুরুষের পাশাপাশি হিন্দু রমণীরাও রয়েছে, তাদের সবার কাছে নিজ নিজ কাজের জন্য কেবল হাত দিয়ে ব্যবহার্য হাতিয়ার রয়েছে। চিনে বহু শতাব্দী পূর্বেই যদিও একটি চাকা ও দুটি হাতলযুক্ত টেলাগাড়ি আবিস্কৃত হয়েছিল এবং ইউরোপীয়রা তিন শতাব্দী আগে থেকেই এটা ব্যবহার করে আসছে, ভারতে তখন শ্রম সাশ্রয়ী এসব অনুষঙ্গ একেবারেই অপরিচিত। পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকরা তাদের মাথায় স্থাপিত ঝুড়িতে করে খনন করা মাটি বহন করত। একই সাথে জল নিষ্কাশনের জন্য পোড়ামাটির পাইপ স্থাপন করে তারা পরিষ্কার এবং সমান করা পুরো এলাকায় পানি ছড়িয়ে দিতে পুরো এলাকাটা নুড়ি পাথরের একটি স্তর দিয়ে ভরে দিত।

নির্মাণের মূল ভার বহনের জন্য শ্রমিকরা উভয়ের প্রাপ্তে গোলাকার গভীর কৃপ খনন করে। তারা এর নিচে ইট আর চুন এবং বালি বা সুরক্ষির গুঁড়া দিয়ে তৈরি সিমেন্ট বিছিয়ে দেয় এবং ওপরের ফাঁকা অংশটা আরো সুরক্ষি আর সিমেন্ট দিয়ে ভরে দেয়। তারা সিমেন্টের শক্তি আর সংস্কৃতি বৃদ্ধির জন্য এর সাথে চিটাগুড় আর পাটের আঁশের মতো দ্রব্য মিশ্রিত করে। তারা এই কৃপগুলোকে—যমুনা নদীর তলদেশের টালের প্রভাব নাকচ করতে বিভিন্ন গভীরতায় খনন করা—অসংখ্য ভূমিকার স্তুপ দিয়ে পরম্পরারের সাথে যুক্ত করে দিয়ে, মূল কাঠামোর ভার বহন করতে এর ওপরে তারা ধনুকাকৃতি বিলান নির্মাণ করে। তারা এবার নদীর তীর বরাবর অধোমৃত্তিকায় আবলুস কাঠের তৈরি বিশালাকৃতি বাঞ্চি সিমেন্ট দিয়ে ভর্তি করে পুতে দেয় যমুনার পানির হ্রাস-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাড়তি দৃঢ়তা প্রদান করতে। অবশেষে তারা বনিয়াদ নির্মাণের কাজ আরো পাথর আর সিমেন্ট ব্যবহার করে সমাপ্ত করে। এক মোগল দিনপঞ্জি রচয়িতা উলুসিত ভঙ্গিতে লিখেছেন, ‘এবং যখন স্বাস্থ্যবান বাহু আর ইস্পাতের ন্যায় শক্তিশালী হাতের অধিকারী কোদালধারী শ্রমিকের দল নিরবচ্ছিন্নভাবে মাটি খুঁড়ে পানির স্তরের নিচে পৌছায়, প্রতিভাবন রাজমিত্তী আর বিস্ময়কর সাফল্যের অধিকারী স্থপতির দল পাথর আর তাগাড়ের সাহায্যে মাটির উপরিভাগ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দৃঢ়তা বিশিষ্ট বনিয়াদ নির্মাণ করে।’

নির্মাণের পরবর্তী পর্যায়ে যমুনার পানির হ্রাস বৃদ্ধির প্রভাবের সাথে লড়াই করার জন্য শক্তিশালী করে তোলা নদীর তীর বরাবর বেলে পাথরের উপরিভাগ বিশিষ্ট একটি বিশাল মঝে তৈরি করা হয়, যা প্রায় ৯৭৫ ফিট লম্বা আর ৩৬৪ ফিট চওড়া, এর ওপরেই পরবর্তী সময়ে মকবরা, মসজিদ আর অতিথিশালা নির্মিত হয়। ইত্যবসরে নির্মাণস্থানে দৈনিক ৫০০০ শ্রমিক (কোনো কোনো স্তু

অনুসারে ২০,০০০) কাজ করছে, যাদের ভেতরে অদক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি দক্ষ রাজমিত্রী আর কারিগরের দলও ছিল। শ্রমিকদের একটি অংশ স্থানীয়, কিন্তু বাকিরা, শাহজাহানের দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে ‘পুরো সাম্রাজ্য থেকে’ এসে হাজির হয়। তারা শাহজাহানের আদেশে মকবরা প্রাঙ্গণের দক্ষিণে নির্মিত লোকায়ত জনপদের আশপাশে এসে সমবেত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এলাকাটা খুব দ্রুত শ্রমিকদের আগমনে একটি জনপদের রূপ লাভ করে এবং ‘মমতাজাবাদ’ নামে মুখে মুখে পরিচিত হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের আবাসস্থলের সাথে সাথে জনপদ প্রাঙ্গণের চারপাশে চারটা সরাইখানা নির্মাণ করা হয়, যা অটীরেই সড়কপথে বা যমুনা নদী দিয়ে নির্মাণস্থলে নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী আর অন্য বণিকদের আগমনে মুখ্যরিত হয়ে ওঠে।

স্থানীয় ধনি থেকে জোড়া গরুর গাড়িতে করে বেলে পাথর বয়ে আনতে শ্রমিকরা মাটির বস্তা ফেলে দশ মাইল দীর্ঘ একটি উঁচু সড়ক নির্মাণ করে। পাথর নির্মাণস্থলে পৌছাবার পর, পাথর কর্তনকারীর দল বড় টুকরোগুলো কাটতে পেরেকের মতো দেখতে হোট কীলক হাতুড়ি দিয়ে একটি সরলরেখায় পাথরের ভেতরে প্রবিষ্ট করায়। পাথরের টুকরোগুলোকে এরপর তুলে জায়গামতো রাখা হয় এবং সিমেন্ট আর লোহাটু বন্ধনী ও পেরেকের সাহায্যে জোড়া দেয়া হয়। পাথরের কারিগররা সামনের পাথরগুলো জোড়া দেয়ার সময় এতই যত্নবান ছিল যে, দিনপঞ্জির রচয়িতারা লিপিবদ্ধ করেছেন, পাথরগুলো ‘দক্ষ কারিগরদের দ্বারা এত মসংজ্ঞিতে কর্তৃত আর জোড়া দেয়া হয়েছে যে, খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেও তাদের মাঝে কোনো ফাটল খুঁজে পাওয়া যাবে না।’ এই নির্ভূলতা, পাথরগুলোকে পুনরায় পরিমাপ করে, হাতুড়ি এবং আরো ধারালো ছেনির সাহায্যে পরিমাপের ফলে চিহ্নিত বাড়তি পাথর ছেটে পরিপাটি করে, অর্জিত হয়। পাথরের কারিগররা এরপর পাথরগুলোকে লোহার বিশাল আর সমতল কর্ণিকের নিচে একবার ধারালো শক্ত কাকর আর পরবর্তী সময়ে হোট সূক্ষ্ম কাকর দিয়ে ঘষে মসৃণ করে। পাথরের এই কারিগরদের কেউ কেউ নিজেদের কাজ নিয়ে এতটাই গর্বিত ছিল যে, তারা পাথরে নিজেদের চিহ্ন উৎকীর্ণ করে রেখেছে। তাজমহলে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের আড়াইশ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। চিহ্নগুলোর কোনোটা হিন্দুদের স্মিক্ষকা (এটা বোঝাতে চারদিকে প্রসারিত বিশুব্রক্ষাও ব্যবহৃত হয়) বা তারকা আকৃতির। অন্যরা তিন্দু বা বর্গক্ষেত্রের ন্যায় জ্যামিতিক নকশা উৎকীর্ণ করেছে। আরো রয়েছে তীর এবং পদ্মফুলের ন্যায় চিহ্ন।

বেলে পাথরের মধ্যের উপরিভাগে পাথরের কারিগররা মূল মকবরার জন্য উনিশ ফিট উঁচু আর তিনশ ফিট দৈর্ঘ্যের একটি বিশাল বর্ণাকৃতির মোকাম-কুর্সি নির্মাণ করে। সমগ্র মকবরা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মূল অক্ষরেখায়

এর অবস্থানকে গুরুত্ব দিতে, শাহজাহান আর তার স্ত্রিও রাজি হন যে, মকবরা আর মিনারিকা-চতুর্ষয় এবং মোকাম-কুর্সির পুরো কাঠামো কেবল সাদা মর্মরে পুরোপুরি আবৃত থাকবে। মসজিদ আর তার জবাব অতিথিশালার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের ক্ষেত্রে, মকবরার বাদবাকি অংশে বেলে পাথর ব্যবহার করা হবে, গম্বুজের ন্যায় মূল অংশগুলো সাদা মর্মরে মোড়া হবে বা অভ্যন্তরে সাদার ওপরে সাদা মর্মরের নকশা থাকবে।

দুইশ মাইল দূরে, আষারের (জয়পুর) ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে, মাকরানায় অবস্থিত খনি থেকে সাদা মার্বেল পাথর নিয়ে আসা হয়। ১৬৩২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জারীকৃত এক শাহী ফরমান অনুসারে খনিগুলোর মালিক আষারের রাজাকে শাহজাহান আদেশ দেন : ‘আমরা এই মর্মে আদেশ দিছি যে, পাথর কাটার জন্য যতজন শ্রমিক আর সেগুলো বহন করতে প্রয়োজনীয় মালবাহী শক্ট ভাড়া করতে...উপরোক্তিষিখ ব্যক্তির (মোগল অধিকারিক) প্রয়োজনীয় সব কিছু রাজা অবশ্যই তাকে সরবরাহ করবেন এবং পাথর কাটার শ্রমিকদের মজুরি আর মালবাহী শক্টের ভাড়া রাজকীয় কোষাগার থেকে তাকে প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে সমসাময়িক আর অভিজ্ঞাত অমাত্যবৃন্দ সর্বোত্তমাবে যে সহায়তা করবেন সেটা না বললেও চলে এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করবেন এবং এই আদেশ পালন থেকে এক চুলও বিচুত হবেন না।’

পিটার মার্ভিকে নিশ্চিতভাবেই দন্তে বিষয় কাজের গতি আর খরচের ব্যাপারে বিন্দুমুক্ত তোয়াক্তা না করা অভিভূত করেছিল। তিনি লিখেছেন : ‘ইমারতটা...বিপুলসংখ্যক শ্রমিক আর ব্যয় দ্বারা, অসাধারণ অধ্যবসায়ের সাথে, সাধারণভাবে মূল্যবান ধাতু হিসেবে বিবেচিত সোনা আর রূপা এবং সাদা মার্বেলকে মাঝুলি পাথর হিসেবে বিবেচনা করে নির্মিত হচ্ছে।’ আরেকজন ইউরোপীয় পর্যটক মাকরানা থেকে আগ্রা নিয়ে আসার সময় মার্বেল পাথর বহনকারী কিছু মালবাহী শক্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘পাথরের এই টুকরোগুলোর কোনো কোনোটার আকৃতি আর দৈর্ঘ্য এতই অস্বাভাবিক যে, ডয়ংকর দর্শন আর বড় শিংবিশিষ্ট মহিষ আর শক্তিশালী ঝাঁড়ের দল, যারা শক্তভাবে নির্মিত অতিকায় শক্টগুলো বিশ বা ত্রিশটা প্রাণীর দলে বিভক্ত হয়ে সেগুলো কোনোমতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।’

মার্বেল পাথর অতিমাত্রায় ভঙ্গুর, খুব সহজলভ্য নয় বলে এবং সেইসাথে অনেক বেশি মূল্যবান হবার কারণে ফাটল আর পাথরে ছিলকা ওঠা পরিহার করতে বাটালি দিয়ে কাটার সময় অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং কাকরের আনন্দমিক স্তর দ্বারা পাথরগুলোকে মসৃণ করা হয়, যতক্ষণ না সেগুলো উজ্জ্বলিত দীপ্তি লাভ করে আর যথাযথভাবে সম্পূর্ণ হয়, যা

তাজমহলের বাহ্যিক রূপের প্রতিনিধিত্বকারী। শাহজাহানের রাজদরবারের সভাকবি যে সূক্ষ্মতায় আর যথার্থতায় মার্বেল পাথরের টুকরোগুলো জোড়া দেয়া হয়েছে তার প্রশংসা করে লিখেছেন :

দুধের মাঝে নিঃশেষে মিশে যাওয়া শর্করা দানার ন্যায়  
চুল পরিমাণ ফাটলও কেউ কখনো কোথায় দেখেনি

কুশলী নির্মাতার দল কেন্দ্র অভিযুক্ত ক্ষমোন্নত তলবিশিষ্ট করে মোকাম-কুর্সি নির্মাণ করেন, চতুরতার সাথে দৃষ্টিগুণ বা পার্সপেক্টিভের বিকৃত প্রভাবের সমত্ববিধান করতে, যা অন্যথায় মকবরাটা খনিকটা শূন্যগর্জে অবস্থান করছে এমন একটি দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ সৃষ্টি করবে। নির্মাতারা মোকাম-কুর্সির নির্মাণ সমাপ্ত করার পরই কেবল মূল মকবরা নির্মাণ শুরু করেন। প্রচলিত ধারণার ঠিক উল্টো, মকবরাটা মোটেই সাদা মার্বেলের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়নি বরং পনেরো থেকে আঠারো ইঞ্চি পুরু ইটের গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত, যার উপরিভাগ মার্বেল পাথরের পুরু, মসৃণ ঝও দ্বারা আবৃত। ছোট চ্যান্টা ইটগুলো, যা গড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা চার ইঞ্চি চওড়া আবৃত্তেড় ইঞ্চি পুরু, যা মকবরা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে পরিবহন সমস্যা সীমাত করতে নির্মাণস্থানের কাছেই অবস্থিত ইটের ভাঁটিতে পোড়ানো হয়েছে। তাগাড়ের জন্য কলিচুন তৈরি করতে চূনাপাথর বা 'কফর', যা মসৃণ চূনাপাথরের নুড়িমিশ্রিত মাটি, কাছেই অবস্থিত ভাঁটিতে গুঁড়া করা হচ্ছে।

কাঠ আর বাঁশ দিয়ে ভারা নির্মাণ করা হয়েছিল, যা আজও সমগ্র এশিয়ায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাজমহল নির্মাণের সময় যা ছিল ইমারত নির্মাণের আদর্শ পদ্ধতি। অবশ্য কোনো অজানা কারণে খুব সম্ভবত যা স্থানীয়ভাবে উপকরণের দুর্প্রাপ্যতার সাথে জড়িত বা বিপুল পরিমাণ ওজন জড়িত থাকায়, বলা হয় যে নির্মাতারা তাজমহলের জন্য ইটের ভারা ব্যবহার করেছিলেন। নির্মাণকাজ সমাপ্ত হতে শাহজাহানকে আপাতদৃষ্টিতে যখন জানানো হয় যে ইটের ভারা অপসারণ করতে পাঁচ বছর সময় লাগবে, কিন্তু তিনি এই সমস্যার চমৎকার একটি সমাধান বের করে আদেশ দেন, যারা ইটের ভারা খুলে নিতে সাহায্য করবে তারা ইটগুলো রাখতে পারবে। ফলাফল, রাতারাতি ইটের ভারা তাজমহল থেকে গায়েব হয়ে যায়। একটি প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ইটের ভারা ব্যবহার করা হয়েছিল নির্মাণের পূর্বে তাজমহলকে দৃষ্টির আড়ালে রাখতে এবং এই কাহিনীর আরেকটা ভাষ্যে এর সাথে যোগ হয়েছে যে, কেউ একজন দেয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি দেয়ার তাকে তার কৌতুহলের জন্য অঙ্ক করে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়।

মকবরার মূল ইমারতের নির্মাণকাজ অহসর হবার সাথে সাথে, মার্বেল পাথর ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী ভারা দিয়ে আরো ওপরে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। পিরমিডের নির্মাণের সময় ব্যবহৃত, ঢালু পথই সম্ভবত সমাধানের একটি অংশ। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পরে, পাথরের খও কপিকলের সাহায্যে উত্তোলন করা হয়। মানুষ, বাঁড় এমনকি হাতি দিয়ে পরিচালিত দড়ি, কড়িকাঠ, পুলির একটি জটিল ব্যবস্থাই মনে হয় সম্ভবত সমাধান ছিল। উত্তোলনের সময় পাথরের খণ্ডগুলোকে নিরাপদ রাখতে, হয় দড়ি ব্যবহার করা হতো কিংবা অত্যধিক ভারী টুকরোগুলোর ক্ষেত্রে মার্বেলে টুকরোয় পূর্বে কাটা গর্তের ভেতরে নথরের ন্যায় ধাতব উত্তোলক যন্ত্র প্রবিষ্ট করানো হতো। পাথরের খণ্ডগুলো প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পৌছাবার পর, পাথরের কারিগররা বাঁকা প্রান্ত বিশিষ্ট লোহনও ব্যবহার করে সেগুলোকে জায়গামতো স্থাপন করে তারপর পরবর্তী পরিমার্জনের কাজ সমাপ্ত করত।

মার্বেলের সামনের দিকের খণ্ডগুলোকে মূল ইটের গাঁথুনিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্থাপন করা হয় বা ইটের আরো গভীরে এমনভাবে প্রবিষ্ট করানো হয়, যাতে কুন্দ্রতম আড়াআড়ি অংশ উন্মুক্ত থাকে। রাজমিঞ্জিদের কাছে ‘স্ট্রেচার/হেডার’ হিসেবে পরিচিত এই কৌশলে, এর সাথে লোহার ধাতব-বন্ধনী ব্যবহার করে অধিকতর শক্তি আর অনুলগ্নতা প্রদান করা হয়। (লোহার বন্ধনীগুলো পরবর্তী সময়ে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মরিচা পড়ার কারণে এবং তাপঘাতিত সংকোচন-প্রসারণের মধ্যে পাথরে ফাটল সৃষ্টি হয়ে মূল কাঠামোর অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করেছে।)

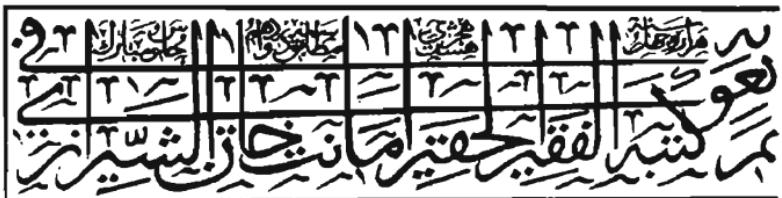
মূল গম্বুজের প্রাঙ্গলিত ওজন ১২,০০০ টনের বেশি এই একটি তথ্য থেকেই বোঝা যাবে যে নির্মাণকার্য কর্তৃতা শ্রমসাধ্য আর কঠিন ছিল। গম্বুজ থেকে পরস্পর সম্পর্কিত ধনুকাকৃতি খিলানের দ্বারা যা অপেক্ষক হিসেবে ক্রীড়াশীল, ভারবাহী দেয়ালে স্থানান্তরিত লোড ফ্যাস্টের প্রতি বর্গ ফুটে প্রায় ৭৫০ টন। এক দিনপঞ্জি রচয়িতা বর্ণনা করেছেন কীভাবে নির্মাতারা ‘বেহেশত স্পর্শ করা গম্বুজ’-এর ওপর পদ্ধ ফুলের পাপড়ি থেকে উঠিত, যা ভারতবর্ষ এবং অন্যত্র উর্বরতার একটি সাধারণ প্রতীক, ত্রিশ ফিটের অধিক উচু ‘সূর্যের মতো উজ্জ্বল’ শর্ণের তৈরি পঞ্জের কারুকাজ স্থাপন করেছিলেন।

মকবরার অভ্যন্তরে শ্রমিকরা মেঝের প্রায় তিন ফিট ওপর পর্যন্ত মার্বেলের খণ্ড দিয়ে আবৃত করে। তারা এই উচ্চতার ওপরের অংশ মকবরা প্রাঙ্গণের অন্যান্য ইমারতের অভ্যন্তরের মতো একইভাবে ইটের ওপর পলেস্টার করেছে। দুই ইঞ্চি পুরু এই পলেস্টার, যা অনেক সময় কাদা আর খড়ের একটি প্রাথমিক মিশ্রণের ওপর প্রয়োগ করা হতো, প্রধান উপাদান ছিল সাদা চূন আর মার্বেল পাথরের গুঁড়া। কিন্তু প্রয়োজনীয় অনুলগ্নতা আর সমাপ্তির পর্যায়ের ওপর নির্ভর

করে পল্লেত্তারায় ডিমের সাদা অংশ, আঠা এবং শর্করার জন্য অন্যান্য উপাদান যোগ করা হতো এবং একের পর এক যিহি প্রলেপ প্রয়োগ করে, যা উজ্জ্বলিত করে তারা হ্বহু মার্বেলের ন্যায় একটি শুভ জেল্লা সৃষ্টি করত। মকবরার বহির্ভাগের কিছু অংশেও তারা এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। দক্ষিণ প্রান্তের তোরণঘারের নিম্নভাগের কিছু অংশ, যা মার্বেল বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে সেটা উজ্জ্বলিত সাদা পল্লেত্তারা। তাজমহলের কিউরেটরেরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, ইবানের পেছনের অংশেও, মকবরার সম্মুখ ভাগ বা সদরের বহির্ভাগের ওপর যেখানে তারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, লাল বেলে পাথরের পৃষ্ঠাযুক্ত সাদা চুনের পল্লেত্তারা রয়েছে।

ইমারতসমূহের মূল কাঠামোর নির্মাণকার্য একবার শেষ হলে তারপর শুরু হয় সেগুলোর অলংকরণ আর শোভাবর্ধনের কাজ। মকবরাটা দূর থেকে যদিও একেবারে শুভ দেখালেও, বস্তুতপক্ষে মকবরার ডেতের আর বাইরে পাথরের ওপর খোদাই করে কোরআন শরিফের আয়াত, মুল-লতা-পাতার নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাদার ওপরে সাদা। ক্যালিগ্রাফিকে—অলংকৃত লিপিকলা—মুসলিম দুনিয়ার শিল্পীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেমনটা চীনে আর জাপানে করা হয়ে থাকে। তাজমহলের ক্যালিগ্রাফিতে ব্যবহৃত আরবি আর ফারসি উভয় প্রকার লিপি, তাদের সাবলীল ছন্দময় পঙ্কতি আর পুনঃপুন ব্যবহৃত নোকতার কারণে শাভাবিকভাবেই নান্দনিক রূপের অধিকারী। বোঝাদের কাছে চিত্রকলার চেয়ে দক্ষ হাতের ক্যালিগ্রাফির কদর অনেক বেশি। শাহজাহানের সরবারের সভাকবিদের একজন বর্ণনা করেছেন সুন্দর ক্যালিগ্রাফির ‘প্রতিটি পঙ্কতি’ কীভাবে ‘কাশীরের সৌন্দর্যের মতো হৃদয়ঘাসী।’ ইসলামি বৃত্তি অনুসারে, কোরআন শরিফের শব্দগুলো—আরবি ভাষায় আমাদের জানা মতে প্রথম গ্রন্থ—তাদের আকার আর বিষয়বস্তু উভয় কারণেই ঐশ্বরিক, অনুপম। অষ্টম শতকে মানুষের দ্বারা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিশীল কাজের অনুমান বা প্রতিমা পূজার ভয়ে—অঙ্কিত বা খোদাই করা এবং তাদের উদ্দেশ্য যতই ধার্মিক হোক—মানুষ বা অন্য জীবজন্তুর অবয়বের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে, কোরআনের লিপি উৎকীর্ণ করা ইমারতসমূহকে বিশেষ করে মসজিদকে অলংকৃত করার প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়।<sup>\*</sup> তাজমহলে ক্যালিগ্রাফি কেবল দর্শনাধীনের অবহিত করতে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত হ্যানি সেইসাথে অলংকরণের বিষয়টিও খেয়াল করা হয়েছে।

\* দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত আলহামরা এই ক্যালিগ্রাফির সবচেয়ে বিখ্যাত নির্দেশন।



মকবরার দক্ষিণ খিলানের নিম্নপ্রাম্ভে আমানত খানের স্বাক্ষর।

পার্স চারুলিপিকররা আরবি লিপি এবং তাদের নিজেদের কল্লনার সংমিশ্রণে ভিন্ন ধারার চারুলিপি সৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং শাহজাহান আমানত খান নামে এক পার্সিকে তাজমহলের প্রধান চারুলিপিকর হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সিরাজ, ইসলাম শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র, থেকে আগত একজন বিদ্যুৎ পণ্ডিত এবং সতেরো শতকের গোড়ার দিকে তার ভাই, আফজাল খানের, যিনি পরবর্তীকালে শাহজাহানের সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক হিসেবে ব্যাকি লাভ করেন, সাথে মোগল দরবারে এসেছিলেন। আমানত খান চারুলিপিকর হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করায়, ১৬১০ সাল নাগাদ জাহাঙ্গীর তাকে আকবরের মকবরার চারুলিপির দায়িত্ব প্রদান করেন, যা পাথরে তার অভিলিখন অনুযায়ী ১০২২ হিজরি সাল (পশ্চিমের বর্ষপঞ্জি অনুসারে ১৬১২/১৩ সাল) থেকে শুরু হয়েছিল। আমানত সেইসাথে স্মাটের মনোনীত সফরসঙ্গী হিসেবে রাষ্ট্রদণ্ডনের সাথেও সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। শাহি মহাফেজখানা থেকে তার নিরীক্ষণ সিলমোহরযুক্ত বেশ কিছু পাঞ্জুলিপি পাওয়া গেছে, যেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই তিনি কোনো দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

শাহজাহান তাজমহলে আমানত খানকেই কেবল তার কাজে নিজের নাম অভিলিখনের অনুমতি দিয়েছিলেন, দুটো স্থানে তার কৃত চারুলিপিতে তুঘরা হরফে সাক্ষর আর তারিখ রয়েছে। একটি অভিলিখন রয়েছে মকবরার অভ্যন্তরে দক্ষিণের ধনুকাকৃতি খিলানের ওপর তারিখ ১০৪৫ হিজরি (১৬৩৫/৩৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং অন্যটা একই অভ্যন্তরের খিলানের পাদদেশে, তারিখ ১০৪৮ হিজরি (১৬৩৬/৩৭ খ্রিস্টাব্দ)। মকবরার পশ্চিম প্রান্তের বহির্ভাগে ধনুকাকৃতি খিলানের পাদদেশের বাম প্রান্তে আরেকটা স্বাক্ষরবিহীন অভিলিখনে কেবল কাজের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, ১০৪৬ হিজরি (১৬৩৬/৩৭ খ্রিস্টাব্দ)। এই তিনটি অভিলিখন সন্দেহাত্মিতভাবে প্রমাণ করে যে, আমানত খানই চারুলিপিকর ছিলেন। এই অভিলিখনগুলো থেকে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, নির্মাণকার্য শুরু হবার, বড় জোর, চার বছরের ভেতরে মকবরার মূল কাঠামো অভ্যন্তরের শোভাবর্ধনের কাজ শুরু করার মতো সমাপ্ত হয়েছিল এবং বহির্ভাগের শোভাবর্ধনের কাজ এক বছর পরই প্রাপ্তসর পর্যায়ে ছিল। দ্বিতীয়

বিষয়, অভ্যন্তরের উৎকীর্ণ দুটো তারিখ প্রতিপন্ন করে যে আমানত খান এবং তার সহকারীরা মকবরার কাঠামোর ওপর থেকে চারুলিপি অঙ্কিত করতে করতে নিচের দিকে নেমে এসেছেন।

আমানত খান নিশ্চিতভাবেই প্রথমে নির্মাণ আর স্থাপত্যকৌশলের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজনের সাথে আলোচনা করে চারুলিপির আকার, অভিলিখনের স্থান আর পরিকাঠামো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভের ওপরের অভিলিখন এবং ফার্স্টে চারুলিপিকরের সাক্ষর আর তারিখ ব্যাপ্তীত অভিলিখিত চারুলিপির পুরোটাই মূল আরবিতে কোরআন শরিফের আয়াতের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরো মকবরায় এমন প্রায় পঁচিশটা অনুচ্ছেদ রয়েছে, যা অন্য যেকোনো ইমারতের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক, এমনকি শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্মিত মসজিদেও এত বেশি সংখ্যক চারুলিপি ব্যবহৃত হয়নি। একজন আলেমকে সাধারণত কোরআন শরিফ থেকে আয়াত নির্বাচনের দায়িত্ব প্রদান করা হতো, কিন্তু আমানত খান নিজে একজন আলেম এবং মোগল দরবারের একজন সম্মানিত সদস্য হবার পাশাপাশি অভিজ্ঞ চারুলিপিকর হবার কারণে ঝুঁত সম্ভবত নিজেই আয়াতগুলো নির্বাচন করেছিলেন, এমনও হতে পারে শাহজাহানের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আয়াত আর স্থান নির্বাচন শেষ হলে, আমানত খান নিজের কর্মশালায়, বিশালাকৃতি কাগজে চারুলিপির স্ক্রিপ্ট সম্মাপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি কাজটা করার সময় আকৃতি স্তর বিষয়বস্তুর মেলবন্ধন ঘটিয়ে একটি একক বৌদ্ধিক সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছেন। তার এই প্রয়াসের ফলে সৃষ্টি নকশার রূপরেখা এরপর মার্বেলের ওপর তৈরি করা হয়েছে এবং পাথর খোদাইকারীরা সাদা মার্বেলের ওপর বাটালি দিয়ে চেছে অগভীর রেখার জন্ম দিয়েছেন, তারা পরবর্তীকালে এই অগভীর রেখায় কালো পাথর প্রবিষ্ট করিয়ে চারুলিপির আকৃতি দৃশ্যমান করেছেন। আরবি লেখা যারা পড়তে পারে না, বিশেষ করে তাদের জন্য মকবরা প্রাঙ্গণের দক্ষিণের প্রবেশপথ এবং মকবরায় প্রবেশের ধনুকাকৃতি খিলানের চারপাশে উৎকীর্ণ চারুলিপি বিশেষভাবে চিত্তহারী। আমানত খান এই উভয় স্থানে লিপির আকৃতি, মাত্রা এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব সতর্কতার সাথে আনুপূর্খকভাবে পরিবর্তিত করেছেন উচ্চতার জন্য সৃষ্টি বিকৃতকারী প্রভাব নাকচ করতে এবং সেইসাথে নিশ্চিত করেছেন যে, দর্শকের চোখে, উচ্চতা হাসের সাথে সাথে লিপিগুলো ছোট-বড় না হয়ে, সমান কৌণিক মাপ উৎপন্ন করে সমরূপে দৃশ্যমান হয়।

তাজমহল প্রাঙ্গণের প্রধান প্রবেশ-তোরণ, দক্ষিণের তোরণঘার স্থপতিরা এমনভাবে নির্মাণ করেছেন, খিলান ঘোমটার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে

দর্শনার্থীরা তাজ প্রথম দর্শনের রোমাঞ্চ-শিহরণ অনুভব করতে পারে। প্রধান প্রবেশ-ডোরণ বস্তুতপক্ষে একটি বিশালাকৃতি ইমারত। মূল মকবরার মতো এর মেঝেও অষ্টভূজাকৃতি, যা একটি বর্গক্ষেত্রের সমকোণী ধারণগুলোকে বৃত্তাকারে কর্তৃ করে তৈরি করা হয়েছে। অষ্টভূজ মিনারগুলো প্রান্তদেশে অবস্থিত যার শীর্ষদেশে একটি গমুজাকৃতি অষ্টভূজ ছেত্রি রয়েছে। ইমারতটার বহির্ভূগ লাল বেলে পাথর দিয়ে আবৃত কিন্তু মকবরা প্রাঙ্গণের মূল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অকৃপণভাবে সাদা মার্বেল দিয়ে কারুকাজ করা হয়েছে, বিশেষ করে উত্তর আর দক্ষিণ পাশের প্রবেশপথে যেখানে আকাশজোড়া ইবানের সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয় ইবানের কাঠামোর শীর্ষে এক সারিতে পাশাপাশি এগারোটা মার্বেলের অষ্টভূজ ছেত্রি অবস্থান করছে। প্রবেশপথ দর্শনার্থীদের দৃষ্টি থেকে তাজমহলকে আড়াল করে রাখে, যতক্ষণ না তারা ভেতরে প্রবেশ করছে। তাদের দৃষ্টি বরং দক্ষিণের ইবানের কাঠামোয় উৎকীর্ণ চারুলিপির দিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক শক্তিশালী উক্তি সেখানে রয়েছে কিন্তু নিম্নোক্ত উক্তিটা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, দর্শনার্থীকে একটি আধ্যাত্মিক পরিমগ্নলে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে—বেহেশতের পার্থিব সমরূপ :

শান্তিতে এসো সমাগত প্রাণ,  
তারপরে, প্রীত আর পরিত্ত তোমার প্রভুর কাছে, তার কাছে ফিরে যাও,  
প্রবেশ করো তোমাদের মাঝে যার আমার অনুগত,  
এবং প্রবেশ করো আমার বেহেশতে !

আমানত খানের দক্ষতা দেখে দর্শনার্থীরা মুক্ষ হয়। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিকদের একজন বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘কোরআন থেকে নির্বাচিত ঐশ্বরিক অনুগ্রহের আয়াতসমূহ—সর্বোচ্চ শিল্পদক্ষতা আর অপরিমিত ব্যয়ের সাথে সূক্ষ্ম সৃজনশীলতার মাধ্যমে...এবং পাথর খোদাইকারী বাটালির ধারালো অংশভাগ আকাশের শৈল্পিক দক্ষতাকে ছাপিয়ে যায় এমন রং আর কমনীয় সজীবতা ফুটিয়ে তুলেছে এবং (অন্যদের) চারুলিপির সাথে বাতিলকরণের ছাপ আর অসিদ্ধকরণের সীমারেখা টেনে দিয়েছে।’

১৬৩২ সালে, তাজমহলের নির্মাণকাজ শুরু হবার ঠিক পর পরই, শাহজাহান আমানতের পদব্যাধি বৃদ্ধি করেন, যা বেতন বৃদ্ধির দ্বারা সূচিত হয় এবং এক বছর পরই তাকে আবারও পদোন্নতি প্রদান করেন, এইবার ১০০০ মনসবদারের পদ। দুটো পদোন্নতিই তাজমহলের চারুলিপিকার হিসেবে তার অবস্থানকে সম্মান প্রদর্শন করতেই সম্ভবত করা হয়েছিল। ১৬৩৭ সালের ডিসেম্বরে, মূল মকবরার চারুলিপির কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,

শাহজাহান আমানত খানকে তখন সমাধির অভ্যন্তরে তার অভিলেখের সৌন্দর্যে মুঝে হয়ে একটি হাতি উপহার দেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের অষ্টাদশ বর্ষের (১৬৪৪/৪৫ খ্রিস্টাব্দে) কোনো এক সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সমাধিতে কত দিন কর্মরত ছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, কিন্তু তাজমহলের প্রবেশপথে যেহেতু ১০৫৭ হিজরির (১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) সাক্ষরবিহীন একটি অভিলেখ উৎকীর্ণ রয়েছে, আরেকজন নিশ্চিতভাবেই এই সময়ে চারুলিপিকার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

‘মকবরার অভ্যন্তর আর বহির্ভাগের সর্বত্র, বিশেষ করে প্রদ্যোতিত সমাধিস্থল ধারণকারী মধ্যে, বিরল কর্মদক্ষতার অধিকারী ভাস্তরের দল কোমনীয় কারিগরি দক্ষতায় নানা রঙের মূল্যবান মণিমুঞ্জ দিয়ে মার্বেলের ওপর প্যাটার্ন তৈরি করে—সেসব মূল্যবান রঙের বর্ণনা বাণীর অপরিসীম বিশালতার মাঝে ধারণ করা সম্ভব নয়, এমনকি বাক্য আর নিবন্ধের ক্ষমতা নেই তাদের নিতান্ত সাধাৰণ একটি বর্ণনা প্রদান করার। আর তাদের মনোহৰ পরিকল্পিত



তাজমহলের তোরণদারে অস্বাক্ষরিত কিন্তু তারিখযুক্ত অভিলিখন।

সম্পাদনার সাথে, যা অনাদ্যন্ত সৌন্দর্যের অধিকারী, আজরাঙ্গের সেরা শিল্পকর্মগুলো এবং চিন আর ইউরোপের চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রকর্মগুলোর, তুলনা করার মতো কোনো ধৃতিসত্ত্ব বা বাস্তবতা নেই, আর সেগুলোকে পানির ওপর নিছক প্রতিবিম্বের মতো মনে হয়।’ শাহজাহানের ঐতিহাসিক শালিহ সমগ্র তাজমহলের অসামান্য অলংকরণ সম্বন্ধে অন্তত এমনই লিখে গেছেন।

১৬৬৩ সালে ফ্রান্সোয়া বার্নিয়ের যখন তাজমহল পরিদর্শন করেন, তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'চারপাশে ইয়াশ্ৰ আৱ ইয়াশ্ৰম' পাথৱেৰ ছড়াছড়ি সেইসাথে ফ্ৰান্সেৰ গ্ৰান্ড ডিউকেৰ চ্যাপেলেৰ দেয়াল সমৃদ্ধকাৰী পাথৱেৰ মতো অন্যান্য পাথৱও রয়েছে এবং অনেকগুলো পাথৱই বিৱল আৱ বহুমূল্যবান, দেয়ালেৰ সম্পূৰ্ণ অংশে সন্নিবেশিত মাৰ্বেল পাথৱেৰ খণ্ডেৰ ওপৰ অগণিত ৱীতিৰ মিশ্ৰণ ঘটিয়ে মণিমুক্তাগুলো বসান হয়েছে। সাদা আৱ কালো বৰ্গাকাৰ মাৰ্বেল দিয়ে তৈৱি কৱা মেৰোতেও এমনকি এসব মূল্যবান মণিমুক্ত দিয়ে সূক্ষ্ম আৱ সুন্দৰ কাৰুকাজ সৃষ্টি কৱা হয়েছে।'

আজও তাজমহলেৰ অলংকৱণ কেবল কুচিলতা আৱ সংযমেৰ কাৱণেই, যা স্থাপত্যশৈলীৰ কাঠামোকে এৱ সৌন্দৰ্যে আচন্দন কৱা থেকে বিৱত রেখেছে, কেবল দৰ্শনাথীদেৱ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৱে না, সেইসাথে অলংকৱণেৰ দক্ষতা আৱ আবেদনপূৰ্ণ কৰণীয়তাও তাদেৱ নজৱ এড়িয়ে যায় না। অভিনিবিত চাৰলিপি ছাড়াও তাজমহলেৰ নিৰ্মাতা অলংকৱণেৰ জন্য তিনটি ভিন্ন ধাৱাৱ আশ্রয় নিয়েছেন : পাথৱেৰ উৎকীৰ্ণ জটিল, সূক্ষ্ম নকশা, উদগত শিল্পকৰ্ম এবং অতিথিশালা আৱ মসজিদে খোদাই কৱা আৱ চিত্ৰিত অলংকৱণ। প্ৰতিটি ক্ষেত্ৰে, ফুল-লতা-পাঞ্চাঙ্ক প্ৰাণ্য দেয়া হয়েছে। মোগল চিত্ৰকৱাৱা পঞ্চফুল, আইরিস, লিলি এবং টিউলিপেৰ মতো ফুল চিত্ৰিত কৱতে বিৱামহীনভাৱে বাটালিৰ সাহায্যে অথবা পাথৱেৰ ওপৰ প্ৰণহিত কৱেছেন।

সন্দৰ্ভ শতকে ইউৱোপ আৱ ফ্ৰান্সীয়া উভয় স্থানে, প্ৰতীক হিসেবে গাছ এবং লতাপাতাৰ ব্যবহাৱ, বৰ্তমানকালেৰ পশ্চিমেৰ চেয়ে, অনেক বেশি পৰিমাণে স্বীকৃত ছিল, যেখানে লাল গোলাপই সম্ভবত একমাত্ৰ ফুল, যাৱ ব্যাপকভাৱে স্বীকৃত প্ৰতীকী তাৎপৰ্য রয়েছে। মুসলিম শিল্পকলায় এবং বিশেষ কৱে পারস্যেৰ চিত্ৰকলা আৱ নকশায় বেহেশতেৰ প্ৰতীক হিসেবে ফুল প্ৰায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। ফুলেৰ বৰ্ণনা কৱতে গিয়ে পারস্যেৰ কবিৱা বলেছেন, বেহেশতেৰ পানিৰ নহৱ থেকে ফুল প্ৰস্ফুতিত হয়েছে। তাজমহল অলংকৱণে ফুলেৰ ব্যবহাৱ একটি বাৰ্তাকেই আৱো জোৱাল কৱে তোলে যে মকবৰাটাকে পৃথিবীৰ বুকে বেহেশতেৰ একটি প্ৰতিৱপ হিসেবেই নিৰ্মিত কৱাৱ চেষ্টা কৱা হয়েছে।

অবশ্য প্ৰতীকীভূতকে ছাপিয়ে গিয়ে, অবশ্য বাবৰ থেকে শুৱ কৱে পৱবৰ্তী সব মোগল সন্মাটদেৱ ভেতৱেই উদ্যানে প্ৰস্ফুতিত ফুলেৰ পাৰ্থিব প্ৰকাশভঙ্গিৰ মাঝো এৱ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যেৰ প্ৰতি একটি বিশেষ অনুৱাগ পৱিলক্ষিত হয়েছে। জাহাঙ্গীৰ বাগান তৈৱিৰ পাশাপাশি ভৌতিকজ্ঞানেৰ প্ৰতি আগ্রহী হৰাৱ কাৱণে মূলত ভাৱতেৱ 'সুগন্ধি ফুল' নিয়ে গবেষণা কৱেছেন, তাৱ ধাৱণা অনুযায়ী যা

পৃথিবীর অন্যান্য সব ফুলকেই সৌন্দর্যের দিক দিয়ে টেকা দিয়েছে। তিনি চিত্রকলার প্রতি আগ্রহী হবার কারণে গাছপালা এবং ফুটন্ত ফুলের অনেক পাঞ্চাত্যরীতির চিত্রকর্ম উপহার হিসেবে পেয়েছিল, যার ভেতরে রয়েছে ইউরোপে সেই সময়ে সদ্য প্রবর্তিত লতাগুল্মের আনুপুঁজিক সচিত্রীকরণ। এসব চিত্রকর্ম সব ধরনের মোগল অলংকরিষ্ঠ চিত্রকর্মে ফুলের আরো অধিকতর প্রাকৃতিক উপস্থাপনের সূচনা করে। প্রথমবাবের মতো, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফুলদানিতে রক্ষিত অবস্থায় বা মাটিতে কিংবা পাত্রে বেড়ে ওঠা লতাপাতা প্রদর্শিত হয়, যেমনটা ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিতে দেখতে পাওয়া যায়। নবায়িত ইউরোপীয় প্রভাবের আরেকটা লক্ষণ সহসাই বাসকগোত্রীয় বৃক্ষের পত্রস্তারের সহসা পুনরাবির্ভাব, যা ফ্রেকো-রোমান দুনিয়ার সাথে ভারতবর্ষের প্রথমদিকের যোগাযোগের পরেই বিলুপ্ত হয়েছিল।

শাহজাহান আরেকটা বাড়তি উপাদান এই প্রয়াসের সাথে যোগ করেন—মণিমুক্তার প্রতি তার ভালোবাসা আর জ্ঞান। ফরাসি মণিকার জ্যাব্যাপত্তিস্ট ত্রেভার্নিয়ের ভাষ্য অনুসারে, ‘বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে মণিমুক্তা সম্বন্ধে আর কারো শাহজাহানের চেয়ে বৃৎপুষ্ট ছিল না।’ তাজমহলে মার্বেলে খোদাই করে বসানো মণিমুক্তার মূল্য আর বিশিষ্টের মাঝে এবং আনুপুঁজিক অলংকরণ আর চূড়ান্ত কারিকুরির প্রতি প্রদত্ত মনোযোগ খেয়াল করলে রত্নপাথরের প্রতি তার আগ্রহের বিস্তৃত স্পষ্ট বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে উনিশ শতকে কলকাতার বিশপ হেবনের এই অসাধারণ কারিগরি দক্ষতার কারণে বহুল উদ্ভৃত একটি মন্তব্য করেছিলেন যে, তাজমহল নির্মাণ করেছে দানবেরা আর মণিকারেরা একে পূর্ণ করেছে। অন্যদের কাছে তাজমহলের মূল মকবরা সাদা মার্বেলের একটি রত্নপাথর, যা বেলে পাথরে নির্মিত পুরো প্রাঙ্গণ দ্বারা সৃষ্ট একটি ধারকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বার্নিয়ের এবং সালিহর মন্তব্যের দ্বারা পরবর্তী সময়ে মার্বেলের ওপর প্রণিহিত কর্মের উৎস আর প্রভাব সম্বন্ধে এক ধরনের উৎকট স্বাদেশিকতাপূর্ণ আর নিষ্কল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একদল দাবি করে যে, শ্বেত পাথর খোদাই করে ভিন্ন রঙের পাথর-বসানোর কাজ শক্ত পাথর প্রণিহিত করার ইতালিয়ান রীতি, যা *pietra dura* নামে পরিচিত, যা বিশেষ করে ফ্লোরেসে মেদিচিদের পৃষ্ঠপোষকতায় চর্চিত হতো, সেখান থেকেই কেবল গৃহীত হয়েছে এবং পর্যটকরা এই পদ্ধতি ভারতে নিয়ে এসেছে। অন্যদের দাবি অনুসারে, ইউরোপীয়দের আগমনের অনেক পূর্বেই, ভারতীয়রা পাথরে প্রণিহিত করার কৌশল রঞ্চ করেছিল, যা *panchi kura*, যার অর্থ ‘সজোরে প্রবিষ্টকারী কর্ম’, অলংকরণ আর চারুলিপি উভয় ক্ষেত্রেই এ কৌশলের প্রয়োগ তারা জানত।

চারুলিপির ক্ষেত্রে বক্তব্যটা সত্যি হলেও, অকুলীন রত্নপাথর, যা ভারতে প্রচলিত প্রণিহিত কর্মের পাথরের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বলে ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে এই রীতির প্রয়োগ কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। মোগল চিত্রকলার ওপর যেমন ইউরোপীয় চিত্রকলার একটি প্রভাব রয়েছে ঠিক সে রকম এমনটা হওয়া ঘটেই বিচ্ছিন্ন নয় যে হয় ইউরোপীয়রা বা দরবারে তারা যেসব বস্তু উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছিল সেগুলো শাহজাহানকে প্রভাবিত করেছিল এবং তার কারিগররা সন্ত্রাটের প্রিয় রত্নপাথরে *panchi kura* সন্নিবেশিত করার কৌশল রন্ধন করেছিল।

শ্বেতপাথরে প্রণিহিত কর্মের বিশ্বয়াবহ সৌন্দর্যের কাছে এমন একটি বিতর্ক একেবারেই অকিঞ্চিত্তর, এক সভাকবি এ জন্য লিখতে বাধ্য হয়েছেন :

শ্বেতপাথরে তাদের প্রণিহিত করা পাষাণ পুল্প  
তাদের সুগন্ধি নয়, বরং তাদের রঙের বর্ণালির ধারা  
সত্য ফুলের মাঝা লাভ করেছে

উনিশ শতকে এক বৃক্ষ প্রমীলা পর্যটক মুকু ফিসয়ে বলেন, কিছু কিছু ফুল ‘দেখতে এতটাই জীবন্ত মনে হয়, ভাঙ্গা ভাঙ্গণ দক্ষতার সাথে প্রকৃতিকে অনুকরণ করেছে, নিজেকে আশ্চর্য কর্তৃত যে ফুলগুলো আসলেই সত্য নয় নিজের অজান্তেই তোমার হাত সেগুলো স্পর্শ করবে। মাল কনেলিয়নে মূর্তি করে তোলা ডালিম ফুলের চারপাশে মাদার অব পার্সে তৈরি সাদা জুই ফুলের বাকানো লতা...গাঢ় সবুজ রঙের লতাগুলোর নিচে থেকে যখন সৃষ্টি কবরী ফুল উঁকি দিচ্ছে...আলাদা আলাদা মুক্তা, পান্না বা পোখরাজ দিয়ে তৈরি প্রতিটি পাতা, প্রতিটি পাপড়ি।’\*

তাজমহলে প্রায় চালিশ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন মণিমুক্তা ব্যবহৃত হয়েছে। শাহজাহান সমগ্র এশিয়া থেকে রত্নপাথরগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। পণ্যবাহী কাফেলা চিনের কাশগর থেকে সিঙ্গ রুট দিয়ে নিয়ে আসা হয় ইয়াশুম; উত্তর-

\* কৃষ্ণ প্রমীলা পর্যটকের নাম মাদাম ব্রাভাতক্ষি (১৮৩১-১৮৯১), একজন প্রখ্যাতবিদোধী ব্রহ্মণী যিনি ১৮৭৫ সালে থিওসফি, প্রত্যক্ষ ইশ্বর দর্শনের অভিপ্রায়ে গঠিত দর্শনের একটি শাখা, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা সম্ভবত ‘নতুন যুগের’ প্রথম দর্শনশাস্ত্র। আকবরের নতুন ধর্মতত্ত্বের সাথে থিওসফির কিছু মিল রয়েছে। এই শাস্ত্র সব ধর্মের মাঝেই সত্য ঘূঁজে পায় এবং হিন্দু আর বৌদ্ধ অনুসন্ধানকে একত্র করে এমন একটি দর্শন সৃষ্টি করেছে যেখানে প্রতিতি মানুষের চাহিদাকে তার আপন কর্ম অনুধাবনে এবং সেই সাথে দিব্যসন্তান সাথে আধ্যাত্মিক অস্তদৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ, অস্ত জ্ঞানলক্ষ যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

পূর্ব আফগানিস্তানের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত খনি থেকে সংগ্রহ করা হয় গাঢ় নীলের মাঝে সবুজ ছোপযুক্ত লাজবন্দ (লাপিস্ লাজুলি); তিক্কতের উপরিভাগ থেকে ইয়াকের দল তাদের যাত্রার প্রথম পর্যায়ে বৈদ্যুর্য বা ফিরোজা বয়ে নিয়ে আসে; লোহিত সাগর আর আরব থেকে আসে প্রবাল বা মুঞ্চ; বার্মার উপরিভাগ থেকে আসে হলুদাত অশুর; রাশিয়া থেকে গাঢ় সবুজ রঙের যালাকাইট এবং সাগর অতিক্রম করে সিংহল ধীপ থেকে নিয়ে আসা হয় পশ্চরাগমণি। লাসুনিয়া, বৈদ্যুর্যমণি বলা হয়ে থাকে যে, সুদূর মিশরের নীল নদের অববাহিকা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কোনো বিশেষ ছান বা নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট রত্নপাথরের রং আর স্বচ্ছতাই কেবল বিবেচনা করা হয়নি সেইসাথে সম্ভাব্য রত্নপাথরের জ্যোতিষতত্ত্ব সম্পর্কিত সম্পৃক্ততাও বিচার করা হয়েছে। নীলা বা মরকৎ যেমন অনেক কিছুর ক্ষেত্রে অকল্যাণসূচক দ্যোতনা রয়েছে বলে বিবেচিত হওয়ায় খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়েছে।

আগ্রায় যখন রত্নপাথরগুলো এসে পৌছায়, ‘বিস্ময় সৃষ্টিকারী...জাদুকরী’ কারিগররা সেগুলোকে উজ্জ্বলিত করে এবং একটি ছোট বাঁকানো করাতের সাহায্যে নির্দিষ্ট আকৃতিকে কাটে। এই বিশেষ ধরনের করাতে পাঁচটা পর্যন্ত তামার তৈরি তার বিভিন্ন দূরত্বে যুক্ত করা হুঙ্গী রত্নপাথরগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পুরুত্বযুক্ত পরতে পৃথক করতে। পাথর ক্ষতনকারীর দল, সম্ভবত তাদের সহায়তা করতে শিল্পীদের ধারা অঙ্গীকৃত নকশা ব্যবহার করে, শ্বেত মর্মরে বাটালি দিয়ে থাঁজ কেটেছে, যার কাঁচে তারা কর্ম প্রবিষ্ট করিয়ে সেটাকে তেল, লেড-অঞ্চাইত এবং প্রমাণের সাহায্যে প্রস্তুত পুটিৎ দিয়ে আটকে দিয়েছে। মণিকাররা এক ইঞ্চি একটি ফুলের আকৃতি নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করতে ষাটটা পর্যন্ত পাথরের টুকরো, প্রতিটি আলাদা করে কেটে তারপর মিলান হয়েছে, গণনা করেছেন। অন্যত্র কারিগররা একটি পাপড়ির মাঝে বিদ্যমান রঙের মাত্রা বোঝাতে একটি পাথরের নানা রঙের ছাঁটা দারুণ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছে। তারা প্রধান ইমারতসমূহে কেবল *panchi kura* কৌশলের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা পুরো মকবরা প্রাঙ্গণে এই কৌশল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে, পুরো স্থাপত্যে একটি একতা সৃষ্টি করতে। তারা মকবরার কেন্দ্রীয়-রেখায় অবস্থিত মমতাজের সমাধিস্থল এবং মূল মকবরার জন্য তাদের সেরা কাজটা সংরক্ষিত রেখেছিল, কিন্তু তার পরও মকবরা প্রাঙ্গণের বেলে পাথরের দেয়ালের ওপর প্রাকারবেষ্টিত সমতল ছাদে কামানের গোলা নিক্ষেপের জন্য সৃষ্টি ছিদ্রগুলো শ্বেত মর্মরে তৈরি ফুলের নকশা প্রণিহিত করেছে, যার কেন্দ্রে তারা এক টুকরো কালো মর্মর ঘোঁট করেছে।

মূল মকবরা ভবনের দেয়ালের ভেতরের আর বাইরের অংশের নিম্ন ভাগের পুরোটা জুড়ে পরম্পরার সম্পর্কযুক্ত খোদাই করা ড্যাডো প্যানেল

বসান রয়েছে। নকশা করা প্যানেলগুলোতে রয়েছে লতাপাতায় শোভিত আইসিস আর টিউলিপের মতো ফুল, যা শ্বেত মর্মরে অধোৎকীর্ণ নকশার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে।<sup>\*</sup> প্রতিটি প্যানেলে কালো মার্বেলের একটি আভ্যন্তর পরিকাঠামো রয়েছে এবং তারপর শৈলীভূত ফুলের নকশার পাথরের চওড়া পরিকাঠামোর বোর্ড প্রণিহিত করা হয়েছে। সূর্যরশ্মি যখন তিরক্ষরণীর ভেতর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে, আলোকচ্ছটায় ফুলগুলোকে তখন আরো গভীরভাবে উদগত মনে হয়, একটি ত্রৈমাত্রিক প্রতীতির সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে উদগত ভাস্কর্য সৃষ্টির কৌশল *manabbai kari* নামে পরিচিত, যেখানে ভাস্কর শ্বেত মর্মরে মেহেদি দিয়ে নকশার ছাপ বসায়। ভাস্কর এরপর ত্রয়োদশ সূক্ষ্ম হতে থাকা এক প্রস্তুত বাটালির সাহায্যে নকশার চারপাশ থেকে পরতের পর পরত পাথর পর্যায়ক্রমে অপসারণ করে, ফুল আর লতাপাতাগুলোকে তাদের আপন সৌন্দর্যে উন্নতিসত্ত্ব করে তোলে।

অলংকরণের জন্য শেষ যে গীতির আশ্রয় নেয়া হয়, সেটা মূলত মসজিদ আর অতিথিশালায় দৃশ্যমান খোদাই করা চিত্রকর্ম, করম এবং ভাস্কর্যের চেয়ে সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে, যার স্থায়িত্বকাল অনেক কম। মসজিদ আর অতিথিশালার দেয়াল আর ছাদে অবশ্য অন্যথনো চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তোলা লতাপাতা আর জ্যামিতিক নকশার সৌন্দর্য পরিকাহার বোৰা যায়। খোদাই করা চিত্রকর্ম তৈরির পদ্ধতি খুবই সহজ এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোকায়ত চিত্রকলায় এখনো এক ঘৃণ্যবহার লক্ষ করা যায়। চিত্রকর প্রথমে সাদা পলেন্টারার ওপর লাল মাটির একটি আন্তরণ প্রয়োগ করে। তারা দেয়ালে এরপর নানা নকশা আঁকে। তারা সবশেষে নকশার ওপর থেকে খুব সাবধানে লাল মাটি চেঁচে তুলে ফেলে নিচের সাদা পলেন্টারা পুনরায় দৃশ্যমান করে তোলে এবং লাল প্রেক্ষাপটে ফুল আর জ্যামিতিক নকশা আপাতভাবে অভিলম্বিত হয়।

\* টিউলিপ ফুল মধ্য এশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। ফার্সি 'দুলবক্স', যার মানে 'পাগড়ি' বা 'পাগড়ি-আকৃতি', শব্দ থেকে 'টিউলিপ' শব্দটার জন্ম হয়েছে। বর্তমান ইরানে এই ফুলটা শহীদস্তুরের প্রতীক এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় যারা নিহত হয়েছে তাদের সমাধিতে এই ফুলটা অঙ্কিত করা হয়। তাজমহলে ভাস্কর যখন টিউলিপ ফুল খোদাই করছে ঠিক সেই সময় ইউরোপ জুড়ে টিউলিপ ফুলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড ক্ষিণতা। ১৬৩৭ সালের গোড়ার দিকে হল্যান্ডে যা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছায়, যখন এক ডাচ বণিক, ফুল গাছ রোপণ করার জন্য না বরং বিনিয়োগ হিসেবে, কয়েক ডজন কদের জন্য ৬,৬৫০ গিন্ডার (একজন সূত্রাধরের বার্ষিক মজুরির বিশ গুণ) প্রদান করে। কয়েক দিন পর কন্দ ফেটে গেলে, সে যে মূল্য প্রদান করেছিল সেটা দশ ভাগের এক ভাগেরও নিচে নেমে আসে।

তাজমহল প্রাঙ্গণ, রত্নপাথর দিয়ে চৰি চমৎকারভাবে অলংকৃত, খোদাই করা এবং শিল্পীর হাতে লৈশুকের সাথে সেখানে ফুল লতাপাতার ছবি অঙ্কিত হয়েছে যে, প্রাকৃতিক প্রেমস্তরে মাঝে একটি সংগতিপূর্ণ সুন্দর উদ্যান ব্যতীত—বেহেশতের উদ্যান—পুরো বিষয়টি যেন সম্পূর্ণতা লাভ করে না।



AMARBOI.COM

## একাদশ অধ্যায়

### এই বেহেশত-তুল্য উদ্যান

১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে একটি মিডিল ইংলিশ পাঠে ইংরেজি প্যারাডাইজ শব্দটা প্রথমবারের মতো আবির্ভূত হয়, যা ছিল একটি প্রাচীন ফার্সি শব্দ pairidaeza- এর সাধারণ প্রতিবর্ণীকরণ, যার মানে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান। কিন্তু চিরস্মৃত স্বপ্নসুখচন্দ্র সময়ের সাথে উদ্যানকে আরো অনেক পরে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং ইসলাম আর খ্রিস্টানধর্ম ওভ টেস্টামেন্ট এবং শুক্র, আকর্ষণহীন মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উভয় ধর্মে এটা দেখতে পাওয়া যায়। বাবা আদম আর বিবি হাওয়ার কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া নন্দন-কাননের সাথে বেহেশতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জন মিল্টন, শাহজাহানের জীবদ্ধশার শেষ সময় লেখা তার প্যারাডাইজ লস্ট মুস্কাবে বর্ণনা করেছেন কীভাবে নন্দন-কাননে :

একটি স্বচ্ছ-তোয়া জলের ফুলারা উঠিত হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায়  
প্রবাহিত হয়ে

জল সিঞ্চন করছে; সেখান থেকে সম্মিলিত জলধারা  
উদ্যানের মধ্যবর্তী ফাঁকা ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে...  
এবং এখন সেই জলধারা, চারটি প্রধান স্রোতে বিভক্ত হয়ে,  
দিঘিদিক ধরে চলেছে...

মরুভূমির অধিবাসীদের কাছে পানি সব সময় জীবনের দ্যোতনা বহন করে। আরব মরুভূমিতে অবস্থিত মরুদ্যান সম্পূর্ণত এই বেহেশত-তুল্য উদ্যানের পূর্ব লক্ষণ এবং আরবদের কাছে মরুদ্যানের সুশ্যামল গাছপালার উজ্জ্বল সবুজ ঝর্মেই পবিত্র রঙে পরিণত হয়, যা পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্মের পবিত্র বর্ণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। হজরত মুহাম্মদ (সা.) যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার

করেন, ইসলামের মূল ধর্মগতি কোরআন শরিফে উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামের চিরস্তন বাসস্থান বা বেহেশত পরম্পর সম্পর্কযুক্ত চতুরের সমষ্টি, প্রতিটি চতুরে রয়েছে পূর্ববর্তী চতুরের খেকে অনেক বেশি জমকালো উদ্যান, যেখানে প্রাণের নদীকে উপস্থাপনকারী চারটি আলাদা পানির নহর দ্বারা অবসোচনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কোরআনে যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

উভয় (বাগিচা) ঘন শাখা-প্রশাখায় ভরা ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

সেখানে উপচে পড়বে দুটো ঝরনা ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দুই রকম ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

সেখানে ওরা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তর-দেয়া পুরু ফরাশে । দুই বাগিচার ফল ঝুলবে তাদের নাগালোর ডেতে ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

তথায় থাকবে আনতনয়না তরুণীরা, যাদেরকে পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

(তারা) অবাল ও পঞ্চাগ সদ্শ ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরকার ছাড়া আর কী হতে পারে?

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

এ দুটো ছাড়া আরো দুটো বাগিচা থাকবে ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

ঘন সুবজ দুটো বাগিচা ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

সেখানে আছে দুটো উচ্ছলিত ঝরনা ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

সেখানে আছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম ।

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অর্হীকার করবে?

আরবরা যখন পারস্য-দেশে অধিক্রম পরিচালনা করে, তারা তাদের সাথে কোরআন শরিফ সেখানে নিয়ে যায়, তারা সেখানে সহস্র বছরের পুরনো উদ্যানের আরেকটা সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। জেনোফোন

লিখে গেছেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহান পারসিক শাসক সাইরাস কীভাবে নিজের হাতে একটি উদ্যান রচনা করেছিলেন। সাইরাসের উত্তরসূরিদের একজন, জারজেস, একটি বক্ষের সৌন্দর্যে এতটাই বিমুক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি এর প্রতিটি শাখা সোনার মন্ত্রপূত কবচ দিয়ে অলংকৃত করেছিলেন। আরব আর পারস্য সংস্কৃতি তাদের নিজ নিজ উদ্যানকর্ষণ নিয়ে পরম্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে এমন উদ্যানের বিন্যাস ঘটায়, যা তাদের স্বষ্টিরা বেহেশতের ঐশ্বরিক মহিমার পার্থিব প্রতিকূল হিসেবে আলেখন করেছেন।

আলেখকদের সবাই একটি সাধারণ মৌলিক পরিলেখের সাহায্য নিয়েছেন। বেহেশতের উদ্যানসমূহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রাচীরবেষ্টিত, ভেতরের শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়কে নির্জনতা এবং বাইরের ধূলিমলিন বিশ্বজলা আর ঘূর্ণিত মতান্তেক্যের হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করতে। উদ্যানের কেন্দ্রে বিপরীতমুখী পানির নহর পরম্পরের সাথে মিলিত হয়ে এবং প্রাণের চারটা ধারাকে উপস্থাপন করেছে আর একই সাথে সম্ভবত মরুভূমিতে প্রাণের বিকাশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় অবসেচনকে প্রতীকায়িত করেছে। অনেকে পানির বিপরীতমুখী ধারা যেখানে মিলিত হয়েছে সেই মিলনস্থলকে মানবের সাথে দিব্যের মিলিত হওয়াকে উপস্থাপনকারী হিসেবে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু পারসিকরা কোনো ধ্বকার প্রতীকী দ্যোতির ব্যতিরেকে উদ্যানের চার অংশে অবসেচনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই প্রায় ব্যবহার করেছে, যেখানে তারা পুন্ডবীঁধি আর পদ্মবিত্ত বৃক্ষের সম্মিলিত ঘটিয়েছে। উদ্যানগুলো সে কারণেই চাহর বাগ, 'চার-খণ্ডে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। (ফার্সি বাগ শব্দের অর্থ উদ্যান।)

তৈমুর যখন পারস্যে অধিকরণ করেন, তিনি সেই দেশ এবং সেখানের অধিবাসীদের ঘারা প্রতিপালিত সাংস্কৃতিক আধার থেকে অনেক কিছুই মধ্য এশিয়ায় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি 'বেহেশতি উদ্যান'-এর ধারণা গ্রহণ করার পাশাপাশি সেখান থেকে কারিগরদেরও নিয়ে এসেছিলেন এবং তার সাম্রাজ্যের রাজধানী সমরকন্দের চারপাশে তিনি যে উদ্যান রচনা করেছিলেন সেখানে এই ধারণাটা একত্রীভূত করেছিলেন। তাদের রাজ্যসমূহ পর্বতসঙ্কুল হ্বার কারণে এবং প্রায়ই পানির উত্তম সংস্থান থাকার কারণে তৈমুর আর তার অভিজাত সম্প্রদায় চতুরযুক্ত উদ্যানের ভেতর দিয়ে ঝালরের মতো বহমান জলপ্রপাত আর ঝরনা নির্মাণে প্রবাহিত জলধারার ব্যাপক ব্যবহার করেন। সামান্য সংখ্যক চিত্রকলা আর বিদ্যমান বস্ত্রনিষ্ঠ ভাষ্য থেকে যতটুকু জানতে পারা যায়, তারা মনে হয় তাদের সৃষ্টি উদ্যানে আনার, চেরি, নাশপাতি আর জাম জাতীয় ফলের সাথে চিনার আর সফেদারের মতো অন্যান্য বৃক্ষও রোপণ করেছিলেন। তারা ফুলের বীথিগুলো গোলাপ, আইরিস, নার্সিসাস এবং ভায়োলেটের মতো

ফুল দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, তারা আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয় ভূপ্রকৃতি আর আবহাওয়ার কারণে ভূতলের আচ্ছাদন হিসেবে ঘাসের পরিবর্তে ত্রিপত্রবিশিষ্ট গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত এক প্রকার শুল্প ব্যবহার করেছিলেন। তৈমূর বৃত্তাকারে সমরকন্দকে ঘিরে রাখা তার সুবিস্তৃত উদ্যানগুলোর নাম কাঞ্চনিক নামকরণ করেছিলেন যেমন ‘পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি’ এবং ‘শান্ত জলাশয়ের তৃণভূমি।’ তৈমূর যখন তার যায়াবর অনুসারীদের নিয়ে উদ্যান থেকে উদ্যানে শিবির স্থানাঞ্চল করতেন, যিনি ছিলেন লম্বা শুভ শুক্রমণ্ডিত এবং দীর্ঘদেহী আর চওড়া একজন নৃপতি, তিনি তার সিংহাসন প্রাণের চারটা নদীকে উপস্থাপনকারী বিপরীতমুখী স্নোতধারা পরম্পর যেখানে মিলিত হয়েছে সেই স্থানের ওপর একটি বেদিতে স্থাপন করে, এভাবেই পৃথিবীর চার প্রান্তের ওপর নিজের আধিপত্যকে বিশেষায়িত করে তুলতেন।

বাবর যখন হিন্দুস্তান বাহুবলে জয় করেন তিনি তার সাথে করে উদ্যানের ঐতিহ্য ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। আগ্রায় তার নিদায়তপু নতুন রাজধানীতে তিনি প্রথম যে কাজটা করেছিলেন সেটা হলো শীতল বায়ু সৃজনকারী উদ্যান রচনা করা। এসব উদ্যান ছিল মূলত প্রমোদকানন—তার উত্তরসূরিয়া তাদের নিজেদের মকবরার জন্য নিজেদের সৃষ্টি উদ্যানকে অধিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের উত্তাবন কুশলতার সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর রেখেছিলেন। স্বার্ট আর তার অভিজ্ঞত সম্প্রদায় সবাই ছান্নুর বাগ নির্মাণ করতেন যেখানে জীবিত অবস্থায় তারা বাস করতেন এবং সেখানের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন আর তারা যখন ইন্তেকাল করতেন তখন সেখানেই তাদের সমাধিস্থ করা হতো। মোগলরা উদ্যান সৃষ্টির ঐতিহ্যে প্রশংসন পানির নহর এবং দুটি বিপরীতমুখী জলস্তোত্রের মিলনস্থলে নির্মিত মকবরার প্রতিবিম্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থির জলরাশির বিশাল বিস্তারের ব্যাপক ব্যবহারের মতো আরো অনেক উন্নতি সাধন করেছিল। শাহজাহান সাদা মার্বেল দিয়ে মূলত কারুকার্যময় চতুর নির্মাণ করতেন এবং কখনো কখনো জবাব হিসেবে কালো পাথরে আরেকটা চতুর নির্মাণ করতেন যেমন কাশ্মীরের শালিমার উদ্যানে ১৬৩০ সালে তার আদেশে নির্মিত কালো পাথরের চতুর।

মোগলরা তাদের তৈমূরীয় পূর্বপুরুষদের তুলনায় বহুমান জলস্তোত্র আরো বেশি পরিমাণে তাদের সৃষ্টি উদ্যানে ব্যবহার করেছে। তারা শুন্যে পানি নিষ্কেপকারী ঘরনা উদ্যানে একটীভূত করেছিলেন এবং সেইসাথে কাঞ্চনিক আর শীতল কুহা, যা সূর্য রশ্মির আঘাতে উজ্জ্বল বর্ণিল রংধনুতে পরিণত হতো। তারা ঘূর্ণি আর প্রতিবিম্ব সৃষ্টির জন্য উদ্যানে যাচ্ছের আঁশের আকৃতিতে মার্বেল খোদাই করে তার ওপর দিয়ে পানির দ্রোত প্রবাহিত করত, যা অলংকৃত পানির নহর আর জলজ লতাঙ্গুরের মাঝ দিয়ে বয়ে যেত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আর বাদুড়ের

দল পানি পান করার উদ্দেশ্যে পানিতে ঝাপ দেয়া শুরু করলে পরিচারকবা  
পড়স্ত পানির পেছনে অবস্থিত শুকনো কুণ্ডনিতে রক্ষিত তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে  
দিত রাতের মখমলি সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলতে।

মোগলদের কাছে উদ্যান এতটাই শুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তারা হরহামেশাই রাজ্যের  
রূপক হিসেবে একে ব্যবহার করত। আবুল ফজল লিখেছেন, পৃথিবীকে সবার  
বাসযোগ্য করে তোলার আকাঙ্ক্ষাই ছিল অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেয়ার  
পেছনে আকবরের প্রণোদনা : ‘মালি যেমন উদ্যানকে গাছ দিয়ে সজ্জিত করে  
এবং তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে এবং অনেক গাছ  
পরিহার করে আর অন্যদের অবসেচন এবং প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে তাদের  
সন্তানের মতো দেখাশোনা করে যথাযথ আকার দিতে আর বাজে গাছ উন্মুক্ত  
করে এবং পচা ডালপালা ছেঁটে দেয় এবং যে গাছগুলো আকারে বেশি বড় হয়ে  
গেছে তাদের সরিয়ে দেয়... এবং নিজের রোপণ করা গাছের ফুল আর ফল  
সংরক্ষ করে এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে গাছের ছায়া উপভোগ করে এবং অন্য  
আরো অনেক কিছু করে, যা উদ্যান কর্ষণের বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়পরায়ণ  
আর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজাও প্রবিধান দ্বারা প্রজার প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন এবং  
তার অনুগত প্রজাদের নির্দেশ দেন এবং এভাবেই নেতৃত্বের আর্দশ আবির্ভূত  
হয়।’

তারা তাদের উদ্যানের আলেখনে যে ভূতীকীভূই আরোপ করুন না কেন এবং  
রূপক হিসেবে উদ্যানকে যত মাজায়ের সাথেই তারা কাজে লাগান না কেন,  
বাবর আর তার উন্নতসুরিরা ক্ষেত্রমান কালের একজন উদ্যানপালকের ন্যায়ই  
তাদের নিজেদের সৃষ্টি উদ্যানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ  
করেছেন। তারা উদ্যানের আলেখন এমনভাবে করতেন, যেন পাঁচটি  
জানেন্দ্রিয়কেই—চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ (পানির ঝিরিয়ির শব্দ, ফলের আর  
পরাগের আকর্ষণে আগত পাখির আর কীটপতঙ্গের আওয়াজ), ত্বক (পল্লবের  
বিন্যাস, মার্বেলের মসৃণতা এবং পানির শীতলতা) আর জিহ্বা (ফল ভক্ষণের  
দ্বারা প্রাণ), তারা আকর্ষণ করতে পারেন।

তৈমুরের মতো, মোগলরাও প্রায়ই উন্মুক্ত বাতাসে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন  
করত। একটি অণুচিত্রে আমরা বাবরকে দেখতে পাই রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত  
জানাতে ফলস্ত বৃক্ষ আর ফুলবীথি দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটি চাঁদোয়ার  
নিচে তার নিজের উদ্যানে সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। অন্যান্য অণুচিত্রে  
স্ম্রাট আর তার অভিজাতবৃন্দকে তাদের স্বল্পবসনা রক্ষিতাদের সাথে তাদের  
নিজ নিজ উদ্যানের নির্জন ছায়াঘেরা স্থানে আমোদে লিঙ্গ, চারপাশে উজ্জ্বল পূর্ণ  
বিকশিত ফুলের সমারোহ, পাকা ফলের ভারে অবনত ফলবান বৃক্ষ থেকে

এখনই বুঝি ফল খসে পড়বে আর সম্মতিজ্ঞত পুরুষ লিঙ্গের ন্যায় ঘরনা থেকে  
পানির বাপটা আকাশমুখে নিষ্কিণ্ড হচ্ছে।

শাহজাহানের সবচেয়ে পরিচিত প্রতিকৃতিগুলোর একটি, তাকে আমরা নার্গিস,  
টিউলিপ, খাতামি, ড্যাফডিল, আইসিস ফুল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে  
পাই। তাজমহলের উদ্যানের আলেখন তার কাছে মূল মকবরার মতোই  
গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং চমকপ্রদ আর সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পূর্ণতা সৃষ্টির জন্য তাদের  
মধ্যবর্তী সমিলন ছিল জরুরি। এক রাজকবি লিখেছেন স্মাটের অভিপ্রায় ছিল  
তাজমহল প্রাঙ্গণে একটি চূড়ান্ত উৎকর্ষ সৃষ্টি করা, যা চিরস্থায়ী হবে

যত দিন কানন আর পুষ্প শব্দগুলো প্রচলিত থাকবে  
যত দিন মেঘ আর বৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক বিরাজিবে



শাহজাহান আর তার পরিকল্পনাবিদের দল তাজমহলের উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত  
ধ্রুপদী চাহর বাগী বা চারখণ্ডের সামুহিক বিন্যাস ছন্দে সৃজনের পরিকল্পনা  
করেছেন। দুটো মর্মরের কৃত্রিম জলপথ—যার একটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত,  
যা পুরো মকবরা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা সৃষ্টি করেছে—সমকোণে  
পরস্পরের সাথে প্রধান সৌধ আর তোরণমার থেকে সমদ্রত্বে বর্গাকৃতি  
বাগিচার কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়েছে এবং পুরো বাগিচাকে চারটি বর্গক্ষেত্রে  
বিভক্ত করেছে। অধিকাংশ মেঝেল বাগিচার ন্যায় এখানেও জলের কৃত্রিম নহর  
উঁচু করা হয়েছে চারপাশের বৃক্ষরাজিতে অবস্থেচনের জন্য, যাতে সেগুলোকে  
ব্যবহার করা যায়। স্থপতিরা, দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসাম্য পুনর্বর্ক্য করতে, পূর্ব-পশ্চিমে  
প্রসারিত মর্মরের নহরের দুই প্রান্তে সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে লাল বেলে  
পাথরের অনন্য রূপ চতুর নির্মিত করেছেন। তারা দুটো চতুরের উপরিভাগে,  
বলা হয় যে এখানে বসে বাদ্যযন্ত্রীর দল বাজনা পরিবেশন করত, অষ্টভূজাকৃতি  
ছত্রী নির্মাণ করেছেন। তারা বিপরীতমুখী নহরের মিলনস্থলের কেন্দ্রবিন্দুতে  
বর্গক্ষেত্র-আকারের একটি কৃত্রিম মর্মরের জলাধার স্থাপন করেছেন। জলাধার  
তার আকার, আয়তন আর সংস্থাপন-চাতুর্বের কারণে তাজমহলকে প্রতিফলিত  
করার অধিকার লাভ করেছে। নামাজের পূর্বে মসজিদে মুসলিমরা নিজেদের  
পবিত্র করতে যে জলাধার থেকে পানি নিয়ে অজু করে সেই জলাধারই  
আপাতদৃষ্টিতে, মোগল বাগিচার বৈশিষ্ট্য এসব জলাধারের আদি উৎস।\*

\* স্থাপত্যবিদ্যার কিছু ঐতিহাসিক দাবি করেন, মসজিদের অজুর জলাধারের অবস্থান  
জরুরস্টীয় মন্দিরের আগুনের আগুনের গহরের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত, পারস্যের

চৌষট্টি ফিট বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গাকৃতি মর্মরের বেদিতে জলাধারটা অবস্থিত, যা পদ্মফুলের নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে জলাধারে অবস্থিত পাঁচটি ফোয়ারা আকাশের দিকে সঙ্গে পানির ধারা বর্ষণ করে। জলাধারের প্রাঞ্চদেশের চারদিকে আরো চারিশটি ফোয়ারা রয়েছে এবং জলাধারের উভয় পার্শ্বে মূল মকবরা আর তোরণঘারের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত প্রশংসন কেন্দ্রীয় নহরের তলদেশে আরো চারিশটি করে ফোয়ারা রয়েছে। উদ্যানরক্ষকরা পদ্মফুল, যা উর্বরতার প্রতীক, আর সোনালি মাছ দিয়ে জলাধার পূর্ণ করে রেখেছে। (আজকাল, গাইডদের অনেকেই আমতা আমতা করে দাবি করে যে, জলাধারের কিছু মাছ আসলেই শাহজাহানের সময়কালের মাছদের বংশধর।)

হ্রপতিরা পরবর্তী সময়ে বাগিচার প্রতিটি খণ্ডকে জলের নহর দ্বারা পুনরায় চারটি সমান খণ্ডে ভিত্তি করে, সর্বমোট যোলোটি বর্গক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। তাজের বাগিচায় মোগলরা ঠিক কি গাছ রোপণ করেছিল সেটা আজ আর স্পষ্ট করে জানার কোনো উপায় নেই। বর্তমান পাদপসজ্জাটি মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে ত্রিতীয়দের সংস্কার পরিকল্পনা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোগলরা যদিও ভারতবর্ষে সাইপ্রেস গাছ আমদানি করেছিল, যা মূলত এশিয়া মাইনর আর পারস্য থেকে এসেছে পরকালের স্মারক হিসেবে, মৃত ব্যক্তির নিয়তিতে যে পরকাল রয়েছে স্টোও এবং এরই অন্তর্ভুক্ত, স্থাপত্যের সাথে এক সুরে বাঁধা সাইপ্রেস গাছের স্মারক, এখন যা তোরণঘার থেকে মকবরা অভিযুক্ত প্রসারিত সেগুলোর সম্মত শতকের হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সাইপ্রেস গাছগুলো অবশ্য দর্দবারের ঐতিহাসিক সালিহ ‘যে বৃক্ষ আর দুর্লভ সুগান্ধি লাতাগুলু’ রোপণের কথা উল্লেখ করেছেন তখনো সম্ভবত ছিল। মোগলরা প্রায়ই তাদের বাগিচায় যা করত, সম্ভবত সেটাই করেছে, সাইপ্রেস গাছগুলোর স্থানে তারা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করেছে। শেষোক্ত প্রজাতির বৃক্ষগুলো সুনিবিড় ছায়া দেয়ার পাশাপাশি প্রতিবছর বসন্তকালে নতুন করে পার্থিব জীবনের নবজীবন লাভের বিষয়টিকে প্রতীকায়িত করে, বিপরীতক্রমে সাইপ্রেসগুলোর সম্পৃক্ততা যেখানে অনেক বেশি সংযোগ। বাগিচা বিষয়ক ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ ঘনে করেন যে, তাজমহলের বাগিচাগুলো এখনকার অবস্থানের চেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক নিচু ছিল, এতটাই নিচু যে জলের উচু নহর বরাবর যারা হেঁটে যেত তাদের কাছে নহরের প্রাচীর বাগিচার চেয়ে অনেক উচু মনে হতো যার ফলে তারা সহজেই সেখান থেকে রসালো ফল ছিড়ে নিতে পারে।

---

প্রথমদিকের অনেক মসজিদই আসলে এই মসজিদগুলোকে পরিবর্তিত করে তৈরি করা হয়েছিল।

ফরাসি চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের যখন তাজমহল ভ্রমণ করেন তিনি তাজের বাগিচাগুলোকে ‘ফুলে ফুলে উদ্দেল’ অবস্থায় আবিক্ষার করেন। তিনি কোনো অজানা কারণে ফুলগুলোর নাম কোথাও উল্লেখ করেননি, কিন্তু ফুলের ভেতরে সচেতন গোলাপ ছিল (মরতাজের দাদিজান কর্তৃক আবিশ্বক্ত গোলাপের আতর তৈরিতে ভীষণ প্রয়োজনীয়), সেইসাথে নার্গিস ও মকবরার অভ্যন্তরের দেয়ালে উৎকীর্ণ বসতের অন্যান্য নানা ফুল এবং সেইসাথে নার্গিস এবং জাহাঙ্গীর তার প্রিয় পুচ্ছপৌরীর নাম বলতে গিয়ে যুইকে তার প্রিয় ফুল হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন—সুগন্ধির আরেকটা উৎস এবং প্যাগোড়া গাছের ফুলসমূহ। ফলস্ত বৃক্ষসমূহের ভেতরে নিশ্চিতভাবেই আম আর কমলালেবু ছিল। মোগলরা আবার আপেল আর নাশপাতিও ভীষণ পছন্দ করত। কাশ্মীরের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় যদিও অনেক সহজ ছিল এসব উৎপন্ন করা কিন্তু আগ্রায় এসব ফল উৎপন্ন হতো, যদি কেবল বছরের নয় মাসব্যাপী শুষ্ক মৌসুমে যত্নের সাথে অবসেচন করা যেত।\*

কোনো নির্মাণস্থল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা যার হয়েছে তারা সবাই জানে তাজমহলের বাগিচার জন্য আক্ষরিক অর্থে গাছ রোপণ করতে পুরো প্রাঙ্গণের অবশিষ্টাংশের নির্মাণ সমাপ্ত হওয়া এবং সেইসাথে নির্মাণে ব্যবহৃত ভারা এবং অন্যান্য কল-কজা আর ইট-পাথরের সমস্ত স্তোঙা টুকরো অপসারণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। স্তুপতিরা অবশ্য বাগিচার জন্য বিস্তারিত আকল্প পুরো প্রাঙ্গণের পরিলেখ তৈরির সময়ে সমাপ্ত করেছিলেন, কেবল এ জন্য নয় যে বাগিচাটা পুরো মকবরা প্রাঙ্গণের সার্বিক ধারণার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু একই সাথে বাগিচার নান্মানুবন্ধ যেমন মধ্যে আর পায়ে হাঁটার পথ এবং বিশেষ করে যমুনা নদী থেকে বলিবর্দ নিয়োজিত ‘পার্শিয়ান ছাইল’ বা ‘পানিচকি’র সাহায্যে পানি তুলে সেই পানি পুরো বাগিচার বিভিন্ন প্রাণ্তে আর কেন্দ্রীয় জলাধারে এবং ফোয়ারার আকারে ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজনীয় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের জন্য নির্মাতাদের প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দিতে।

নির্মাণস্থানের পশ্চিম প্রাণ্তে পানি সরবরাহের জন্য নির্মিত এসব স্থাপনার মাত্রা আর জটিলতা এতই ব্যাপক যে, সম্প্রতি ভূগর্ভ থেকে পোড়ামাটির জলবাহী একটি পাইপ খুড়ে বের করে সেটাকে মূলের আদলে পুনর্নির্মাণ করা হলে, আরো একবার স্পষ্ট হয় যে, তাজ শৈল্পিক অর্জনের পাশাপাশি কারিগরি সাফল্যের একটি বিশাল উদাহরণ। তাজের পশ্চিমে, যেখানে মাটি ঢালু হয়ে যমুনার দিকে নেমে গেছে, নির্মাতারা নদীর জলস্তোত একটি সংগ্রাহক

\* মোগলরা তাদের মাত্রাহীন অপব্যয় আর প্রাচুর্য সত্ত্বেও তারা যখন রাজকীয় বাগিচায় উৎপন্ন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুল আর ফলসমূহ, যার ভেতরে তাজমহলের বাগিচাও রয়েছে, বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা খানিকটা হলেও অর্থনৈতিক বিচক্ষণতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল।

জলাধারের দিকে ঘুরিয়ে দেন, যেখানে পানিতে বিদ্যমান পলি আর অন্যান্য আবর্জনা জলাধারের তলদেশে জমা হবে এবং তারপর এই পানি তাজের পশ্চিমের দেয়ালের সমান্তরালে অবস্থিত একটি কৃত্রিম জলবাহী খাতে প্রবাহিত করেন এবং সেটা জলাধার থেকে ২৫০ ফিট দূরে অবস্থিত। এই জলবাহী খাতের পশ্চিম প্রান্তের পার্শ্বদেশে নির্মাতারা ইটের একটি লম্বা ধনুকাকারের বাঁকানো পানি সরবরাহের কৃত্রিম নালা নির্মাণ করেন। তারা এই নালার উপরিভাগ এতটাই চওড়া করেন যে, সেখানে কেবল আরেকটা জলবাহী নালা ছাড়াও পানি সেখান পর্যন্ত তোলার জন্য তেরোটা পুরের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাও সেখানে স্থাপন করা যায়।

প্রতিটি পুর পানিবাহী নালার প্রান্তে স্থাপিত এক জোড়া রোপার নিয়ে গঠিত হয়েছে, যেখান থেকে নিচের পানির নালা দেখা যায়। রোপারের চারপাশে পেঁচানো একটি দড়ির সাথে একটি চামড়ার মশক সংযুক্ত রয়েছে এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক এক জোড়া ঝাঁড়কে রোপার থেকে দূরে একটি মৃদু ঢাল বরাবর হাঁটিয়ে নিয়ে নদী থেকে পানি তুলে আনে। (মশকগুলো ঝাঁড়ের চামড়ার চার প্রান্ত একসাথে শক্ত করে বেঁধে তৈরি করা হয়—ঝাঁড়ের ভাগে কী ঘটেছিল তা অবশ্য সহজেই অনুমেয়।) ভারতবর্ষে জাত প্রজন্মের এই পদ্ধতিটা মোগলরা ব্যবহার করা অব্যাহত রাখে, যদিও বাবর পদ্ধতিটার তীব্র নিদা করে একে অভিহিত করে বলেছেন এটা ‘পরিষ্কারাধ্য আর নোংরা...এখানে একজন লোককে ব্যস্ত থাকতে হয় ঝাঁড়গুলো পরিচালনা করতে আর অন্যজন মশকগুলো খালি করে। ঝাঁড়গুলোকে প্রতিবার মশক তোলার জন্য হাঁটতে বাধ্য করা হয় এবং তারপর তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়, দড়িটাকে ঝাঁড়ের চলাচলের পথের ভেতরে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া আর নিয়ে আসায়, সেটা ঝাঁড়ের মৃত্র আর গোবর লেগে নোংরা হয়ে থাকায়।’ তত্ত্বাবধায়ক সম্ভবত ছাদটা নিয়মিতভাবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করত।

পানি সরবরাহের জন্য নির্মিত বাঁকানো পথে পার দিয়ে একবার পানি তোলা সম্ভব হলে, পানিকে তখন আরেকটা নহর দিয়ে সংরক্ষণ জলাধারে প্রেরণ করা হয় এবং তারপর সামনে আরেকটা জলাধারে। এই শেষোক্ত জলাধারের দক্ষিণের শেষ প্রান্তে নির্মাতারা পানি সরবরাহের জন্য শেষ আরেকটা কৃত্রিম প্রণালী নির্মাণ করেন এটা অন্য প্রণালীর সাথে সমকোণে প্রায় ত্রিশ ফিট উঁচুতে এবং তাজের পশ্চিম প্রান্তের প্রাচীরের সাথে অবস্থান করে। পারের আরেকটা ব্যবস্থা যখন পানিকে এই উচ্চতায় তুলে নিয়ে আসে, একটি কৃত্রিম প্রণালী পানিকে তিনটা পরস্পর সংযুক্ত জলাধারে বয়ে নিয়ে আসে যেগুলোকে কৃত্রিম প্রণালীর শেষ প্রান্তে পশ্চিম প্রান্তের চাতালের পাশে তাজ প্রাঙ্গণের দেয়ালের কাছে তাজের পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত পানিবাহী মূল প্রণালীর কাছেই নির্মাণ করা

হয়। তাজের দেয়াল থেকে সব থেকে দূরে অবস্থিত জলাধার—প্রথম জলাধারটা সাড়ে চার ফিট গভীর, পরের জলাধারটা ছয় ফিট গভীর এবং তাজের দেয়ালের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত জলাধারটা নয় ফিট গভীর। তাজের পুরো বাগিচায় পানি সরবরাহ করতে ত্রুটী হতে থাকা জলাধারে নির্দিষ্ট উচ্চতায় রাখিত পানিতে আয়তনভিত্তিক চাপ সৃষ্টি করে। পানিবাহী নালি প্রাঙ্গণের তলদেশে পাইপের সাহায্যে পানি পৌছে দেয়, নির্মাতারা যেখানে একটি বাঁধানো পায়ে হাঁটা পথের নিচে চাপা পড়া প্রধান পাইপটার স্মৃতি ভুলে যেতে চান।

ফোয়ারাগুলোর, বিছিন্নভাবে না, প্রতিসমভাবে সক্রিয় হওয়া নিশ্চিত করতে, সেগুলো এলোপাথাড়িভাবে প্রতিসমভাবে সক্রিয় হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে, ফোয়ারাটা শেষ জলাধার থেকে যত দূরেই থাকুক এবং পানির প্রবাহ যতই সমঙ্গস্যাহীন হোক, প্রকৌশলবিদ্রো প্রতিটি ফোয়ারার নিচে তামার পাত্র স্থাপন করে একটি উন্নাবনচতুর ব্যবস্থা সৃষ্টি করেন। তারা পানির প্রবাহের সাথে এই পাত্রগুলোকে সংযুক্ত করে, পানির প্রবাহ সরাসরি ফোয়ারার দিকে না পাঠিয়ে, যাতে করে পানি প্রথমে এসে তামার পাত্রে জমা হতে পারে এবং যখন সবগুলো তামার পাত্র পানিপূর্ণ হয় তখনই কেবল ফোয়ারার মুখ দিয়ে সম্মিলিতভাবে জলের ধারা শূন্যে নিষিষ্ঠ রহে।

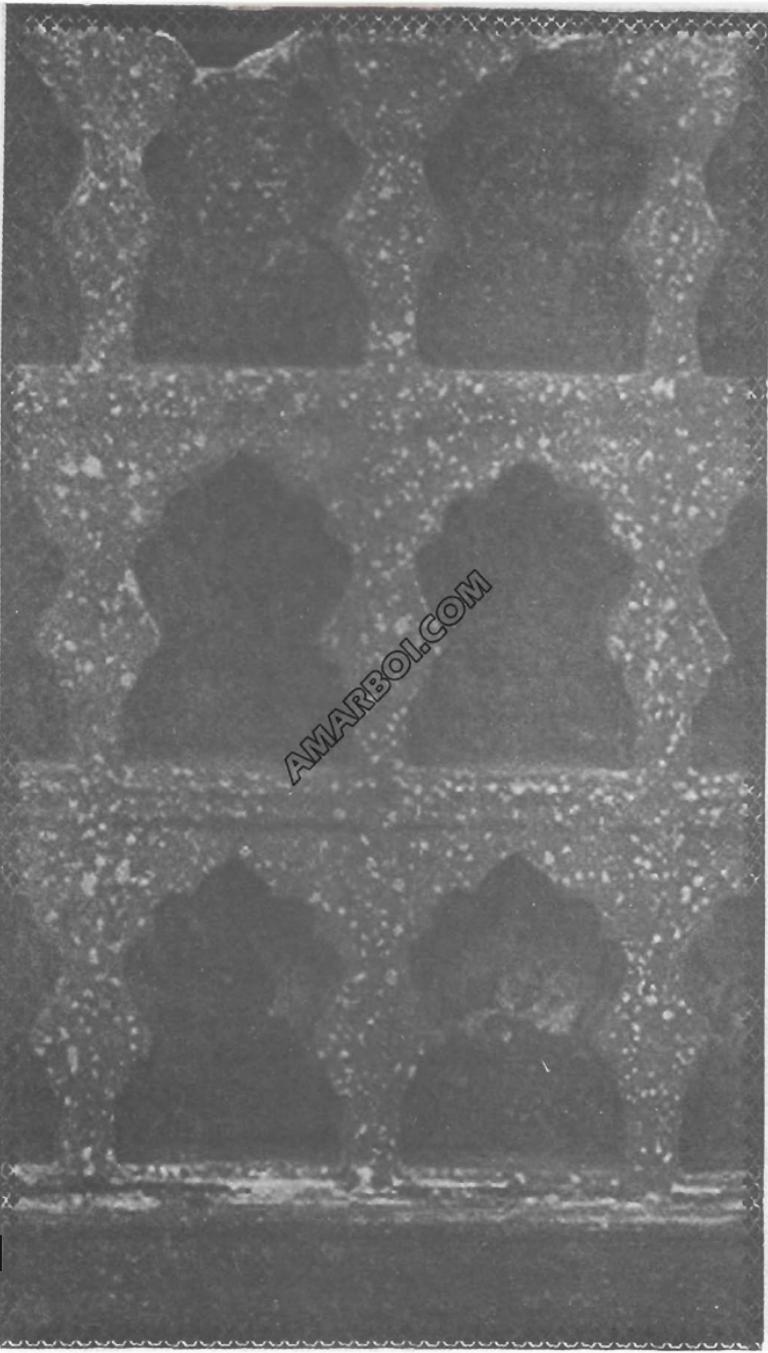
১৬৪৩ সাল নাগাদ মূল মকরবুর নির্মাণ সমাপ্ত হয়, তাজের বাগিচা তখনো পরিপক্ষ হয়নি কিন্তু ইতিমধ্যেই সেখানে ফলবান বৃক্ষ এবং উজ্জ্বল বর্ণের সুগন্ধি ফুলের দারণ একটি সম্মাবেশ ঘটেছে। শাহজাহানের ইতিবৃত্তকার সালিহৰ ভাষায় সেগুলো ছিল দেখতে অনেকটা ‘পৃথিবীর সব নন্দনকাননের কপালে একটি কালো তিল এবং এখানের প্রতিটি পুষ্পবীঁধির প্রাচুর্য প্রীতিকর এবং বেহেশতের তদ্বাবধায়কের উদ্যানের পুষ্পবীঁধির মতোই হৃদয়কে তারা বিমোহিত করে। প্রাণদায়ী পানির প্রবাহ এখানের আকর্ষণীয় সবুজ বৃক্ষরাজিকে সারা বছরই সিঁজ রাখে এবং প্রতিটি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য...দিব্য জল-পন্থের বৈশিষ্ট্যকে অপ্রতিম করে তুলেছে...আলোকসিঞ্চন ফোয়ারা থেকে মুক্তার মতো দৃঢ়তিময় জলের ধারা নিঃসৃত হয়...সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই বেহেশতভূল্য বাগিচার চমৎকার বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন লাল বেলে পাথর দিয়ে পায়ে হাঁটার পথের পুরোটা তৈরি করা হয়েছে, এখানের পানির নহর নক্ষত্রপুঞ্জের-ইঙ্গিতবহু এবং এখানের অপূর্ববিদ্যিৎ আলেখনের আধার, যাকে উজ্জ্বলতার দুনিয়ার বিশুদ্ধতা ক্ষটিক কণা থেকে বাস্তবে মূর্ত করা হয়েছে, যা এমন একটি মাত্রা লাভ করেছে, যেখানে কলনাও পরাভব মানে এবং এর সৌন্দর্যের শুদ্ধতম কণাও বাক্যের প্রাচুর্য দ্বারা পুরোপুরি প্রকাশ করা অসম্ভব।’



AMARBOI.COM

দি হিস্ট্রি অভ্ দ্য তাজমহল-১৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~



AMARBOI.COM

## ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

### ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଯ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ସମାଧି

୧୬୪୩ ସାଲେର ୬ ଫେବ୍ରୁଆରିର ରାତେ, ଶାହଜାହାନ ତାର ମୃତ ଶ୍ରୀର ଜନ୍ୟ ନିଜେର ସୃଷ୍ଟି କରା ଆଲୋକୋଞ୍ଚଳ ସମାଧିତେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରେନ । ତାଜମହଲେର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ ଶେଷ, ଯଦିଓ ୧୬୪୮ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳଂକରଣେର କାଜ ଚଲେ ଏବଂ ୧୬୫୩ ସାଲ ନାଗାଦ ମକବରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶେର ନିର୍ମାଣକାଜ ଶେଷ ହବେ । ଦ୍ୱାଦଶ ଉରସ ବା ‘ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଷିକୀ’ ଉପଲକ୍ଷେ—ତାଜେ ଏବାରଇ ପ୍ରଥମବାରେର ମତେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭୋଜନ କରା ହେଁଛେ ।\*

ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ଆକାଶେର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟେ ଭେସେ ଥାକା ଗୁମ୍ଭଜ୍ୟୁକ୍ତ ମକବରାର ଝଞ୍ଜୁ ମାତ୍ରା ପୁଞ୍ଚବୀଥିର ସୁଗଙ୍କେ ମାତୋଯାରା ବାଗିଚାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଯେ ପାଯେ ପାଯେ ଏଗିଯେ ଆସା ଅଭ୍ୟାଗତଦେର ଭେତରେ ନିଶ୍ୟାଇ ଏକଟି ସମ୍ବର୍ମ ଜାଗାନୋ ଅନୁଭୂତିର ଜନ୍ୟ ହେଁଛି । ଶାହଜାହାନେର ଦରବାରେର ଏକ କ୍ଷଟକବି ଯେମନ ଲିଖେଛେ :

ପୃଥିବୀର-ଭାରବହନକାରୀ ବୃଷେର ପୃଷ୍ଠାଦଶ ଥେକେ ଉଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୟ,  
ଏମନ ଶୁରୁଭାର ବହନ କରତେ ଶିରେ ପଦଚିହ୍ନେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଁଛେ ।

ମକବରାଟାର ବିଶାଳ ଆକୃତି ସନ୍ତୋଷ କିନ୍ତୁ ପୁରୋ କାଠମୋଟାକେ ଗାଗନିକ ମନେ ହୟ, ହୟତୋ ଖାନିକଟା ଭୁତୁଡ଼େ, ତାଇ ତୋ କବିର କାହେ ମନେ ହେଁଛେ, ‘ଚୋଥେର ଦୃଷ୍ଟି ତାଜକେ ମେଘ ଭେବେ ଭୁଲ କରତେ ପାରେ ।’ ତିନି ଏକଇ ସାଥେ କବିତାର ପଞ୍ଚକ୍ରିତେ ତାଜେର ଥିରବିଜଲିର ମତୋ ଦୀଣି ମୂର୍ତ୍ତ କରେ ତୁଳେଛେ :

ତାଜେର ଉତ୍ତର ହତେ ଭେସେ ଓଠେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମୀର ବିଚ୍ଛରଣ,  
କ୍ଷଟକ ଭୃତ୍ୟାରେ ଯେନ ମଦିରାର ହଳ ।

\* ମମତାଜେର ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଉରସ ଅବଶ୍ୟାଇ ମୁସଲିମ ଚାନ୍ଦ୍ରବଂସର ଅନୁସାରେ ଉଦୟାପିତ ହେଁଛିଲ ଏବଂ ପଚିମେର ସୌରବଂସର ଅନୁସାରେ ନୟ ।

এর মর্মরে নক্ষত্রপূঁজ্বের ছায়া আপত্তি হতে,  
পুরো স্বপ্ন-সৌধ প্রদীপের আলোকিত উৎসবে হয় মাতোয়ারা

মকবরার দক্ষিণ পার্শ্বের অতিকায় প্রতিহারের নিচে দিয়ে শোকার্ত অভ্যাগতের দল অতিক্রম করে, যেখানে আমানত খানের সাবঙ্গীল চিরালিপি এর পরিকাঠামো জড়িয়ে রেখেছে এবং একটি জালিকরা দরজার ভেতর দিয়ে তারা অট্টভূজাকৃতি কেন্দ্রীয় সমাধিকক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আজ মর্মরের মেঝে সূক্ষ্ম নকশা করা উজ্জ্বল বর্ণের পুরু গালিচা দিয়ে যোড়া এবং দেয়ালে ঝুলত্ব মূল্যবান মুখমল আর রেশমের পর্দা সোনার কালাই করা অলংকৃত বাতির বাড়ের কোমল মৃদু আলোয় জুলজ্জ্বল করছে—উরস অনুষ্ঠানের সময় সমাধিগুলোয় বিদেহী আত্মার ‘ভাস্বর শুণাবলি আর নৈতিকতা’ প্রতীক রাখে বিশেষভাবে আলোকসজ্জিত করা হয়। ‘বেহেশতের বাগিচায় অবস্থানরত মমতাজের আত্মার শাস্তির জন্য’ মুসলিম ধর্মবেষ্টা বা মোল্লাদের সুর করে উচ্চারিত হতে থাকা মোনাজাতের শব্দ ওপরে উঠে গিয়ে, ওপরের গম্ভুজের নিচের বিশাল শূন্যস্থানে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে।

সমাধি কক্ষের সন্দোধ ঘিরে একটি ছবি ফুটের বেশি উঁচু অট্টভূজাকৃতি শ্বেতপাথরের জালিকাজ-করা প্রাচীর, দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতা লাহোরির ভাষ্য অনুসারে, ‘কৃষ্ণীন আর জীৰ্ষণভাবে উজ্জ্বলিত করে তোলা... তুর্কি রীতির অনুসরণে প্রাচীরের দুই প্রান্তে ইয়াশব-মুমিত দুটি প্রবেশদ্বার, গিন্তি করা কজা দ্বারা সংযোজিত হয়েছে।’ জালিকা প্রাচীরকরণীটা, শাহজাহান খাঁটি সোনার তৈরি রত্নখচিত যে বেড়া নির্মাণের নির্দেশ শুরুতে দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে চোর আর দস্যুদের অপকর্মের ভয়ে সেটা সরিয়ে ফেলার আদেশ দেন, সেই স্থানেই প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তিরক্ষরণীটা ভেতরের সাদা মর্মরের ছিমছাম স্মৃতিস্তম্ভ বা সন্দোধ ঘিরে রেখেছে, যা পূর্ববর্তী সোনার ঝালরের কারুকাজের সাথে দৃশ্যমানতা ফুটিয়ে তুলতে একটি মাত্র মর্মরের খণ্ড খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের পুরোটায় মার্বেলের ওপর উজ্জ্বল রত্নখচিত ফুলের নকশা, যার পরিচিত ফুল-লতা-পাতার সংযত খোদাইয়ের নৈপৃণ্য দেখে মনে হবে মার্বেলের ওপরেই তারা আক্ষরিক অর্থে জন্ম নিয়েছে, যাদের ভেতরে রয়েছে প্রাণশক্তি আর নবজীবনের ইঙ্গিত, যা ঠিক গম্ভুজের একেবারে নিচে স্থাপিত। স্মৃতিস্তম্ভের উপরিভাগ আর পার্শ্বদেশে পরিকাঠামোর আঙিকে কোরআন শরিফের আয়াত ছন্দোব্য উসিতে মার্জিতভাবে খোদাই করা হয়েছে আর দক্ষিণ পার্শ্বে কালো মার্বেলে উৎকীর্ণ রয়েছে একটি সমাধিলিপি যেখানে দর্শনার্থীদের উদ্দেশে বলা রয়েছে : ‘আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বল এই সমাধিগঙ্গে শায়িত আছেন আরজুমান্দ বানু বেগম, যিনি মমতাজ মহল নামেই সুপরিচিত, ১০৪০ হিজরিতে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।’

সেই রাতে শোকার্ত ব্যক্তিবর্গ সম্মত আরো দেখেছিল সেই অসম্ভব সুন্দর 'মুক্তার চাঁদর' যা শাহজাহানের এক ইতিহাসবিদের ভাষ্য অনুসারে, 'মমতাজ মহলের সমাধির জন্য তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং চাঁদরটা মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে আর প্রতি শুক্রবার রাতে সমাধির ওপরে বিছিয়ে দেয়া হতো।' সরাসরি নিচে অবস্থিত, সমাধিগর্ডের মার্বেলের বেদিতে, দ্বিতীয় আরেকটা সাদা মার্বেলের শবাধারে মমতাজের নশ্বর দেহ চিরনিদ্রায় শায়িত ছিল। এটাও একই রকম করে অলংকৃত করা হয়েছে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে একই সমাধিলিপি রয়েছে, সেইসাথে এখানে আল্লাহতায়ালার নিরানবহটি নামও উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

শাহজাহান, সেই রাতের প্রধান শোকার্তব্যক্তি, আগ্রা দুর্গ থেকে নৌকায় করে সম্মত তাজে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি যেভাবেই সেখানে পৌছান, তাজে স্থাপিত মকবরায় প্রথমবারের মতো মমতাজের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্যাপন নিশ্চিতভাবেই অনেক কারণে বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ। মধুর সব স্মৃতি জাগরুক হবার পাশাপাশি সেই রাতটা ছিল তার আকাঞ্চ্ছা পরিপূরণের—মমতাজের শেষ বিশ্রামের স্থান হিসেবে একটি নিখুঁত, জন্মস্থানে মকবরা সৃষ্টি, ক্ষেত্রে একটি শুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

এই আকাঞ্চ্ছার বাস্তবায়ন মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। আজ আমাদের কাছে হিসাবপত্রের এমন কোনো নথি মেইঝে যার যথার্থতা সন্দেহাত্মীত। শাহজাহানের দিনপঞ্জির রচয়িতা ঐতিহাসিক শাহেরি তাজের নির্মাণ ব্যয় বলেছেন 'পঞ্চাশ লক্ষ' তক্ষা—৫,০০০,০০০ শাহ জাহানি তক্ষ। অবশ্য এই হিসাবের ভেতরে জমির মূল্য, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদিসহ মূল তাজমহল, মসজিদ আর জবাব নির্মাণে শ্রমিকের প্রত্যক্ষ মজুরি বাবদই এই পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে এমনটা ধরে নেয়া হয়। পরবর্তীকালের বিতর্কিত নথিপত্র থেকে কিছু কিছু ঐতিহাসিক অনুমান করেন অর্থের পরিমাণ ৪০,০০০,০০০ শাহ জাহানি তক্ষার মতো হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আগ্রা প্রদেশের কোষাগার আর রাজকীয় কোষাগার থেকে সম্মিলিতভাবে নির্মাণ ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছিল। শাহজাহান একই সাথে ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি চুক্তিপত্রও তৈরি করেন, যার ভেতরে ত্রিশটি মৌজাও চিহ্নিত করে দেন যেখান থেকে আদায় করা খাজনা, ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে তার প্রিয়তমার স্মৃতি তাজমহল যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ আর প্রহরার কাজে ব্যয় করা হবে। তিনি আস্ত রিকভাবেই চেয়েছিলেন তার এই সৃষ্টি যেন অনন্তকাল বিরাজ করে। এক সভাকবি সুন্দরভাবে যা ব্যক্ত করেছেন :

অনন্তের ইঙ্গিতে যখন ভিত্তি স্থাপিত হয়,  
অনিয়ত সোদিন মর্মভূমির বালুকণায় মুখ শুকিয়েছিল

মমতাজের মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ বারো বছর শাহজাহানের কাছে সবচেয়ে প্রবোধ ছিলেন জাহানারা, মমতাজের চৌক সন্তানের ডেতরে জীবিত বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তান। জাহানারা, মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান মহিষীর ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি, ছোট ভাইবোনদের যত্ন নিত যাদের নিরাপত্তা আর সুরক্ষার জন্য মৃত্যুশয্যায় মমতাজ তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল। সাহিত্য আর ধর্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে স্থাপত্য আর সংগীতকলায় আগ্রহী জাহানারা ছিল ভীষণ বিদ্যুতী একজন মহিলা। তিনি কোরআন শরিফে বিশেষভাবে পারদর্শী হবার সাথে সাথে আরবি আর ফার্সি ভাষায় তার বৃৎপত্তি ছিল এবং তিনি দ্রুমে একজন শুণী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। জাহানারার সাথে তার ঝুপসী জনন্দাত্রী মায়ের চেহারার বাহ্যিকভাবে কোনো মিল আরোপিত করা না হলেও, আনুমানিক ১৬৩৫ সালে তার ভাই দারা শুকোহুর জন্য অক্ষিত চিত্রকলার একটি সংকলনে জাহানারার একটি প্রতিকৃতি আমরা দেখতে পাই। একজন মার্জিত দর্শন তরুণী গোলাপি ফুলে শোভিত একটি গাছের ডালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার আরেক হাতে রয়েছে ফুল-পাতায় শোভিত একটি ডাল। তার পায়ের কাছে ফুটে রয়েছে নার্গিস ঝুরির লিলি।

জাহানারার প্রিয় ভাই ছিল দারা শুকোহ, বয়সে তার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট। জাহানারা ভাইয়ের মতেই সুফিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তারা দুজনই সুফিসাধক মোল্লা শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জাহানারা লিখেছেন, ‘তৈমুরের সব উভরপুরুষের ডেতরে আমরা দুই ভাইবোনই সৌভাগ্যবান, যারা এই দজ্জা লাভ করেছে। আশ্চর্যহাতায়ালার এবং সত্যের সন্ধানে আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ ইতিপূর্বে সাধনা করেননি। আমার আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, মোল্লা শাহের প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়েই চলেছে এবং আমি তাকে আমার পথপ্রদর্শক আর আধ্যাত্মিক শুরু হিসেবে মেনে নিয়েছি...।’ জাহানারা পরম অনুরাগে তাদের এক আত্মীয় সম্পর্কিত বোনের সাথে দারা শুকোহুর সম্বন্ধ করেন, যা মূলত ছিল তাদের আশ্মিজান মমতাজের অভিপ্রায় এবং তার মৃত্যুর কারণেই যা এত দিন স্থগিত রাখা হয়েছিল—আর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ইংরেজ প্যটিক পিটার মানডি বিশ্বায়কর কিছু আতশবাজির প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেছিলেন : ‘বিশালাকৃতি সব হাতি, যাদের পেটে আতশবাজি আর ছুঁচেবাজি ভর্তি, বিশাল দানব যাদের হাতে রয়েছে চক্র, তারপর একসারি কীষ্টভজীব, এরপর প্রাসাদশৃঙ্গ, কৃত্রিম গাছ আর অন্যান্য উন্নতবনকুশল প্রতিকৃতি যার সবই হাউই পূর্ণ...’ মমতাজের মৃত্যুর পরে



জাহানারার একটা কথিত চিত্রকর্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

এই প্রথমবারের মতো শাহজাহান দরবারে নৃত্যগীতের আয়োজন করার অনুমতি দিলেন।

জাহানারার প্রতি শাহজাহানের স্নেহ ‘তার অন্য সন্তানদের প্রতি তিনি যেমন অনুভব করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।’ ১৬৪৪ সালে, মহত্বাজের ঘাদশ মৃত্যুবার্ষিকীর উরসের পরের বছর, তার ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী একদিন বছর বয়সী রাজকন্যা প্রায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এপ্রিলের চার তারিখ রাতের বেলা, জাহানারা ‘যখন ঘুমাবার জন্য তার মহলের দিকে অঞ্চলসর ইচ্ছিলেন তখন অন্দরমুখী পথের মধ্যে মেঝের ওপর রাখা একটি প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা তার বুকের কাচুলির প্রান্তদেশ স্পর্শ করে। প্রাসাদের রমণীদের পরিহিত পোশাকসমূহ যেহেতু সবচেয়ে সূক্ষ্ম কাপড় দিয়ে প্রস্তুত করা হতো আর নানা সুগন্ধি তেলের সাহায্যে সেগুলোকে সুরভিত করে তোলা হতো, তার কাপড়ে সাথে সাথে আগুন ধরে যায় এবং নিমেষের ভেতরে আগুনের লেলিহান শিখা তাকে গ্রাস করে নেয়। তার ব্যঙ্গিগত পরিচারিকাদের চারজন তখন তার সাথেই ছিল, যারা সাথে সাথে আগুন নেতাতে চেষ্টা করে কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সাথে সাথে তাদের পরনের কাপড়েও আগুন ধরে যায়। পুরো ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে যায় যে কেউ কিছু বুঝে পায় আর পানি আনার আগেই গুণের আধার এই রমণীর পিঠ, দুই হাত আর দেহের দুই পাশ আগুনে ভীষণভাবে পুড়ে যায়।’

আগুন সব সময় ভীতিকর। রাজকুমারবারের রমণীদের পরিহিত পোশাকের কাপড় বাস্তবিকই ভীষণ হালকা এবং বাড়াবাঢ়ি ধরনের স্বচ্ছ আর ভীষণ দাহ্য। জ্যায়া-ব্যাপতিস্ট তাভার্নিয়ের দারুণ মূল্যবান বিশেষ একপ্রকার মসলিনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘এই কাপড় রঞ্জনির অনুমতি বিলিকদের ছিল না এবং সুবেদার প্রস্তুতকৃত কাপড়ের পুরো অংশটাই মোগল হারেম এবং প্রধান অমাত্যদের ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করতেন। রাজকন্যা আর প্রধান অমাত্যদের স্ত্রীরা এই কাপড় দিয়েই কটিরেখাবিহীন সরু জামা, যাকে কামিজ বলে এবং গ্রীষ্মকালের উষ্ণ আবহাওয়ার উপযোগী পোশাক প্রস্তুত করতেন এবং সন্ত্রাট আর অভিজাতের দল এই সূক্ষ্ম কাপড়ের পোশাক পরিহিত অবস্থায় মেয়েদের দিকে মুঝ চোখে তাকিয়ে থাকত এবং যা তাদের সাথে নৃত্যগীতে অংশ নিতে পুরুষদের প্রায় বাধ্যই করত।’

নিরাকৃণ মনঃকষ্টের কারণে শাহজাহান ‘ভীষণ ভারাক্রান্ত’ হয়ে পড়েন। পরের দিন তিনি দরবারে উপস্থিত না হয়ে পুরোটা দিন হারেমে অতিবাহিত করেন। তিনি তার কন্যার যজ্ঞাগার আশু নিরাময়ের জন্য মসজিদে বিশেষ মোনাজাতের আদেশ দেন, কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্তি দেন আর গরিবদের মাঝে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ বিতরণ করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যের সেরা হাকিম আর

শল্যচিকিৎসকদের তলব করেন এমনকি ভিনদেশি চিকিৎসকেরাও বাদ যায় না এবং জাহানারার শুধুমাত্র তার নিজের হাতে তুলে নেন, ‘তার ওষুধ আর পথের বিষয় তদারকির পাশাপাশি নিজ হাতে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার আর সেখানে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে দেন।’ তিনি নিজের দায়িত্ব কর্তব্য এতটাই অবহেলা করেন যে, ‘মহামান্য স্ম্রাট আর্ত কন্যার শুধুমাত্র নিরন্তর ব্যস্ত থাকায়, তিনি দরবারে আর ব্যক্তিগত মন্ত্রণাসভায় দেরিতে উপস্থিত হতে শুরু করেন আর দ্রুত তাদের বিদায় করে দেন।’

পরিচারিসদের দুজন যারা জাহানারাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল তারা অগ্নিশঙ্খতের কারণে মৃত্যুবরণ করে। একজন অগ্নিশঙ্খ হবার সাত দিন পর, আর ঘটনার আট দিন পরে অন্যজন। পারস্যের এক চিকিৎসকের চিকিৎসায় রাজকন্যা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেন এবং কিছুদিনের জন্য তার শারীরিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়। কিছুদিন পরই অবশ্য আবারও শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করলে শাহজাহান পুনরায় হতাশায় নিমজ্জিত হন, অবশ্যে রাজদরবারের এক বালকভূত্য ক্ষতস্থানে পটি বাঁধা বিশেষ একটি উপায় উন্নাবন করলে দুই মাস পরে ধীরে ধীরে ‘ক্ষতস্থানগুলো শুকিয়ে যেতে শুরু করে।’ কৃতজ্ঞ শাহজাহান রাজকীয় নাকাট্টি বাজানোর আদেশ দেন এবং সোনার বিপরীতে জাহানারাকে ওজন করতে বলেন—‘এই প্রথাটা এত দিন কেবল ব্যক্তি স্ম্রাটের জন্যই নির্ধারিত ছিল।’ অবশ্য ১৬৪৪ সাল যখন প্রায় শেষের দিকে তখনই কেবল শাহজাহান জাহানারার পূর্ণ রোগমুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট আস্থাবান হয়ে উঠে আউট দিনব্যাপী শোকরানা উৎসব বিশাল করে আয়োজন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আদেশ দেন। উৎসবের সময় তিনি তার আরোগ্য লাভ করতে থাকা কন্যাকে দুই হাত খুলে উপহার দেন, যার ভেতরে রয়েছে ‘বিরল রত্ন আর অলংকার’ থেকে ‘শুক্র পানিতে জাত নিকলনৃষ্ট ১৩০টি মুক্তা’ আর ‘বিশাল একটি হীরকখচিত কিরীট।’ তিনি সেইসাথে সুরাট বন্দরের খাজনা তাকে দান করেন, যার একদা হকদার ছিলেন স্ম্রাজী নূর। সেই সময়ে সুরাট ছিল প্রধান সমুদ্রবন্দর যেখান থেকে ইউরোপীয় বণিকরা তাদের বেশির ভাগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত আর তাই খাজনার পরিমাণও ছিল কল্পনাতীত। নদীর তীরে দর্শনীয় এক আতশবাজির প্রদর্শনীর মাধ্যমে উৎসব সমাপ্ত হয়, ‘বিশ্বিত দর্শনার্থীদের দারুণ আনন্দ দান করে।’ ‘বস্তুত পক্ষে’, শাহজাহানের ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন, ‘মহামান্য স্ম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের মঙ্গলময় তিথিতেও এমন উৎসবের আয়োজন করা হয়নি...।’

জাহানারার প্রতি শাহজাহানের প্রবল, কখনো বা আচ্ছন্ন করা ভালোবাসা এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ভিনদেশির দল, নিক্রিয় দর্শক হিসেবে

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা আর গুজবের প্রতি ব্যগ্রভাবে আগুণ্ঠাই মনোভাব প্রদর্শন করে, এই সম্পর্কের ভেতরে আরো বিশ্রি একটি সম্পর্ক আঁচ করতে চেষ্টা করে : অজাচার। তারা তাদের বক্ষব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে যে, জাহানারা অন্য রাজকন্যাদের মতো বাস না করে আথা দুর্গের বাইরে নিজস্ব প্রাসাদে বাস করেন। তারা সেইসাথে আকবরের প্রবর্তিত প্রথাও লক্ষ্য করে যেখানে রাজকুমারীদের বিয়ে করা থেকে বিরত রাখা হতো। তারা জল্লানা-কল্লনা করতে থাকে, জাহানারা কি আক্ষরিক অর্থেই মহতাজকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত করেন, শাহজাহানের মাঝে নিজের স্বামীকে খুঁজে নিয়েছেন এবং শাহজাহানও তার মৃত স্ত্রাজীর পুনর্জন্মের একটি উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

নেদারল্যান্ডের অধিবাসী জোহানেস ডি লায়েট মহতাজের মৃত্যবরণের বছরের কথা লিখে গেছেন এবং যিনি, নিজে যদিও ভারতে পর্যটক হিসেবে আসেননি, অন্যদের বিবরণী সংঘর্ষ করে দাবি করেছেন যে, ‘তিনি (শাহজাহান) তার অসংখ্য আত্মায়ের রক্তে হাত রঞ্জিত করার পর অগম্যগামীও হয়ে ওঠেন; আর এ কারণে তার প্রিয়তমা স্ত্রী মৃত্যবরণ করলে...তিনি তার মৃতা স্ত্রীর গর্জাত আপন কন্যাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন’<sup>8</sup> পিটার মানডি কয়েক মাস পরেই ধারণাটায় বাতাস দেন : ‘প্রাচীন সৈন্য অনুসারে মোগল রাজকন্যারা (আমি যত দূর জানতে পেরেছি) কখনো বিয়ে করার অনুমতি শাও করে না। এই শাহজাহান, অন্যদের ভেতর থেকে, তিমিনি বেগম (জাহানারা) নামে একজনের সাথে, শোনা যায় স্ট্রেকণ বৃপ্তসী এক মহিলা, তিনি অজাচারে লিঙ্গ হয়েছেন, যার সাথে (আগ্রায় বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে আর ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়) বহুবারই তাকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা গেছে।’

আগ্রা আর সুরাটে অবস্থানরত করণিকের দল ইংল্যান্ডে চিঠি লেখার সময় ব্যগ্রভাবে এসব কাহিনী উথাপিত করায়, গল্পগুলোর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হতে থাকে। ফ্রান্সোয়া বার্নিয়ের, যিনি শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ পর্বে মোগল সাম্রাজ্যে এসে হাজির হন এবং সম্ভবত গুজবের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, যা এত বছরেও কিছুই পরিবর্তিত হয়নি, সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উথাপন করেন। তিনি লিখেন, জাহানারা ছিলেন, ‘দারুণ সুদর্শনা, আবেদনময়ী দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণী, এবং ‘তার আক্রাজানের ভীষণ প্রিয়তমা ছিলেন। গুজব রয়েছে যে, তার অন্তরঙ্গতা এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যা বিশ্বাস করা কষ্টকর, স্ত্রাট শেষ পর্যন্ত মোগ্নাদের ডেকে ব্যাপারটার বিচার করে একটি ফয়সালা করতে বলেছিলেন...মোগ্নাদের ভাষ্য অনুযায়ী নাকি কন্যার সাথে স্ত্রাটের এই সম্পর্ক রাখার অধিকার ন্যায়সংগত, কারণ যে বৃক্ষ তিনি রোপণ করেছেন তার ফল আস্থাদের অধিকারও তার রয়েছে।’

তিনি একই সাথে রাজকুমারী বেগমসাহেবাকে অন্য প্রেমিক গ্রহণের অভিযোগেও অভিযুক্ত করেছেন : ‘আমি আশা করি কেউ যেন ভাববেন না যে অকারণে আমি রোমাঞ্চ বা ঝুঁপকথা রচনা করতে বসেছি’, তিনি নির্মোহ ভঙ্গিতে লিখেছেন। ‘আমি যা লিখছি তা ইতিহাসের অংশ এবং আমার অভিপ্রায় এখানের অধিবাসীদের রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান সংক্ষে বিশ্বাসযোগ্য একটি বর্ণনা উপস্থাপন করা। প্রথমেই বলি ইউরোপের মতো এশিয়ায় প্রেম করা মোটেই সহজ কাজ নয়। ফ্রাঙ্কে প্রেম করা হলো একটি মজার ব্যাপার। ফরাসিরা হেসে, হৈ-হল্লা করে, হাততালি দিয়ে প্রেম উড়িয়ে দিতে পারে এবং হাসির মতোই প্রেম সেখানে ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু পৃথিবীর এই প্রাপ্তে প্রেম প্রয়াসের খুব নজিরই আছে, যেখানে এর পেছন পেছন ভয়ংকর আর শোচনীয় বিপর্যয় হাজির হয়নি।’ তিনি এরপর প্রহসন আর শোকাবহ প্রতিশোধের মাঝে আরোপিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি ইঙ্গিত দেন, জাহানারা, সৌভাগ্যক্রমে সুদর্শন কিন্তু ‘খুব উচ্চবংশজাত কেউ নন’ এক তরঙ্গের সঙ্গে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নিজ কন্যার অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে উদ্বিগ্ন, দীর্ঘাস্থিত স্মার্ট একদিন অতর্কিতে এসে তার কন্যার গোপন কক্ষে এমন ‘এক অপ্রত্যাশিত সময়ে’ ঢুকে পড়লেন যে, জাহানাস্ত্রের প্রেমিক কোনো দিশা না পেয়ে স্নানের জন্য পানি গরম করতে ব্রোবস্ত বড় কড়াইয়ের ভেতরে আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। স্মার্ত কন্যার সাথে ‘সাধারণ বিষয়ে’ অনেকক্ষণ আলাপ করার পর কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি বলেন, ‘বেগমসাহেবার তুক দেখে যেমন্তে যাচ্ছে যে তিনি শরীরের তেমন তোয়াজ করছেন না এবং তার উচিত এখন গোসল করা। তিনি এ কথা বলেই খোজাদের আদেশ দিলেন জলের কড়াইয়ের নিচে আগুন জুলাতে এবং পানি টগবগ করে ফুটতে প্ররূপ করলে কড়াইয়ের ভেতর বেগমসাহেবার প্রেমিকও সিদ্ধ হতে থাকে। স্মার্ট চূপ করে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন যতক্ষণ না খোজারা বলে যে তার ভাগ্যপ্রপৌত্রিত শিকার শেষ হয়ে গেছে।’ বার্নিয়ের আরো লিখেছেন, শাহজাহান তার কন্যার আরেক প্রেমিককে হত্যা করেছিলেন বিষ দেয়া পান হাসিমুর্খে হতভাগ্য যুবকের হাতে তুলে দিয়ে।

বার্নিয়ের গল্প অবশ্য সব ইউরোপীয় বিশ্বাস করেনি। ভেনিসীয় নিকোলাও মানুচি বার্নিয়ের বিষ জার্জ আর সিদ্ধ হয়ে যাওয়া প্রেমিকের গল্প বাতিল করে দিয়েছেন সেগুলোকে ‘অন্ত্যজ শোকদের মাঝে প্রচলিত গল্প বলে।’ তিনি অজাচারের অভিযোগের পেছনের ঘটনার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, জাহানারা তার আকরাজানের প্রদৰ্শ দায়িত্ব ‘ভীষণ ভালোবাসা আর অধ্যাবসায়ের সাথে তামিল করত এই কারণে যে, তিনি যেন তার আর্জি সব সময় মেনে নেন। আর এ কারণেই সাধারণ লোকেরা ইঙ্গিত করেছে, সে তার

আকাজানের সাথে রত্নক্রিয়ায় অভ্যন্ত...।' জাহানারার মহলের ভেতরের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে মানুচি দাবি করেছেন, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে '...সুরাপানে আসক্ত রাজকুমারীর জন্য কাশ্মীর, কাবুল আর পারস্য থেকে সুরা আমদানি করা হতো। কিন্তু তার পান করা সর্বোৎকৃষ্ট সুরা তার নিজ বাড়িতেই চোলাই করা হতো। এটা ছিল গোলাপজল আর সুরা থেকে প্রস্তুত উপাদেয় কোহল, নানা ধরনের মূল্যবান মসলা আর সুগন্ধিযুক্ত ঝৌঝালো মাদকের স্বাদযুক্ত। তার হারেমের লোকজন আমার চিকিৎসার জন্য সুস্থ হয়ে উঠলে তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বহবারই তিনি এই উপাদেয় সুরার কয়েকটা বোতল আমার বাসায় প্রেরণের আদেশ দিয়েছেন... তিনি রাতের বেলা মূলত পান করতেন যখন তার চারপাশে নৃত্য, গীত, অভিনয় আর নানা আনন্দকর মর্কটিক্রীড়া চলছে। পানাহারের মাত্রা মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় পৌছাত যে, তিনি দাঁড়াতে পর্যস্ত পারতেন না এবং তারা তাকে তার শয্যায় বয়ে নিয়ে যেত।' তিনি যেন সন্তান্য প্রশংস্ন আঁচ করতে পেরেই এরপর যোগ করেছেন, 'আমি এ কথা বলছি কারণ অন্তরঙ্গতার খাতিরে এই মহলে আমায় প্রায়ই যেতে হয়েছে এবং আমি তার মহলের খেদমতে নিয়োজিত খোজা আর দায়িত্বশীল ঘরমণীদের গভীর আস্থা অর্জন করেছিলাম।'\*

মোগল সরকারি দস্তাবেজ অজাচার স্তরেণ সম্পর্কে একেবারেই মৌনতা পালন করেছে, জাহানারাকে অত্যন্ত পছন্দের রাজকুমারী হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, এর বেশি আর কিছুই বলা হয়নি। দরবারের লিখিত ইতিহাসের প্রতিটি শব্দ যেহেতু শাহজাহানের পূর্ব অনুমোদনপ্রাপ্ত, এতে তাই অবাক হবার মতো কিছু নেই। কালের গর্ভে এতটা পথ উজানে অতিক্রম করে আসার পরে, আজ আর কোনোভাবেই অজাচারের অভিযোগ প্রমাণ করা কিংবা তাকে খারিজ করার কোনো উপায়ই আর নেই। শাহজাহান আর জাহানারার মধ্যকার অন্তরঙ্গ নিকট সম্পর্ক স্পষ্টতই নানা রসাল মন্তব্যের জন্য দিয়েছে। এটা আপাতত্থায় যে, মারাত্মক শোকের কারণে বিভ্রান্ত একজন স্ম্রাট নিজের কন্যার মাঝে শারীরিক সাত্ত্বন খুঁজে পেয়েছেন, যার সাথে যুবতী মহতাজের দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, তরুণী রাজকন্যা তার পিতার প্রতি ভীষণভাবে নিবেদিতপ্রাণ, সম্ভবত তার সাথে তর্ক করতে ভয় পেত, সম্মতি দিয়েছে।

\* জাহানারা আর তার ছোট বোন রৌশনআরা স্পষ্টতই কোহলের প্রতি পারিবারিক দুর্বলতা উন্নয়নাদিকার সূত্রে লাভ করেছিল এবং রাজকুমারী হবার কারণে নিজ মহলের অভ্যন্তরে সুরা পান করার বিষয়ে তাদের ওপর কোনো বিধি-নিয়েধ ছিল না।

অবশ্য এটাই বোধ হয় আদতে ঘটেছিল যে, শাহজাহান চেতন বা অবচেতন মনে যৌন অনুভূতি পোষণ করলেও, সেগুলো পূর্ণতা লাভ করেনি। পরবর্তী বছরগুলোতে বিদ্রোহী সঙ্গনেরা তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উথাপন করেছিল কিন্তু কখনো তাদের বোনের সাথে অজাওয়ার সম্পর্কের জন্য তাকে অভিযুক্ত করেনি।

অবশ্য জাহানারার প্রতি শাহজাহানের মোহাবিষ্টতা একটি ছকে বিশ্লেষণ করা যায়, যা অপরিহার্যভাবে যৌনতা আশ্রয়ী নয়। শাহজাহান তার সারা জীবনে যত রমণীর সংস্পর্শে এসেছিলেন সবার প্রতিই তিনি গভীর অনুভূতি পোষণ করেছেন। তার আমিজান যখন ইস্তেকাল করেন শোকের ভাবে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং মমতাজের প্রতি তার স্থায়ী আর একচেটিয়া ভালোবাসা যতটা ছিল যৌনতা আশ্রয়ী ঠিক ততটাই তার সাথে আত্মনিবিষ্ট হবার ক্ষমতা আর সাহচর্য-নির্ভর।

তাদের সম্পর্কের বাস্তবতা যাই হোক, শাহজাহানের ওপর জাহানারার প্রভাব ছিল প্রশাগীত। মানুষিচ্ছিলেন অনেকের ভেতরে একজন, যারা এটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ‘জাহানারা তার পিতার কাছে যা চাইতেন, সেটাই পেতেন।’ ১৬৪৪ সালে, প্রায় প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড থেকে তার আরোগ্য লাভের বছর, জাহানারা তার ভাই আওরঙ্গজেবের হয়ে অধ্যুষ্টতা করেন, তিনি দৃঘটনা কবলিত হবার কিছুদিনের ভেতরেই যিষ্ঠি শাহজাহানের সাথে বিরোধে লিঙ্গ হয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেব তখন পর্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় চৌগল নৃপতুবের একটি আর্দ্ধ প্রতিমূর্তি। ১৬৩৫ সালে, শাহজাহান অর্থনকার ঘোলো বছরের আওরঙ্গজেবকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ ছিল আর্চার সমুদ্রশালী রাজা, ঝুঁঝর সিৎ, আঘা থেকে প্রায় একশ মাইল দক্ষিণে একটি নিবিড় অরণ্যাবৃত অঞ্চলে যার রাজত্ব অবস্থিত। শাহজাহানের রাজত্বকালের সূচনা পর্বে রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু ১৬২৯ সালে দাক্ষিণাত্যে শাহজাহান আর মমতাজের পরিচালিত বিশাল যুদ্ধাভিযানের কিছুকাল পূর্বেই তাকে প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছিল। রাজা অবশ্য পরবর্তীকালে স্বাধীনতার অনাকাঙ্ক্ষিত ইঙ্গিত প্রদর্শন করতে থাকলে, শাহজাহান বাধ্য হন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আওরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনী রাজার বাহিনীকে পর্যন্দন্ত করতে, আতঙ্কিত রাজা জগলে আশ্রয় নিলে সেখানে গণ উপজাতির লোকদের হাতে নিহত হন। আওরঙ্গজেব তার পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের পিছু ধাওয়া করেন এবং রমণীরা জওহরবৰ্তের, একত্রে বিষপান করে আত্মহত্যা, কৃত্যানুষ্ঠান পালন করার পূর্বেই তাদের বন্দি করতে সক্ষম হন, দরবারের একজন ঐতিহাসিক এ প্রথার প্রতি বিরাগ প্রদর্শনপূর্বক মন্তব্য করেছেন, ‘হিন্দুস্তানের নৈতিকতা বিবর্জিত রীতির অন্যতম।’

শাহজাহানের আদেশেই কার্যত ঝুঁঘর সিংয়ের পিতার নির্মিত হিন্দু মন্দির—সেই ব্যক্তি যিনি জাহাঙ্গীরের অনুরোধে ব্যতঃপৰ্যন্ত হয়ে আকবরের বকু আর দিনপঞ্জির রচয়িতা আবুল ফজলকে হত্যা করেছিল—ভেঙে ফেলে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। বিষয়টি পিতা আর পিতামহের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা থেকে শাহজাহানের আপাত বিচ্যুতির ইঙ্গিত বহন করে। যৌবনে তার যে প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার স্থলাভিষিক্ত হতে থাকে রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবন্ধ, কঠোর অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি। মহতাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যার প্রথম লক্ষণ প্রতিভাত হয়। ১৬৩২ সালের গোড়ার দিকে, তিনি সদ্য নির্মিত সমস্ত হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলার আদেশ দেন এবং তার আদেশ ‘অবিশ্বাসীদের শক্ত ঘাঁটি’ হিন্দুদের পবিত্র শহর বেনারসে যেন পালিত হয় সে বিষয়ে কোনো কারণ ছাড়াই কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তিনি সেইসাথে নতুন মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। প্রবল শোক আর অবিশ্বাসীদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের কারণেই শাস্তিস্বরূপ মহতাজের মৃত্যু হয়েছে এমন একটি ধারণার বশবত্তী হয়ে সম্ভবত তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ধর্মাঙ্ক গোড়া মোল্লাদের চাপের কারণেই এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। নিজে একজন সুন্নি মুসলমান হওয়া স্থিতেও শাহজাহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ কয়েকজন কঠোরপক্ষি সুন্নি মোল্লাদের বরখাস্ত করেছিলেন এবং সম্ভবত তাদের শ্রমিত করতে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হয়েছিল।

১৬৩২ সালেই, শাহজাহান মোগল সাম্রাজ্যে বসবাসরত স্রিস্টানদের ওপর প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গমাত্র সামরিক আক্রমণের আদেশ দেন। তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল, সুবে বাংলার হগলি নদীর তীরে, বর্তমানে কলকাতা শহর যেখানে অবস্থিত তার উত্তর-পশ্চিমে, বহু বছর পূর্বে পর্তুগিজদের স্থাপিত বাণিজ্য কুঠি। ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো যেমন তিক্তভাবে অভিযোগ করেছেন, শাহজাহান তার পিতা স্বার্য জাহাঙ্গীরের চেয়ে ভিন্নদেশীদের সম্বন্ধে বরাবরই সম্পৰ্ক মনোভাব পোষণ করেছেন। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, পর্তুগিজরা একই সাথে ‘অবিশ্বাসী’ হবার কারণে, নিজেদের শহর ‘কামান, ম্যাচলক বন্দুক আর যুদ্ধের অন্যান্য অনুষঙ্গ’ দ্বারা সুরক্ষিত করায় তাদের পাপের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে এবং আশপাশের গ্রামে হামলা চালিয়ে সেখানে বসবাসরত লোকজনকে জোর করে স্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে আর অন্যদের ক্ষীতিদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

এই বিশেষ ‘খারিজি সম্প্রদায়’কে আক্রমণের পেছনে, যদি এসব কারণ যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান মনে না হয়, তাহলে শাহজাহানের ব্যক্তিগত প্রণোদনাও আক্রমণের পেছনে কাজ করেছে। পিতার বিরুদ্ধে শাহজাহান যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, সেই সময়ে পর্তুগিজরা তাকে সহায়তা প্রদান করতে

অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং বন্ধুতপক্ষে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাজকীয় বাহিনীকে সহায়তা প্রদান করেছিল। শাহজাহানের রাজ্যভিষেকের মুহূর্তে গীতি অনুযায়ী শুভেচ্ছা আর উপটোকন প্রেরণ করতে তারা দৃষ্টিকটুভাবে ব্যর্থ হয়। কিছু নথীপত্রে অবশ্য পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে শাহজাহানের প্রতিহিংসা আর মমতাজের মাঝে একটি সম্ভাব্য যোগসূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, শাহজাহান আর মমতাজ বাংলার ভেতর দিয়ে পলায়ন করার সময় তারা যখন হুগলির নিকটবর্তী এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন পর্তুগিজরা কীভাবে তাদের দুর্দশার সুযোগ নিয়েছিল। নিকোলাও মানুচির ভাষ্য অনুসারে, ‘কতিপয় পর্তুগিজ হার্মাদ সহসা অভিনিষ্ঠমণে প্রবৃত্ত হয় আর (মমতাজ মহলের) সবচেয়ে প্রিয় দুজন পরিচারিকাকে অপহরণ করে। তিনি তখন তাদের অদ্ব ভাষায় সতর্ক করে বলেন, আশ্রয় সন্ধানী একজন পলাতক যুবরাজের সর্বশ্র হরণের প্রয়াসের পরিবর্তে তাকে সাহায্য করাই তাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি সে কারণে তার দুই দাসীকে ফেরত দেয়ার জন্য তাদের কাছে সন্দেশ অনুরোধ করেন। কিন্তু পর্তুগিজরা তার অনুরোধের প্রতি কোনো রকম কর্ণপাত করে না, পরবর্তীকালে যার জন্য তাদের ভীষণ মূল্য দিতে হয়েছে...।’

প্রায়শিকভাবে মূল্য বাস্তবিকই মহার্ঘ ছিল শাহজাহানের আদেশে বাংলার সুবেদার বসতি অবরোধ করে, পর্তুগিজদের নৌপথে যাতে পালাতে না পারে সে জন্য নদীতে সারিবদ্ধভাবে নৌকা ছেঁটায়েন করে আর তারপরে তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থার নিচে বিপুল পরিমাণ স্বিক্ষেপকের বিক্ষেপণ ঘটায়। ঘটনা পরবর্তী নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্কের সুযোগে, ‘ইসলামের যোদ্ধারা’ পর্তুগিজ বসতির সীমানা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করে প্রায় ৪,০০০ লোককে বন্দি করে, বেশির ভাগই নারী আর শিশু, যাদের আঘাতের উদ্দেশে এগারো মাস দীর্ঘ একটি যাত্রায় প্রেরণ করা হয়। ফ্রান্সোয়া বার্নিয়ের তাদের ভাগ্যের বর্ণনা করেছেন : ‘বিবাহিত আর কুমারী নির্বিশেষে, সুন্দরী রমণীরা হারেমের বাসিন্দায় পরিণত হয়; যাদের বয়স বেশি কিংবা অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী তাদের অমাত্যদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়; অল্প বয়সী ছেলেদের খৎনা করে তাদের বালক ভৃত্যে পরিণত করা হয় এবং পরিণত বয়ক্ষ পুরুষদের, প্রলুক্ত করা হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভালো ভালো প্রতিক্রিতি দিয়ে বা কখনো হাতির পায়ের নিচে পিট করার ভীতি প্রদর্শন করে, আনন্দানিকভাবে খ্রিস্টান ধর্ম পরিত্যাগ করতে।’ সেদিন যারা ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করেছিল, লাহোরির ভাষ্য অনুসারে, ‘তাদের পশ্চ মতো খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়’ এবং ‘খ্রিস্টান ধর্মের প্রবক্তাদের মতো দেখতে পবিত্র হিসেবে গণ্য মৃত্যুগুলোকে যমুনার বুকে নিষ্কেপ করা হয় আর কিছু ভেঙে ঝঁড়িয়ে দেয়া হয়।’ শাহজাহান আঘা আর লাহোরে তার পিতার

স্মাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত গির্জাগুলোও ভেঙে ঝঁড়িয়ে দেয়ার আদেশ দেন। আগ্রা গির্জার ক্ষমেই সরু হয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়া গম্বুজে স্থাপিত ঘড়ির সূরে বাঁধা উচ্চেষ্ঠের ঘট্টাধ্বনি শহরের সর্বত্র শোনা যেত। শাহজাহান সম্মত চাননি যে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সমাধিগর্তে অবিশ্বাসীর ঘট্টাধ্বনি প্রবেশ করুক।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শাহজাহানের এই শান্তিমূলক কর্মকাণ্ড অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। শাহজাহানের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে দমন পীড়নের শিকার আগ্রার জেসুইট সম্প্রদায় নিজেদের পুনর্বাসিত করতে সক্ষম হয় এমনকি তারা তৃণলি থেকে বন্দি হওয়া পাদ্রিদের কয়েকজনকে মুক্ত করতেও সক্ষম হয়। শাহজাহানের মৌলবাদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য তরুণ আওরঙ্গজেব কর্তৃক সমর্থিত হয়, পৃথিবী সমক্ষে যার ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি তার পূর্ববর্তী যেকোনো মোগলের চেয়ে অনেক বেশি হতাশাব্যঙ্গক অনাড়ুবর নীতিপ্রায়ণ এবং পরবর্তীকালে যিনি নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গি সতত অনুসরণ করবেন।

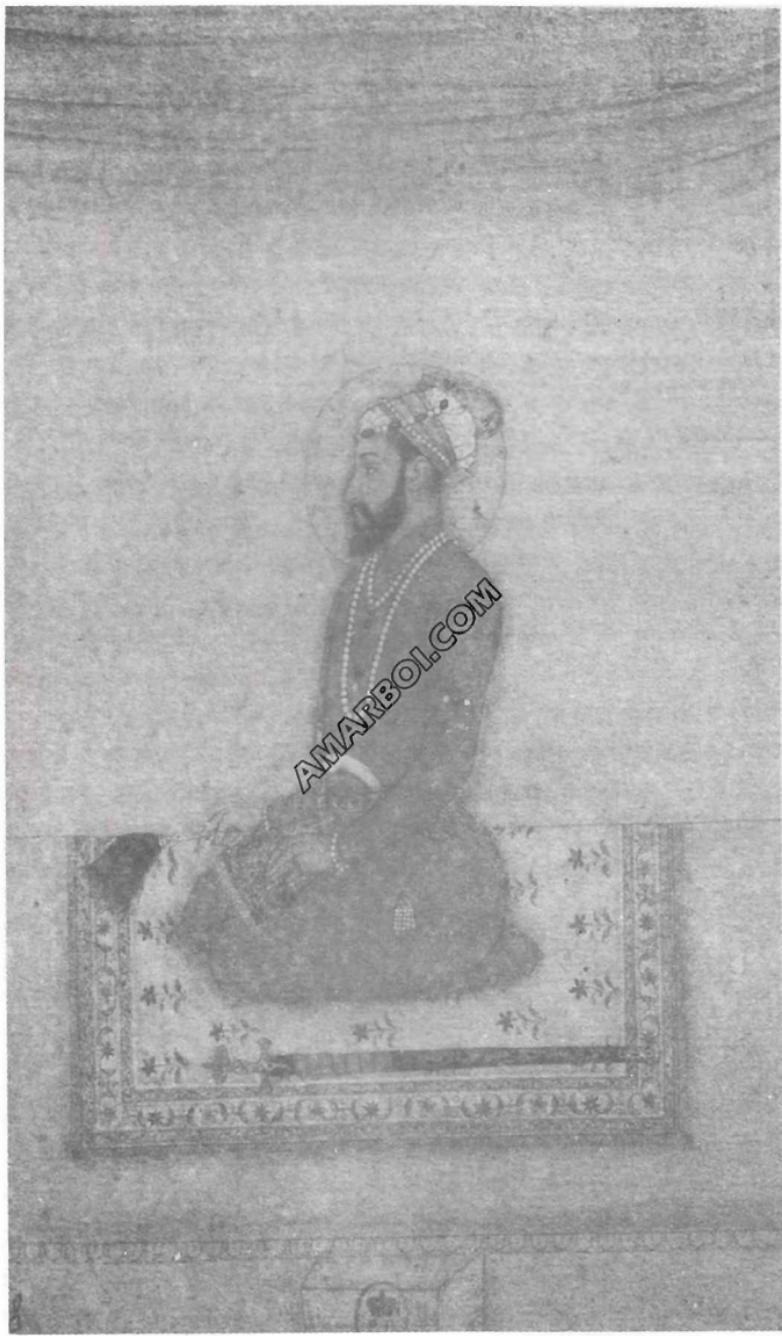
আওরঙ্গজেব তার জীবনের প্রথম দিকে স্মাটের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। অচৰ্যার রাজার বিরুদ্ধে তার সফল অভিযান<sup>১</sup> সমাপ্ত হবার পরের বছর, শাহজাহান তাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদান ছিলবে বহাল করেন, যে পদে সে পরবর্তী আট বছর অধিষ্ঠিত থাকবে। প্রিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তখনো সমস্যা সৃষ্টিকারী এই প্রদেশে আওরঙ্গজেবের উপস্থিতি বিজাপুরের শাসককে মোগলদের সাথে সান্ধিচূক্তি স্বাক্ষরে প্ররোচিত করতে যথাযথভাবেই হমকি প্রদর্শনে সক্ষম হয় এবং গোলকুণ্ডার শাসককে একটি স্মারক আত্মসমর্পণ করতে উৎসাহিত করে। পরবর্তী বছরগুলোতে, শাহজাহান দুই দফায় আওরঙ্গজেবকে পদোন্নতি<sup>২</sup> প্রদান করেন, তার ভাতা এবং পদর্মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

১৬৪৪ সালের মে মাসে, জাহানারার দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে তড়িঘড়ি আঘায় বোনের শয়াপার্শে এসে উপস্থিত হন। অবশ্য এই দফা আগ্রায় অবস্থানকালীন সময়ে কিছু একটি ঘটেছিল, যার ফলে শাহজাহানের সাথে আওরঙ্গজেবের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং যার ফলশ্রুতিতে তিনি তার পদর্মর্যাদা আর সুবেদারের দায়িত্ব দুটোই হারান। ঐতিহাসিক লাহোরির ভাষ্য অনুসারে মুবরাজ ‘অদূরদশী ইয়ারদোস্ত আর তাদের কুপরামশ্রের প্রভাবে’ মোহিবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং ‘পার্থিব বকমারি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত করেন।’ অবশ্য দশ বছর পর জাহানারার কাছে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে লেখা একটি চিঠি থেকে আরো সুনিদিষ্ট ধারণা লাভ করা যায়, যেখানে তিনি লিখেছেন : ‘আমি জানি (প্রতিপক্ষ) আমায় হত্যার ষড়যন্ত্র করছে...।’

ଆଓରଙ୍ଗଜେବେର ମନେ ଆତକ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏହି ଅଜ୍ଞାତନାମା ପ୍ରତିପଦ୍ଧ ଆର କେଉ ନନ୍ତର ତାରିଖ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଫି-ସାଧକ ଦାରା ଶ୍ରକୋହ୍, ଯାର ମାଝେ ମାନୁଷକେ ପ୍ରଭାବିତ କରତେ ପାରାର ଏକଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷମତା ଛିଲ । ଦାରା, ତାର ଆକାଜାନେର ସେହ ଆର ଭାଲୋବାସାର ନିର୍ଭର୍ୟୋଗ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଭୀଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସେବେ, ଶାହଜାହାନେର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ସବଚେଯେ ବେଶି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେଛିଲେନ ଏବଂ ୧୬୩୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶାହଜାହାନ ତାକେ ତାର ମନୋନୀତ ଉତ୍ତରସ୍ତ୍ରି ହିସେବେ ଘୋଷଣା କରେନ, ହିସାର ଫିରୋଜ ଜେଲା ତାକେ ଦାନ କରେନ, ଐତିହ୍ୟଗତଭାବେ ଭାବୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କେ ଯା ପ୍ରଦାନ କରା ହୟ, ଆର ସେଇସାଥେ ସମ୍ରାଟେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଧାରିତ ଟକଟକେ ଲାଲ ରଙ୍ଗେ ତାଁବୁ ଛାପନ୍ତର ଅନୁମତି । ଦାରାର ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତ୍ତେର ଏସବ ଲକ୍ଷଣ ଆଓରଙ୍ଗଜେବକେ କୁଳୁକ କରେ । ଧର୍ମୀୟ ବିଷୟେ ଦାରାର ଉଦାରତାର ପ୍ରତି, ଯାର ମାଝେ ଆକବର ଆର ଜାହାଙ୍ଗୀରେର ଉତ୍ସୁକ୍ୟ ଆର ସହିକୁତା ଫୁଟେ ଉଠେଛେ, ବଡ଼ ହୟ ଓଠାର ସାଥେ ସାଥେ ଆଓରଙ୍ଗଜେବେର ମାଝେ ଏକଟି ବୈରୀ ମନୋଭାବ ଜନ୍ୟ ନେଇ, ଯା ତାର କାହେ ଛିଲ ଉତ୍ପଥଗମିତାର ନାମାନ୍ତର । ଦାରା ଆବାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନ୍ଦି ମୌଳବାଦୀ ହିସେବେ ଆଓରଙ୍ଗଜେବକେ ଅବଜ୍ଞାର ଚୋରେ ଦେଖିତେନ ।

ଏକ ଅମାତ୍ୟେର ଭାଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ଭାଇଯେର ମାଝେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଜାହାନାରା ସଖନ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭେର ପର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଗ୍ ସାନ୍ତ୍ୟ ଫିରେ ପାନ ତଥନ ଆଗ୍ରାଯ ଯମୁନାର ତୀରେ ଦାରାର ନୃତ୍ୟ ହାତେଲି ପରିଦର୍ଶନେର ସମୟ ଆଓରଙ୍ଗଜେବ ତାଦେର ଆକାଜାନେର ସଙ୍ଗୀ ହିସେବେ ଗମନ କରିଲେ ନାଟକୀୟଭାବେ ଜନସମକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶ ପାଯ । ତାରା ସଖନ ହାତେଲି ଘୁରେ ଦେଖିଲୁଣିଲାନ, ଦାରା ତଥନ ଆଓରଙ୍ଗଜେବକେ ଡୁଗର୍ଭତ୍ତ ଏକଟି କଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରତେ ଆମ୍ବଲ୍ ଜାନାନ । କିନ୍ତୁ ଆଓରଙ୍ଗଜେବ ତାର ପ୍ରତ୍ୟାବନ୍ଧ କରେନ ଏହି ଭେବେଶେ, ଦାରା ତାକେ ସେଥାମେ ହତ୍ୟା କରାର ବନ୍ଦୋବନ୍ଦ କରେଛେ । ତିନି ଏମନକି କଷ୍ଟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରାର ଜନ୍ୟ ତାର ଆକାଜାନେର ଆଦେଶପ୍ରାଣ ଅମାନ୍ୟ କରେନ । ଦରଜାର ଚୌକାଠେର ନିଚେ ଏକଣ୍ଡ୍ୟେ ଭଙ୍ଗିତେ ଦାଁଭିଯେ ଥାକେନ ।

ଗଞ୍ଜଟାର ମାଝେ ବଡ଼ ବେଶି ନାଟକୀୟତା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକାଯ ଯଦିଓ ସେଟୋକେ ସତି ବଲେ ମାନତେ କଟେ ହୟ କିନ୍ତୁ ଦୁଜନେର ମାଝେ ଶକ୍ତି ଆର ଅଭିପ୍ରାୟେର ସମାପାତନେର ଇମିତ ସମ୍ଭବତ ସତି । ଆଓରଙ୍ଗଜେବ ନିଶ୍ଚିତଭାବେଇ ଦାରାର ପ୍ରତି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନ୍ଵିତ ଛିଲେନ ଏବଂ ନିଜେକେ ତାଦେର ଆକାଜାନେର ଅବଜ୍ଞାର ପାତ୍ର ମନେ କରତେନ । ନିଜେର ଅନୁଭୂତିଶଳୋ କୋନୋମତେଇ ଆର ନିୟମ୍ବନ କରତେ ନା ପେରେ ତିନି ସମ୍ଭବତ ତାର ଆକାଜାନକେ ଏ ବିଷୟେ ଅଭିଯୋଗ ଜାନାନ କିନ୍ତୁ ହିତେ ବିପରୀତ ହୟ ଶାହଜାହାନେର ସହାନ୍ତ୍ରି ଲାଭେର ପରିବର୍ତ୍ତ ତିନି ତାକେ ଆରୋ କୁଳୁକ କରେ ତୋଲେନ । ଶାହଜାହାନ ଏର ଫଳକ୍ଷତିତେ ଉତ୍ସୁତ ଦୟଦ୍ୱରା ଜେରେ ହୟ ତାକେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ଥେକେ ଅବ୍ୟାହତି ଦେନ ବା କୋନୋ କୋନୋ ଭାଷ୍ୟ ଯେମନ ଇମିତ କରା ହୟେଛେ, ଅହ୍ଙ୍କାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଲାଗାଯ ଆଓରଙ୍ଗଜେବ ନିଜେଇ ନିଜେର ଦାୟିତ୍ୱ ଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମର୍ପଣ କରେନ ।



ନାମାଜରତ ଆସିଲଙ୍ଗେବ ।

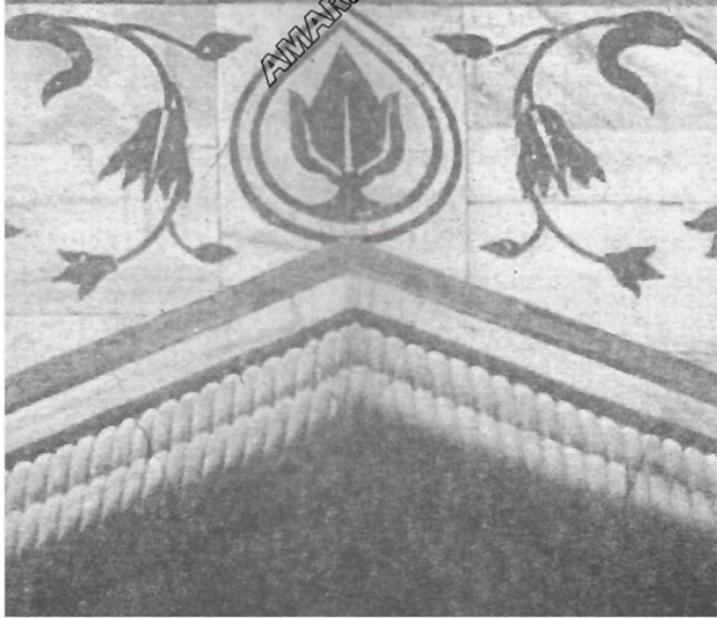
ଦୁନିଆର ପାଠକ ଏକ ହୋ! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

আসল ঘটনা যা-ই হোক না কেন, আওরঙ্গজেব অচিরেই বিরোধের জন্য অনুত্পন্ন হন, কিন্তু শাহজাহানের অনুষ্ঠান পুনরায় লাভ করতে তাকে সাত মাস অপেক্ষা করতে হয়। স্টোও এমনকি, দরবারের এক ঐতিহাসিক যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, কেবল ‘তার বড়বোন বেগমসাহেবোর সন্নির্বক্ষ অনুরোধের কারণেই’ সম্ভব হয়েছিল। জাহানারা অনুরোধ করার জন্য তার আরোগ্য লাভ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সময়টা বেছে নেন এবং শাহজাহান তার অনুরোধ মেনে নিয়ে আওরঙ্গজেবকে তার পূর্ববর্তী মর্যাদায় পুনরাবিভিন্ন করেন এবং কয়েকমাস পরে ১৬৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে ঐশ্বর্যশালী গুজরাটের সুবেদার হিসেবে নিয়োগ করেন। সব কিছু পুনরায় আবার ছন্দ ফিরে পেয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু এই ঘটনাপ্রবাহ রাজপরিবারের মাঝে অতীত অসূয়ার, বিশেষ করে খসরুর সাথে শাহজাহানের নিজের বৈরিতার, চিন্তিবিক্ষেপকারী প্রতিধ্বনি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। শাহজাহান আর খসরু অবশ্য বৈমাত্রেয় ভাই, যেখানে দারা শকেহু আর আওরঙ্গজেব আপন ভাই, তার পরও পরবর্তী দিনগুলোতে এটা একেবারেই শুরুত্বহীন বলে প্রতিপন্ন হয়।

AMARBOI.COM

عَلِيٌّ شَهِيدٌ بِرَبِّهِ وَ  
كُلُّ الْمُعْنَفِينَ لِلَّذِينَ  
كُلُّهُمْ لِغَيْبٍ

AMARBOI.COM



## অর্যোদশ অধ্যায়

### সেই মহিমাময় মসনদ

১৬৪৫ সালের শেষের দিকে লাহোর থেকে শাহজাহানের কাছে, আটবিটি-  
বছরের বৃক্ষা নূরজাহান, শক্রতে পরিণত হওয়া তার একসময়ের মিত্রের মৃত্যু  
সংবাদ এসে পৌছে। শহরের বাজারগুলোতে আরেকটা হত্যাকাণ্ডের জোর  
গুজব ভেসে বেড়ায় কিন্তু দরবারের ঐতিহাসিকরা যেমন লিপিবদ্ধ করে গেছেন  
তাতে মনে হয় সম্ভবত ঘটনাটা তাই হয়েছিল যে, বার্ধক্যজনিত কারণেই তার  
মৃত্যু হয়েছিল। নূরজাহান তার স্বামীর মৃত্যুর পর নিভৃতে বিধবার জীবন যাপন  
করেছেন, যেখানে চক্রন্তের কোনো সুযোগই ছিল না। শাহজাহানের তাই  
তাকে হত্যার আদেশ দেয়ার কোনো কারণ নেই। নূর সম্পর্কে শাহজাহানের  
নীতি ছিল তাকে ব্যক্তিগতভাবে উপেক্ষা করা এবং নিয়মতাত্ত্বিকভাবে তার  
একদা বিদ্যমান পরিব্যাপক প্রভাবের সমস্ত নিশানা অপসারণ, তার নাম  
উৎকীর্ণ করা সকল 'মুদ্রা' বাজার থেকে তুলে নেয়া এবং একদা তার প্রতি  
অনুগত সমস্ত অঘাতকে নিজের দরবার থেকে অপসারণ করা। নূর সম্পর্কে  
যোগল ঐতিহাসিকদের মাঝে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই  
পারে, অবশ্য তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক আনুগত্যের ওপর সেটা নির্ভর  
করে। জাহাঙ্গীরের ওপর তার প্রভাবকে অনেকেই নিন্দা করেছে, কিন্তু তার  
জীবনের অসামান্য অগ্রগতিকে আড়াল করা তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি,  
যা জাহাঙ্গীরের দুর্বলতার পাশাপাশি তার নিজের দক্ষতার প্রতি সমানভাবে  
ঝুঁটী।\*

- 
- দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে মহিলাদের প্রভাবকে প্রায়শই উন্নজ্ঞান করা হয়।  
মহিলাদের ওপর পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক বেশ বিধি-নিষেধ আরোপ করাকে  
অনেক বিশ্লেষক সমাজনীতি হিসেবে বিবেচনা করা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের  
মতো মুসলিম দেশে, পাশাপাশি ভারত আৰ শ্রীলঙ্কা, সব দেশেই মহিলারা

মমতাজের মৃত্যুকে স্মরণীয় করতে আয়োজিত নানা আনুষ্ঠানিকতা থেকে একেবারে আলাদা, নূরের অঙ্গোষ্ঠিমায় দারুণ মিতাচার প্রদর্শন করা হয়। নূর তার স্বামী স্ম্রাট জাহাঙ্গীরের মকবরার নিকটেই নিজের জন্য যে মকবরা তৈরি করেছিলেন সেখানেই মর্মরের শিবাধারে তার নশ্বর দেহ স্থান পায়। ১৬৪১ সালে নূর তার নিজের জন্য মকবরা নির্মাণের কাজ শুরু করেন, তার ভাই এবং একই সাথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানী আসফ খান সে বছরই মৃত্যুবরণ করেন। শাহজাহানের প্রধান উজির আর সেইসাথে শুশ্র হবার কারণে আসফ খানও কৃতপ্রয়ত্নে নূরকে উপেক্ষা করতেন। তার কন্যা মমতাজ মৃত্যুবরণ করা সম্মেতে, জামাতা আর শাশ্বতের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক সব সময় জোরাল ছিল। পর্তুগিজ প্রিস্টান ভিক্ষু সেবাস্তিয়েন ম্যানরিকে দাবি করেন, তিনি একটি ভোজসভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যেখানে আসফ খান যে কক্ষে শাহজাহানকে আপ্যায়ন করেছিলেন সেটা সজ্জিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল ‘সোনা আর রূপার কারুকাজ, করা রেশমের পুরু গালিচা’ এবং ‘নির্মাণে চমৎকার দক্ষতার ছাপযুক্ত, রূপার ঝুড়িসদৃশ পা-ওয়ালা বহনযোগ্য পাত্র আর বিশাল সুগন্ধি-ধারক, কক্ষের চারপাশের পুরোটা বিজ্ঞার জুড়ে ছড়ান রয়েছে, যেখানে মিষ্ট গন্ধযুক্ত ধূপ পুড়েছে...’ একটি সাত মুখবিশিষ্ট ঝুঁটিনা থেকে প্রবল বেগে সুগন্ধি পানি উৎসরিত হচ্ছে এবং ধ্বনিবে সামনে সামনের টেবিল-চাদরে সুন্দরী মেয়েরা সোনালি রঙের পানির পাত্র সামিয়ে রাখছে, স্ম্রাট যাতে প্রাক্ষালন করতে পারেন। ‘হিন্দুস্তানি রীতিতে রেশমের নানা রঙের পাতলুন আর শচ্ছ সৃষ্টি মসলিনের সাদা লম্বা ইতাওয়ালা বুক-খোলা পোশাক পরিহিত, জমকালোভাবে সজ্জিত খোজার দল’, খাবার পরিবেশন করছে। শাহজাহান আহারের সময় আসফ খানের স্ত্রী, মমতাজের আমিজানকে, তার নিজের ‘আমিজান’ হিসেবে সম্রেখন করে এবং তাকে নিজের ডান পাশের বিশেষ সম্মানিত স্থানে আসন গ্রহণের আহ্বান জানান।

তাজমহলের নির্মাণকার্য যদিও অনেকাংশে সমাপ্ত, শাহজাহান নিজেকে অন্যান্য সুনির্মিত, ব্যয়বহুল এবং উচ্চাভিলাষী ইমারত নির্মাণে নিয়মগ্রন্থ করেন। ১৬৪৭ সালে আগ্রার লালকেল্লায় তিনি অপরূপ সুন্দর মোতি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। তিনি অবশ্য তার সবচেয়ে অহংকারী পরিকল্পনা দিল্লির জন্য

প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন— এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, সংখ্যাটা একের বেশি, এখানে দুজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। জর্জ বুশ সিনিয়রের সভান জর্জ ডাব্লিউ বুশের মতোই তারা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক পরিবারের সাথে জন্ম বা বৈবাহিক স্ত্রী সম্পর্কিত।

সংরক্ষিত রাখেন, যমুনার পশ্চিম তীরে—শাহজাহানাবাদ নামে (বর্তমানে যা পুরাতন দিঘি নামে পরিচিত)—একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজধানী নির্মাণ। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিক ইনায়েত খান তার অনুসন্ধান প্রয়াস বর্ণনা করেছেন ‘একটি মনোরম স্থানের জন্য, মৃদু আবহাওয়ার কারণে জায়গাটা আশপাশের থেকে আলাদা যেখানে তিনি ঝুঁজে পাবেন একটি দৃষ্টিনন্দন দুর্গ আর পুরক সৃষ্টিকারী প্রাসাদ... যাদের ভেতর দিয়ে পানির ধারাকে প্রবাহিত করা যাবে এবং যাদের চতুরযুক্ত বারান্দা থেকে নদী দেখা যায়।’ শাহজাহান সেইসাথে তার ক্ষমতার পরিচায়ক হবে এমন একটি শহর প্রস্তুত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন, তার পূর্বপুরুষদের মতোই তার কাছেও হিন্দুস্তানের দাবদাহকে অসহনীয় মনে হয়েছে, আগ্রার উষ্ণ, ঝলসে দেয়া বাতাসের হাত থেকে এবং সম্ভবত ময়তাজের স্মৃতির কাছ থেকেও পালিয়ে যেতে চেয়েছেন।

১৬৩৯ সালে শাহজাহানাবাদের নির্মাণযজ্ঞ শাহজাহান শুরু করেন এবং তাজের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গিয়েছিল, দ্রুত অগ্রগতি হতে থাকে। শ্রমিক, পাথর ছেদনকারী, অলংকরণে সিদ্ধহস্ত ভাস্কর, রাজমিহন্তী আর সূত্রধরের একটি বাহিনী সাতাশটা পর্যবেক্ষণ গুরুজ আর এগাশ্টেটা তোরণঘারযুক্ত উচ্চ বেলে পাথরের নিরাপত্তা প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্বাতীকায় দুর্গপ্রাসাদ, লালকেঠা নির্মাণ করে। এই নতুন দুর্গ-শহর আকারে আঢ়া দুর্গের হিণুণ। প্রশস্ত সড়ক দুর্গের বিভিন্ন অংশগুলোর—যীনাবাজার, ফুফতরখানা, অমাত্যদের বাসস্থান, শাহি পরিবারের সদস্যদের জন্য মহল আর হারেম, যার বিশালাকৃতি কঙগুলোর অলংকরণে সোনা আর মূল্যবান রত্নপাথর ব্যবহৃত হয়েছে—মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে।

ফোয়ারা আর জলের নহর পুরো এলাকায় বিলম্বিত করছে। ফ্রাসোয়া বার্নিয়ের নগর পরিকল্পনা দেখে মুক্ষ হয়েছিলেন : ‘প্রায় প্রতিটি কক্ষেই দরজার কাছে বহমান পানির নিজস্ব জলাধার রয়েছে; দুই পাশে মনোরম বাগিচা, দৃষ্টিনন্দন কুণ্ডগলি, ছায়াময় বিশ্রামস্থল, জলের নহর, ফোয়ারা, গভীর করে তৈরি করা কৃত্রিম গুহা, যা দিনের বেলা সূর্যের আলো থেকে বাঁচতে আশ্রয় দেয়, পূরু গদিযুক্ত ডিভান আর চতুর যেখানে রাতের বেলা শীতলতার স্পর্শ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায়। এই মুক্ষ করা স্থানের প্রাচীরের ভেতর কোনো ধরনের অস্বত্ত্বকর বা পীড়িদায়ক উষ্ণতা অনুভূত হয় না।’ শাহি মহলের পাশ দিয়ে একটি জলের নহর, ‘নহর-ই-বেহেশত’ বয়ে গেছে। মোগলদের সব জলের নহর যেমন হয়ে থাকে সে রকমই, জলের নহরের নতিমাত্রা যতটা সম্ভব চেটোল রাখা হয়েছে—পানি প্রবাহিত করতে যতটুকু প্রয়োজন কিন্তু খালি চোখে দেখে বোঝা জাস্তির। রংমহল, মূল হারেম ভবন, সাদা মর্মরে তৈরি একটি চোখ ধাঁধামো

হাতেলি, যার চার কোণে অবস্থিত ছোট কক্ষগুলোর দেয়ালে ছোট ছোট আরসি চকচক করছে; কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার শাহজাহানের দেয়ান-ই-আম—মর্মরের তৈরি চারপাশ খোলা একটি বিশাল চতুর সোনা আর রূপা দিয়ে কারুকাজ করা ছাদের নিচে নানা রঙিন পাথর দিয়ে ইনলে কাজে ফুল-লতা-পাতা তৈরি করে রত্নখচিত একটি উদ্যান তৈরি করা হয়েছে।

শাহজাহানাবাদের উর্ধ্বধন স্মরণীয় করতে দশ দিনব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নতুন দুর্গের মধ্যবর্তী প্রকাণ বাগিচায় গুজরাটের বিখ্যাত তাতে বোনা মৰ্মলের দৈত্যাকৃতি শামিয়ানা টাঙাতে তিন হাজার শ্রমিক প্রায় একমাস শক্তিশালী কপিকল আর তার হাতল নিয়ে গলদঘর্ম হয়, সোনার জরি দিয়ে কারুকাজ করা শামিয়ানার নিচে অনায়াসে দশ হাজার অতিথিকে আপ্যায়ন করা সম্ভব। ১৬৪৮ সালের ১৮ এপ্রিল, দরবারের জ্যোতিষীদের বিবেচনায় মাত্রালিক হিসেবে বিবেচিত ক্ষণে কাড়া আর নাকাড়ার উদ্বাম ধ্বনিতে চারপাশ মাতিয়ে দিয়ে রাজকীয় বজরা নিয়ে শাহজাহান এসে উপস্থিত হন এবং তার তখন-তাউসে উপবেশন করেন।

সৌভাগ্যবান ইউরোপীয় অভ্যাগতদের ভেতরে যারা এটা নিজের চোখে দেখেছেন তারা সবাই বিকচ-কলাপ ময়রের স্ফুর্তে অধিবেশিত হীরা-মুক্তা-পান্নাখচিত স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসন দেখে ফুঁস হয়েছেন। ফ্রায়ার ম্যানরিকের তখন-তাউসের দীপ্তিময় হীরক ধূও, মনুরাঞ্জিত পান্না আর ‘দিব্যসুন্দর’ নীলার ঝলক দেখে নিচিতভাবেই আত্মহত্যা হয়েছিলেন : ‘তাই, সবচেয়ে নির্খুত যা কিছু যদি আমাদের অনুভূতিভুক্ত সৃষ্টি করে, ঠিক যেভাবে আমাদের ওপর আপত্তিত সূর্যের দীপ্তিময় আলোক রশ্মি আমাদের দৃষ্টিপথকে অঙ্ককারময় করে; যদি আমাদের শ্রবণশক্তি হতবাক আর বধির হয় সুউচ্চ শিলাধু থেকে তীব্র বেগে নিচের দিকে ধাবিত জলধারার মন্ত্র গর্জনে; আমাদের আণেন্দ্রিয় যদি সুগক্ষয় ওশুধি আর প্রাচ্যের মসলার আগে হতবাক হয়ে পড়ে; আমাদের রসনা যদি মধুর মিষ্টেন্দ্রের কারণে দুর্বল হয়; আমাদের স্পর্শের অনুভূতি যদি হিমের কারণে অসাড় আর নষ্ট হয়ে যায়;—এতে বিস্ময়ের কি আছে, যে এই সিংহাসনের মতো এত স্মরণীয় আর চমৎকৃত বস্ত্রের দর্শনে আমার পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বিক্ষিপ্তিত হয়ে পড়েছিল, আমি সিংহাসন তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণের মূল্যবান প্রকৃতি ভালোভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিঃ?’

সন্তুষ্ট শতাব্দীর সম্ভবত সবচেয়ে ধনাত্মক, পরাক্রমশালী যোগল স্বারাটের জন্য সিংহাসনটা নিঃসন্দেহে যথার্থ প্রতীক। তার বার্ষিক আয় ছিল ২২০,০০০,০০০ তক্ষা, তার কোষাগারে স্পন্দিত বিরল সব রত্নরাজি আর মূল্যবান ধাতুর মূল্য কোটির হিসাব ছাড়িয়ে বহু দূর এগিয়ে। সিংহাসনটা যদিও, একই সাথে স্বারাটের ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনুপাদনশীলতার প্রতীক-প্রতিম।

আকবরের সময়ের চেয়ে খাজনার পরিমাণ যদিও তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নতুন ভূখণ্ড স্থানের সাথে যুক্ত করে বা বিদ্যমান মোগল জমিতে কৃষির উন্নত উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি বা বাণিজ্য বিভাগের মাধ্যমে এটা অর্জিত হয়নি। শাহজাহান অধিকস্তুতি তার প্রজাদের নিংড়ে এই সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন, তিনি রাজকীয় খাজনা সংস্থাহকদের ক্রমবর্ধমান ভাবে পীড়াদায়ক হারে খাজনা আদায়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকাল ঝুঁকিপুঁকিরভাবে অতিবাহিত হতে থাকলে খাজনা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তার প্রজাদের অনেকেই নিজেদের সম্পদ রত্ন আর মূল্যবান ধাতুতে ঝুঁকিপুঁকি করতে শুরু করে এবং খাজনা আদায়কারীদের কাছে সেগুলো গোপন করতে থাকে—আর্থিক সক্রিয়তার পরিবর্তে এটা আসলে স্থবিরতার নিয়মনির্দেশকারী। খাজনার পরিমাণ যখন তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক সেই সময়েই, আকবরের রাজত্বকালের তুলনায় রাজকীয় ব্যয় চতুর্গুণ হয়েছে।

শাহজাহান তার আকবাজান জাহাঙ্গীরের ন্যায়, নিজের ওমরাহ আর মনসবদারদের মাঝে খেতাব আর তনখা বা তনখার পরিবর্তে জাগীর বরাদের জন্য আকবরের প্রবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেন, যা নির্ধারিত হতো তাদের অধীনে নির্দিষ্ট সৈন্যসংখ্যা অনুযায়ী। কেবলগত আর শক্তিশালী দেশীয় রাজাদের সন্তুষ্ট রাখতে বিদ্যমান রাজনৈতিক চাপের কারণে তিনি অনেকটা বাধ্য হতেন সব সময় তাদের বেশি ক্ষেত্রে খেতাব আর সেই অনুপাতে তনখা বরাদ্দ করতে। তিনি রাজনৈতিক জঙ্গের কারণে বাস্তবতা উপেক্ষা করতে বাধ্য হতেন যে তার সমর্থকরা তাদের খেতাব অনুযায়ী যতজন সৈন্য ভরণপোষণের অধিকারী তারা সেটা কদাচিত অনুসরণ করে। তারা অধিকাংশ সময়েই মূল সৈন্যসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের ভরণপোষণ করেন। আর রাজকীয় পর্যবেক্ষণের সময় হলে একে অপরের কাছ থেকে ঘোড়া আর সৈন্য ধার করেন। তারা অনেক সময় আবার দুর্নীতিপ্রায়ণ আধিকারিককে উৎকোচ দেয় ব্যাপারটা গোচরীভূত না করতে আর তারাও এর পরিবর্তে সেই একই আধিকারিক যখন নিজেকে সম্পদশালী করতে প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত খাজনার জন্য জুলম করে সেটা নিয়ে যাথা ঘামায় না।

শাহজাহান ভালো করেই জানতেন, আয়ের চেয়ে ব্যয় খুব দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। তিনি চেষ্টা করেন খেতাব আর তনখার এই বর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে। বাস্তবে অবশ্য খুব কঠোর অর্থনীতি অনুসরণ করলে তার সমর্থকদের আবার বিরূপ হবার সম্মুখ সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে তার গৃহীত সীমিত পদক্ষেপগুলো তহবিলের নির্গমন রোধে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অপ্রতিরোধ্য শাহজাহান তার আবেগের বক্ষ দুয়ার খুলে দেন এবং নিজের মহস্তম স্থাপত্য আলেখনকে বাস্তব রূপ দিতে কোষাগারের সম্পদ উজাড় করে

দেন। ১৬৫০ সালে শাহজাহানবাদে তিনি জাম-ই-মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন, স্থানের বৃহত্তম মসজিদ, যা পরবর্তী ছয় বছরে মোকাম কুর্সি থেকে বেলে পাথর আর মর্মরের তিনটি গমুজ আর দুটি গগনস্পর্শী মিনার নিয়ে পূর্ণতা লাভ করে শহরের দৃশ্যপটে জাঁকিয়ে বসে। এ মসজিদই তার বড় মাপের শেষ নির্মাণকার্য হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি পাবে।

মহানবী (সা.) একবার স্থাপত্যকলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এটা সবচেয়ে অলাভজনক একটি বিষয়, যা মুমিনের সম্পদ গ্রাস করে।’ শাহজাহানের রাজত্বকালে তার নির্মিত সমস্ত ইমারতের নির্মাণ ব্যয় নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব কারণ দিনপঞ্জিতে বর্ণিত হিসেবে প্রায়ই উপাদান, উপকরণের মতো অনেক কিছুর খরচই উল্লেখিত হয় না, যেমনটা হয়েছে তাজমহলের ক্ষেত্রে লাহোরি কর্তৃক ৫,০০০,০০০ তল্পা উন্নত করার সময়ে। অবশ্য সতর্ক আর পরিমিত গণনা ইঙ্গিত করে যে, মোগল কোষাগার থেকে প্রদত্ত বার্ষিক খরচের (আরেকটা সংখ্যা, যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুরহ) ভেতর গড়ে ১০ থেকে ২০ শতাংশ অর্থ ইমারত নির্মাণে ব্যয় করা হতো। মোগল দরবারের রাজকীয় ভাবমূর্তি বৃক্ষি করা এবং যোগাযোগ আর সরবরাহ পথ বা সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত বা স্থুল নির্মাণের চেয়ে ভাবমূর্তির খাতিরে সৌন্দর্যবর্ধন ছিল এসব খরচের উদ্দেশ্য। ইমারত নির্মাণের এই প্রকল্পগুলো তাই কোষাগারের সম্পদ আরাত্তুকভাবে হ্রাস করার পাশাপাশি স্থান্ত্রিক পরিচালনা, এর সমৃদ্ধি সংরক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ মতাবেদন ও বহিরাগত শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একে সাক্ষাত্কাশালী করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে স্থাট আর তার আধিকারিকদের চিন্তিক্ষেপ ঘটায়। এই ব্যবহৃত চিন্তিক্ষেপের পরিণতি প্রবর্তী কয়েক বছরের ভেতরেই স্থাট নিজে ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার অনুধাবন করেন এবং তার স্থানে প্রবর্তী কয়েক দশক এর জের টানতে হয়।



শাহজাহান প্রায় দুই দশকের সঙ্গী মমতাজকে হারিয়ে নিজেও সব কিছু ভুলে থাকতে গিয়ে সংরক্ষ, পাশব সঙ্গমের মাঝে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বৃথাই চেষ্টা করে তার মানসিক ক্ষতির জন্য শারীরিক ক্ষতিপূরণের সন্ধান করেন। তার মাত্রাতিরিক্ত যৌন উন্মেষক ব্যবহারের কারণে ডয়ংকর যন্ত্রণার—তার দরবারের ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুসারে, তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ এ যন্ত্রণায় কষ্ট পান—সৃষ্টি হয়। তিনি যদিও প্রবর্তী সময়ে আর দার পরিশ্রেষ্ঠ করেননি, তার অসংখ্য যৌন সঙ্গীর বিষয়টি ইউরোপীয় অতিথিরা ভীষণ তৎপরতায় প্রকাশ করেছে। অধিকাংশ ভাষ্যই হয়তো অতিরিক্ত এবং সুড়সুড়ি দেয়ার

জন্য প্রস্তুত হলেও, সেগুলো প্রকাশিত হবার মাত্রা আর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, খানিকটা হলেও সত্যের উপাদান রয়েছে। তারা সমানভাবে এটোও বলেন যে, জাহানারার সাথে শাহজাহানের যৌন আবিষ্টার গুজবটা সম্ভবত সত্য নয়। জাহানারা যদি শারীরিকভাবে মমতাজের প্রতিভূতে পরিণত হতেন, তিনি তাহলে নিচয়ই এতটা বাছবিচারহীন হতেন না।

তেনিস থেকে আগত পর্যটক মানুচি মীনা বাজারের মাধ্যমে শাহজাহানকে প্রদন সুযোগ বর্ণনা করেছেন, বলা হয় এখানেই কিশোরী মমতাজকে তিনি প্রথমবারের মতো দেখেছিলেন : ‘সেই আট দিন, তাতার রমণীদের দ্বারা বাহিত একটি ছোট সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায়, স্বাট প্রতিদিন দুইবার প্রতিটি দোকান পরিদর্শন করতেন, তাকে ধিরে থাকত হারেমের বেশ কয়েকজন বয়স্কা মহিলা, যারা তাদের কলাই করা সোনার লাঠি হাতে নিয়ে হাঁটত, আর উপস্থিত থাকত ঘোজার দল, সবাই পরবর্তী কেনাবেচার দালাল; সেখানে আরো উপস্থিত থাকত একদল মহিলা সংগীতবিশারদ। শাহজাহান মেলার ভেতর নিবিট মনে হেঁটে বেড়াতেন এবং তার মনোযোগ আকৃষ্ট করে এমন কোনো বিক্রেতাকে দেখতে পেলে, তিনি সোজা সেই দোকানের দিকে এগিয়ে যেতেন এবং সৌজন্যমূলক আলাপচারিতা সঙ্ক করতেন, তার দোকানের পসরার ভেতর থেকে কিছু জিনিস বাছাই করতেন এবং আদেশ দিতেন দোকানের মালকিন তার পসরার জন্মস্থ দাম চায় তাই যেন তাকে দেয়া হয়। স্বাট তারপর পূর্বনির্ধারিত একটি ইশারা কুরতেন এবং পুনরায় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে, হারেমের বয়স্কা মহিলারা, এসব বিষয়ে তারা দারূণ দক্ষ, দোকানি মেয়েটাকে হারেমে আনার ব্যবস্থা করতেন এবং যথসময়ে তাকে স্বাটের সামনে হাজির করা হতো। তাদের অনেকেই ভীষণ ধনী আর তৃণ অবস্থায় প্রাসাদ ত্যাগ করলেও, অনেকেই উপপত্তির মর্যাদায় সেখানেই বাস করতে থাকত।’

মানুচি একই সাথে অবশ্য শাহজাহানের কতিপয় অমাত্যের স্তৰীর সাথে তার ফষ্টিনষ্টির একটি কর্কশ কিন্তু স্থূলভাবে স্পষ্টভাষ্য একটি রূপকল্প তৈরি করেছেন। এই মহিলারা যখন সড়ক দিয়ে অগ্রসর হতো, লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের বলত, ‘ওহে শাহজাহানের প্রাতঃগ্রাশ! আমাদের কথা মনে আছে! ওহে শাহজাহানের দুপুরের ভোজ! আমাদের উদ্ধার করবে না!’\* মানুচি আরো দাবি

\* রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া লভনে এর মাত্র কয়েক বছর পরেই এখানেও দৃশ্যপট নিয়ে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে দ্বিতীয় চার্লসের অনেক রক্ষিতাই জনগণের কাছে ভীষণভাবে পরিচিত ছিল। নেল গাইনকে, অভিনেত্রী আর প্রাক্তন কমলা-বিক্রেতা, বহুকারী চারদিক বক্ষ ঘোড়ার গাড়ি উচ্চভূমি একদল লোকের

করেন, ‘শাহজাহান তার যৌন-কামনার পরম সন্তুষ্টির জন্য বিশ কিউবিট (এক কিউবিট আঠারো খেকে বাইশ ইঞ্জি সময়ানের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ) লম্বা আর আট কিউবিট চওড়া একটি বিশাল কামরা নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন, যার ভেতরটা বিশাল সব আয়না দিয়ে সজ্জিত করা। মূল্যবান রত্নপাথর আর কলাইয়ের কাজ ছাড়া, দেড় কোটি তফা মূল্যের সোনা ব্যবহৃত হয়েছিল, যার কোনো হিসাবই রাখা হয়নি। আলোচিত কামরাটার ছাদে, দুটো আয়নার মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে মুক্তাখচিত সোনার পাত বসানো ছিল। আয়নাগুলোর প্রতিটি কোণে মুক্তার বড় বড় গোছা ঝোলানো ছিল এবং দেয়ালে লাল, হলুদ বা বাদামি রঙের ইয়াশ্ৰ পাথর ছিল। তিনি তার প্রিয় রমণীর সাথে নিজেকে হয়তো অশীলভাবে দেখতে চেয়েছিলেন তাই হয়তো এত খরচ করা হয়েছিল। সব কিছু দেখে মনে হবে যে, শাহজাহানের কাছে কেবল তাকে আনন্দ দিতে পারবে এমন রমণীর সন্ধান করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’

বার্নিয়ের লিখেছেন কীভাবে শাহজাহানের নাচওয়ালি দলের মেয়েরা ‘তাদের ভাড়ামি আর বাতুলতা দিয়ে’ তার মনোযোগ ডিন্মুখী করত, যা, তিনি খুঁতখুঁত করে বলেছেন, ‘শালিনতার সকল সীমা লজ্জান করেছে।’ শাহজাহান অনেক সময়ই এসব নীচু-বংশজাত মেয়েদের কাউকে দেখে এতটাই মুক্ষ হতেন যে, তিনি হারেমের ভেতর মেয়েটাকে নিয়ে আসার আদেশ দিতেন, নিজের আবেগকে যুক্তিসংগত প্রতিপন্থ করতে অজুহাত হিসেবে বলতেন, ‘কোনো দোকান থেকে একটি ভালো দ্রব্য নিয়ে এসো।’

মমতাজের গর্তে তার যে সন্তুষ্টিরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তার ওরসে আর কারো গর্তে কোনো সন্তান জন্ম নেয় না এবং ইউরোপীয়রা অনুমান করে, হারেমের অভ্যন্তরে সম্ভবত গর্ভপাতের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। মহিমাস্থিত যৌন অনুরক্ততার মাঝে বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের সংগত, যা মমতাজ আর তার মাঝে বিদ্যমান ছিল তার সমকক্ষ হতে পারে এমন কোনো পরিপূর্ক সম্পর্ক শাহজাহান নিশ্চিতভাবেই আর খুঁজে পাননি। প্রেমহীন যৌন সম্পর্কের প্রতি তার নিরন্তর পশ্চাদ্ধাবন এবং তার দরবারের অমাত্যদের স্ত্রী আর কন্যাদের প্রতি তার নীতিবিগ্রহিত আচরণ সম্ভবত এটাই প্রমাণ করার তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যে, মমতাজ মহল একজন অনন্য রমণী ছিলেন এবং যিনি অনন্য ভালোবাসা লাভের যোগ্য।

---

ঘারা অবরুদ্ধ হয়েছিল, যারা ভুলবশত তাকে চার্লসের ঘূণিত ফরাসি রাঙ্কিতা, মুসি ডি কেরোআলে বলে মনে করেছিল। নেল গাইন তার গাঢ়ি থামান এবং নিজের মুখ দেখিয়ে, চিংকার করে বলেন, ‘অনুহাহ করে অন্তর্ভুক্ত বজায় রাখেন। আমি মোটেই সেই ফরাসি নই বৱেং ইংল্যান্ডেই বেশ্যা!’ জনতা করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে যেতে দেয়।

শাহজাহান তার ইমারত নির্মাণের পরিকল্পনাসমূহ, তার কামনাদক্ষ শরীরকাও আর দরবারিক জীবনের প্রতিদিনকার জটিল কৃত্যানুষ্ঠান নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, সামরিক অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব তিনি বেশি মাত্রায় ক্রমেই নিজের চার ছেলের ওপর ন্যস্ত করতে শুরু করেন। তিনি শুরুর দিকের বছরগুলোতে সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থান করতে পছন্দ করতেন, নিজে যদিও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে আর অবর্তীর্ণ হতেন না। কিন্তু এখন তিনি দূর থেকে আদেশ জারি করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ১৬৪৮ সাল নাগাদ তিনি যখন শাজাহানাবাদে বাস করতে আরম্ভ করেন, তার চার ছেলেই তখন প্রাণবয়স্ক : দারা উকোহুর বয়স তখন তেমনি বছর; শাহ সুজার একত্রিশ; আওরঙ্গজেবের উনত্রিশ এবং মুরাদ বকশের তেইশ। উদারমনের, সৌন্দর্যতাস্তুক আর সংক্ষারমুক্ত দারা যতটা না যোদ্ধা তার চেয়ে বেশি বিদ্যুজন, নিজের কতিপয় মোগল পূর্বপুরুষদের, বিশেষ করে আকবরের আচরিত ধর্ম সমক্ষে যার বৌদ্ধিক উৎসুক্য ছিল। তিনি নিজের লেখায় হিন্দু মতবাদের অনুষঙ্গগুলো সুফিবাদের, ইসলামের মরমি ধারা জাহানারার মতো তিনি নিজেও যার একান্ত অনুসারী, সাথে স্থূলনা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি আবার হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রকাশ উপনিষদ ফার্স্টে অনুবাদ করেছেন এবং একটি হিন্দু মন্দিরে পাথুরের বেড়া নির্মাণ করার জন্য নিজের আকবাজানকে রাজি করিয়েছেন। দারা কবিতা রচনায় ছিলেন দারুণ দক্ষ আর একজন প্রতিভাবান চারুলিপিকর। তিনি অবশ্য একই সাথে ছিলেন ভীষণ আত্মদৰ্শী। বার্নিয়ের মনে করেন, অন্ত আর সংক্ষারমুক্ত হলেও, ‘দারা নিজের সমক্ষে অনেক বেশি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন; আর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন নিজের মনের আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে তার পক্ষে সব কিছু অর্জন করা সম্ভব।’

বার্নিয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, শাহ সুজার চরিত্রে সাথে দারার অনেক দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন। দারা যখন সবার পরামর্শকে তুচ্ছতাছিল্য করতেন এবং শুরুত্পূর্ণ অভিজ্ঞাতদের সাথে সম্পর্ক বিকাশের কোনো তোয়াক্ষা করতেন না, দরবারের রাজনীতিকে নিজের চেয়ে অনেক নীচ মনে করতেন, শাহ সুজা সেখানে ছিলেন দক্ষ ষড়যন্ত্রকারী। তিনি জানতেন কীভাবে দরকারি বস্তুবান্ধব সংগ্রহ করতে হয়। তিনি আবার একই সাথে ছিলেন ‘নিজের ভোগসুখের ঝীতদাস; এবং নিজের পছন্দের স্তীলোকদের ঘৰা একবার পরিবেষ্টিত হলে, যাদের সংখ্যাও নেহাত অল্প নয়, তিনি সারাটা দিন নাচগান-পান-হল্লার মাঝে অতিবাহিত করতে পারতেন।’

আওরঙ্গজেবের মাঝে তার বড় দুই ভাইয়ের মতো অন্ধ, বিনয়ী সভ্যাচারের অভাব ছিল। সমসাময়িক কালের নথিপত্রে বর্ণিত যোগ্য, একাথাটিস্ট, কিন্তু কখনো কখনো বিষদবায়ুগ্রন্থ মানুষ। যিনি বার্নিয়ের ধারণা অনুসারে, ‘চাপা স্বভাবের, চতুর, কুশাগ্রবৃক্ষি আর নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপন করার বিদ্যায় একজন প্রথম শ্রেণীর সন্তান।’ ফরাসি চিকিৎসক আর পর্যটক তার বিরুদ্ধে ‘গোপনে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করার সময় পার্থিব মহিমার প্রতি বিরাগ’ প্রদর্শনের অভিযোগ করেছেন। আওরঙ্গজেব নিশ্চিতভাবে ধূর্ত আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও, একই সাথে ছিলেন সশক্ত আর ভ্রমগ্রন্থ—এ কারণে তাকে হত্যা করার ঘড়্যন্ত করার অভিযোগে দারাকে তিনি যখন অভিযুক্ত করেন তখন দারার সাথে তার সেই অসাধারণ ঝগড়া। দারার মতো তিনিও ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু ভাইয়ের উদার, অনুসন্ধিৎসু, সবাইকে আপন করে নেয়া মরমিবাদের পরিবর্তে, যা তিনি সর্বান্তকরণে ঘৃণা করতেন, আওরঙ্গজেব ছিলেন অনাড়ম্বর, গৌড়া সুন্নি ইসলাম ধর্মের প্রচণ্ড সমর্থক। শুজরাটের সুবেদার থাকাকালীন তিনি একটি জৈন মন্দিরের সম্পত্তি জবরদস্থল করার পাঁয়তারা করেছিলেন, যতক্ষণ না দারা তাকে বাধা দেন।

ভাইদের ভেতরে, শাহজাহানের সাথে আওরঙ্গজেবের সম্পর্কই সবচেয়ে জটিল ছিল, যাকে তিনি সব সময় গ্রীত করার চেষ্টা করলেও তার কপালে প্রায়ই রুক্ত প্রত্যাখ্যান জুটত। জাহানারার কাছে তার চিঠিগুলোয় প্রকাশ পায় যে, তার আকৰাজান তাকে ‘আহ্বা আর ভূরসার অযোগ্য’ মনে করেন। ‘হায়! হায়! আমার রাশিচক্র কত দুর্ভাগ্য! আর অসুবী এবং অমার্জিত’, তিনি বিলাপ করেছেন। ভেনিসের পর্যটক মানুচি সঠিকভাবেই আওরঙ্গজেবের বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ গির্দেশ করেন যখন তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে যুবরাজ জানেন তার আকৰাজান ‘ভালোবাসেন না।’ যোগল পিতা আর পুত্রের মাঝে সম্পর্কের পূর্ববর্তী টানাপড়েন আওরঙ্গজেবের অবস্থানের মাঝে প্রতিভাত হয়েছে। জাহঙ্গীর তার আকৰাজান আকবর দ্বারা অসমাদৃত আর উপেক্ষিত বলে অনুভব করতেন, যখন শাহজাহান আবার জাহঙ্গীরের মাঝে অবিশ্বাস আর অসন্তোষের জন্য দিয়েছেন।

মুরাদ বকশ, শাহজাহান আর মমতাজের সর্বকনিষ্ঠ জীবিত সন্তান, ছিল আকর্ষণীয়, হঠকারী ও দাস্তিক একজন ব্যসনবিলাসী, যার ‘একমাত্র চিন্তা’ আবারও বার্নিয়ের ভাষ্য অনুসারে, ‘সে কীভাবে নিজেকে আরো আমোদপ্রমোদে মশগুল রাখতে পারে।’ সে শিকার করতে পছন্দ করত, রাজনৈতিক চক্রান্তকে অবজ্ঞার চোখে দেখত এবং দাবি করত, ‘সে কেবল তার তরবারি আর তার হাতের শক্তির ওপর আস্থাশীল।’ ১৬৪৬ সালে শাহজাহান এই মুরাদ বকশের ওপরই অবশ্য নির্ভর করতে চেয়েছিলেন।

শাহজাহান মনে মনে তার পূর্বপুরুষদের মতো, ময়ুরকষ্টী-নীল-গম্ভুজের শহর সমরকন্দ—‘তার মহান পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী আর বাসস্থান’ পুনরায় উজবেকদের কাছ থেকে দখলের আকাঙ্ক্ষা বহন করতেন। উজবেকদের ডেতরে মারাত্মক অস্তর্কলহ তাকে সেই সুযোগ প্রদান করে এবং তিনি ৫০,০০০ অশ্বারোহী আর ১০,০০০ তরবি, হাউই-নিক্ষেপক আর তোপচির বিশাল একটি বাহিনীর নেতৃত্ব মুরাদের ওপর দিয়ে তাকে প্রেরণ করেন তার বহুদিনের পুরাতন একটি স্বপ্ন সফল করতে। এমন একটি বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে স্থানীয় সব শাসক পালিয়ে গেলে, অঙ্গুস নদী পর্যন্ত পথ উন্মুক্ত হয়। মুরাদ প্রাচীন শহর বালখ দখল করে কিন্তু তারপর সে সেখানেই আটকে থাকে, যদিও সেখান থেকে মাত্র ১৭০ মাইল উত্তরে সমরকন্দের অবস্থান।

ধৈর্যচূড়তি ঘটা শাহজাহান তার ছেলেকে সামনের দিকে অগ্রসর হবার জন্য অনুরোধ করেন, তাকে সমরকন্দের সুবেদার নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু আমোদপ্রিয় মুরাদ তার পূর্বপুরুষদের ঝুনো, অনুর্বর এলাকার প্রতি তার আকরাজানের মতো কোনো ধরনের আবেগপ্রবণ নৈকট্য অনুভব করে না এবং অগ্রসর হতে অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করে, বরং অনাহৃতের ন্যায় লাহোরে ফিরে আসে। ত্রুটি শাহজাহান তার খেতাব কেজুনেন এবং রাজদরবারে তার উপস্থিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন মধ্য এশিয়ায় অভিযানের বিষয়ে মুরাদের মনোভাব অবশ্য যোগল বাহিনীর অনেকের মাঝেই বিদ্যমান ছিল—রাজপুতদের একটি বাহিনী নদ পর্যন্ত ফিরে এলে, তাদের ফিরতি পথে পুনরায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে। লাহোর যেমন লিখেছেন, পুরো অঞ্চলটাই কেমন যেন অতিমাত্রায় বৈরী : ‘বিদেশের প্রতি স্বাভাবিক টান, ফিরে যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং হিন্দুস্তানের রীতি, লোকজন অপছন্দ করায়...এবং আবহাওয়ার তীব্রতা’ তাদের সংকল্পকে দুর্বল করে তোলে।

আওরঙ্গজেবের মাঝে সংকল্পের কোনো ঘাটতি ছিল না। শাহজাহান তাকে গুজরাট থেকে ডেকে পাঠান এবং তাকে অভিযানের নেতৃত্ব দেন কিন্তু তার পক্ষেও আশানুরূপ ফলাফল আনয়ন করা সম্ভব হয় না। উজবেক আর তুর্কমানদের কাছে নাজেহাল আর নাকাল হয়ে, তিনি কার্যকর কোনো অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হন, যদিও তিনি নিজের সাহসিকতা আর ধার্মিকতার কারণে নিজ বাহিনীর সৈন্যদের বিশ্বাসিত্ব শৃঙ্খা অর্জন করেন, যখন যুদ্ধের তীব্রতার মাঝে, আসরের নামাজের ওয়াক্তে তিনি কোনোদিকে ঝক্ষেপ না করে জায়নামাজ বিছিয়ে অধোমুখে নিজেকে নামাজে সমর্পিত করেন। ১৬৪৭ সালের গ্রীষ্মকালের শেষদিকে শীতের তুষারপাতে তার ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ হবার আগেই তিনি কাবুলের দিকে ফিরে আসতে থাকেন কিন্তু তার পরও পাহাড়ের শীতল আবহাওয়ায় তার হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। এই

ব্যর্থ অভিযানে ব্যয় হয়েছিল ২০,০০০,০০০ তক্ষা এবং মোগল সাম্রাজ্যে এক ইঞ্চি নতুন এলাকাও যুক্ত হয়নি। এটাই ছিল শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম মারাঞ্চক সামরিক বিপর্যয়, একই সাথে সন্মাটের ইমারত নির্মাণের ব্যয়ভারের কারণে ইতিমধ্যে চাপের ভেতরে পড়া কোষাগারের জন্য একটি অপ্রীতিকর বার্তা।

অন্যান্য আরো মারাঞ্চক আর ব্যয়বহুল ব্যর্থতা পেছন পেছন এসে হাজির হয়ে, শাহজাহানের সম্পদ আরো সংকুচিত করে ফেলে। শাহজাহান এক দশক পূর্বে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কান্দাহার পারস্যের কাছ থেকে পুনর্দখল করেছিলেন। পারস্যের শাহ অবশ্য কান্দাহার পুনর্দখল করতে মোগলদের সমরকূপ অভিযানের বিপর্যয়ের সুযোগ নেন। ১৬৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, মাত্র সাতাম্ব দিনের অবরোধের পরই, কান্দাহারে মোতায়েন করা ৭০০০ মোগল সৈন্যের শক্তিশালী রক্ষীসেনা দল, দিনপঞ্চির রচয়িতারা যেমনভাবে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন, ‘মনোবলের অভাবের কারণে’ নিজেদের জান বকশের বিনিময়ে পারস্যের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

তার কান্দাহার শহরর কাছে দল এত সহজে আত্মসমর্পণ করবে সে সম্বন্ধে অনবহিত, শাহজাহান সেখানে পারস্য বাহিনীর সঙ্গমলার সংবাদ জানতে পেরে ইতিমধ্যে কান্দাহারের নিরাপত্তা বিধানে ৫০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীর প্রধান করে আওরঙ্গজেবকে প্রেরণ করেন। তৈরি শীতের কারণে আওরঙ্গজেবের দ্রুত পাহাড় অতিক্রম করা বাধ্যতামূলক হওয়ায়, তিনি মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে কান্দাহার পৌছাতে পারেন না, বিজয়নন্দে উৎফুল্ল পারস্য বাহিনী তিনি মাস পূর্বেই শহর দখল করে নেয়। আওরঙ্গজেব কান্দাহার অবরোধ করেন, কিন্তু ভারী কামানের অভাবে শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন এবং সেন্টেন্সের মাসের গোড়ার দিকেই অবরোধ তুলে নেন। তিনি বছর পর, ১৬৫২ সালে আবারও চেষ্টা করেন এবং সেবারও তিনি ব্যর্থ হলে, শাহজাহানের আদেশে মাত্র দুই মাস পরই তাকে ফিরে আসতে হয়। শাহজাহান ব্যর্থতার জন্য আওরঙ্গজেবকে এককভাবে দায়ী করেন, ক্ষুঁক হয়ে ছেলেকে লেখেন, ‘এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, এত আয়োজন সত্ত্বেও দুগটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি।’ আওরঙ্গজেব যখন পুনরায় চেষ্টা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন, তার আবাজান পাটা খোঢ়া দেন যে, তিনি যদি আওরঙ্গজেবকে কান্দাহার দখল করতে সক্ষম বলে বিবেচনা করতেন, সৈন্যবাহিনীকে তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন না।’

সেই বছরের ডিসেম্বরে, আগ্রার ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময়, আওরঙ্গজেব তার আমিজানের ঘকবরায় আসেন ‘জিয়ারতের নেকি’ অর্জন করতে এবং স্তুবত আমিজানকে স্মরণ করতে, যার স্নেহ ছিল শতাব্দী। তিনি তাজমহলের

ভেতরে পানি চুইয়ে প্রবেশ করার বিষয়টি আবিক্ষার করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সাথে সাথে শাহজাহানকে চিঠি লিখে জানান : ‘এই পবিত্র প্রাঙ্গণের ইমারতগুলো স্মাটের উপস্থিতিতে যখন সমাঞ্ছ হয়েছিল তখনকার মতোই সুস্থিত অবস্থায় রয়েছে। অবশ্য পবিত্র মকবরার ওপরের গম্বুজটার উত্তর পার্শ্ব দিয়ে বর্ষার মৌসুমে পানি প্রবেশ করে এবং চারটা প্রতিহার, দ্বিতীয় তলার অধিকাংশ চোরকুঠিরি, চারটা ছোট গম্বুজ, উত্তর প্রান্তের চারটা উপপ্রকোষ্ঠ...স্যাতসেতে হয়ে গেছে। বিশাল গম্বুজটার মর্মম পাথরে আবৃত ছাদের দুটি কি তিনটি স্থান দিয়ে এবারের বর্ষায় পানি প্রবেশ করেছে। স্থানগুলো মেরামত করা হয়েছে, কিন্তু আগামী বর্ষায় কী ঘটবে সেটা দেখার জন্য আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে দেখতে হবে।’ তিনি সর্বোচ্চ হারাবার মতো শোকে অধীর হয়ে যোগ করেন, ইমারত নির্মাতারা ‘বড় গম্বুজটা মেরামত করার উপায় বের করতে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করেছে।’ হে পুণ্যাত্মা, তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও! কারো কুস্তির কারণে এমন চমৎকার ইমারতটার এমন দুর্দশা! তিনি আরো জানান, তাজের বিপরীত দিকে যমুনার তীরে অবস্থিত উদ্যান, যেটা মাহতাব বাগ নামে পরিচিত, বন্যার পানিতে সেটা ‘পুরোপুরি প্লাবিত হয়েছে, এবং সে কারণে পুরো উদ্যানটাই শ্রীহীন হয়ে পড়েছে’, যদিও অষ্টভূজাকৃতি ছলাধাৰ আৱ তাৱ চারপাশেৰ চতুর এখনো ভালো অবস্থায় রয়েছে। তিনি শাহজাহানকে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করেন। এই বঙ্গে তাড়া দেন যে, ‘পরিস্থিতি সংশোধনে স্মাটের মনোযোগের একটি ক্ষিণণ যদি আপত্তিত হয়, সেটা তাহলে যথার্থ হবে।’ গম্বুজকে পানিনিরোধক এবং ভিতকে শক্ত করতে তখন স্পষ্টতই বিশাল আয়োজন শুরু হয়।

১৬৫৩ সালে শাহজাহান তৃতীয়বারের মতো কান্দাহার পুনর্দখলের চেষ্টা করেন। তার সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব এবার তিনি দারা শকোহকে দেন। স্মাটের জ্যোষ্ঠ পুত্র, যিনি বেশির ভাগ সময় তার আব্বাজানের সাথেই অতিবাহিত করেছেন, কদাচিং যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন কিন্তু অথবা সেই অনভিজ্ঞতার কারণেই হয়তো বড়াই করে বলেন, এক সন্তানের ভেতরে তিনি কান্দাহার দখল করবেন। শাহজাহান যুবরাজকে ৭০,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী, বিপুলসংখ্যক কামান আৱ অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ভাড়াটে গোলন্দাজ দেন তাৱ দাবিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে। কিন্তু এৱ পৱে কোনো কাজে আসে না। পাঁচ মাসব্যাপী প্রচণ্ড আক্ৰমণ পরিচালনা করেও দারা শহরেৰ মাটিৰ তৈরি প্রতিৱক্ষা প্রাচীৱে ফাটল সৃষ্টি কৰতে ব্যৰ্থ হন, যা কোনো স্থানে আনে ত্ৰিশ ফিট পৰ্যন্ত চওড়া। মোগলৱা কখনো কান্দাহারেৰ ওপৰ আধিপত্য বিস্তাৱ কৰতে পাৱে না।

কান্দাহার দখল করার অভিপ্রায়ে পরিচালিত তিনটি ব্যর্থ অভিযানে ব্যয় হয়েছিল ১২০,০০০,০০০ তক্ষা, পরিমাণে এটা শাহজাহানের বার্ষিক খাজনার অর্ধেকেরও বেশি। কিন্তু অর্থনাশের চেয়ে সম্মানহানি অনুভূতিকে অনেক বেশি আঘাত দেয়। শাহজাহান, যিনি যুবরাজ হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বিজয়ের নায়ক, ব্যর্থতা তাকে ক্ষুঁক করে। সাফল্য লাভে ব্যর্থতাজনিত হতাশার কারণে কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি তার স্নেহে কোনো ধরনের হেলদোল সৃষ্টি করে না এবং তিনি দারাকে আরো বেশি ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৬৫৪ সালে নিজের চৌষট্টিতম চান্দু জন্মদিন উদ্যাপনের সময় শাহজাহান বিশেষ একটি খেতাবে দারাকে অভিষিক্ত করে প্রতীত উত্তরাধিকারী, যুবরাজ হিসেবে তাকে পুর্নব্যক্ত করেন এবং তাকে 'স্বার্টের মহিমাময় মসনদের নিকটে সোনালি একটি চেয়ারে উপবেশনের' আদেশ দেন। দারার এই সময়ের প্রতিকৃতিতে তাকে চিহ্নিত করার সময় তার সুদর্শন মুখাবয়বের চারপাশে একটি কোমল জ্যোতিচক্র দেখানো হয়েছে, যা তার মর্যাদাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

আওরঙ্গজেবকে এসব কিছুই প্রভাবিত করতে পারে না, শাহজাহান ইত্যবসরে যাকে দ্বিতীয়বারের মতো দাক্ষিণাত্যের সুবোধের হিসেবে বহাল করেন এবং দক্ষিণের উদ্দেশ্যে তিনি রওনাও হন। পিঙ্ক বা পুত্র কেউই জানতে পারলেন না, যদিও তাদের জীবনে খেরোখাতাম্বা অথবা বহু বছরের হিসাব লেখা বাকি রয়েছে কিন্তু তারা আর কখনো পর্যবেক্ষণের মুখোমুখি হবেন না। ত্রিশ বছর পূর্বে শাহজাহানের বিদ্রোহের পর অমতাজ আর শাহজাহান বাধ্য হয়েছিলেন নূরজাহানের তত্ত্বাবধায়নে অবিচ্ছয়তার হাতে দারা আর আওরঙ্গজেবকে সমর্পণ করতে। সেই সময়ের শোকার্ত দৃশ্যকল্পের সাথে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের বর্তমান টানাপড়েন সুস্পষ্ট ও অরম্ভদ বৈসাদৃশ্য। জাহাসীর যখন শাহজাহানকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেছিলেন ঠিক তখনকার মতো, এখন শাহজাহানও আওরঙ্গজেবের প্রতি সামান্যই আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন, তাকে নিয়মিত চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার মতো তাছিল্য আর উপেক্ষা করেন, এমনকি দাক্ষিণাত্যে তার পছন্দের আমবাগান থেকে বাছাই করা সেরা আমগুলো প্রেরণে ব্যর্থ হয়েছেন বলে দোষারোপ করেন। আওরঙ্গজেব যখন তার দাক্ষিণাত্যের প্রশাসনের জন্য বাঢ়তি অর্থ প্রেরণের অনুরোধ জানান, তার আবকাজান অর্থ প্রেরণ করতে অসম্ভব হন, তাকে বরং প্রবর্তনা দেন উন্নত চাষাবাদ এবং খাজনা আদায়ে আরো দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে।

আওরঙ্গজেবকে এসব উপায় মোটেই আগ্রহী করতে পারে না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন বিজয় অর্জনের মাধ্যমে প্রত্যু স্থাপন করে নিজের খালি পেটিকা ধনসম্পদ

দিয়ে আবার পূর্ণ করবেন। সম্পদশালী গোলকুণ্ডা রাজ্য, ১৬৩৬ সালে যারা মোগল অধিবাজাত অনিচ্ছার সাথে মেনে নিয়েছিল, সেখানকার সমৃক্ষ সোনা আর হীরার খনি এবং বিলাসপ্রিয় আর নিরঙ্গন্যম সুলতানের কারণে সম্পদ আহরণের বেশ নথর মক্কেল বলে প্রতীয়মান হয়। আওরঙ্গজেবের আক্রমণের অজুহাত ১৬৩৬ সালের চূড়ি অনুসারে গোলকুণ্ডার কাছ থেকে প্রাপ্য কর প্রদানে বিলম্ব এবং তা ছাড়া আরো আছে মোগলদের অনুমতি ব্যতিরেকে গোলকুণ্ডার কর্ণটকে—দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে কৃষ্ণা আর কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি স্ফুর্দ্র রাজ্য—অধিক্রম পরিচালনা করা।

১৬৬৫ সালের গোড়ার দিকে, আওরঙ্গজেব তার ঘোলো বছর বয়সী পুত্র মাহমুদ সুলতানের অধীনে একটি বাহিনী গোলকুণ্ডায় প্রেরণ করেন এবং নিজে আরেকটা বিশাল বাহিনী নিয়ে তাকে অনুসরণ করেন। বাস্তবতা হলো, গোলকুণ্ডার সন্তুষ্ট সুলতান ইতিমধ্যে তার সব দাবি মেনে নিলেও আওরঙ্গজেবের পরিকল্পনাকে সেটা কোনোভাবে প্রভাবিত করে না। আওরঙ্গজেব তার ছেলেকে আদেশ দেন, যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তবে সুলতানকে হত্যা করতে বা তিনি আরো মার্জিতভাবে নিজের অভিপ্রায় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, ‘তার (সুলতানের) গ্রীবাকে মন্তিকের বোৰা থেকে মৃত্যু দেয়া।’ আতঙ্কিত সুলতান তার আকর্ষণীয় নতুন মুজধানী হায়দ্রাবাদ ফেলে পশ্চিমে গোলকুণ্ডার দূর্গের দিকে পালিয়ে যান এবং আওরঙ্গজেবের করুণা ভিক্ষা করতে মূল্যবান উপহার, আপসমূলক বাতী, এমনকি নিজের মাকে পর্যন্ত পাঠিয়ে দেন। সুলতান দারার কাছেও সহায়ের জন্য অনুরোধ পাঠান, যিনি শান্তিপ্রিয় আর ক্ষমাশীল স্বত্বাবের, সেইসাথে যুক্তিবহুত্বাবে অঙ্গবিশ্বাসী হবার কারণে আওরঙ্গজেবকে অপচন্দ করায়, ভাইয়ের অভিপ্রায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে তিনি পরিস্থিতির ভেতর হস্তক্ষেপ করেন।

আওরঙ্গজেবও সেই সময়ে গোলকুণ্ডার বিপুল ঐশ্বর্যের কথা এবং সাম্রাজ্যের সাথে রাজ্যটার সংযুক্তির জন্য তাগিদ জানিয়ে প্রলুক্ককারী ভাষায়, তার আবাজানের সমর্থন আদায়ে চিঠি লিখতে ব্যস্ত। ‘এই রাজ্যটার সৌন্দর্যের বিষয়ে আমি কী লিখব’, তিনি হস্তারকের ছুরি সরিয়ে মিষ্টিভাষী হতে চেষ্টা করেন : ‘এখানের পানি আর লোকের অতিপ্রাচুর্যের কথা, চমৎকার বাতাসের কথা, এবং এখানের ব্যাপক চাষাবাদের কথা?... দারুণ অর্থকরী একটি দেশ।’ শাহজাহান তার প্রায় তলানিতে গিয়ে পৌছানো কোষাগারের ওপর অনেক চাপ সন্দেশ, তিনি অবশ্য মোটেই প্ররোচিত হন না। তিনি বরং দারার পরামর্শ শোনেন, যুক্তি দিয়ে স্মাটকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, সুলতানের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ শীমাংসায় পৌছানোটা একাধারে অনেক বেশি ন্যায়ানুগের পাশাপাশি অনেক বেশি দূরদৃশী হবে। শাহজাহান এই আলোচনার ফলস্বরূপ

আওরঙ্গজেবকে গোলকুণ্ডা রাজ্যের সংযুক্তির অনুমতি দিতে অসম্মতি জানান। তিনি বরং তাকে সুলতানের নিরাপত্তা-প্রতিবিধানের প্রস্তাব গ্রহণ এবং কালবিলুষ্ট না করে গোলকুণ্ডা ভ্যাগ করার আদেশ দেন। তিনি আওরঙ্গজেবকে সুলতানের ধনরত্ন অধীকৃত করার অভিযোগ করেন, গোলকুণ্ডার নিরাপত্তা-প্রতিবিধানের অংশ দিতে অব্যুক্ত করেন এবং তার আদেশের আওতার বাইরে যাবার জন্য তিরক্ষার করেন।

আওরঙ্গজেব নিশ্চিতভাবেই তাছিল্য অনুভব করেছিলেন। তিনি মেনে নেন আক্রান্তের আদেশ পালন করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই এবং নিতান্ত অনীহার সাথে ফিরে যান। তিনি অবশ্য ফিরে যাবার পূর্বে সুলতানকে চাপ দিয়ে তার ছেলে, মাহমুদ সুলতানের সাথে সুলতানের এক মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি করান। তিনি সেইসাথে একটি গোপন প্রতিক্রিয়াও আদায় করে নেন যে, সুলতান তার নতুন জামাতাকে নিজের উস্তুরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করবেন। আওরঙ্গজেব নিজের চারপাশে আরেকটা মক্কলের খৌজে তাকালে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টি বিজাপুরের ওপর নিবন্ধ হয়, যা ১৬৩৬ সালে গোলকুণ্ডার মতোই মোগলদের শাস্তি চূক্ষি করেছিল এবং রাজ্যটা, গোলকুণ্ডার মতোই, মাঝের বছরগুলোয় অনেক বিস্তৃশালী হয়। ১৬৫৬ সালে বিজাপুরের রাজা মৃত্যুবরণ করার পরে সেখানে<sup>১</sup> সৃষ্টি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ছিল এবারের অধিক্রমের অজুহাত।

শাহজাহান এবার আওরঙ্গজেবকে<sup>২</sup> ইচ্ছামতো চলতে দেন। স্মাটের মনোভাবের এই আকস্মিক পরিস্থিতিনের পেছনে একটি কারণ ছিল পারস্য থেকে তার দরবারে সম্প্রতি<sup>৩</sup> এক ধনবান আর দৃঢ়সাহসিক অভিযান্ত্রিকের আগমন, মীর জুমলা, যিনি গোলকুণ্ডার সুলতানের সাথে কলহ করে চলে আসার আগে সম্প্রতি তার উজির হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মীর জুমলা গোলকুণ্ডা আর বিজাপুর থেকে নিয়ে আসা হীরকখণ্ড, পোখরাজ আর পশ্চরাগমণি বিশেষ ধূর্ততার সাথে শাহজাহানকে উপহার দেন।<sup>\*</sup> আলো ঝলমলে রত্নপাথরের স্তূপ স্ম্রাটের মনে দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্ম দেয় যে, অতীতের ন্যায় কেবল যোগল অধিরাজত্ব আরোপ করে খাজনার জন্য তাদের দোহন করার পরিবর্তে রাজ্যগুলোর সংযুক্তি অনেক অর্থবহ। তিনি মীর জুমলাকে শুরুত্বপূর্ণ সরকারি দণ্ডের নিয়োগ দেন এবং আওরঙ্গজেবকে বিজাপুরের ওপর সর্বশক্তিতে আক্রমণ পরিচালনার অনুমতি দেন। শাহজাহান তার ছেলেকে চিঠি

\* মানুচি লিখেছেন, মীর জুমলা ‘একটি বিশাল অকর্তৃত হীরক খণ্ড যার ওজন করা হয়েছিল তিনশ ষাট ক্যারাট’ শাহজাহানকে উপহার দিয়েছিলেন এবং বার্নিয়ের একটি ‘প্রসিদ্ধ হীরক খণ্ড যার সৌন্দর্য আর আকার সাধারণত অনুপম বিবেচনা করা হতো’ লিখেছেন। এই হীরক খণ্ডটাই সম্ভবত কোহ-ই-নূর, যা পারস্য থেকে পালিয়ে আসার সময় কোনো একভাবে মীর জুমলার হস্তগত হয়েছিল।

লিখে জানান, তিনি যদি সফল হন তাহলে গোলকুণ্ডা রাজ্য সংযুক্তির রাজকীয় ফরমানও তাকে প্রদান করা হবে।

১৬৫৭ সালের গোড়ার দিকে, ঘীর জুমলাকে সাথে নিয়ে, বিজাপুরের সেই সব আধিকারিক, যারা ১০০ জন লোক নিয়ে স্বপক্ষ ত্যাগ করবে তাদের প্রত্যেককে ২,০০০ তঙ্কা উৎকোচের প্রস্তাব দিতে দিতে, আওরঙ্গজেব ধীরে এবং সুসংবন্ধভাবে অগ্রসর হতে থাকেন। আওরঙ্গজেব ঠিক তার আবোজানের মতোই নিজেও ব্যক্তিগতভাবে একজন সাহসী যোদ্ধা—তিনি চৌদ্দ বছর বয়সেই তাকে পদদলিত করার ঠিক আগ মুহূর্তে স্থির মস্তিষ্কে আর চমৎকারভাবে একটি ক্রোধেন্মুস্ত হাতির মুখোমুখি হয়ে ঝুঁক প্রাণীটার দিকে তার হাতের বর্ণাটা ছুড়ে মেরেছিলেন। তার সমরাভিযান পরিচালনার ধীর, সুসংবন্ধ প্রয়াস অবশ্য শাহজাহানের বেপরোয়া, বটিকা আক্রমণের সামরিক রীতির থেকে আলাদা। বর্ষাকাল শুরু হবার পূর্বে লক্ষ্য অর্জনে আওরঙ্গজেবের সাফল্য নিয়ে শক্তি হয়ে এবং আরো একবার দারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শাহজাহান মত পরিবর্তন করেন এবং তার ছেলেকে বিজাপুরের সাথে সঞ্চি করার, যেখানে বিজাপুর মোগলদের বিশাল অঙ্কের নিরাপত্তা-প্রতিবিধান প্রদানে সম্মত হয় এবং তাদের বেশ কিছু দুর্ঘট্রীর কর্তৃত সমর্পণ করে এবং বিজাপুরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে, সৈন্যগুহ্যে নিয়ে ফিরে আসার আদেশ দেন। আওরঙ্গজেব আরো একবার অনীতীমুখ সাথে আদেশ পালন করেন।

॥

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযান দৃষ্টি আকর্ষক হয়নি কিন্তু এই অভিযানের ফলে পুরো অঞ্চলটা আরো পরাভৃত হয় এবং মধ্য এশিয়ায় বরণ করা দুর্ভাগ্য এবং কান্দাহার পুনর্দখল প্রয়াসের বিপর্যয়ের ক্ষতি খানিকটা হলেও পূরণ করে। ভবিষ্যতে আর কোনো সামরিক অভিযান, যার হয়তো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, পরিচালনার জন্য লড়াকু সন্তানদের একটি ঝাঁক সাথে থাকায়, আর বিশেষ করে তার বয়সও বার্ধক্যের কাছে চলে আসায়, এই সময়টা নিশ্চিতভাবেই শাহজাহানের জীবনের একটি শান্তিময় পর্ব, তাকে তার জীবনের মহত্তম স্থাপত্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দেয় এবং আগ্রা পরিদর্শনের সময়, তার তৈরি করা মর্মরের মকবরায় মমতাজের জন্য, মোনাজাত করার তৌফিক দেয়। ১৬৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সব হিসাব পাল্টে দিয়ে সাতষটি বছরের স্মার্ট মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এটা ছিল মহামান্য স্মার্টের নশ্বরতার ইঙ্গিত, যার জন্য তার তিন যুবক ছেলে অপেক্ষা করছিলেন এবং এর সাথেই শেষ হয়ে যায় তার সহজ মাধুর্যময়, পরিতৃপ্ত বার্ধক্য জীবন অতিবাহিত করার আশা।



## চতুর্দশ অধ্যায়

### সাপের দাঁতের চেয়েও শানিত

অগ্নিগর্ভ দৃশ্যকল্প নির্মাণের সব প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। বিয়োগাত্মক নাটকের কোনো জ্যাকবীয় রচয়িতা কিৎ লিয়ারের ন্যায়, প্রৌঢ়, দোষযুক্ত লিয়ারের ন্যায় শাহজাহানের চেয়ে আরো বিশ্বাসযোগ্য কেন্দ্রীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে হিমশিম খেয়ে যেতেন। তিনি দশক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পরে তিনি তার সৃষ্টি করা মহিমাময় আর অবেদ্য রাজকীয় ভাবমূর্তি আর শাসন করা তার ঐশ্বরিক অধিকার হিসেবে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি অবশ্য রাজ্য পরিচালনার পুজ্ঞানুপুজ্ঞ বিষয়গুলো অবহেলা করেন, তার অমাত্যদের ওপর সেসব দায়িত্ব অর্পণ করেন, যারা সাম্রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির চেয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত অবস্থান আর সমৃদ্ধির দিকেই বেশি মন্দেয়াগ দিয়েছেন। তিনি যুদ্ধবাটা পরিত্যাগ করে সামরিক অভিযানের দায়িত্ব নিজের ছেলের, বিশেষ করে ছেট তিনি সন্তানের ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধন তার পিতামহ আকবরের ন্যায় একনিষ্ঠ বলিষ্ঠিতা প্রদর্শন করেননি, যার জীবন দর্শন যে ‘একজন সন্ত্বাট সব সময় বিজয় অর্জনে একায়ত থাকবেন, নতুন তার প্রতিবেশীরা তার বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে উঠবে’ অভ্যন্তরীণ অসঙ্গোষ আর বহিঃশক্ত হৃষ্মকি প্রশংসিত করতে দারুণ কার্যকর ছিল।

সর্বোপরি, এক ধরনের মানসিক অবসাদে গুটিয়ে গিয়ে, ‘তখত তত্ত্ব?—সিংহাসন বা শবাধার?’ এই প্রবচনের মধ্যে বিবৃত মোগল ইতিহাসের নির্যাস ক্রমেই তার কাছে অব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। ক্রমাগতভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম উচ্চাকাঙ্ক্ষী সন্তানেরা তাদের পিতাকে শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছেন: আকবরের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ করেছিলেন; তিনি নিজেও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সৎভাই হামেশাই সৎভাইয়ের বিরুদ্ধে অন্ত্র ধারণ করেছেন। কামরান, হিন্দাল আর আসকারিকে পরাভূত করতে ন্য আর অমায়িক হৃমাযুনকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শাহজাহান আরো এক কাঠি

সরেস, সংভাই খসকু আৱ পুত্ৰহীন শাহৱিয়াৱকে হত্যা কৱাৰ পৰ, আপদেৱ  
বালাই না রাখাৰ সংকল্পে তিনি অন্যান্য আজীয়-সম্পর্কিত ভাই আৱ  
ভাতুশ্পুত্ৰদেৱও ভৱলীলা সাঙ্গ কৱেছেন। কিন্তু এই রক্তাক বৎসগতিৰ গুণাবলি  
সত্ত্বেও শাহজাহান মৃত্যুচিত আশায় নিজেকে আশ্বস্ত কৱেছেন যে, তাৰ ছেলেৱা  
বিশ্বস্ততা আৱ আনুগত্যেৱ পৰিচয় দেবেন। তাৰা সবাই যে এক মায়েৱ সত্ত্বান,  
পৱন্পৰেৱ প্ৰতি অনুৱত দম্পতিৰ বৎসধৰ, পৱন্পৰবিৱোধী স্ত্ৰী আৱ  
উপপত্নীদেৱ গৰ্ভজাত না হৰাৰ কাৱণে নিষ্ঠিতভাবেই তাৰ এ প্ৰত্যয় দৃঢ়তা  
লাভ কৱেছিল।

মমতাজ যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তাৰ এই প্ৰত্যয় হয়তো সত্যি হতেও  
পাৰত। তিনি তাৰ সত্ত্বানদেৱ জন্য ছিলেন সন্ময়ী এক মা এবং শুৱৰ  
দিনগুলোতে পৱিবাৰ হিসেবে তাৰেৱ একতা বিপদ দ্বাৰা গড়ে উঠেছিল এবং  
দুৰ্ভোগেৱ মাধ্যমে টিকে থেকেছে। মমতাজ তাৰ পাশে থাকায় সত্ত্বানৱা যখন  
বড় হচ্ছিল, শাহজাহানেৱ তথন শাশন কাজে অনেক বেশি আগ্ৰহ এবং  
দীৰ্ঘস্থায়ী আৱ অবক্ষয়কাৰী কোনো শোক থেকে সামুদ্রণ খুঁজতে গিয়ে  
স্থাপত্যবিদ্যা সিদ্ধ কোনো ইমারত নিৰ্মাণ বা অন্য কোনো কিছুৰ ভেতৱে তাকে  
নিমগ্ন থাকতে হয়নি। তিনি তাৰ পৱন্পৰ হয়তো মিজেৰ প্ৰিয় পুত্ৰ বেছে নিতেন  
কিন্তু মমতাজেৱ সন্ধে আৱ সত্ত্বানদেৱ আৱেগেৱ সাথে একাত্ম হৰাৰ মাতৃসূলত  
ক্ষমতা নিষ্ঠিতভাবেই আওৱসজেবেৰ বিচ্ছিন্নতাবোধেৱ মনোভাৱ আৱ শাহ  
সুজা এবং মুৱাদ বকশেৱ অসম্ভৱকে লাঘব কৱত। জীবিত তিনি বোনেৱ  
মাৰোও সম্পর্ক অনেক আনন্দিত হতো। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, সন্ত্বাজ্যেৱ প্ৰধান  
মহীয়সী হিসেবে মমতাজেৱ স্থানে জাহানারাব আপাত আৱোহণ তাৰ চেয়ে  
তিনি বছৱেৱ ছেট রৌশনআৱাকে বিশেষ কৱে ঈৰ্ষাৰ্থিত কৱে তোলে।  
ডেসিনীয় পৰ্যটক নিকোলাই মানুচিৰ ভাষ্য অনুসাৱে রৌশনআৱা, যে সদ্যই  
দারাব অধীনে প্ৰশাসনিক কাজে যোগ দিয়েছেন, দেখতে খুব রূপসী না হলেও  
'ভীষণ চতুৰ, নিজেৱ প্ৰকৃত মনোভাৱ গোপনে পারদশী, বুদ্ধিমান,  
আনন্দোচ্ছল, কৌতুক আৱ রঙপ্ৰিয়।' তিনি আৱো দাবি কৱেছেন, রৌশনআৱা  
ছিলেন ভীষণ 'কামুক প্ৰকৃতি।' আসন্ন শোকাবহ পারিবাৰিক ঘটনাবলিিৰ সময়  
তিনি আওৱসজেবেৰ একান্ত অনুগত থাকেন, গোঢ়া মনোভাৱেৰ কৌতুহলী  
একজন মিত্ৰ, কিন্তু অন্যান্য সাধাৱণ ঐক্যমতেৱ স্থানও ছিল। তাৰা উভয়েই  
বহু বছৱ নিজেদেৱ নিষ্পত্ত অনুভব কৱেছেন—আওৱসজেৱ বড় ভাই দারাব  
কাৱণে আৱ রৌশনআৱাব নিজেকে হীন মনে কৱাৱ কাৱণ জাহানারা। কনিষ্ঠ  
কল্যাণ গওহৱআৱা, যাৰ জন্মেৱ সাথে মমতাজেৱ মৃত্যুৰ বিষয়টি সম্পর্কিত,  
ছেট ভাই মুৱাদেৱ সাথে একাত্মা অনুভব কৱাৱ মতো কাৱণ খুঁজে পাওয়া  
যায়।

মমতাজ যদি সে সময় জীবিত থাকতেন, পারিবারিক সঞ্চিক্ষণের এই মুহূর্তে মধ্যস্থৃতা করার শক্তি ও তার থাকত। মোগলদের এমন শক্তিশালী পরিবারে কর্তৃত্বকারিণী মহিলার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যারা যদিও পর্দার অন্তরালেই বাস করতেন কিন্তু অনেক সময় সাফল্যের সাথে হস্তক্ষেপ করেছেন আর তাদের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো। বাবরের পিতামহী তাকে তার রাজত্বকালের শুরুর বছরগুলোতে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, অন্যদিকে হামিদা, জাহাঙ্গীরের পিতামহী জাহাঙ্গীরের আবাজান আকবরের সাথে তার বিরোধের মিটামাট করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মমতাজের পূর্ববর্তী পারস্যের পূর্বপুরুষদের শামী-স্ত্রীর মাঝের প্রেমময় নিকট সম্পর্কও—তার পিতামহ ইতিমাদ-উদ-দৌলা এবং তার স্ত্রী, তার আবাজান আসফ খান আর তার আশ্মিজান আর বলার অপেক্ষা রাখে না জাহাঙ্গীরের ওপর তার ফুপিজান নূরের কর্তৃত্ব—পারিবারিক বিষয়ে বয়ক্ষ মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। জাহানারারও, অবশ্য সেই অর্থে প্রভাব ছিল। আওরঙ্গজেব বিগত বছরগুলোতে তাকে চিঠি লেখার সময় বহুবার তাকে তার ‘পৃষ্ঠপোষক’ হিসেবে সম্মোধন করেছেন এবং তাদের আবাজানের সাথে তার পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু একজন বোনের পক্ষে মায়ের মতো সম্মান আর আনুগত্য দাবি করা সম্ভব নয়।<sup>১</sup> শাহজাহানের নিজের মা এবং মমতাজ উভয়েই ইন্দোকাল করায় এবং এভ্যন্য কোনো স্ত্রী বা বয়ক্ষ মহিলা তার আশপাশে না থাকায় তাকে ভালো হোক বা মন্দ হোক, একাই নিজের বিশাল, প্রতিভাবান এবং প্রাণবন্ত পরিবারকে সামলাতে হয়েছে। তিনি অচিরেই আবিক্ষার করেন, তার ওরপে মমতাজের গর্ভে জন্ম নেয়া এই সাত জীবিত সন্তান—জাহানারা এবং দারা শুকোহ থেকে, তাদের রুচি আর মেজাজের প্রকৃতি একই রকম হ্বার পাশাপাশি তাদের বয়সের পার্থক্যও সামান্য হওয়ায়, কনিষ্ঠজন পর্যন্ত, অনেক বেশি অবাধ্য, বৈরী ভাইবোন—তাদের নিজেদের ভেতর আপন আপন মৈত্রীর সম্বন্ধ গড়ে তুলেছে। তিনি আরো আবিক্ষার করেন, কিং লিয়ারের মতোই, তাকে কি আসলেই তাদের কেউ সত্যিই ভালোবাসে?



১৬৫৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, দিল্লিতে সংকটের সূচনা হয়, যখন তার দিনপঞ্জির রচয়িতা যেমন লিখেছেন, ‘স্ত্রাট কোষ্ঠকাঠিন্য আর মৃত্যুলির জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন।’\* ফরাসি চিকিৎসক

\* মৃত্যুলি অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রস্তাৱ খুব ধীৰে, জ্বালাময়ী ফোটায় হয়।

ফ্রাসোয়া বার্নিয়ের লিখেছেন, শাহজাহান ‘এমন একপ্রকার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন, যার প্রকৃতি বর্ণনা করাটা সীতিমতো অশোভন। এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তার বয়সের একজন লোকের পক্ষে ব্যাপারটা লজ্জাজনক, যিনি তার জীবনের অবশিষ্ট প্রাণশক্তি সতর্কতার সাথে সংরক্ষণের পরিবর্তে অসহায়ভাবে তা ব্যয় করতে থাকেন।’ মানুচি আরো প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন : ‘শাহজাহান এখনো একজন তরুণের ন্যায় জীবনকে উপভোগ করতে এবং সেটা করতে গিয়ে নানা উদ্দেশ্যে ওষুধ সেবনের ফলেই নিজেকে এই অসুস্থিতায় সোপর্দ করেছেন—অন্য কথায়, কাম-উদ্দীপক বস্ত।

শাহজাহান তিন দিন প্রস্তাব করতে পারেন না এবং সামান্য সময়ের জন্যও ঝরোকা বারান্দায় দর্শন দিতে ব্যর্থ হন, তিনি তার প্রজাদের দৃষ্টির সামনে থেকে আঢ়ালে চলে যান। দারা, তার তিন ভাই শাহজাহানের শারীরিক অবস্থার অবনতির সংবাদ জানতে পারার পর কী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবেন সে সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের শাসনাধীন দূরবর্তী প্রদেশে, পিতার অসুস্থিতার সংবাদ জানিয়ে বিবরণী পাঠাতে নিষেধ করেন—শাহ সুজা তখন বাংলার সুবাদার, মুরাদ বকশ গুজরাটের আর আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের। পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট শূন্যতার ফলে নানা ধরনের গুজরেজিজ্ঞা হতে শুরু করে যে, স্যাট মৃত, এমনকি এটাও শোনা যেতে থাকে হ্যাঁ দারাই অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন আর তাকে হত্যা করেছেন। প্রিয়ান্তি ছড়িয়ে পড়ায় দিল্লির বণিকরা তাদের দোকান দাঙ্গা আর লুটপাটের আশঙ্কায় বন্ধ করে দেয়। বাস্তবতা হলো, জাহানারার শুন্ধায় শাহজাহান ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে শুরু করেছিলেন এবং পুরুণ আর মানার সুপের সাহায্যে নিজের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং উদ্বিগ্ন জনগণের সামনে সামান্য সময়ের জন্য দর্শনও দিতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তার দরবারের একজন ঐতিহাসিক লিপিবন্ধ করেছেন কীভাবে দুর্বল আর মৃত্যু নিকটবর্তী আশঙ্কা করে শাহজাহান ‘সাম্রাজ্যের শাসনভাব সামলাবার অধিকাংশ দায়িত্ব’ দারাকে দিয়েছিলেন, ‘প্রতীত উত্তরাধিকারী হিসেবে দারার প্রতি তার অভিজাতদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে অনুরোধ করেছিলেন।’ নিয়তির বিড়ম্বনা এই যে, সব ভাইদের ভেতরে দারাই একমাত্র সিংহসনের জন্য লালায়িত ছিলেন না। শাহজাহানের প্রিয় উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি তার প্রিয় আবাজানের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু পরিস্থিতি তার ওপর জোর করে দায়িত্ব অর্পণ করে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শাহজাহান রাজকীয় বজরায় করে আগার উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করে যেখানে তাজমহল আর বহুদিন পূর্বে গত, কিন্তু তখনো প্রিয় মমতাজের কাছাকাছি অবস্থান করে নিয়তির মুখোমুখি হবার জন্য তিনি নিজের মনকে শান্ত করেন।

রাজকীয় বিবরণীর অনুপস্থিতিতে, শাহজাহানের তিন পুত্র তাদের সমর্থকদের কাছ থেকে প্রাণ বার্তার ওপর তথ্যের জন্য নির্ভর করেন, আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে তাদের বোন রৌশনআরা আর মুরাদ বকশের ক্ষেত্রে তাদের বোন গওহরআরাও এ খেলায় জড়িয়ে যান। তিন ভাইই নিশ্চিত হন যে, তাদের আবুজান ইন্তেকাল করেছেন এবং তার উত্তরাধিকারী হিসেবে দারার অধিকার তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সিংহাসন দখলের জন্য সবাই ষড়যজ্ঞ ওরু করেন। তাদের কেউই শাহজাহানের জীবিত থাকার ব্যাপারে প্রাণ প্রমাণ ওরুত্তের সাথে বিবেচনা করেননি, নিজেদের উদ্দেশ্য পাছে হতোদ্যম হয়ে পড়ে এই ভয়ে। মানুষের ভাষ্য অনুসারে, যিনি দারার প্রতি নিজের পক্ষপাতের কথা খোলাখুলি স্বীকার করেছেন, আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছিলেন শাহজাহানের তখনো জীবিত থাকার সংবাদ বহনকারী সব চিঠি যেন পুড়িয়ে ফেলা হয় আর তাদের বার্তাবাহকের মাথা কেটে ফেলা হয়।

শাহ সুজাই প্রথম প্রকাশে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, নিজেকে সম্মাট হিসেবে ঘোষণা করে তার নামে মসজিদে খৃতবাপাঠের এবং তার রাজত্বকালের সূচনা উৎকীর্ণকারী মুদ্রা প্রবর্তন করতে আদেশ দেন। শাহজাহানের প্রতি অনুগত অর্থমন্ত্রীকে হত্যা করে মুরাদ বকশও নিজেকে সম্মাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সুরাট শহর লুঁচন করে নিজের অভিপ্রায় উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করেন। আওরঙ্গজেব তাদের মতোই উচ্চভিলাষী ক্ষম্তি তাদের চেয়ে অনেক ধূর্ত, মীরবে কালক্ষেপণ করতে থাক্কেন। অবশ্য তার প্রিয়তমা স্ত্রী সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মৃত্যুবরণ করার স্তিনি তখন অবশ্য শোকগ্রস্তও ছিলেন। তিনি তার জন্য একটি মকবরা নির্মাণ করেন, যা তাজকে নকল করার প্রয়াসে তার একটি মন্ত্রন, কৃশকায় আর হত্যী প্রতিচ্ছায়ায় পরিণত হয়।

দারা ঠিকই অনুমান করেন, আওরঙ্গজেবই যে ভাইকে ‘গৌড়া আর ভও-নামাজি’ বলে অবজ্ঞা করেন, তিনিই আসল হমকির কারণ হবেন আর তাই তার নামমাত্র অধীনস্ত সমস্ত মোগল সেনাপতিদের তিনি অবিলম্বে দিন্মি ফিরে আসার আদেশ দেন। মীর জুমলা, শকিশালী পার্সি অভিযাত্রিকও ছিলেন, তাদের ভেতর যিনি আওরঙ্গজেবের সাথে দাক্ষিণাত্যের অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন এবং যার বাহিনী দারা বিশেষভাবে আওরঙ্গজেবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে আগ্রহী।

দারার অভিপ্রায় নির্ভুলভাবে অনুধাবন করে, আওরঙ্গজেব মীর জুমলার সাথে আঁতাত করে তাকে যিথ্যা অভিযোগে কারাবন্দ করে তার প্রত্যাবর্তনে বাধা দেন। আওরঙ্গজেব গোপনে মুরাদ বকশের সাথেও যোগাযোগ করেন। কতিপয় মোগল ভাষ্য অনুসারে, আওরঙ্গজেব তার একমাত্র অভিপ্রায় আল্লাহতায়ালার ইবাদত করে জীবনের বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটান এই নিশ্চয়তা দিয়ে তার সমর্থন আদায় করে তাকে উল্টো বোঝান যে, দারার

উৎগামিতার কারণে এটা অচিন্তনীয় যে তিনি স্মাট হবেন এবং মুরাদকে, যাকে তিনি ধর্মপ্রাণ সাচ্চা মুসলমান হিসেবে প্রশংসা করেন, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্য সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন। পুরো ব্যাপারটা সত্য হতেও পারে—যেহেতু আওরঙ্গজেব এমন শর্তার কৌশলে ভীষণ পারদর্শী—তিনি এবং মুরাদ একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন, সাম্রাজ্য নিজেদের ভেতরে বিভক্ত করে নেন, দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করেন আওরঙ্গজেব আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্য—আফগানিস্তান, কাশ্মীর, প্রাচুর্যময় পাঞ্জাব আর সিঙ্গ যাই মুরাদের ভাগ্যে। আরো প্রমাণ রয়েছে যে, কয়েক বছর পূর্বে এই দুই ভাই শাহ সুজার সাথে সাম্রাজ্য ভাগভাগি করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং আরো প্রমাণ রয়েছে যে, সংকট শুরু হবার পর থেকেই তারা উভয়ে তার সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী ছিলেন। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, তিনজনের কেউই তাদের আবাজানের প্রিয়পাত্র, অহংকারী দারার প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি প্রদর্শন করেননি, যাকে তারা সবাই অনেক দিন থেকেই দীর্ঘ করেন এবং যার মৃত্যু তাদের পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শাহ সুজা ইতিমধ্যে দিল্লি অভিযুক্ত যাত্রা শুরু করায় দারা তার ছেলে সুলেমান ওকোহর নেতৃত্বে বিশাল এক রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন, যিনি ১৬৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেনারসের কাছে দুব ডোরের দিকে তার অলস চাচাজানের বাহিনীকে আচমকা আক্রমণ করেন এবং পুরোদস্ত্র পরাজিত করেন। শাহজাহান নিজের পরিবর্ত্তনের ভেতরে প্রকাশ্যে, সশস্ত্র বিরোধের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে এবং তাদের মধ্যকার মারাত্ক বিরোধের মাত্রা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকায় তিনি তখনো বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আশাবাদী ছিলেন; তিনি তাই আদেশ দেন, শাহ সুজার সাথে যেন সহানুভূতিশীল আচরণ করা হয়। সুলেমান আদেশ মেনে তার চাচাজানকে পলায়নের সুযোগ দেন কিন্তু পিছু ধাওয়া করার লোভ সংবরণ করতে ব্যর্থ হন—একটি সিদ্ধান্ত, যা বিপর্যয়কর বলে প্রতিপন্ন হয়। দারা ইত্যবসরে দক্ষিণে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন আওরঙ্গজেব আর মুরাদের অঘ্যাতা প্রতিরোধ করতে, কিন্তু এই যুদ্ধে তার বাহিনী পরাজিত হয়। সমূহ বিপদ অনুধাবন করে দারা তড়িঘড়ি সুলেমানকে ডেকে পাঠান, কিন্তু তার ছেলে তখন আগ্রা থেকে কয়েকশ মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন।

বিদ্রোহী তিন যুবরাজই ইতিমধ্যে তাদের আবাজানের কাছে, তার প্রতি নিজেদের আনুগত্য আর তার সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর তার সাথে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে সুলিলত ভাষায় স্তবকতাপূর্ণ চিঠি প্রেরণ করা অব্যাহত রাখেন। তারা তাকে স্মরণ করিয়ে দেন, জাহানারা যখন অগ্নিদণ্ড হয়েছিলেন তখন এই একই পারিবারিক ভালোবাসার কারণে তারা তড়িঘড়ি করে দরবারে

ছুটে এসেছিলেন। তাদের সাথে নিজ নিজ বাহিনী রয়েছে, কেবল দারাকে তারা নিজেদের শক্তি বলে মনে করেন বিধায়।

শাহজাহান শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে সেসব ঘটনার সঙ্গে পরিস্থিতি হতবৃক্ষি হয়ে অনুধাবন করেন এবং ছেলেদের ভেতরে আপসের চেষ্টা করে অনুরোধ করেন, তাদের বিরোধ রাজকীয় মন্ত্রণা পরিষদে আলোচিত হবে, এমনকি আওরঙ্গজেব আর মুরাদ আগ্রা দুর্গে এসে তার সাথে দেখা করতে পারেন, যাতে তিনি শাস্তি স্থাপনে মধ্যস্থতা করতে পারেন। শাহজাহানের অনুরোধে জাহানারা আসন্ন শোচনীয় পরিস্থিতি এড়াতে যাইয়া হয়ে আওরঙ্গজেবকে লেখেন : ‘স্ম্যাট আরোগ্য লাভ করেছেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য তদারকি করছেন। তোমার সশস্ত্র অগ্রযাত্রা তাই তোমার আক্রাজানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার শাখিল। এমনকি যদি এই অগ্রযাত্রা দারাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ও, সেটাও কম অন্যায় নয়...’ আওরঙ্গজেব অবশ্য জোর দিয়ে জানান, তিনি অন্তর্ধারণ করেছেন কেবল নিজেকে রক্ষা করতে এবং তিনি তার আক্রাজানের প্রতি অনুগত, যার সাথে দেখা করার জন্য তিনি উদ্যোগী হয়ে রয়েছেন। ‘আমি এই প্রেমপূর্ণ আলেখনে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সহ্য করব না’ তিনি চিঠিতে যোগ করেন।

দারার বক্ষমূল ধারণা আওরঙ্গজেবের সাথে জড়িবিদার একমাত্র উপায় যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে হতগর্ব করা এবং বিশাদগুণ্ঠ শাহজাহানকে তিনি যুদ্ধযাত্রায় রাজি করান। ১৬৫৮ সালের ১৮ মে, দারা আগ্রা উৎসাগ করে চৰল নদীর অগভীর অংশ দখল করতে দক্ষিণে যাত্রা করেন এবং তার পুত্র সুলেমান শিকোহর নেতৃত্বে অতিরিক্ত রাজকীয় এসে শক্তি বৃক্ষি না করা পর্যন্ত আওরঙ্গজেব আর মুরাদকে নদী অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখতে। তার দিনপঞ্জির রচয়িতাদের ভাষ্য অনুসারে শাহজাহান তার সন্তানের কাছ থেকে ‘নিতান্ত অনীহার সাথে বিদায় নেন...নিয়তির বিধান সম্বন্ধে অনবহিত যে এটাই তাদের শেষ সাক্ষাৎ বিহুল স্ম্যাট নিজের অজান্তে ছেলেকে শক্ত করে আলিঙ্গন করেন’ তারপর মোনাজাত করতে দুই হাত তুলে, শাহজাহান আল্লাহতায়ালার কাছে দারার বিজয় কামনা করেন।

নিকোলোও মানুষি, দারার বাহিনীর সাথে আসন্ন যুদ্ধে ভাড়াটে গোলন্দাজ সৈন্য হিসেবে অংশ নিতে প্রস্তুতি নেন। তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘আমরা এমন সুশৃঙ্খল ভঙ্গিতে যাত্রা শুরু করি। মনে হচ্ছে জল আর স্থল বুঝি একত্র হয়েছে। যুবরাজ দারাকে তার বাহিনীর মাঝে স্ফটিকের স্তম্ভের ন্যায় মনে হতে থাকে। যেন তীব্র উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় সমগ্র ভূখণ্ডের ওপর ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। তার চারপাশে রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনীর অসংখ্য দল অগ্রসর হয়, দূর থেকে যাদের বর্ম দীপ্তিময় দেখায় এবং তাদের বর্ণার কম্পিত অহঙ্কার

থেকে চারদিকে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে...একটি দারুণ দেখার মতো জিনিস, যা চড়াই-উত্তরাইয়ের ওপর দিয়ে, উপত্যকার মাঝ দিয়ে বাঞ্ছাবিক্ষুক সমুদ্রের চেউয়ের মতো অতিক্রম করতে থাকে।' কিন্তু ঝকঝকে ইস্পাতের বর্ম আর শুঁড়ে ধারাল তরবারিযুক্ত রণহস্তির সারির দৃতিময়তা এবং কাঢ়া আর নাকাড়ার সম্মিলিত রণবাদ্য সন্দেশে মানুচি স্পষ্ট বুঝতে পারেন সেনাবাহিনী যেমনটা হওয়া উচিত ছিল তেমন অবস্থায় নেই।\* রাজকীয় বাহিনীর সেরা দলটা সুলেমানের নেতৃত্বে রয়েছে এবং দারার বাহিনীকে কাছ থেকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় তারা মেটেই যুদ্ধমনক্ষ নয়, কসাই, কামার, সূত্রধর, দর্জি এমন সব লোকজন প্রচুর রয়েছে।'

আওরঙ্গজেব আর মুরাদের অগ্রসর হবার গতি আরেকটা সমস্যা। দারা তাদের বাধা দেয়ার পূর্বেই তারা তাদের নিজ বাহিনী নিয়ে আয়াসসাধ্য যাত্রায় অন্য আরেকটা শৱ পরিচিত আর অরক্ষিত প্রত দিয়ে চৰল নদী অতিক্রম করে। প্রত অতিক্রমের ধকলে ক্লান্ত ভাইদের বাহিনীকে আক্রমণ না করে দারা তড়িঘড়ি করে আগ্রা অভিযুক্ত যাত্রা করেন। সামুগড়ের বিশাল সমভূমিতে শহর থেকে মাত্র আট মাইল দক্ষিণপূর্ব দিকে, তিনি যাত্রা বিরতি করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুলেমানের বাহিনীর আগমনের কোনো লক্ষণ তখনো পরিলক্ষিত হয় না।

১৬৫৮ সালের ২৯ মে, আক্ষরিক অধেই দারদাহের প্রচণ্ডতার মাঝে আত্মাতি দুটো বাহিনী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় : যুদ্ধে স্বত্ত্বা নেয়া যোদ্ধাদের দেহের ধাতব বর্মে তাদেরই ত্বক ঝলসে যায়। সেদিনের যুদ্ধের মাত্রা ছিল প্রবল। হাতির পিঠে যুদ্ধমান মুরাদের মুখ তীরবিছুর্য এবং তার হাওদা তীরে শজারুর কাঁটার মতো দেখায়। তিন ঘণ্টার তীব্র যুদ্ধের পরে দারার সৈন্যরা বিজয়ী হচ্ছে প্রতীয়মান হতে থাকে, কিন্তু সংকটময় এক মুহূর্তে দারা যুদ্ধ খামিয়ে হাতির পিঠ থেকে নিচে নেমে আসেন। 'সেটা ছিল', মানুচি লিখেছেন, 'এমন যেন দারা নিজের আরুক বিজয় ত্যাগ করলেন।' দারা, বস্তুতপক্ষে হাতির পিঠ থেকে নেমে আরো দ্রুত গতিতে সঞ্চারণের অভিপ্রায়ে ঘোড়ায় আরোহণ করছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে যা মানসিক ক্ষতি হবার তা হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের সেনাপতিকে দেখতে না পেয়ে অনভিজ্ঞ যোদ্ধাদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক মিনিটের ভেতর পুরো রাজকীয় বাহিনী 'বাতাসের তোড়ে তেসে যাওয়া কালো মেঘের মতো' পালাতে আরম্ভ করে। একজন পরিচারক দ্রুত এগিয়ে এসে দারার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়।

\* একটি রণহস্তির দেহাবরণী ধাতব শৃঙ্খল নির্মিত বর্ম আর ৮০০০-এর অধিক ইস্পাতের প্রাবরণ টুকরো দিয়ে তৈরি যার ২০০০-এর বেশি টুকরো কেবল মাথার আচ্ছাদন নির্মাণেই প্রয়োজন হয়।

দারা দ্রুত ঘোড়া হাকিয়ে আগ্রায় ফিরে আসেন, যেখানে শাহজাহান উদ্বিগ্ন চিন্তে জাহানারার সাথে সংবাদের প্রতিক্রিয়া করছিলেন, তিনি পরাজয়ের শোকে অধীর নিজের সন্তানকে অনুরোধ করেন তার কাছে আসতে কিন্তু দারা লজ্জায় তার মুখোমুখি হন না। তিনি ভোর হওয়া পর্যন্ত নিজের মহলে অবস্থান করেন তারপর স্ত্রী, পুত্র আর তাদের সন্তানদের নিয়ে এবং অনুগত কর্মচারীদের একটি ছোট দল নিয়ে হাতি আর অশ্বের পিঠে করে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করেন। বিশুরু শাহজাহান অনেকগুলো গাধার পিঠে সোনা বোঝাই করে দারার কাছে প্রেরণ করেন এবং দিল্লির সুবেদারকে আদেশ দেন সেখানের রাজকীয় কোষাগার যেন দারার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। জাহানারাও নিজের মূল্যবান অলংকার ভাইয়ের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

মুবরাজ ঠিক সময়েই পলায়ন করেছিলেন। মানুষি পরের দিন আগ্রা থেকে ঘোড়ায় চেপে বের হন দারার সঙ্গী সাথীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবের বিজয়ী বাহিনী দ্বারা নিজের পথ অবরুদ্ধ দেখতে পান, যারা তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করে। তারা তাকে বলে, ‘ইতিমধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে’, এবং ‘আওরঙ্গজেব বিজয়ী হয়েছেন।’ তারা ঠিকই বলেছিল, ‘আওরঙ্গজেবই মূলত সব কিছু নিয়ে করেছিলেন।’ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণিত করে যে, সামুগড়ের যুদ্ধ ছিল ওয়াটারলু কিংবা কালডেনের যুদ্ধের মতোই নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সাধ্যাত্মক, মনীষী, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক, ধর্মীয় গোড়ামি মুক্ত কিন্তু উদ্ভৃত দারা আর কখনোই দক্ষ-যোদ্ধা, অসহিষ্ণু, আক্রমণাত্মক, অনেক বেশি জিন্দুর তার ছোট ভাইদের থেকে প্রত্যুপক্রমের অধিকার লাভ করতে পারেন না এবং যোগল সাম্রাজ্য আর ভারতবর্ষের ইতিহাস যার ফলক্রতিতে একটি ভিন্ন, বিবাদ সৃষ্টিকারী আর চূড়ান্তভাবে বিপর্যয়কারী একটি বাঁক নেয়।



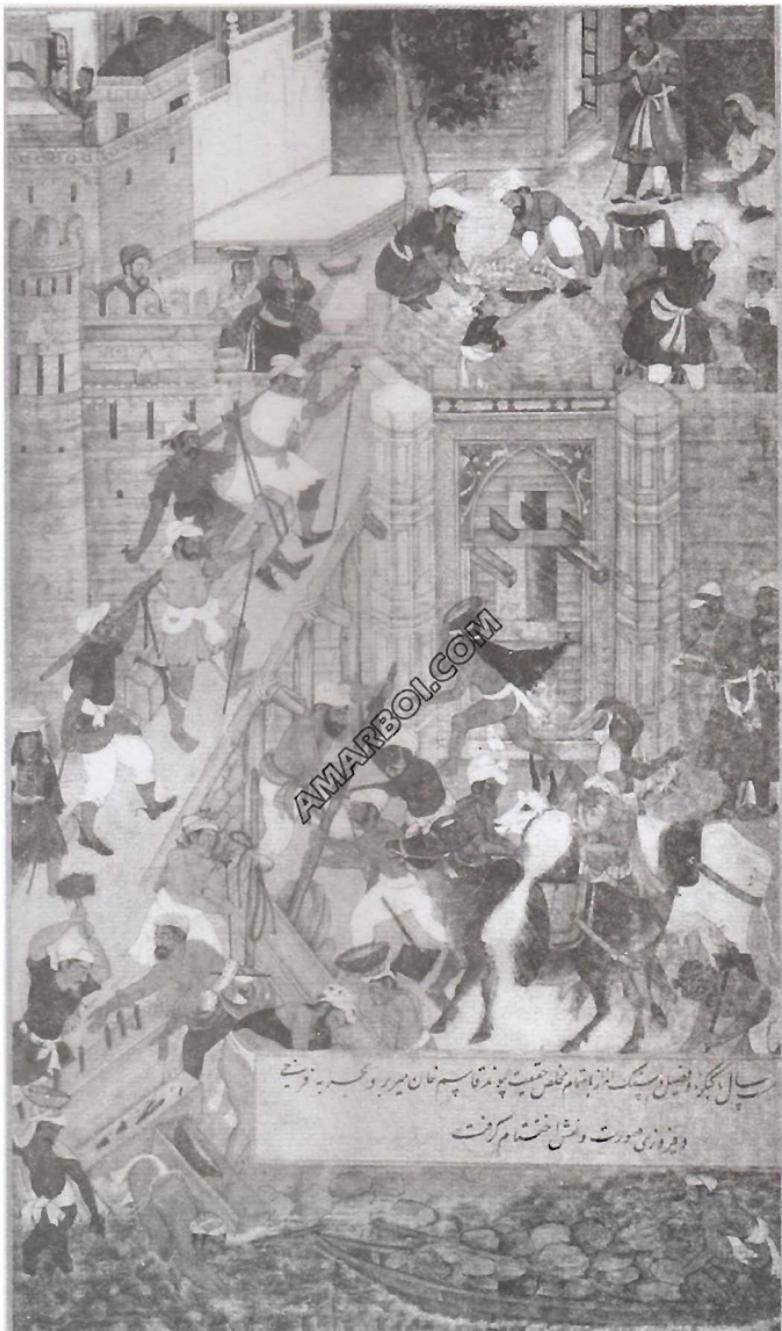
জুন মাসের ১ তারিখে আওরঙ্গজেব আর মুরাদ আগ্রার বাইরে এসে উপস্থিত হন। জাহানারা তার দুই ভাইয়ের সাথে এসে দেখা করেন এবং শাহজাহান আপসমূলক একটি বার্তা পাঠিয়ে দুর্গে এসে তার সাথে দেখা করার জন্য আওরঙ্গজেবকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি সেইসাথে তাকে দ্যুতিময় আর বিখ্যাত তরবারি ‘আলমগীর’, ‘বিশ্বের দখলদার’ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। আওরঙ্গজেব কাঠখোটাভাবে উত্তর দেন, তিনি তখনই দুর্গে প্রবেশ করবেন যদি তার আবাজান সেটা তার কাছে সমর্পণ করেন। শাহজাহান, সংগত কারণেই অস্থীকৃতি জানালে নিজের আবাজানের ভালোমন্দের তোয়াক্তা না করে তিনি দুর্গ অবরোধ করেন। কামান দিয়ে দুর্গের শক্ত প্রাচীর ওঁড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস

ব্যর্থ হলে আওরঙ্গজেব আপাত সরল একটি বুদ্ধির আশ্রয় নেন। তিনি যমুনা থেকে দুর্ঘে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। গ্রীষ্মের প্রথম উষ্ণতায় যমুনার ‘তুষার গলা’ পানির পরিবর্তে দুর্ঘের তিতকুটে, ঈষৎ লোনা পানি পান করতে বাধ্য হলে, যাত্র তিনি দিন পরই শাহজাহান সংকল্পের অভাবের কারণে যা একটি সময় জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে মমতাজকে সঙ্গী করে তার নিজের বিদ্রোহে ইঙ্কন জুগিয়েছিল, অগ্রিমভাবে ভঙ্গিতে বশ্যতা স্থীকার করে নেন এবং দুর্ঘের তোরণধার খুলে দেন।

আওরঙ্গজেব তার আক্রাজান এবং জাহানারাকে হারেমে অন্তরীণ রাখার আদেশ দেয়ন। রৌসনআরাই একমাত্র মহিলা, যাকে দুর্গ ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়। মানুচির ভাষ্য অবস্থারে, যিনি ‘মহা আড়ম্বরের সাথে’ প্রস্থান করেন। আওরঙ্গজেব তিনি দিন পর তার আক্রাজানের সাথে দেখা করতে যাবার একটি ভান করেন। তিনি অবশ্য যখন ঝাঁকজমকের সাথে সজ্জিত হাতির পিঠে আরোহণ করে দুর্ঘের অভিযুক্ত বিজয়ীণ ভঙ্গিতে অগ্রসর হন, তার কাছে সুবিধাজনক হৃষি পৌছায় বা তেমনটা তিনি দাবি করেন যে, শাহজাহানের হারেমের তাতার মহিলা প্রহরীরা তাকে হত্যার সংকল্প করেছে। তার পরিচারকরা শাহজাহানের লিখিত একটি জব করা কথিত চিঠিও উপস্থিত করে, যেখানে তিনি তার প্রিয় পুত্র দারাকে তার অব্যাহত সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। আওরঙ্গজেব সাথে সাথে হাতির মুখ ঘুরিয়ে নেন এবং নিজের মহলে ফিরে যান।

ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মাঝে কঁকে বছর পর একটি উন্ট গল্প ছড়িয়ে পড়ে এবং সেটা সম্ভবত ঘটনা পরবর্তী সংবোধের ফসল, যেখানে দাবি করা হয়, শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে নিয়ে অনেক আগে থেকেই ভীত ছিলেন। গল্প অন্যায়ী মমতাজের বহুবার গর্ভধারণের সময় একবার যখন আপেলের ছোসুম না তখন তার খুব আপেল খাবার শৰ্ক হয়েছিল। শাহজাহান তার জন্য অধীর হয়ে আপেল খুঁজতে গিয়ে একজন ফকিরের দেখা পান, যিনি তাকে দুটো আপেল দেন। তিনি কৃতজ্ঞ শাহজাহানকে বলেন, নিজেকে কখনো যদি তার অসুস্থ মনে হয় তাহলে তিনি যেন তার হাতের আণ নেন। তার হাতে যত দিন আপেলের গন্ধ থাকবে তত দিন তিনি আরোগ্য লাভ করবেন কিন্তু হাত থেকে যখন গন্ধ মিলিয়ে যাবে ‘সেটা হবে একটি হঁশিয়ারি যে, তিনি তার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছেন।’ নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরো কিছু অস্তর্দৃষ্টি লাভ করতে অধীর শাহজাহান ফকিরের কাছে জানতে চান, ‘তার কোন ছেলে তার জাতির বিনাশকের ভূমিকা পালন করবে?’ ফকির উত্তর দিয়েছিলেন, সেটা সম্ভবত আওরঙ্গজেব।

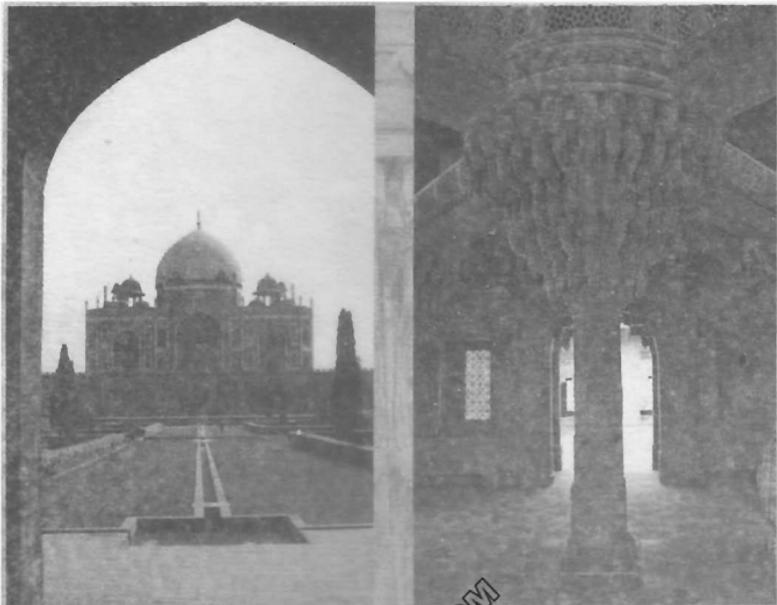
আওরঙ্গজেবের অব্যবহিত উদ্দেশ্য তখন মুরাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করা মিত্র হিসেবে যার প্রয়োজনীয়তা তখন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন পর



سپل بکر افسن پیک لایز بتم ملک سعیت پر زرقا پسم خان بیر و دیگر  
دیگر فرزی درست و نشانه نهاد کرد

ଆଗ୍ରା ଅବସ୍ଥିତ ଲାଲକେଲ୍ଲାର ବିଶାଲାକୃତି ତୋରଣଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ

ଦି ହିନ୍ଦି ଅତ୍ତ ଦୁଆଜମହଲ-୧୯  
ଦୁନ୍ଯାର ପାଠକ ଏକ ହୋ! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~



AMARBOI.COM



উপরে বামদিক থেকে ডানদিকে: হুমায়ুনের মকবরা, দিল্লী; আকবরের দরবারের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, ফতেহপুর সিক্রি। নীচে বাম থেকে ডানে: আকবরের মকবরার তোরণস্থার, সিকান্দ্রা; রাজকীয় হাতেলী, বুরহানপুর দূর্গ

দারাকে ধাওয়া করে তারা দুই ভাই একসাথে রওনা হলে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ লাভ করেন। ২৫ জুনের রাতে, মাঝুরায় যখন তাদের সম্পত্তি বাহিনী শিবির স্থাপন করে, আওরঙ্গজেব তার তাঁবুতে মুরাদকে আমন্ত্রণ জানান এবং তার আত্মপ্রশ়ংস্যী আর অকপট ভাইয়ের সামনে প্রচুর পরিমাণে কড়া সুরা উপস্থিত করেন, যা তিনি নিজে একজন একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে সাধারণত স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন। মুরাদ মাতাল হয়ে খুশি মনে তাকে 'শ্যাম্পু' (শ্যাম্পু, হিন্দি থেকে উন্ন্যব হওয়া একটি শব্দ, যার মানে চুল ধোয়া না চুল মালিশ করা) করতে আসা একজন দক্ষ মেয়ের হাতে সঁপে দেন। নিজের পেশায় দক্ষ অঙ্গসংবাহনকারী রঞ্জনী নিজের কাজ শুরু করায় মুরাদ প্রশ়াস্তির নির্দ্বায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অল্প কিছুক্ষণ পর, পেষল দেহের অধিকারী, ব্যাপকভাবে অস্ত্র সজ্জিত বোজা দেহরক্ষী, যাকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন তাকে প্রহরা দেয়ার জন্য তাকে তাঁবুর বাইরে কৌশলে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। মুরাদ অবশেষে নির্দ্বা থেকে যখন জেগে ওঠেন, তিনি নিজেকে একজন নিঃশরণ বন্দি হিসেবে দেখতে পান। সে রাতেই পরে একই রকম হাওদা বহনকারী চারটা হাতি অস্থায়ী শিবির থেকে উন্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিম দিকে রওনা হয়। খুব কম মেজিই জানত যন্ত্র গতিতে উন্তর দিকে গমনকারী হাতির পিঠে দুর্ভাগ্য মুরাদ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। দিল্লির কাছেই যমুনার মাঝে একটি দীপে বন্দি করে রাখতে হাতিটা তাকে বহন করে নিয়ে চলে।

আওরঙ্গজেব সিদ্ধান্ত নেন তার সমজেকে স্থ্রাট হিসেবে ঘোষণা করার এবার সময় হয়েছে। ১৬৫৮ সালের জুনাই মাসের ২১ তারিখে দিল্লির বাইরে অবস্থিত একটি উদ্যানে অনাড়ুর অনুষ্ঠানটার আয়োজন করা হয়। এই সংক্ষিপ্ততার কারণ একটিই যে, এখনো আওরঙ্গজেবের দুই ভাই বাকি রয়েছেন, যাদের সাথে তাকে একটি সংবিদা করতে হবে—পশ্চিমে রয়েছেন দারা আর শাহ সুজা পূর্বে। দারার সমস্যা বেশি গুরুতর বিবেচনা করে তিনি তার তীব্র ঘৃণার পাত্র তার বড় ভাই দারার পশ্চাদ্বাবন শুরু করেন। দিল্লি থেকে তার পক্ষে যা ধনসম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব তা নিয়ে দারা প্রথমে লাহোরে আশ্রয় নেন, তারপর সিঙ্গু নদ বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সিঁকের দিকে অগ্রসর হন, তার প্রিপাতামহের পিতা হুমায়ুন তার সিংহাসনের দখলদার, শের শাহের কাছ থেকে যখন পলায়ন করেছিলেন তখন ঠিক এই পথ দিয়েই গমন করেছিলেন। দারা বেশ কয়েকবারই ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারতেন কিন্তু তিনি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যদিও আরেকটা বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করলেও বাহিনীটা তখনো যুদ্ধে অনভিজ্ঞ আর তাদের আনুগত্য নিয়ে তার মনে ব্যাপক সন্দেহ ছিল। আওরঙ্গজেব জাল চিঠির ফাদ সৃষ্টি করে তার এই

সন্দেহকে আরো উসকে দেন, যা তার গুণচরণ তার ভাইয়ের শিবিরে গোপনে নিয়ে আসত আর যা তার কোনো সেনাপতিকে দারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনায় জড়িত করে মিথ্যেভাবে প্রতীয়মান হতো। আওরঙ্গজেব একই সময়ে দারার সমর্থকদের উদ্দেশে আসল চিঠি প্রেরণ করতেন, পক্ষ পরিবর্তনের জন্য তাদের উৎকোচের অঙ্গাব দিতেন। দারার বাহিনী এর ফলশ্রুতিতে ভাঙ্গতে আরম্ভ করে। মানুষটি যিনি লাহোরের কাছে দারার সাথে যোগ দিয়েছিলেন, একটি জোরাল ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। দারার ঝীঁ একজন শক্তিশালী রাজার সমর্থন লাভের জন্য তাকে নিশ্চয়তা দেন যে, তাকে তিনি পুত্রবৎ মনে করেন। নিজের কথার ক্ষীকৃতিস্বরূপ তিনি এমন কিছু একটি করেন ‘মোগল সাম্রাজ্য যা পূর্বে কখনো সম্পাদিত হয়নি—তিনি নিজের স্তনস্নাত পান তাকে পান করতে দেন, স্তনস্নয়-শূন্য বিধায়।’ রাজা পান পান করেন এবং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু দারার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য নিয়োগের নিমিত্তে জনবল সংগ্রহের জন্য অর্থ আদায় করে তিনি নিজের রাজ্য নীরবে প্রস্থান করেন।

আওরঙ্গজেব তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মনোবল বেশ ভালোভাবেই ভেঙে দেন। তার পক্ষ থেকে শীঘ্র আর কোনো বিপদের সম্ভাবনাই নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে তিনি দারার সমস্যার সমাধানের তার অন্যদুর্যোগের ওপর অর্পণ করেন এবং নিজের মনোযোগ সুজার প্রতি নিবন্ধ করেন। আর্মিন ১৬৫৮ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ, তাদের আবোজানকে মুক্তি করার অভিথায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করে আগ্রার অভিযুক্ত নিজের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আওরঙ্গজেব তার পুরনো মিত্র মীর জুমলাকে পাশে নিয়ে, তত দিনে তিনি তার ভানকৃত ‘বন্দিদশা’ থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, আগ্রা ও বেনারসের মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গার তীরে, খাওয়াজে শাহ সুজার মুখোমুখি হন। ভীষণ তীব্র লড়াই হয়েছিল এবং আওরঙ্গজেবের সেনাপতিদের একজন, মারওয়ারের রাজা, জশ্যাত্ত সিং স্বপক্ষ ত্যাগের কারণে আওরঙ্গজেব প্রায় পরাজিত হতে বসেছিলেন। তিনি অবশ্য নিজের স্বভাবজাত স্থিরতা বজায় রাখেন, আরো একবার যুদ্ধের গুরুতর বিশৃঙ্খলার মাঝে, নিজের লোকদের মাঝে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে তাদের বিজয়ের দিকে পরিচালিত করতে পুনরায় ঘোড়ায় আরোহণ করার পূর্বে ঘোড়া থেকে নেমে নামাজের নির্ধারিত ওয়াক্তে নামাজের জন্য নতজানু হন।\* শাহ সুজা গঙ্গার ভাট্টিতে পালিয়ে যেতে মীর জুমলা তার পশ্চাক্ষাবন করেন।

\* দারা যখন সমর গড়ের যুক্তি থেকে নেমে আসে এর ভয়ংকর পরিণতি ঘটে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের ওপর, ফলে আওরঙ্গজেবের বাহিনী দ্রুত যুদ্ধে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পনেরো মাসব্যাপী ইন্দুর-বিড়াল খেলার সূচনা হয়, যা বাংলার পূর্ব দিকে আরাকানের জলদস্যু রাজার এশিকায় শাহ সুজা আর তার পরিবারকে ঠেলে দেয়। সেখানে ‘দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর কুমীর ভর্তি অতিকায় নদীর’ মাঝে মানুষ জলাভূমি অঞ্চলটা যেভাবে কম্পিত ভঙিতে বর্ণনা করেছেন, তারা হারিয়ে যায়, সম্ভবত নিহত হয়।

দারা ইত্যবসরে শুজরাটে নিজের বাহিনী পুনরায় সংগঠিত করেন এবং মারওয়ারের রাজা বার্তা প্রেরণ করে প্রতিশ্রুতি দেন, দারা যদি আগা অভিযুক্ত অগ্রসর হন তাহলে তিনি আওরঙ্গজেবের সাথে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য ২০,০০০ রাজপুত যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে তার সাথে মিলিত হবেন। দারা সম্ভত হন, কিন্তু তিনি যখন উত্তর অভিযুক্ত যাত্রা করেন সেখানে রাজার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। তাকে আওরঙ্গজেব মিষ্টি কথায়, হমকি আর উৎকোচ দিয়ে পুনরায় নিজের পক্ষে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আগ্রার পঞ্চিমে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে আজমিরের শহর অভিযুক্ত দারা যখন অগ্রসর হন, যেখানে মমতাজ তাকে জন্ম দিয়েছিলেন এবং আওরঙ্গজেবও তার দিকে দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসায়, তিনি একটি সংকীর্ণ গিরিপথে টেকসই রক্ষণাত্মক অবস্থান নির্বাচন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি তিন দিন প্রাণ্তিরোধ অব্যাহত রাখেন কিন্তু ১৬৯৯ সালের ১৪ মার্চ আওরঙ্গজেবের বাহিনী তার প্রতিরোধ শুরু দেয়।

দারা আরো একবার পলায়ন করেন, নিজের পনেরো বছর বয়সী পুত্র সিপির শুকোহ আর মুষ্টিমেয় কিছু দেহরক্ষা নিয়ে তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। তিনি নিকটেই তার ধনসম্পদের মালামাল নিয়ে অপেক্ষমাণ তার জ্ঞানী, উপপত্নী আর খোজাদের সাথে বিভাগিত কারণে মিলিত হতে ব্যর্থ হন। দারার সাথে তারা পরের দিন মিলিত হন কিন্তু তার নিজের পরিচারকদের দ্বারা মুষ্টিত হবার পরই কেবল সেটা সম্ভব হয় এবং মহিলাদের সমস্ত মূল্যবান রত্নসমূহ কেড়ে নেয়া হয়। অপরিচ্ছন্ন নোংরা ফেরারিয়ে দল দক্ষিণে শুজরাটের আমেদাবাদ অভিযুক্ত দ্রুত অগ্রসর হবার সময় ঘনঘন ডাকাতদের আক্রমণের শিকার হয়, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সেখানেও কোনো আশ্রয় পাওয়া যায় না। আমেদাবাদের সজ্জন নাগরিকরা চিন্তা করে যে, পলাতকদের আশ্রয় দেয়াটা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। দারার সম্ভবত কয়েক দশক পূর্বের আরেকটা তিঙ্ক যাত্রার কথা তখন মনে পড়েছিল, যখন তাকে, তার পিতা-মাতা এবং ভাইবোনকে, আওরঙ্গজেবসহ, শেয়ালের মতো তাড়িয়ে অনুসরণ করা হয়েছিল এবং কোথাও কোনো আশ্রয় খুঁজে পাননি। বার্নিয়ের, দারার পলাতক দলটার সাথে যার ভাগ্যচক্রে দেখা হয়েছিল, বর্ণনা করেছেন কীভাবে ‘মেয়েদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সবার চোখ অঞ্চল হয়ে উঠেছিল।’ দারা নিজেও কেমন ‘জীবিতের চেয়ে মৃতই বেশি’ মনে হয় এবং কী করতে হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্টতই অনিচ্ছিত। ভগ্ন

মনোবল আর নিজের পূর্বেকার আত্মবিশ্বাস এবং ঔন্ধত্য পুরোপুরি অনুপস্থিত, তিনি তখন ‘থেমে থেমে সাধারণ সৈন্যের সাথে পর্যন্ত আলোচনা করেন’ তিনি অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন, সিক্রে রান অব কচ্ছের মরুভূমি আর বিশাল লবগান্ত জলাভূমির মাঝেই তারা কেবল নিরাপদে থাকতে পারবেন। তার সঙ্গের একজন মহিলার পা মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় তিনি চান, বার্নিয়ের তার সাথে থাকুন কিন্তু তিনি ডাঙ্কারের জন্য কোনো বাহনের বন্দোবস্ত করতে ব্যর্থ হন। বার্নিয়ের নিজের জন্য অভুহাত সৃষ্টি করেন।

দারা রান অব কচ্ছ অতিক্রম করতে সফল হন এবং পারস্যের পশ্চিমে অভয়স্থল খুঁজে পাবার আশা করেন, কিন্তু এমন সময়ে ফ্লাণ্টি আর আমাশয়ের কারণে দুর্বল তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী নাদিনা বেগম, দৈহিকভাবে ডেঙে পড়েন এবং মারা যান। তার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্য লাহোরে প্রেরণ করেন, বিমৃঢ় দারা এক আফগান গোত্রপতির নিকট শরণ খুঁজে পান, যার জন্য কয়েক বছর পূর্বে তিনি শাহজাহানের কাছে তার জন্য অনুহাত লাভ করতে মধ্যবর্তীতা করেছিলেন এবং তাকে হাতির পায়ের নিচে পদদলিত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। দারা যেমন ডেবেছিলেন গোত্রপতি মোটেই সে রকম কৃতজ্ঞ কিংবা সম্মান্য ছিলেন না এবং কয়েক দিন পরই তিনি দারা এবং তার পরিবারকে বন্দি করেন। তিনি দারা আর সিপারকে চারদিক ঘেরা হাওড়ায় করে দিল্লি প্রেরণ করেন, যেখানে মৃত্যু কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই আওরঙ্গজেব পূর্বেকার অনুন্ধত আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষতি পূর্ষিয়ে নিতেই হয়তো মোগল মানদণ্ডের কাছেও এমনকি জঙ্গলনীয় জাঁকজমকের দৃশ্পটের মাঝে ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৬৫৯ সালের আগস্টের ২৩ তারিখ বন্দিরা শহরে পৌছায় এবং ছয় দিন পর দিল্লির সড়কে রোগাক্রান্ত হাতির পিঠে শতচিন্ম পোশাক পরিয়ে আওরঙ্গজেব তাদের প্রদর্শিত করেন। দারা মাথা নিচু করে নির্বিকারভাবে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন এবং ভিড়ের মাঝে লোকজন প্রকাশ্যে অক্ষ বিসর্জন করেন এবং তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যে গোত্রপতি তার প্রতি বিষ্ঠা আর অভিশাপ বর্ষিত হয়। বার্নিয়ের, যিনি ইতিমধ্যে দিল্লি ফিরে এসেছিলেন এবং ‘লজ্জাকর শোভাযাত্রা’ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আতঙ্কিত হন যে, ডয়ংকর কোনো ঘটনা ঘটতে চলেছে।

তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন। আওরঙ্গজেব বন্ততপক্ষে হত্যা করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু তাকে সে জন্য সত্যতা প্রতিপাদন করতে হয়। তিনি পরিষদমণ্ডলীর সভা আহ্বান করে নিজের বক্তব্যে অটল থাকেন, ইসলামকে দমন করতেই দারা শাহজাহানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তার ভাই ‘সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিরীশ্বরবাদ আর নাস্তিকের ঝীতির পুনঃপ্রচলন’

করেছিলেন এবং 'মুসলমানের কোনো সাদৃশ্যই ছিল না।' দারার ধর্মীয় সারঞ্জাহিতার জন্য আওরঙ্গজেবের ক্ষোভ বহু পুরাতন আর অকৃতিম। দারার হিন্দুধর্মের প্রতি আগ্রহকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং তার ভাইকে ধাওয়া করার বিষয়টি কিছুটা হলেও এক ধরনের জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ছিল। দারার উৎপথগামিতা, অবশ্য ভীষণ সুবিধাজনকও ছিল। পরিষদমণ্ডলীর সভায় আওরঙ্গজেব আলোচনা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যে, তিনি এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, ভাইয়ের নির্বাসনই তার একমাত্র কাম্য, যখন তিনি কঠোর সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার দায়িত্ব অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে তিনি পরবর্তী সময়ে দাবি করতে সক্ষম হন, প্রথম এলিজাবেথের তার আতীয় সম্পর্কিত বোন স্কটল্যান্ডের রানি মেরিয়ে মৃত্যুদণ্ডের প্রতি প্রদর্শিত মনোভাবের সদৃশ, যে অন্যেরা দারার মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি জোর করে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। উপর্যুক্ত পরিষদ প্রায় সর্বসমতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, দারার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য এবং দারার মৃত্যুদণ্ড যারা সবচেয়ে উচ্চেষ্ঠবরে তিচ্কার করে দাবি করেছিল তাদের ভেতরে অন্যতম মমতাজের ভাই, তার চাচাজান, শায়েস্তা খান, যিনি শুরু থেকেই গোপনে আওরঙ্গজেবকে দুর্কর্মে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন।

মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর করা হয়। জনসাধারণের সামনে দারার লজ্জাজনক প্রদর্শনীর পরের দিন, তার কারা কুর্যানিতে ক্রীতদাসের দল প্রবেশ করে তার কিশোর পুত্র সিপির তকোহকে তার পাশ থেকে টেনে সরিয়ে নেয় এবং কোনো ধরনের ভনিতার আশ্রয় না নিয়ে দারার তখনো সুদর্শন মন্তককে দেহের আশ্রয় থেকে আলাদা করে দেয়। যুবরাজের তখনো রক্ত নির্গত হতে থাকা কবক দেহটা বাজারের ভেতর দিয়ে হাতির পিঠে করে হৃষ্মাযুনের মকবরায় সমাধিস্থ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তার ছিন্ন মন্তক আওরঙ্গজেবের কাছে পাঠানো হয়। দ্রুত গঁজের সৃষ্টি হয়। মানুষিচি, দারা তাকে একটি দুর্গের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে পেছনে রেখে এসেছিলেন এবং তিনি সেই সময়ে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন না, হলফ করে দাবি করেছেন যে, উল্লিঙ্কিত আওরঙ্গজেব তার হাতের তরবারি দিয়ে ছিন্ন মন্তকে আঘাত করেছিলেন এবং তারপর সেটাকে একটি রেকাবে সাজিয়ে আগ্রায় শাহজাহানের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। Grand Guignol-এর এই আচরণের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে অনেক বেশি যুক্তিসংগত আওরঙ্গজেবের নাকচ করে দেয়া মন্তব্যের বিষয়ে প্রাণ মোগল ভাষ্য এই যে, তিনি যেহেতু এই নাস্তিকের মুখ বেঁচে থাকতেই যখন দেখার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি তখন এখন তা দর্শনের কোনো অভিপ্রায় তার নেই।

আওরঙ্গজেব সিংহাসনের সম্ভাব্য অবশিষ্ট দাবিদারদের দ্রুততার সাথে মোকাবিলা করেন। তার কারারুক্ত ভাই মুরাদের ক্ষেত্রে, মুরাদ সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হবার জন্য তার প্রচেষ্টা শুরু করার প্রাথমিক পর্যায়ে নিজের অর্থমন্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন এ বিষয়টি তিনি নির্মমভাবে ব্যবহার করেন। আওরঙ্গজেব নিহত মন্ত্রীর পরিবারকে ন্যায়বিচারের জন্য বিনয়ের সাথে আমন্ত্রণ জানান। মুসলিম শরিয়া আইনের অধীনে যা তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ অথবা যদি তারা এতই নাছোড়বাদ্দা হয়, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দাবি করার অনুমতি তাদের দিয়েছে। নিহত মন্ত্রীর জ্যোষ্ঠ পুত্র যখন আর্থিক বা শারীরিক উভয় অথেই ক্ষতিপূরণ অব্দেষণ প্রত্যাখ্যান করে, দ্বিতীয় পুত্র, সন্দেহাতীতভাবে উৎকোচ গ্রহণ করেছিল, আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করলেও মুরাদের মৃত্যু দাবি করে এবং ১৬৬১ সালের ৪ ডিসেম্বর মুরাদের প্রাণদণ্ডনেশ কার্যকর করা হয়। আওরঙ্গজেব নিজের স্বত্বসিদ্ধ রীতিতে বড় ভাইকে 'রক্তের জন্য নিজের দাবি প্রয়োগে ব্যর্থতার' জন্য পুরস্কৃত করেছিলেন। দারার জ্যোষ্ঠ পুত্র এবং শাহজাহানের প্রিয় নাতি, সুলেমান শুকোহ, পাঞ্চাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু ঠিক তার আকুজানের মতোই, তার আশ্রয়দাতাই তাকে আওরঙ্গজেবের উৎসুক হাতে তুলে দেয়। আওরঙ্গজেব তাকে বাধ্য করেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পোতা—পপিফুলের একপ্রকার নির্যাস—পান করতে, যা তার শরীরে আর ঘনকে নিঃশেষ করে ফেলে এবং জীবন্ত করে তোলে, তাকে হত্যা করা হয়। সুলেমান শুকোহের নিজের অপ্লবয়সী পুত্রের আগেই অবশ্য আওরঙ্গজেবের আদেশে হত্যা করা হয়েছিল। দারার আরেক পুত্র, কিশোর সিন্দির শুকোহ, কেবল বেঁচে থাকেন, আওরঙ্গজেব তাকে গোয়ালিয়ার টুর্পের মজবুত হস্তিদ্বার আর উঁচু বেলে পাথরের নিরাপত্তা প্রাচীরের অস্তরালে অস্তরীণ করে রাখেন। আওরঙ্গজেব, চৌদ্দ বছর পরে, এই বন্দির সাথে নিজের এক কল্যান বিয়ে দেন। আওরঙ্গজেব একই সাথে নিজের পুত্র সুলতান মুহাম্মদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, বেচারা সামান্য সময়ের জন্য আর হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে নিজের আকুজানের বাহিনী পরিত্যাগ করে তার চাচাজান শাহ সুজার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব তাকে তার যৌবনের অবশিষ্ট চৌদ্দ বছর কারাগারে বন্দি করে রাখেন।



দারার মৃত্যু সংবাদে শাহজাহান 'সান্ত্বনাতীত শোকে' আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। মমতাজ আর তার ভেতরে বিদ্যমান পরম, পবিত্র ভালোবাসা তাদের সন্তানদের মাঝে আরোপিত হয়নি এই তিক্ত ভাবনাটা নিশ্চয়ই তাকে জারিত করেছে। পারিবারিক অনুভূতিতে ঘৃণা আর দৰ্শা এমনভাবে ছাপিয়ে যায় যে, তাদের দুজন সন্তানের নির্মম হত্যাকাও, ত্রৃতীয়জনের অস্তর্ধান আর প্রিয়তম পৌত্র,

আর প্রপৌত্রদের ধৃৎসের সর্বোচ্চমাত্রা স্পর্শ করে । শাহজাহান সম্ভবত দারাকে এককভাবে মনোনীত করে তার অন্য সন্তানদের অবহেলা করার জন্য নিজেকেই দায়ী করেছিলেন । তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করতেন, প্রথাটার ভেতরেই খুত রয়েছে, যা জ্যেষ্ঠকে স্পষ্টতই আলিঙ্গন করার পরিবর্তে সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে অংশ নেয়ার দক্ষতা আর যোগ্যতাসম্পন্ন রাজবংশের যেকোনো যুবরাজকে নীরবে অংশ নিতে উদ্বৃদ্ধ করে । সর্বোপরি তিনি নিজে কি সেটাই করেননি?

আগ্রা দুর্গে:: ওপর নির্মিত মর্মরের ছাউনি যেখান থেকে যমুনা দেখা যায়, যা তিনি নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন, সেখানেই শাহজাহান তার জীবনের শেষ বছরগুলো অত্তীরণ হিলেন । তিনি সেখান থেকে নদীর বাঁকের ওপারে তাজের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন । নদীর ওপর ঝুলে থাকা একটি বুরুজে নির্মিত তামার অট্টজাকৃতি গম্ভীরযুক্ত দালান থেকে তিনি সেরা দৃশ্যটা অবলোকন করতে পারতেন । রত্ন দিয়ে কারুকাজ করা দেয়াল আর স্তম্ভে দারুণভাবে খোদাই করা আন্দোলিত নার্গিসের ড্যাডো আর মার্জিতভাবে খোদাই করা একটি মর্মরের জলাধারযুক্ত আবাসস্থল, যা তার নির্মিত সব মহলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ।

জাহানারা তাকে সাম্রাজ্য দিতেন, তার সাম্রাজ্য বন্দিত্ব বরণকারী তার একনিষ্ঠ আর সব সময়ের সঙ্গী, কিন্তু এসব কিছুই আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে নমনীয় করতে পারেনি । নতুন স্ম্যাট নিজের আক্রমণান্বেষণের ওপর পর্যায়ক্রমে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, কখনো তিনি লেখাবার সামগ্রী তার কাছে মহার্ঘ করে তোলেন । তিনি চেয়েছিলেন তার আকাজান নিজের প্রিয় রত্নসমূহের ভাণ্ডার তার কাছে সমর্পণ করুন । তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন, একজন বন্দি যিনি অবসর জীবন যাপন করছেন তার এসবের কোনো প্রয়োজন নেই এবং বিশেষ করে শাহজাহানের মোতির তসবি তিনি কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন । শাহজাহান প্রত্যন্তে জানান, তিনি নিখুতভাবে বাছাই করা একশ মোতির তসবি হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন কিন্তু কিছুতেই সেটা তার হাতে তুলে দেবেন না । তসবিটা শেষ পর্যন্ত অবশ্য তার কাছেই থাকে ।

শাহজাহানের কারাকুন্ড জীবনের প্রথম বছরে, পিতা-পুত্রের মাঝে অবশ্য চিঠিটির আদান-প্রদান হয়েছিল, শাহজাহানের চিঠিগুলো ছিল ভর্তসনা আর নিদায় ভরা । অন্যদিকে আওরঙ্গজেবের চিঠিতে নিজের শুভ অভিধায়ের সত্যতা প্রতিপাদনের প্রয়াস । একটি চিঠিতে, অবহেলিত সন্তানের গভীর বেদনায় জারিত হয়ে তিনি কাঠখোটা ভঙ্গিতে উল্লেখ করেন, ‘আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছিল যে, মহামান্য স্ম্যাট আমাকে ভালোবাসেন না ।’ শাহজাহান নিজের ভাইদের হত্যার আদেশ দেয়ায় তিনি একই সাথে নিজের পিতাকে বিদ্রূপাত্মক

ভঙ্গিতে খোঁচা দিয়েছেন : ‘মহামান্য স্মার্ট খসরকে এখনো কি কোনো নামে অভিহিত করেন না...স্মার্ট হিসেবে আপনার অভিষেকে অনেক পূর্বেই যে অস্তিত্বহীনতার রাজ্য বিশীন হয়ে গেছে এবং যার কাছ থেকে আপনার কোনো ধরনের অপমান বা ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না?’

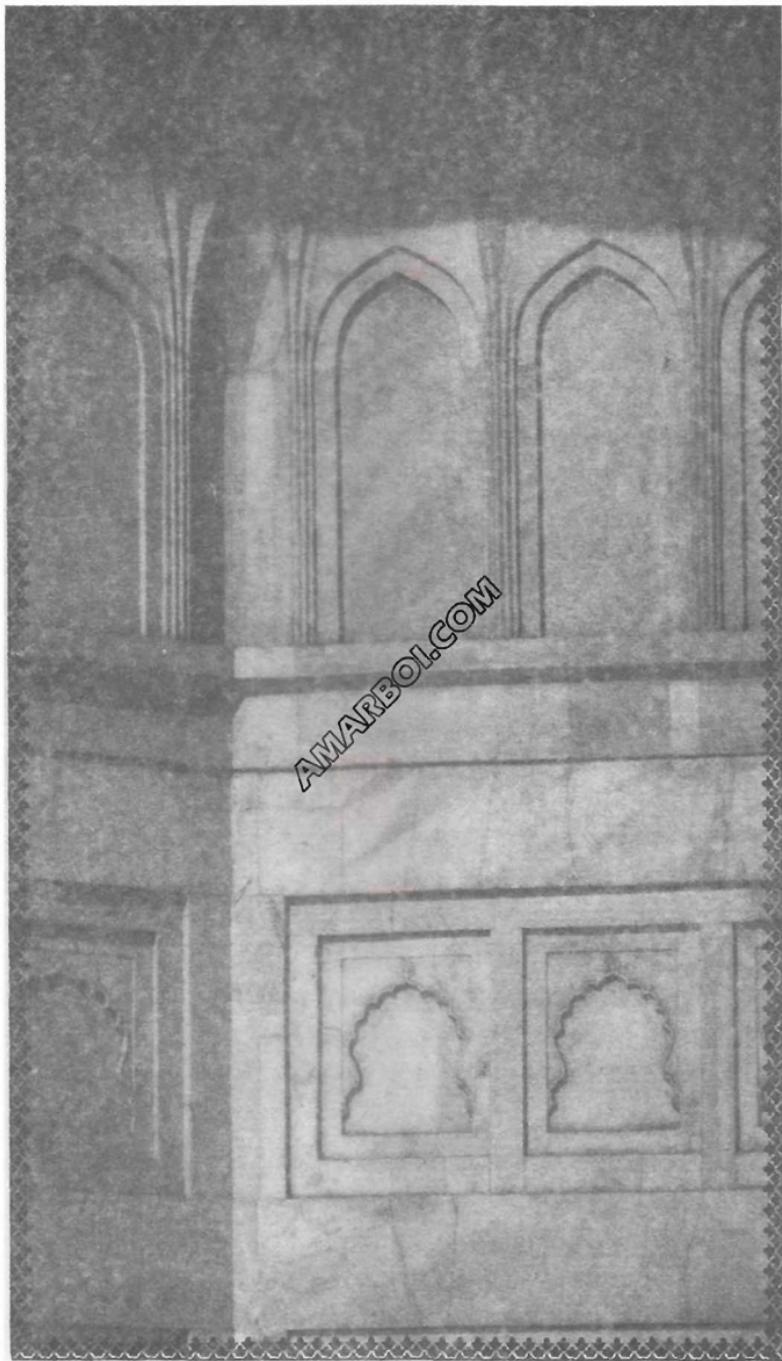
তার অন্তরীণ জীবনের বছরগুলো সম্পর্কে তিনি কীভাবে সেখানে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এর পরম্পরাবিরোধী ভাষ্য পাওয়া যায়। বার্নিয়েরের ভাষ্য অনুসারে, জাহানারাই কেবল নন, শাহজাহানকে তার ‘সমস্ত জেনানাকুল যাদের ভেতরে নতকী আর গায়িকা ও রাঁধুনিরাও ছিল’, সবাইকে তার সাথে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। মানুষ অবশ্য দাবি করেছেন, আওরঙ্গজেব নিজের আক্রোশমূলক কর্মকাণ্ড বজায় রেখেছিলেন, যার ভেতরে ছিল একটি বিশেষ গবাক্ষ ইটের দেয়াল গেঁথে বক্স করে দেয়া, যেখান থেকে বৃক্ষ স্মার্ট যমুনার জলের শাস্ত স্নোতের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর নিঃশব্দে ময়তাজের মকবরার কথা নিবিট মনে ভাবতে পছন্দ করতেন।

১৬৬৬ সালের গোড়ার দিকে, শাহজাহান জুর, আমাশয় আর প্রস্তাবের জালাময়ী উপসর্গ—তার সন্তানেরা সিংহসনের জন্য লড়াই শুরু করার অব্যহিত পূর্বের সেই একই উপসর্গে পুনরায় অসুস্থ ঝঁঝঁ পড়েন। ইউরোপীয় একটি ভাষ্যে রোগের কারণ হিসেবে পুনরায় ক্ষয়াদীপক বস্ত্রের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়েছে : ‘মহান মোগল স্মার্টের ক্ষয়াদ উপায়ে যৌন-কামনাকে উদ্ধীপিত করার চেষ্টাই, যা ৭২ বছর বয়স ক্ষয়ের কারণে তার মাঝে প্রাকৃতিকভাবেই হ্রাস পেতে শুরু করেছিল, তার নিজের মৃত্যুকে তুরাবিত করে।’ মালিশ বা তার মৃত্যুনালিনির বাধা অপসারণকারী একটি শল্যচিকিৎসায়ও শাহজাহান কাঞ্চিত ফলাফল লাভ করতে ব্যর্থ হন। তার জীবনের মাঝে বৃক্ষ পায় এবং সেইসাথে প্রবল পানির পিপাসার সৃষ্টি হয়। কিছু ভাষ্য অনুসারে, শাহজাহান যথন অনুধাবন করেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন, তখন তিনি অনুরোধ করেন তাকে পার্শ্ববর্তী একটি বারান্দায় নিয়ে যেতে, যেখান থেকে তিনি আরেকটু সহজে তাজমহল দেখতে পাবেন। সেখানে সেই বারান্দায়, কোমল কাশ্মীরী কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত অবস্থায় এবং পাশে ক্রন্দনরত জাহানারার উপস্থিতিতে, ১৬৬৬ সালের ২২ জানুয়ারি ভোরের কোনো একটি সময় তিনি ইন্দোকাল করেন। পরিচারকরা কর্গুর জলে গোসল করিয়ে, ধূসর একটি কাফনের কাপড় দিয়ে তাকে মুড়ে দেয় এবং চন্দনকাঠের একটি শবাধারে তার শবদেহটা শায়িত করে। পরের দিন সকালবেলা, প্রথা অনুসারে, মাথার দিকটা সামনে রেখে একটি সদ্য খোলা ভূগর্ভস্থ দরজা দিয়ে তাকে নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শোকার্তদের একটি ক্ষুদ্র দল তার শবাধারটা নৌকায় করে যমুনার অপর তীরে নিয়ে যায়।

জাহানারা একটি 'সম্মানজনক আর যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া'র পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। আওরঙ্গজেব রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আয়োজনের অনুমতি দেননি। বৃক্ষ স্ম্রাটকে, তার পরিবর্তে, মোনাজাতের মৃদু উজ্জনের মাঝে তাজমহলের মার্বেলের ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে দ্রুত আর নিঃশব্দে মহতাজের পাশে সমাহিত করা হয়।

সময়ের আবর্তের সাথে, একটি সময় এখানে সংক্ষিপ্ত সমাধিলিপি এবং স্বল্পমূল্যের রত্নপাথর দিয়ে উৎকীর্ণ উজ্জ্বল পুষ্পের নকশা করা একটি সৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়। সৃতিস্তম্ভের সরাসরি ওপরে মূল মকবরা কক্ষে আরেকটা পুষ্পের নকশাখচিত সৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়। মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে, উভয় সৃতিস্তম্ভের উপরিভাগে গর্বিত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান কলমদানির উপস্থিতি মানে সেটা একজন পুরুষের সৃতির উদ্দেশে নিবেদিত ঠিক একইভাবে মহতাজের সৃতিস্তম্ভের ওপর রাখিত পাতলা, করবিত নকশার ফ্রেমে বাঁধানো লেখার স্লেটের অর্থ সেখানে একজন মহিলা চিরশয্যায় শায়িত রয়েছেন।

AMARBOI.COM



## পঞ্চদশ অধ্যায়

### তথ্ত-ই-তাউসের নিপতন

আওরঙ্গজেব, যিনি শোকের সাদা আলখাল্লা ধারণ করেছিলেন, তার আবরাজানের ইন্তেকালের দুই সঙ্গাহ কাল অতিবাহিত হবার পরই কেবল দিন্তি থেকে আগ্রায় তার পিতা-মাতার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। তিনি সম্ভবত কোনো ধরনের রাজনৈতিক অস্ত্রিতা সৃষ্টি হয় কি না দেখতে চেয়েছিলেন। আগ্রায় পৌছে, তিনি তাজমহল জিয়ারত করেন, দরিদ্রদের মাঝে দানসামগ্রী বিতরণ করেন এবং শোকের সব ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

তিনি তার বড় বোন জাহানারার সাথে দ্রুত আর পুনরায় মীমাংসা করে নেন। জাহানারা আপাতদৃষ্টিতে তাদের আবরাজানেন্তর্প্রাপ্তি আওরঙ্গজেবের আচরণ ও মনোভাব ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। একান্ত সুইচ বয়সী রাজকন্যার ক্ষমতা আর মনোহারিতা এতটাই ছিল যে, রোশেন্সারাকে সরিয়ে তিনি নতুন সন্ত্রাটের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবিভীর্ণ হন। জাহানারা নিজের অবস্থান এতটাই সুরক্ষিত বলে অনুভব করেন যে, তিনি আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় বিশ্বাসের গোড়ামির সাথে তাল মিলিয়ে জনসাধারণের জীবনে তার ক্রমাগত কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপকে প্রশংসন করার মতো সাহস দেখান। আওরঙ্গজেব দরবারে গান-বাজনা, কবিতা চর্চা নিষিদ্ধ করেন এবং তার রাজত্বকালের দিনপঞ্জির রচয়িতাও নিষিদ্ধ করেন এই অজুহাতে যে, সেটা একান্তই আত্মাভিমানী একটি বিষয়। তিনি ঝরোকা বারান্দায় প্রত্যুষে প্রজাদের সামনে সন্ত্রাটের দর্শন দানের প্রথার সাথে পৌত্রলিঙ্কতার মিল রয়েছে বলে সেটা বাতিল করেন। তিনি গাঁজা, মদ ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্রক্ষ নিষিদ্ধকরণে অন্য শাসকদের মতো, যারা এসব নীতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিল তাদের মতোই সাফল্য লাভ করেন।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোড়ামি আর বিধান অনেকাংশেই অলিভার ক্রমওয়েলের পিউরিটানিজমের সাথে তুলনীয়, যিনি এর কিছুদিন পূর্বেই ইংল্যান্ডে ক্রিসমাসের

সময় আনন্দ-ফুর্তি করা এবং ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি নাটক আর মেপোল নৃত্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। ক্রমওয়েলের ন্যায়, পৌর্ণলিকতার প্রতি নিজের ঘৃণার কারণে আওরঙ্গজেব অন্য ধর্মের মৃত্তি আর ভাস্কর্যের আকৃতিনাশ করেন। হিন্দু মন্দিরের মৃত্তিশুলো ছিল তার মূল লক্ষ্য। আগ্রার নিকটে মথুরায়, হিন্দুদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান হিসেবে যা ভীষণ পবিত্র, তিনি আরো কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে আক্ষরিক অর্থেই হিন্দু তীর্থস্থানের ওপর তিন-গম্বুজবিশিষ্ট দুর্গসন্দৃশ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র শহর, গঙ্গার তীরবর্তী বেনারসে, তিনি হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির ওপর বিশাল একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের ২২৫ ফিট উঁচু মিনার শহর আর সেখানের আনুষ্ঠানিক শবদাহ করার ঘাটের ওপর জাকিয়ে বিরাজ করছিল।

১৬৭৯ সালে আওরঙ্গজেব ১১৫ বছর পূর্বে আকবরের নিষিদ্ধ করা জিজিয়া কর বা ‘নাস্তিক’দের ওপর আরোপিত ধাজনা পুনঃপ্রবর্তন করলে জাহানারা তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আবেগময় ভাষায় প্রতিবাদ জানান। তিনি তার ভাইয়ের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়কে বিরূপ করে তুলে এই প্রথাটার সম্ভাজ্যকে বিভক্ত করে ফেলবে। মানুষের ভাষ্য অনুসারে, আওরঙ্গজেব কোরআন শরিফ থেকে উদ্ভৃতি দিয়ে নিজের কর্মকাণ্ডের যথার্থতা প্রতিপাদন করেন এবং তারপর ‘তাকে বিদায় জানান এবং তার দিকে পিঠ দিলে ঘূরে দাঁড়ান, এমন একটি আচরণ যা রাজকন্যাকে দ্রুত নিজের অবস্থানে স্বুরাতে সহায়তা করে।’

সেই একই বছর, আওরঙ্গজেব মোগলদের অন্যতম মিত্র—রাজপুতদের, বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে দিহ্নি থেকে রওনা দেন। তিনি এরপর যদিও আরো সাতাশ বছর জীবিত থাকেন কিন্তু নিজের রাজধানীতে তিনি আর ফিরে আসেন না। জাহানারা আঠারো মাস পর, সাতষষ্ঠি বছর বয়সে, ১৬৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আওরঙ্গজেব তাকে মরণোত্তর ‘শাহিবাত-উজ-জামানী’, ‘সময়ের নিয়ন্ত্রক নারী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। দিহ্নিতে এক সুফি সাধকের দরগার নিকটে একটি মাঝুলি সমাধিতে ময়তাজের প্রিয়কন্যাকে সমাধিস্থ করা হয়। জাহানারা ফার্সি ভাষায় লেখা তার একটি কবিতায় যেমন অনুরোধ করেছিলেন ঠিক তেমনই তার মর্মরের শবাধারের ওপর ঘাস রোপণ করা হয় :

আমার সমাধিকে কেবল যেন ঘাসই আবৃত করে রাখে;  
ধৈর্যশীলদের সমাধির সেরা আচ্ছাদন কেবলই ঘাস

রাজপুতদের ওপর আরো সরাসরি শাসনব্যবস্থা আরোপের অভিপ্রায়েই আওরঙ্গজেব রাজস্থান অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি মারওয়ারের

(জোধপুর) রাজার মৃত্যুবরণ করার পরে জন্ম নেয়া এক নবজাতককে তার উন্নতরাধিকারী হিসেবে রেখে গেলে সৃষ্টি রাজনৈতিক শূন্যতাকে অভিযানের অঙ্গুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি দ্রুত মারওয়ার দখল করে নেন এবং সেখানের অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে অধিবাসীদের মাঝে ব্যাপক বিরোধিতার জন্ম দেন। মেওয়ারের (উদয়পুর) প্রতিবেশী রাজ্য তরুণ শাহজাহানের কাছে পরাষ্ট হবার পরই কেবল অনীহার সাথে আর নামেমাত্র মোগল অধিরাজত্ব মেনে নিয়েছিল। মারওয়ার দখলের পর মেওয়ারের সাথে আন্তঃসীমান্ত সংঘাতের সূচনা হয় এবং সবচেয়ে স্বাধীন রাজপুত রাজ্য আর মোগলদের মাঝে আরো একবার লড়াই শুরু হয়। মেওয়ারের সাথে যদিও অঠিরেই এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু ত্রিশ বছর পরও মারওয়ারের বিশৃঙ্খলা আর বিছিন্ন গেরিলা যুদ্ধ একেবারে স্থিতি হয় না, যখন আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলরা মারওয়ারের রাজার মৃত্যুর পর ভূমিত্ত হওয়া সন্তানকে শেষ পর্যন্ত শাসক হিসেবে স্বীকৃত করতে বাধ্য হয়।

মেওয়ার আর মারওয়ারের মাঝে সংঘর্ষের একটি অনিবার্য পরিণতি— মাগলদের সাথে হিন্দু রাজপুতদের মৈত্রীতে ভাঙ্গন, যা ছিল আকবর আর তার উন্নতরসূরিদের শাসনের প্রধান অবলম্বন, যেরো তাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিপাদনের পাশাপাশি তাদের সম্প্রদায়ের চৌকশ সৈন্য আর সেনাপতি মোগলদের সরবরাহ করত। অধিকক্ষে রাজপুতদের সাথে চলমান লড়াইয়ের কারণে আওরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র ফেরেশ বছর বয়সী আকবরকে বিদ্রোহী হতে অনুপ্রাণিত করে। মানুচির ভাস্তু অনুসারে, আওরঙ্গজেবের পুত্রদের ভেতরে তিনি ছিলেন ‘সবচেয়ে সাহসী আর সবচেয়ে উচ্ছ্বেল’। তিনি সেইসাথে আবার তার আকবাজানের প্রিয়পাত্রও বটে। সে যা-ই হোক, আওরঙ্গজেব মেওয়ারে যুদ্ধের বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে আকবরকে অপসারিত করেন, কারণ তার সাফল্য লাভে ব্যর্থতা। আকবর যখন তার আকবাজানের অসম্ভৃতির সম্মুখীন, তখনই রাজপুতরা তার সাথে যোগাযোগ করে এবং পরামর্শ দেয় আকবরের পক্ষে তার আকবাজানকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং তার প্র-প্রপিতামহ আর একনামা সন্ত্রাউ আকবরের রাজত্বের অনুকরণে একটি নতুন আরো সহিষ্ণু রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই হবে তাদের উভয়ের স্বার্থের জন্য মঙ্গলজনক। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রধান অনাধিকারিক দিনপঞ্জির রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, ‘অনভিজ্ঞ যুবরাজ সততার পথ থেকে বিপর্যামী হন এবং যৌবনের উচ্ছ্বেলতা আর লোলুপতার কারণে রাজপুতদের ফাঁদে আটকে পড়েন।’

আকবরের বিদ্রোহ প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য লাভ করবে বলে আপাতভাবে প্রতীয়মান হয়। তার আর রাজপুতদের অধীনে বিশাল শক্তিশালী একটি বাহিনী থাকায়, আকবর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন যে তিনি আরাধ্যবস্ত্র

ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন। তিনি কালক্ষেপণ শুরু করেন। আওরঙ্গজেব তার চিরাচারিত ছলনার আশ্রয় নিয়ে তার ছেলের লেখা একটি চিঠি অনেকটা যেন দৈবাং রাজপুতদের হাতে তুলে দেন। আওরঙ্গজেব চিঠিতে আকবরকে খিথ্যাই অভিনন্দন জানান রাজপুতদের সাথে নিজেকে একীভূত করতে সফল হওয়ায় ‘যেমনটা তাকে করতে বলা হয়েছিল’ এবং আরো যোগ করেন ‘যে তার উচিত এই সাফল্যকে পূর্ণতা দিতে রাজপুত বাহিনীকে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে আসা, যেখানে তারা’ মোগল বাহিনীর ‘গোলাবর্ষণের আওতায় অবস্থান করবে।’ চিঠিটা তার কাঞ্চিত ফলাফল লাভে সিদ্ধ হয়, আকবরের বাহিনী ছত্রপদ হয়ে যায়। আকবর নিজে দাক্ষিণাত্যের দিকে পালিয়ে যান।

আওরঙ্গজেব নিজের বিপথগামী সঙ্গানকে বন্দি করতে এবং সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলকে শেষ পর্যন্ত দমন করার পৈতৃ অভিপ্রায় নিয়ে অহসর হন। নিজের জ্যোষ্ঠ কন্যা, কবি-রত্ন জেবুন্নিসার চিরস্ময়ী কারাদণ্ডের আদেশ দেয়ার জন্য কারণ জেবুন্নিসা গোপনে আকবরকে সমর্থন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, পথে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতি করার পর তিনি তার বাহিনী নিয়ে সোজা দক্ষিণ অভিযুক্ত যাত্রা করেন। সেখানেই তিনি তার জীবনের আর রাজত্বকালের অবশিষ্ট ছাবিশ বছর নিরস্তর যুদ্ধ প্রয়াসে অতিবাহিত করেন।

আকবর মারাঠাদের নিকট দাক্ষিণাত্যে তাদের পার্বত্য শুপ্তিস্থানে শরণ প্রার্থনা করেন। আওরঙ্গজেবের জন্য যুদ্ধবাজ মারাঠারা বহুদিন ধরেই একটি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছিল। মোগলদের বিরুদ্ধে তারা তাদের পূর্ববর্তী গোত্রপতি শিবাজির নেতৃত্বে নিরবচ্ছিন্ন প্রেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। ১৬৬৩ সালে, শিবাজি চালাকি করে পুনায় প্রবেশ করেন, যেখানে মোগল সেনা ছাউনির নেতৃত্বে ছিলেন মহতাজ মহলের ভাই শায়েস্তা খান। স্বয়ং শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠারা রাতের অক্ষকারে শায়েস্তা খানের মহলে গোপনে প্রবেশ করে, ইট দিয়ে আংশিকভাবে বক্ষ করা একটি জানালা ভেঙে হারেমে প্রবেশ করে যেখানে শায়েস্তা খান ঘুমিয়েছিলেন এবং তাকে সেখানেই আক্রমণ করলে তিনি বিছানা থেকেই তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। মারাঠারা পালিয়ে যাবার পূর্বে, তারা শায়েস্তা খানের বৃক্ষাঙ্কলি কর্তন করে আর তার ছেলেদের একজনকে হত্যা করে যায়। শিবাজি শেষ পর্যন্ত যদিও পরাভব মানতে বাধ্য হন কিন্তু সেটা কেবল একটি শৃঙ্খল সাপেক্ষে যে, মোগলদের খাজনা দেয়ার পর তিনি তার ভূখণ্ডের কিছুটা নিজের আয়তে রাখতে পারবেন। ১৬৬৬ সালে শিবাজিকে যখন আওরঙ্গজেবের দরবারে হাজির করা হয়, তার মনে হয় তাকে প্রতিশ্রূত সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। তিনি সন্মাটের উপস্থিতিতেই জোরালো কঠে প্রতিবাদ জানালে তাকে গৃহবন্দি করা হয়। তিনি অচিরেই যেখানে বন্দি ছিলেন সেখান থেকে খাবারের ঝুড়িতে আত্মগোপন করে পলায়ন করেন,

দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি এলাকায় ফিরে যাবার পূর্বে ছাই মেথে অর্ধ-নগ্ন হিন্দু ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে, মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শিবাজির অন্য অভিযানসমূহের কারণে ভারতবর্ষের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বীরদের অন্যতম হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। আকবর মারাঠা অঞ্চলে পৌচ্ছাবার এক বছর পূর্বে শিবাজি যুদ্ধবরণ করেন। তার ছেলে শম্ভুজি, যিনি তখন শিবাজির পরিবর্তে শাসন করছিলেন, তিনি ছিলেন অনেক কম যুদ্ধবাজ। ইউরোপীয় বণিকদের ভাষ্য অনুসারে, যিনি নিজেকে 'মদ আর রমণীর সাহচর্যে ভূলিয়ে রাখতে' পছন্দ করতেন। তিনি সংগত কারণেই আকবরকে অনুসন্ধানী হামলার হাত থেকে, যা আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি এলাকার গভীরে প্রেরণ করত, সুরক্ষা দেয়া ছাড়া সামরিকভাবে সামান্যই সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

আওরঙ্গজেব তার আক্রাজন শাহজাহানের পিতৃসুলভ নিষেধাজ্ঞা, যা প্রায়ই তার হাতকে সংযত রাখতে বাধ্য করত, তা থেকে মুক্তি লাভ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, মারাঠাদের শায়েস্তা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো মোগলদের দীর্ঘদিনের শক্তি, বিজাপুর আর গোলকুণ্ডের প্রতিবেশী এবং বিশাল মুসলিম রাজ্য দুটি দখল করা। তাদের সমর্থন থেকে এক্ষেত্রে বাধিত হলে, হিন্দু মারাঠা আর তাদের মেহমান আকবরকে জন্ম করার সহজ হবে। ১৬৮৫ সালের জুন মাসে আওরঙ্গজেব প্রথমে বিজাপুর আক্রমণ করেন। রাজ্যটা দখল করতে তার পনেরো মাস সময় লাগে এবং এর সঙ্গে গোলকুণ্ড অভিযানের পথ উন্মুক্ত হয়, যা তত দিনে ব্যতিচারী রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রাজধানী হায়দ্রাবাদেই নাকি কেবল ২০,০০০ গণিকা বাস করত, যাদের অনেকেই প্রতি শুক্রবার শাসকের সামনে প্রকাশ স্থানে ঝাকালোভাবে নিজেদের প্রদর্শন করত। মোগল আক্রমণের প্রথম ইঙ্গিতেই, সেখানের শাসক হায়দ্রাবাদে নিজের বিলাসকুণ্ড ত্যাগ করে পাশ্ববর্তী পাহাড়ে অবস্থিত গোলকুণ্ড দুর্গে পালিয়ে যান। এক দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে 'নিজের অমাত্যদের সাথে কোনো পরামর্শ না করেই এবং নিজের কোনো সম্পত্তি বা তার পরিবার কিংবা হারেমের মেয়েদের কথা না ডেবেই।' দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পরই কেবল তার বোধোদয় হয় এবং সাহসিকতার সাথে তিনি আওরঙ্গজেবের বাহিনীর মোকাবিলা করেন। আট মাস অবরোধের পর, মোগলদের সামরিক বিক্রম নয়, উৎকোচের ফলে দুর্গের তোরণঘার অবারিত হয়, ইতিমধ্যে প্রেগের প্রাদুর্ভাবে মোগল শিবিরের অবস্থা সঙ্গিন। তাদের রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হবার সাথে সাথে একটি অনাড়ম্বর কারাগারে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ গোলকুণ্ডের শাসক বিজাপুরের শাসককে অনুসরণ করেন।

আকবর ইত্যবসরে পারস্যে পালিয়ে যান। মানুচির ভাষ্য মতে, কতিপয় ফরাসি বাণিকের সহায়তায়, কিন্তু আওরঙ্গজেব তার বিপর্থগামী সন্তানের সহযোগী মারাঠাদের পরাস্ত করার সংকল্প বজায় রাখেন। মোগলরা বিলাসপ্রিয়, অলস শুভ্রজি আর তার প্রধানমন্ত্রীকে শেষোক্তজনের বাসস্থান থেকে বাটিকা আক্রমণ চালিয়ে গ্রেপ্তার করে। মন্ত্রীর বাসভবনের মেঝেতে একটি গর্ত খুড়ে তারা সেখানে লুকিয়ে ছিল। মোগলরা তাদের দুজনের মাথায় ঘট্টাযুক্ত গাধার টপি পরিয়ে, উটের পিঠে চাপিয়ে দাক্ষিণাত্যের সড়কে আর শাহি সেনা ছাউনিতে প্রদর্শিত করায়। আওরঙ্গজেবের সামনে যখন শুভ্রজিকে আনা হয়, তিনি তার ধনসম্পদ কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে সেটা জানাতে অশীকৃতি জানান, আওরঙ্গজেবকে অভিশাপ দেন এবং তার ধর্মকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন। আওরঙ্গজেব খুব ধীরে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দান করার মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করেন। মোগলরা প্রথমে তার ঈশ্বর নিন্দাকারী জিহ্বা কর্তৃত করে। তারপর তাকে অঙ্গ করে দেয়। পরবর্তী দুই সপ্তাহ আরো বিলম্বিত নির্যাতনের পরে তার হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেনা ছাউনির কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার মাথায় খড় ভরে সেটা উদ্ধৃত বিদ্রোহীদের ভাগ্যে কী রয়েছে সেবাবাতে দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র প্রদর্শিত হয়।

শুভ্রজির নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফলে আওরঙ্গজেবের বদলে মারাঠাদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বৃদ্ধি পেলে তাই অবক্ষেত্রে হবার কিছু থাকে না। দাক্ষিণাত্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করার অভিজ্ঞায়ে আওরঙ্গজেব সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন, কিন্তু অচিরেই চোরাঞ্চো গেরিলা হামলা শুরু হলে আওরঙ্গজেবের ১৭০,০০০ সৈন্যের বাহিনী আর প্রায় সাড়ে তিনি লক্ষ শিবির অনুগমনকারী দুর্বহুরূপে অকার্যকর প্রতীয়মান হয়। আওরঙ্গজেব যদিও তার সাম্প্রতিক বিজয়ের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্ত তাদের সর্বোচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি করে ভারতের দক্ষিণে অনেক ভেতরে এর সীমারেখা নিয়ে গেলেও, দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ মোগল প্রাচুর্যের জন্য তলাবিহীন পাত্র হয়ে উঠে, শাহজাহান যখন তার বিশাল আর ব্যয়বহুল নির্মাণ প্রকল্পের কথা বিবেচনা করছিলেন তখনো যা ছিল অফুরন্ত। দাক্ষিণাত্যে, রাজস্থানে আর সাম্রাজ্যের অন্যত্র আওরঙ্গজেব তার হিন্দু প্রজাদের প্রতি যে আচরণ করেন তার ফলে মোগল শাসনের মৌলিক চরিত্র বদলে যায়। এটা তখন আর স্বাধীনতা আর পারম্পরিক বিশ্বাসের দ্বারা একত্রে প্রতিষ্ঠিত সম্রাট আকবরের স্থাপিত সহিষ্ণু আর সামগ্রিক সম্রাজ্য নয়। বাবরের সময়কালের ন্যায় মোগলরা আরো একবার দখলদারী শক্তির রূপ গ্রহণ করে।

১৭০৫ সালের অক্টোবরে, ঘোলো বছর পরে আওরঙ্গজেব পুনরায় উন্নত দিকে যাত্রা আরম্ভ করেন। সাতাশি বছর বয়স আর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে, তিনি মুঘাইয়ের

(বোম্বে) পূর্বে আহমেদনগরে পৌছাবার পর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। পাচাত্যের দিনপঞ্জি অনুসারে সেদিনটা ছিল ১৭০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। আওরঙ্গজেব যেমন কামনা করেছিলেন দিনটা ছিল তেমনই শুক্রবার, মুসলমানদের পবিত্র দিন। আহমেদনগর থেকে বিশ মাইল দূরে, খুলদাবাদ বলে একটি স্থানে এক মুসলিম সাধুর মকবরায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, শেষ মহান মোগলের সমাধির ওপর নামবিহীন বেলে পাথরের একটি আয়তাকার টুকরো দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং উপরিভাগ আকাশের দিকে খোলা রাখা হয়—কাবুলে অবস্থিত তার প্র-প্র-প্রগতিমহ বাবরের সমাধির চেয়েও অনাড়ম্বর একটি সমাধি এবং তার পিতা-মাতার চমকপ্রদ মকবরার সম্পূর্ণ বিপরীত। তার শেষ বক্তব্যে নিজের আবাজানের প্রতি তার অসঙ্গোষ স্পষ্টতই উদ্বেলিত : “নিজের সন্তানদের কথনো বিশ্বাস করবে না, নিজের জীবন্দশ্যায় কথনো তাদের সাথে আন্তরিক আচরণের কথা ভাবতে যেয়ো না; কারণ স্মাটি শাহজাহান যদি দারা শুকোহের প্রতি (পক্ষপাতিতু) না করতেন, তার কার্যকলাপের তাহলে এমন দুঃখজনক পরিণতি হতো না। সব সময় এ কথাটা স্মরণে রাখবেন ‘একজন রাজার প্রতিশ্রুতি সব সময় উষ্ম’।”

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই বিশ্বজ্ঞালার সূত্রপাত ঘটে। ১৭০৪ সালে নির্বাসিত অবস্থায় অক্ষয়বর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেবের তিন জীবিত পুত্র, যাদের দুজনকে তিনি বিভিন্ন সময়ে কারাবুক করেছিলেন—উত্তরাধিকারী হতে লড়াই শুরু করেন। পুত্রদের ভেতর দুজন আর তিনজন পৌত্র এসডাইয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মোগল সাম্রাজ্য অচিরেই ভেঙে গিয়ে পরম্পরের সাথে যুদ্ধমান রাজ্যের একটি জটলায় পরিণত হয়, যেখানে আমোদপ্রিয় স্মাটের পরম্পরা ততোধিক অল্প কর্তৃতৃ ভোগ করে। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের নেতৃত্বে পার্সিরা দিল্লি আক্রমণ করে শহরটা দখল করে নিলে সেখানকার অধিবাসীরা নিরাপত্তা-প্রতিবিধান হিসেবে বিপুল অর্থ প্রদান করে এবং পার্সিরা তথ্য-ই-ভাউসসহ অন্যান্য ধনসম্পদ সেইসাথে লুট করে নিয়ে যায়। তৈমুরের দিল্লি আক্রমণ আর সেখানের কারিগরদের তার একত্রীকরণের প্রায় ৩৫০ বছর পর এবং বাবর হিন্দুস্তানে যে গুটিকয়েক মূল্যবান অনুষঙ্গ খুঁজে পেয়েছিলেন তাদের ভেতর কারিগরদের অন্তর্ম জ্ঞান করার ২০০ বছর পর, ভারতীয় কারিগরদের খ্যাতি কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। ১৭৩৯ সালে পার্সিরা লুটের ধনসম্পদের সাথে ১০০ রাজমিস্ত্রি আর ২০০ সূত্রধরকে বন্দি করে নিয়ে যায় তাদের বন্দিকর্তার রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, তখন আসলে তাতে বিস্মিত হবার হবার কিছু থাকে না।

মোগল স্বাটদের ক্ষমতা হ্রাস পাবার সাথে আগায় তাদের উপস্থিতিও হ্রাস পায়, যা ইতিমধ্যে একটি প্রাদেশিক শহরের মর্যাদায় আপত্তি হয়। তাজমহল এই সময়ে ভালোবাসার প্রতীকের চেয়ে মোগল সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবের স্মারক হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। দূরের আর কাছের মুটেরাদের কাছে এটা এবং আগ্রার আশপাশে অবস্থিত অন্যান্য মোগল স্মৃতিসৌধ লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়, যদিও দিন্তিতে নাদির শাহের মুটতরাজের মাত্রার সাথে তাদের ধৰ্মস্তীলার তুলনাই চলে না। জাঠ সম্প্রদায়, একটি স্থানীয় উঠতি সামরিক শক্তি, মোগলদের বেশির ভাগ ঐশ্বর্য তারা মুট করে নিয়ে গিয়েছিল, বলা হয়ে থাকে যার ভেতরে ছিল তাজমহলের কারুকার্যময় আর রত্নখচিত রূপার তোরণঘার। তারা তাদের প্রাসাদের শোভাবর্ধনের জন্য মর্যাদার আর বেলে পাথর পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আঠারো শতকে যখন মারাঠারা, তখনকার শক্তিশালী জাতি একদা শিবাজি যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, শহরটা দখল করে, তারা এবং তাদের ফরাসি পরামর্শদাতারা মোগলদের ইমারতসমূহের মুটপাট অব্যাহত রাখে, ইমারতগুলো থেকে তারা আরো অধিক পরিমাণে পাথর আর অল্প মূল্যের রত্নপাথরের করমিত নকশা তুলে ফেলে।

১৮০৩ সালে জেনারেল লেকের অধীনে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সৈন্যবাহিনী আগ্রা দখল করে তত দিনে তাজমহলের দেয়ালের পর্দা, রত্নখচিত শামিয়ানা আর গালিচার সাথে সাধে বেশির ভাগ মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম খোয়া গেছে। তারা যদিও তাজমহল ভারিপ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং ১৮১০ সালে গোড়ার দিকেই পুনর্নির্মাণের প্রথম পদক্ষেপ নিলেও, ব্রিটিশরা মকবরাটার সাথে তার প্রাপ্য মর্যাদা অনুসুরে আচরণ করেনি। তারা মধুচন্দ্রিমা উদ্যাপনের জন্য কটেজ হিসেবে মকবরার দুই পাশে অবস্থিত মসজিদ আর তার জবাব মেহমানখানা ভাড়া দিতে আরম্ভ করে। তারা সেইসাথে সেখানে বলনাচের আয়োজন করা শুরু করে যেখানে মকবরার মোকাম কুর্সি থেকে সামরিক বাদ্যযন্ত্রীর দল যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করত। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ভাইসরয় যেমন স্বীকার করেছেন, ‘গুরুর দিকে যখন তাজমহলের উদ্যানে বনভোজনের আয়োজন করা হতো তখন বনভোজনে আসা লোকদের কাছে হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে অলস মধ্যাহ্নে স্বামাট আর তার বিরহি স্মার্জীর স্মৃতিস্তু থেকে আকিক আর কার্নেলিয়নের টুকরো খুড়ে তোলাটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।’

ব্রিটিশরা উদ্যানের নির্জনতায় সুরা পান করতে পছন্দ করত। ১৮৭২ সালের একটি ইংরেজি ভ্রমণ পঞ্জিকায় অবজ্ঞার সাথে উদ্বিত্ত ভঙ্গিতে বলেছে, ‘পৰিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিভৃত স্থানে নির্মিত এই স্থানে কখনো কোনো উৎসবের

আয়োজন যদি না করা হতো তাহলে নিচ্ছিতভাবে হয়তো সেটা এর চরিত্রের সাথে মানানসই হতো, কিন্তু স্থানীয়রা এর প্রবেশপথে হরদিন বাজার বসানোর ফলে এবং সমস্ত প্রাঙ্গণে কমলার খোসা আর অন্যান্য আবর্জনা ফেলায়, এটা সম্ভবত গুটিকয়েক ইংরেজ লোককে নির্জন কোনো কোণে তাদের সতেজ হবার সুযোগ না দেয়াটা ভওমি হতো।’

অবশ্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং, যিনি ১৮৩০ সালে ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন, তিনি তাজমহল ভেঙে ফেলে এর মর্মর পাথর নিলামে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু লন্ডনে ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর নিলাম কাজিক্ষত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে জানার পরই কেবল এ বিষয়ে নিরস্ত হয়েছিলেন বলে যে দাবি করা হয় সেটা সর্বেব মিথ্যা। ভারতবর্ষে তার স্বদেশি শক্রুরা গল্পটা ফেরেছিল, যা এমনকি একটি সরকারি নথিতেও খুঁজে পাওয়া যায়। তারা সত্যের যে মামুলি সুতোটাকে ভিত্তি করে এমন গল্প তৈরি করেছিল, সেটা হলো বেন্টিং আঘার অন্য আরেকটা স্থাপনার মার্বেলের তৈরি গোসলের জলাধারের অবশিষ্টাংশ বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন, যার কিছু অংশ ঘোলো বছর পূর্বেই জাহাজে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।’

লর্ড কার্জন নিজে এতটাই উক্ত একজন অভিজ্ঞাত ছিলেন যে, অক্সফোর্ডে তার সহপাঠীরা নিম্নোক্ত বিধ্যাত পঞ্জিকিণুগুলোতের করেছিল, ‘আমার নাম জর্জ নাথানিয়েল কার্জন, আমি সবচেয়ে মেরু ব্যক্তি’, এবং ডার্বির সপ্তদশ আর্ল পরবর্তী সময়ে স্বীকার করেছেন, কার্জন ‘যেকোনো ব্যক্তির মাঝে ভয়ংকর পামরের একটি অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলে পারত।’ এটা সম্ভবত প্রথা আর সামাজিক অবস্থানের প্রতি তার শ্রদ্ধার কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি আঘার রাজকীয় মোগল স্থাপত্যের অবহেলাজনিত প্রভাব দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে নিজের কাজের বিষয়ে আর আঘার কারিগরদের দক্ষতা সম্বন্ধে যথার্থেই গর্বিত বোধ করেছিলেন। তাজে এখন আর ‘ঘিঞ্জি বাজার আর ধূলিধূসরিত নোংরা মাড়িয়ে যেতে হয় না। সেখানে একটি সুন্দর উদ্যান তৈরি করা হয়েছে। তাজে প্রবেশের পথে অবস্থিত উদ্যানের প্রতিটি ইমারত বিচক্ষণতার সাথে মেরামত করা হয়েছে এবং মূল পরিকল্পনা খুঁজে পাবার কারণে জলের নহর আর ফুলের বাগিচাগুলোকে তাদের ঠিক মূল অবস্থায় পুনর্নির্মাণের সুযোগ আমাদের দিয়েছে। আঘার দক্ষ শ্রমিকরা এ উদ্যোগে ঠিক ততটাই আঘাত আর রুচির স্বাক্ষর রেখেছে, যতটা তিনশ বছর পূর্বে তাদের পূর্বসূরিরা রেখেছিল। আমি ভারতবর্ষে আসার পর থেকে আমরা কেবল আঘার পুনর্নির্মাণেই ৪০,০০০ পাউন্ড ব্যয় করেছি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্তে আর পুনরুদ্ধারকৃত সৌন্দর্য ভবিষ্যতের জন্য উপহারস্থলুপ বিবেচনা করেই প্রতিটি রূপি ব্যয় হয়েছে।’ তার বক্তব্যের সবচেয়ে কৌতুহলকর বিষয়

সম্ভবত পুরাতন পরিকল্পনার উপরে, কিন্তু হতাশার কথা হলো, ব্রিটিশ বা ভারতীয় কোনো মহাফেজখানায় সেগুলো এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।\*

তাজমহলের প্রতি কার্জনের বিশেষ একটি পক্ষপাত ছিল। মর্যাদার মোকাম কুর্সিতে দাঁড়িয়ে একবার একটি বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ‘তাজমহলের মাঝের গম্বুজটা আকাশের বুকে বিশাল আকৃতি নিয়ে ভেসে উঠেছে। আমি যদি ভারতবর্ষে আর কোনো কিছুই না করি, আমি সেখানে আমার নাম লিখেছি প্রাণবন্ত এক আনন্দের মাত্রায়।’ প্রাচীন এক মিশরীয় মসজিদের ঝাড়বাতির অনুকরণে নির্মিত পিতলের একটি চমৎকার ঝুলন্ত ঝাড়বাতি কার্জন তাজমহলে দান করেছেন। ঝাড়বাতিটা রাজকীয় সমাধিসন্দোধের শীর্ষে অভ্যন্তরীণ গম্বুজের কেন্দ্রে আজও ঝুলন্ত রয়েছে।\*\*

বিংশ শতাব্দী অতিবাহিত হবার সাথে সাথে ব্রিটিশরা তাজমহল জরিপে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সব কিছু নথিবদ্ধ করে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে, ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, যা আসলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত হয়েছিল, পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার একটি বিশদ প্রকল্প গ্রহণ করে। তারা যদিও তাজমহলের মূল কাঠামোতে কোনো খুঁত খুঁজে পায়নি কিন্তু প্রতিবেদন পেশ করে যে, তাজমহলের চারটি মিনারের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমের মিনারটি সাড়ে আট ইঞ্চি ঝোইরের দিকে হেলে রয়েছে এবং অন্য তিনিটি দেড় ইঞ্চি থেকে সাড়ে চার ইঞ্চির ভেতরে হেলে রয়েছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণ আর যত্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, যা ১৯৮৩ সালে ইউনেসকো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়, ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য আঘা বিমানঘাঁটি বিমান চলাচলের জন্য শুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতো। পাকিস্তানের বিমান বাহিনী রাতের চন্দ্রালোকিত আকাশে শুভ তাজমহলকে দিকনির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করে সেখানে বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ করতে পারে আশঙ্কায় ভারত সরকার সাদা শকবরা আর তার মিনারগুলো পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে দর্জিদের কালো কাপড়ের অতিকায় কপটবেশ তৈরি করে ঢেকে

\* বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে স্থাপত্যকর্মের নকশা অঙ্কনকারী ওস্তাদ দেশার উত্তরসূরিয়া সম্ভবত এ নকশাগুলোর কথাই বলেছিল।

\*\* কার্জন অবশ্য, হয়তো, মমতাজ মহল আর শাহজাহানের ভালোবাসায় বিদ্যমান ভোগসূখাসক্ত আবেগ ঠিক অনুধাবন করতে পারতেন না তাই নিজের স্তীকে সহবাসের সময় তিনি বারবার তাকে বলতেন, ‘মেয়েরা সব সময় নিজীব পড়ে থাকবে।’

ফেলার আদেশ দেয় আকাশ থেকে তাদের দৃশ্যমানতা হ্রাস করতে। দশ বছর আগেও ইন্দুরের আক্রমণে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত তাজমহলের একটি কক্ষে কপটবেশটা রাখা ছিল।

একবিংশ শতকের প্রথম বছরে সঞ্চাসবাদ তাজমহলের জন্য আরো ব্যাপক প্রত্যক্ষ হ্রক্ষি হিসেবে দেখা দেয় এবং ভারত সরকারও গুরুত্ব অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। পুরো মকবরা প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বালির বস্তা দিয়ে বাকার তৈরি করা হয়েছে এবং যমুনা আর মকবরার মধ্যবর্তী স্থানে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হয়েছে। সারা বিশ্বে আজ বিমানবন্দর আর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ইমারতে নিরাপত্তারক্ষীদের লোকজনের দেহ তল্লাশি করতে আর ব্যাগ পরীক্ষা করতে দেখা একটি নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, দরকারের সময় তাদের সাথে বিস্ফোরক অনুসন্ধানের জন্য বোমা খুঁজতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের পাল যোগ দেয়।

মকবরারটার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হ্রক্ষির হয়ে দেখা দিয়েছে আশপাশের এলাকায় অবস্থিত কলকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, রেলস্টেশন আর চলমান গাড়ির বহরের ধোঁয়ার ফলে সৃষ্টি মানুষের তৈরি দৃশ্য। ভারত সরকার বায়ু দৃশ্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তারা ২৫০টি কারখানা স্ট্রেফ বন্ধ করে দিয়েছে, যাদের ধোঁয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাপাতি নেই। এমন পদক্ষেপের ফলে প্রায় ১৫০,০০০ লোক চাকরি হারিয়ে বেকার হয়েছে বিধায় আগ্রার সবাই বিষম্পটি ভালোভাবে মানতে পারেনি, যেখানের মানুষ প্রকাশ্যেই মন্তব্য করে, মকবরাটা রক্ষা করতে আমাদের কি শহরটাকে একটি সমাধিসৌধে পরিণত করতে হবে?’

আগ্রায় কেবল সীমা-মুক্ত পেট্রোল বিক্রির অনুমতি রয়েছে এবং সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মিত হচ্ছে, যাতে করে সেই অঞ্চলের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় সবচেয়ে ন্যূনতম দৃশ্য ঘটে। তাজ প্রঙ্গণের ৫৫০ গজের ভেতরে কেবল ব্যাটারিচালিত গাড়ি আর পশু বা মানুষে টানা গাড়ি প্রবেশের অধিকার পায়। মকবরার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত মিনারিকায় ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ দৃশ্য পর্যবেক্ষণের একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেছে, যা আগত দর্শনার্থীদের সালফার-ডাই অক্সাইডের মতো দৃশ্যকের মাত্রার পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দিতে সক্ষম। সাদা মর্মরের ওপর থেকে পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ অনেক পরিশ্রম সহ্য করে হলুদ ছোপ দূর করতে পেরেছে। তবে কয়েক বছর পূর্বে আবিষ্কার করে যে কাদা, শস্যকণা, দুধ, আর চুনের মিশ্রণ, আকবরের দিনপঞ্জির রচয়িতা আবুল ফজল যাকে মহিলাদের মুখের সর্বোৎকৃষ্ট প্রসাধন বলে উল্লেখ করেছেন, আদতে অনেক সফল একটি বিশেষজ্ঞ। সংরক্ষণকারীরা এক ইঞ্জি পুরু করে এই লেইটা পাথরে প্রয়োগ করেন এবং এর ব্যবহারের

ফলে মকবরার অভ্যন্তরভাগ আর মিনারিকার রঙে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০৩ সালে ভারত সরকার তাজমহল থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরে ছয় মাস পূর্বে আরম্ভ হওয়া একটি বিনোদন কমপ্লেক্সের নির্মাণ স্থগিত করে দেয়, ইউনেস্কোর কাছ থেকে এই মর্মে একটি হাঁশিয়ারি পাবার পরে যে নতুন তারা তাজমহলের নাম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে।

যমুনার পানির স্তর আর পানির প্রকৃতি আরেকটা অন্যতম উৎকর্ষার বিষয়। যমুনা প্রথমদিকে তাজমহলের গা ঘেঁষে বয়ে যেত, যাতে শাহজাহান আগ্রা দুর্গ থেকে নৌকা করে সরাসরি মকবরার নিচে অবস্থিত বারান্দার অবতরণ স্থানে এসে নামতে পারেন। যমুনা বর্তমানে অনেক শীর্ণকায়া, ভীষণ দূষিত একটি নদী, যা বারান্দার অবতরণস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূর দিয়ে বয়ে চলেছে। ২০০৩ সালের জুনে, তাজমহলের কাছেই রাসায়নিক দূষণ আর নর্দমার অপরিশোধিত ময়লার কারণে হাজার হাজার মাছ মৃত অবস্থায় ভেসে উঠেছিল। ২০০৪ সালে দুজন ভারতীয় ঐতিহাসিক, ইউনেস্কোর জরিপের উদ্ভৃতি দিয়ে হাঁশিয়ার করেন যে, ১৯৪০ সালের জরিপের পর মিনারিকার নতি আশঙ্কাজনকভাবে বৃক্ষি পেয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ অবশ্য আরো অনুসন্ধানের পর মিনারিকার ভিত্তি ব্যায়োকাম কুর্সিতে কোনো ধরনের ফাটলের চিহ্ন দেখতে পায়নি এবং সিঙ্ক্রান্ত নেয় যে, নতিটা মূল পরিকল্পনারই অংশ যা সম্ভবত ভূমিকম্পের ক্ষয় মিনারিকাগুলোকে মকবরা অভিযুক্ত ভেতরের দিকে বিধ্বস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে বা শতাব্দী প্রাচীন ভূগর্ভস্থ বনিয়াদ বসে যাবার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা পরামর্শ দেয় যে, নতির পরিমাপের পার্থক্য পরিসংখ্যানের আন্তিজিক মাত্রার ভেতরেই অবস্থান করছে। ঐতিহাসিকরা দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বিশ্বাস করেন, যমুনার পানির ভারসাম্য রক্ষাকারী চাপের অনুপস্থিতির কারণে তাজমহল আর এর মোকাম কুর্সি ধীরে ধীরে উত্তর দিকে বসে যেতে শুরু করেছে এবং মিনারিকার চতুর্ষয়ের নতি এই প্রক্রিয়ার প্রথম ইঙ্গিত। তারা তাজমহলের ভাটিতে যমুনার ওপর বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব দেন, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ধরে রেখে পানির আদি স্তর আর চাপ ফিরিয়ে আনা যায়।

সে যাই হোক, তাজমহল এখন প্রত্যেক সঙ্গাহের শুক্রবার রক্ষণাবেক্ষণের আর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের কারণে দর্শনার্থীদের জন্য বক্ষ থাকায় পর্যটন ব্যবস্থা নালা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবছর তাজমহলে দেখতে আসা ৩,০০০,০০০ জন পর্যটকের মকবরার অভ্যন্তরে নিঃশ্বাসের ঘনীভবন আরেকটা বিশাল সমস্যার জন্ম দিয়েছে। পর্যটকের এই বিপুল সংখ্যার মানে নিভৃতে তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করা, যা একে সবচেয়ে আকর্ষক করে তুলে

বর্তমানে অসমৰ্ব। অবশ্য এটা ও ঠিক যে, পর্যটকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করাও পুরোপুরি অনেতিক একটি কাজ হবে আর সেটা অসমৰ্বও বটে। বিদেশি পর্যটকদের প্রদত্ত প্রবেশ মূল্যের সাথে সংগতি রেখে ভারতীয়দের জন্য মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বিপুলসংখ্যক ভারতীয় তাদের জাতীয় উত্তরাধিকার দর্শন থেকে বাধ্যত হবে। ভারতীয় জাতীয়ভাবে ধারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অর্থ হবে বিদেশিরা সত্যিকারের অতুলনীয় একটি কীর্তি হিসেবে বহুদিন ধরে স্বীকৃত নির্দর্শন আর দর্শন করতে পারবে না। শাহজাহানের রাজ কবিদের একজন যেমন লিখেছেন :

বেহেশতের সম্মুনত থিলানের নিচে, এমন একটি স্বপ্ন-সৌধ  
আকাশের সাথে প্রতিষ্ঠিতার অভিপ্রায়ে মাথা উঁচু করেনি।

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
الْحٰمِدُ لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ  
كَلِمَاتُهُ تَحْمِلُ  
كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يُؤْثِرُ  
كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ  
كَلِمَاتُهُ تَحْمِلُ  
كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يُؤْثِرُ  
كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

## ଶୋଡଶ ଅଧ୍ୟାୟ

### ନଦୀର ଅପର ତୀରେ ତାର ଆପନ ମକବରା

ମୋନାଲିସାର ରହସ୍ୟମୟ ହାସିର ଆଡ଼ାଳେ କୀ ଶୁକିଯେ ଆହେ ଆମରା ଯେମନ କଥନୋ ଜାନତେ ପାରବ ନା ଠିକ ତେମନି ତାଜମହଲ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅନେକ ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରଯେଛେ । କିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଯତେ ଆରୋ ପ୍ରତ୍ତିତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁମନ୍ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରା ସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଗୁଲୋ ଶାହଜାହାନ ଯଥନ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣେର ପରିକଳ୍ପନା କରଛିଲେନ ତଥନ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ସନ୍ତ୍ରାଟ ତାର ମାନସପଟେ କୀ ଦେଖେଛିଲେନ ତାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କିତ ।

ଶାହଜାହାନ ଆର ତାର ସ୍ତ୍ରୀତିରା କୀ କାରଣେ ତାଜମହଲେର ମୂଳ ମକବରା ଉଦୟାନେର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ମାଣ ନା କରେ, ଯା ମକବରାର ଜନ୍ୟ ରୀତିସମ୍ଭବ, ଶେଷ ପ୍ରାତ୍ନେ ନିର୍ମାଣ କରେଛେ, ତା ସବଚେଯେ ବେଶି ସବାର ମନୋଯୋଗୀ ଆକର୍ଷଣ କରେଛେ । ୧୯୭୦ ସାଲେ ଆମେରିକାର ଏକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଝୟାପକଭାବେ ସ୍ଵିକୃତ ମତବାଦେର ଓପର ଭିତ୍ତି କରେ ବଲେନ, ତାଜେର ମକବରା ପ୍ରତ୍ଯେକିତେ ବେହେଶ୍ତେର ଅନୁଭୂତି ଜନ୍ୟ ଦେଯାର ଅଭିଧାଯେ ନିର୍ଭିତ ହେୟଛିଲା ଏଟା ବୋକାତେ ଯେ ମୂଳ ମକବରାଟା ଆଦ୍ୟାହର ଆରଶେର ପ୍ରତ୍ତିକ ଉପହାପନ, ଯୁସରାସରି ବେହେଶ୍ତେର ଓପର ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପୁରୋ ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟା ପୁନରୁଥାନେର ଦିନେର ହାଶରେର ମୟଦାନେର ଏକଟି ରୂପକାଶ୍ରୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେମନଟା ମରମି ସୁଫି-ସାଧକଦେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେୟଛେ । ତାଜମହଲେର ନିଚେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଗିଚା ପୁନରୁଥିତ ମାନୁଷେର ସମବେତ ହବାର ମୟଦାନେର ପ୍ରତ୍ତିକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିଜେର ସାଦା ମର୍ମରେର ସିଂହାସନ ତାଜମହଲ ଦ୍ୱାରା ଉପହାପିତ ଉପବିଷ୍ଟ ଅବହ୍ଵାନ ଯେଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକବେନ । ଶାହଜାହାନେର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ଦାରା ପ୍ରକୋହ ଆର ଜାହାନାରା ସୁଫି ଭାବାଦର୍ଶେର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ତିକ ହିସେବେ ବ୍ୟାବହଳ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣେ ତାର ଚିତ୍ତାକୁଳତାର ଖାନିକଟା ହଲେଓ ଏ ବିଷୟର ପ୍ରତି ସାଫାଇ ଦେଯ । ଅନ୍ୟରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଦୀର ତୀରବତୀ ଉଦୟାନେ ଅନୁସ୍ତତ ରୀତି ଅନୁମାରେ ପାନିର ପାଶେ ମୂଳ ହାତେଲି ନିର୍ମାଣେର ଫଳେ ଯମୁନାର ପାନିତେ ପ୍ରତିଫଳନ, ଶୀତଳ ବାତାସ ଆର ଦୃଷ୍ଟିର ଆଡ଼ାଳ ପ୍ରାଣିର ସୁବିଧାର କଥା ଭେବେଇ ମୂଳ ମକବରାର ଅବହ୍ଵାନେର ବିଷୟଟିକେ ବିବେଚନା କରେନ ।

অবশ্য প্রায় দশ বছর পূর্বে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া আর আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত স্মিথসোনিয়ান ইনসিটিউটের স্যাকলার গ্যালারি, যমুনার উপর তীরেতাজমহলের ঠিক বিপরীত পাশে অবস্থিত বাগিচার অবশিষ্টাংশে যা ‘মাহতাব বাগ’ বা ‘চন্দ্রালোকিত বাগিচা’ নামে পরিচিত এবং বাবর কর্তৃক প্রথমে নির্মিত স্থানে অবস্থিত বলে ধারণা করা হতো, পর্যবেক্ষণ করা আরম্ভ করে। আগ্রার পরিকল্পনা আর পুরাতন নকশা তুলনা করে আবিষ্কার করে যে, এই বাগিচাগুলোতে সম্ভবত হাতেলি ছিল এবং তাজমহলের সাথে একই রেখায় অবস্থিত। তারা যখন তাদের খননকার্য শুরু করে, মাহতাব বাগ এলাকাটা যমুনায় বন্যার ফলে জমা হওয়া পলিমাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল এবং পুরো এলাকাটা ছিল ঘাস আর অন্যান্য গাছপালায় আচ্ছাদিত। আশপাশের গ্রামে বাড়ি নির্মাণের জন্য এখান থেকেই পাথর আর অন্যান্য উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল। যমুনার তীরবর্তী ইটের কাঠামোর কিছুটা অংশ নদীর পানিতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

প্রতুতত্ত্ববিদদের স্বত্ত্ব খননকার্য নিশ্চিত করে যে চৰিশ একর জমিতে অবস্থিত মাহতাব বাগ বাস্তবিকই একটি নিশ্চার প্রমোদকানন। মোগলরা চন্দ্রালোকিত বাগিচার প্রবর্তক নয়, হিন্দু শাসকরা তাদের স্বাক্ষরমনের অনেক আগেই এমন বাগিচা ভারতবর্ষে নির্মাণ করেছেন। দিনেভোগে উষ্ণতা হ্রাস পাবার পর তারা সঞ্চার স্রীঞ্জ শীতলতা, বিশেষ করে জ্যোৎস্নার রাত্রিগুলো উপভোগ করতে পারতেন। মালিয়া বাগিচাগুলো সারুজ্জ্বা ধূসর রঙের ফুলের গাছ দিয়ে সজ্জিত করত, যা দ্বিতীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রক্ষেপণে ফুটে থাকবে এবং জুই বা কলম করা মিষ্টি গুঁক্যুক্ত ফুল রাতের নিশ্চল বাতাসকে সুরভিত করতে তাদের প্রথম পছন্দ ছিল। তাদের আরেকটা পছন্দের ফুল ছিল চম্পা। ম্যাগনোলিয়া পরিবারের সদস্য তীব্র সুগন্ধযুক্ত এই দুধ সাদা ফুলটা রাতের বেলা ফোটে। জাহাসীর বর্ণনা করেছেন কীভাবে ফুলের মাঝে কখন ‘পুরো একটি বাগিচার সুরভি পাবে।’\*

মোগলরা প্রবাহিত পানির ধারা আর শূন্যে পানি ছিটাতে থাকা ঝরনা যোগ করে হিন্দুদের মূল ধারণাটা আরো উন্নত করে। তারা সেইসাথে বাগিচার পথগুলো তেলের প্রদীপ দিয়ে আলোকিত করে এবং হাতেলি আর পানির প্রবাহের পেছনে স্থাপিত কুলঙ্গিতে প্রদীপের ব্যবস্থা করে। মোগলরা প্রায়ই তাদের বাগিচায় আতশবাজির প্রদর্শনীর আয়োজন করত। মোগল অণুচিত্রে দেখা যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন বাগিচায় রমণীরা তাদের হাতে আতশবাজি ধরে রেখেছে, যা থেকে সোনালি স্ফুলিঙ্গের ধারা ঝরে পড়ছে।

\* হিন্দু মন্দিরে চম্পা ফুল পূজার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ভারতীয় রমণীরা আজও এই ফুল শোধন করে তৈরি করা তেল মাথায় ব্যবহার করে।

১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি তাপমাত্রায় মাহতাব বাগে কাজ করার সময় প্রত্তিতাত্ত্বিক উদ্ভিদবিদ মোগল আমলের হাঁটাপথ, জলের নহর 'আর ফুলের কেয়ারি পর্যন্ত খনন করে প্রমাণ পেয়েছেন যে, একটি সময় এখানে সত্যিই চম্পা গাছ ছিল। তারা সেইসাথে আরেকটা মিষ্টি গন্ধুকু রাতের বেলা প্রস্কৃতিত সাদা ফুলের গাছ লাল সিডার (নাম যাই হোক মেহগনি পরিবারের সদস্য) সেইসাথে কাজুবাদাম, আম, তাল আর ডুমুর গাছের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। তারা এ ছাড়া লাল ফুলবিশিষ্ট মোরগচূড়া ফুল গাছের কার্বনে পরিণত হওয়া বীজের সঙ্কান পেয়েছেন, যা থেকে গানের পাথর কাছে আকর্ষণীয় বীজ উৎপন্ন হতো।\*

তাজের জন্য মাহতাব বাগের অবশ্য এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে। প্রত্তিতাত্ত্বিকদের খননকার্যের ফলে আবিশ্কৃত হয়েছে যে উদ্যানটা বর্ণাকৃতি, যার চার কোণে চারটি মিনার রয়েছে, যার একটি এখন কেবল ঢিকে আছে। তারা উদ্যানের উত্তর প্রান্তের দেয়ালের মধ্যখানে একটি তোরণের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হলো, উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে তারা একটি উচু অষ্টভূজাকৃতি বারান্দার ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে বের করেছেন, যেখান থেকে মন্দির বিপরীত তীরে অবস্থিত মকবরা দেখা যায়। বারান্দায় একটি বিশুলেন্ড অষ্টভূজাকৃতি জলাধার রয়েছে এবং এর উত্তর প্রান্তে একটি ছোট ঝোপেলির ভিত্তি রয়েছে। জলাধারে পঁচিশটা ঝরনা রয়েছে এবং সেটা ঝোপেলির আর অন্যান্য মোগল উদ্যানের জলাধারের চারপাশে ব্যবহৃত প্রাচুর্যের পাপড়ির মতো নকশা দিয়ে ঘেরা রয়েছে। জলাধার যখন পানি পূর্ণ থাকে তখন এর উত্তরে অবস্থিত অগভীর নহর দিয়ে পানি প্রবাহিত হতো, বেলে পাথরের একটি কিনারার ওপর দিয়ে এবং এক সারি কুলঙ্গি অতিক্রম করে, যেখানে রাতের বেলা প্রদীপ আর দিনের বেলা ফুলের পাপড়ি রাখা থাকত, একটি ছোট জলপ্রপাতের মাধ্যমে নিচে এসে পড়ত, যেখানে তলদেশে বেলে পাথরের একটি ছোট জলাধার রয়েছে।

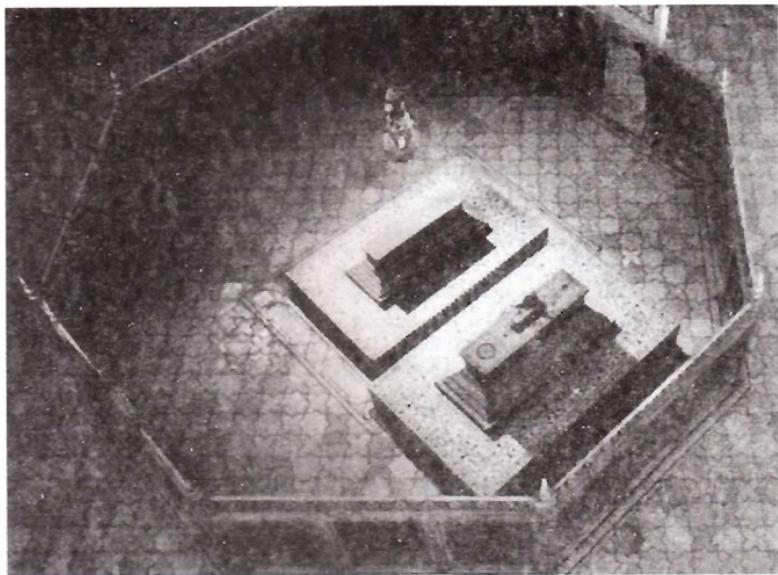
জলের কোনো নহর এই সীমার পরে বিদ্যমান না থাকলেও উদ্যানের মধ্যস্থলে প্রত্তিতাত্ত্বিকরা আরেকটা উচু বর্গাকার জলাধার মাটি খুঁড়ে বের করেছেন, যার একেকটা বাহু প্রায় বিশ ফিট দীর্ঘ এবং প্রায় পাঁচ ফিট গভীর। তারা খুব সংগত কারণেই এ থেকে সিঙ্কান্ত গ্রহণ করেন যে, উদ্যানটা খুব সম্ভবত

\* বর্তমানে মাহতাব বাগ সংস্কার করে জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ফুলের কেয়ারিতে পুনরায় ফুল ফুটেছে যা অসংখ্য মৌমাছি আর প্রজাপতিকে আকর্ষণ করেছে। এএসআই প্রায় ১০,০০০ গাছের আর গুল্মের চারা রোপণ করেছে যার ভেতর রয়েছে মোরগচূড়া, আম আর সুগন্ধি চম্পা ফুলের চারা।

ঐতিহ্যবাহী চারবাগ নকশায় নির্মিত, যেখানে পরম্পরাছেদী পানির নহরগুলোর একটি বেলে পাথরের অষ্টভূজাকৃতি জলাধার হয়ে উদ্যানের মধ্যেখানে অবস্থিত জলাধার পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। আরেকটা নহর যেখানে একে সমকোণে পরিচ্ছিন্ন করতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদ্যানের বাইরের দেয়ালে এখানের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পেয়েছেন, বিশেষ করে তারা স্তম্ভের ওপর উচুতে স্থাপিত একটি জলাধার পেয়েছেন এবং অন্যান্য স্তম্ভের অবশিষ্টাংশ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাজমহলের সাথে এখানের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নির্মাণ কৌশলের সাদৃশ্য রয়েছে।

গবেষকদের সতর্ক পরিমাপের ফলে দেখা গেছে, মাহতাব বাগের পানির সন্নিহিত দেয়ালের শেষ প্রান্ত চিহ্নিকারী গম্বুজগুলোর চিহ্ন অপর তীরে তাজের শেষ প্রান্তে অবস্থিত গম্বুজগুলোর সাথে নিখুঁতভাবে এক রেখায় অবস্থিত এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত পানির নহর তাজের কেন্দ্রীয় অক্ষরেখ—মাহতাব বাগের বিদ্যমান কেন্দ্রীয় জলাধার এবং অনুমিত সম্ভাব্য নহরের সাথে একই রেখায় অবস্থিত। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, পানিতে এটা যখন পরিপূর্ণ থাকে, অষ্টভূজাকৃতি জলাধারে তাজের প্রতিবিম্ব নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেন, মাহতাব বাগ তাজমহলের সামগ্রিক ধারণার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জ্যোৎস্না অবলোকনের জন্য একটি বাগিচার সূষ্টি করেছে। বারান্দার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি ছোট হাতেলির ওপর থেকে শাহজাহান মাহতাব বাগের ঝরনা থেকে উথিত বাস্পের ওপর তাজমহলকে ভাসমান অবস্থায় অবলোকন করতে পারতেন।

তারা সিদ্ধান্ত নেন, শাহজাহান আর তার স্ত্রীর দল তাজমহল প্রাঙ্গণের তাদের সামগ্রিক পরিলেখের মাঝে মাহতাব বাগকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন এবং এ জন্য তারা উদ্যানের ব্যাপক পরিবর্তন আর পরিবর্ধন সাধন করেছিলেন এবং অষ্টভূজাকৃতি জলাধার এবং হাতেলির মতো বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছিলেন, ১৬৫২ সালের ৯ ডিসেম্বর আওরঙ্গজেবের চিঠিতে তাজমহল আর মাহতাব বাগ সবকে তার পছন্দের বিষয়টি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি চিঠিতে শাহজাহানকে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে বন্যার কারণে ‘উদ্যানের সৌন্দর্য’ নষ্ট হচ্ছে একই সময় তাজমহলের প্রধান গম্বুজ দিয়ে পানি ঢোয়ানোর বিষয়টিও তিনি তাকে জানিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাম্প্রতিক গবেষণা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যে, শাহজাহান বিশাল একটি উদ্যানের মধ্যস্থলে তাজমহল অবস্থান করবে এটাই চেয়েছিলেন, যা প্রথাগত চারবাগ নকশার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাজমহল আর মাহতাব বাগের উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত পানির নহর মতাজের দেহের সাথে একই রেখায় অবস্থান করে প্রধান অক্ষ সৃষ্টি করেছে



মূল কক্ষে মমতাজ মহল আর শাহজাহানের স্মৃতিস্থানের উপর থেকে ধারণকরা দৃশ্য।

কিন্তু সেইসাথে যমুনা নদীর পূর্ব-পশ্চিমে নহরে হিসেবে বিরাজ করা আকরিক  
অথেই সম্ম উদ্বেককারী বিশাল মাপের একটি ধারণা।

শাহজাহানের এমন একটি উদ্যান খুলাসের সাথে একটি চিরস্থায়ী ধারণা  
জড়িয়ে রয়েছে যে, মমতাজের জন্মেই তিনি কেবল তাজমহল নির্মাণ করতে  
চেয়েছিলেন এবং তাজ থেকে দূরে যমুনার ওপাশে নিজের জন্য পৃথক একটি  
মকবরা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ফরাসি পর্যটক আর রত্ন ব্যবসায়ী  
ফ্রান্সোয়া ত্রেভার্নিয়ের ১৬৪০ সালে প্রথমবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ এবং  
পরবর্তীকালে ১৬৫৫ সালে (আওরঙ্গজেব তার পরবর্তী ভ্রমণের সময়  
শাহজাহানকে বন্দি করে রেখেছেন) তার আগ্রায় অবস্থানের কথা বর্ণনা করতে  
গিয়ে বলেছেন : ‘শাহজাহান নদীর অপর তীরে নিজের জন্য একটি মকবরা  
নির্মাণ শুরু করেছিলেন কিন্তু নিজের পুত্রদের সাথে যুদ্ধের কারণে তার  
পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটে।’ ত্রেভার্নিয়ের নিজের ভাষ্য সংকলনের কালে  
নিশ্চিতভাবেই আগ্রার অম্বত্যদের আর অন্যদের সাথে আলোচনা করেছিলেন।  
স্থানীয় মৌখিক ইতিহাস ত্রেভার্নিয়ের বক্তব্য সমর্থন করে, সেইসাথে এটাও  
বলে যে, দ্বিতীয় তাজ কালো মর্ম দিয়ে নির্মিত হবার কথা ছিল এবং আরো  
বলা হয় যে শাহজাহানের দুটো মকবরাকে একটি সেতুর সাহায্যে, খুব সম্ভবত  
রৌপ্য নির্মিত, সংযুক্ত করার ইচ্ছা ছিল। অনেক গাইড বইয়ে এই তথ্য কঠোর  
বাস্তবতা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং অধিকাংশ গাইড নিদেনপক্ষে দ্বিতীয় কৃষ্ণ  
তাজের কথা খুব সামান্য করে হলেও উল্লেখ করবে।

দ্বিতীয় তাজের ধারণা অনেক ঐতিহাসিক নাকচ করে দিয়েছে কারণ প্রেভান্সের ছাড়া সমসাময়িক অন্য আর কারো লেখায় বিষয়টি উল্লেখিত হয়নি এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাহত্বাব বাগে তাদের সাম্প্রতিক খননকার্যের সময় এমন কোনো ইমারতের ভিত্তিপ্রস্থর খুঁজে পাননি। (অষ্টভূজাকৃতি প্রতিবিম্ব জলাধার কালো তাজ যেখানে অবস্থিত হবার কথা ছিল সন্দেহ সেখানেই নির্মিত হয়েছে।) শাহজাহানের অন্য কোথাও নিজের মকবরা নির্মাণের কোনো প্রস্তুতির বিষয়ে কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায় তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তার ভেতর সব সময় তাজেই সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় ছিল, একটি পূর্ব দৃষ্টান্ত—যে মমতাজের পার্সি পিতামহ ইতিমাদ-উদ-দৌলাকে তার স্ত্রীর সাথে একই মকবরায় সমাধিস্থ করা হয়েছে—উল্লেখ করে তাকে জোর করে তাজমহলে সমাধিস্থ করা তার ক্ষমতা জবরদখলকারী সন্তানের এই অনুচিতন তারা নাকচ করে দিয়েছে, তারা দেখিয়েছেন যে উভয় ক্ষেত্রে মহিলা, যিনি প্রথমে মৃত্যুবরণ করেছেন মকবরার কেন্দ্রে শায়িত তার সামান্য পাশে পরবর্তী সময়ে তার স্বামীকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

‘কালো তাজ’-এর বিষয়টি নিয়ে চিঞ্চোভনার আগে অবশ্য যুক্তিটা অন্য দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে যে, শাহজাহান তাজমহলে সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় কখনো ব্যক্ত করেছিলেন কি না এবং বিষয়ে কোনো প্রমাণ কি আদৌ রয়েছে? শাহজাহানের সত্যিকারের স্মারণযোগ্যনের পর পর্যন্ত দরবারের কোনো দিনপঞ্জি রচয়িতা কোনো ইউরোপীয় প্রয়োগক, কেউই তাজমহলকে মমতাজের মকবরা ভিন্ন অন্য কিছু হিসেবে উল্লেখ করেনি। মকবরার নাম ‘তাজমহল’ সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে, মমতাজ মহলের নামের সংক্ষিপ্তরূপ, যা শাহজাহানের মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে এবং এ থেকে একটি বিষয়ই স্পষ্ট হয় যে, মকবরাটা তখন তার কথা ভেবেই নির্মাণ করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও কেবল তারই থাকবে। এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই যে, মমতাজ মহলের স্মৃতিস্তম্ভ মমতাজাবাদ থেকে মাহত্বাব বাগ পর্যন্ত প্রসারিত সমগ্র প্রাঙ্গণের মূল অক্ষরেখা বরাবর একই রেখায় অবস্থিত হওয়ায় মকবরার সেরা স্থানটা দখল করে রেখেছে। সমগ্র মকবরা প্রাঙ্গণে শাহজাহানের স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থানই একমাত্র অপ্রতিসম উপাদান। তার যদি তাজমহলে নিজেকে সমাধিস্থ করার অভিপ্রায় থাকত তাহলে তিনি কি নিজের জন্য সেরা স্থানটা সংরক্ষিত রাখতেন না বা অক্ষ রেখার উভয় পাশে প্রতিসমভাবে নিজের আর মমতাজ মহলের সমাধির কথা বিবেচনা করতেন না?

আরো রয়েছে, শাহজাহানের স্মৃতিস্তম্ভ নিচের সমাধিগর্ভ এবং মকবরার মূল সমাধিসন্দোধে জোর করে স্থাপিত হয়েছে এটা দৃশ্যতই প্রতীয়মান হয়ে

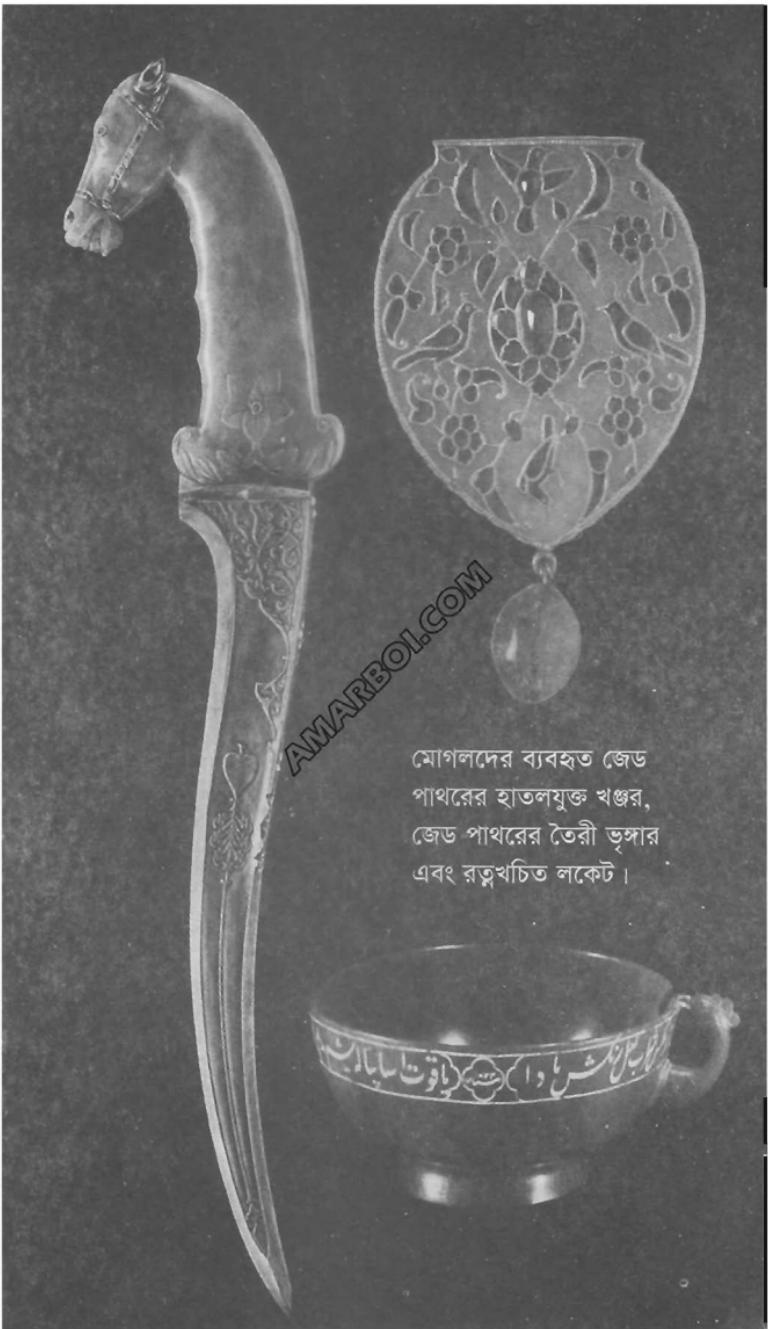
মাহতাব বাগ (চন্দ্রালোকিত বাগিচা) থেকে দৃশ্যমান তাজমহল।



AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

মোগলদের ব্যবহৃত জেড  
পাথরের হাতলযুক্ত খঞ্জর,  
জেড পাথরের তৈরী ভঙ্গার  
এবং রত্নখচিত লকেট।



রয়েছে। মূল সমাধিসন্দোধে বিশেষ করে ওপর থেকে যখন দেখা হয় মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভ আর চারপাশের জাফরির তিরক্ষরণীর মাঝে তার স্মৃতিস্তম্ভের জন্য সামান্যই স্থান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, মমতাজের পাশেই যদি শাহজাহানের সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় থাকত তিনি আরো বড় এলাকা অলংকৃত জাফরির তিরক্ষরণী দ্বারা ঘিরে রাখতেন, যা করার মতো স্থান মকবরায় ছিল। তা ছাড়া মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভের চারপাশে কিনারার মেঝের সাদা কালো টালির অনেকটাই শাহজাহানের স্মৃতিস্তম্ভ অনভিপ্রেতভাবে দখল করেছে যখন তার নিজের স্মৃতিস্তম্ভের চারপাশের কিনারায় এমনকোন সীমারেখা নেই। সমাধিগর্ভে শাহজাহানের সমাধি আর দেয়ালের মাঝে বিদ্যমান ফাঁকা স্থান দিয়ে কোনোমতে একজন লোক হেঁটে যেতে পারে অন্যদিকে মমতাজের সমাধি আর বিপরীত দিকের দেয়ালের মাঝে প্রায় আট ফিট ফাঁকা জায়গা বিদ্যমান। মমতাজের পাশেই যদি সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় থাকত তাহলে কি শাহজাহান আরো বড় করে সমাধিগর্ভ নির্মাণ করতেন না?

ইতিমাদ-উদ-দৌলার মকবরার সাথে তুলনাটা প্রথম দৃষ্টিতে যতটা বোধগম্য মনে হয় আসলে ততটা নয়। ইতিমাদ-উদ-দৌলা আর স্তুর নিচু মকবরার সমাধি দুটো যারা তিন মাসের ব্যবধানে মৃত্যুব্রহ্মণ করেছিলেন মমতাজ মহল আর শাহজাহানের মতো নয়, একই আনুষ্ঠুন্ত আর নকশার এবং দুটোই মেঝেতে একটি টালির সীমানাযুক্ত এলাকার ভেতর অবস্থিত। জাফরি কাটা কোনো তিরক্ষরণী সেখানে নেই এবং স্মৃতিস্তম্ভের চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে সিঙ্কান্ত নেয়াটা নিতান্তই যুক্তিসংগত যে, আওরঙ্গজেব যখন তার আবক্ষানেমের জন্য একটি সমাধিস্থল সঙ্কান করেছিলেন তার প্রপিতামহ আর প্রপিতামহীর স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থান দরকারি সাশ্রয় আর অপ্রত্যক্ষ একটি পূর্ব দষ্টান্ত হিসেবে দেখেছিলেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে, ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধির বিন্যাস এই যুক্তি সমর্থন করে যে, শাহজাহানের বরাবরই তার স্তুর পাশে সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় ছিল।

এসব প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এটা ধারণা করাটা সংগত হবে যে, শাহজাহানের তাজমহলে সমাধিস্থ হবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। সে ক্ষেত্রে আরো একটি প্রশ্ন সামনে এসে যায়, তিনি তবে কোথায় সমাধিস্থ হতে চেয়েছিলেন? আমরা নিশ্চিতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। অবশ্য অনেক সময় যেমনটা বলা হয়ে থাকে তার চেয়ে জোরাল বস্তুনিষ্ঠতা কালো তাজমহলের জন্য সুষ্ঠি করা যায় এবং এর স্বপক্ষে কিছু সমর্থনও রয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল এম. সি. জোশির সাম্প্রতিক বক্তব্য, যিনি মনে করেন, এটা নিশ্চিতভাবে অন্ততপক্ষে পরিকল্পনা স্তরের একটি অংশ ছিল, সেইসাথে হাতে রয়েছে ত্রেতার্নিয়ের মন্তব্য এবং শক্তিশালী জোরাল স্থানীয় উপকথা।

শাহজাহান, যিনি শিল্পকলাকে বিশাল পরিমাপে অবলোকনের ক্ষেত্রে একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং যমুনার উত্তর তীরে বিপরীত পাশে আরেকটা মকবরা নির্মাণের বিষয়টি তার কাছে মোটেই কল্পনাতীত নয়। মাহতাব বাগের

অষ্টভূজাকৃতি জলাধারে দীপ্তিময় যেকোনো প্রতিবিম্বের চেয়ে দ্বিতীয় মকবরাটা তাজমহলের অনেক বেশি নির্বুত প্রতিফলনে সক্ষম হতো। সাদা মার্বেলের সাথে কালো মার্বেলের প্রতিভূলানা শাহজাহান পছন্দ করতেন। ১৬৩০ সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরে শালিমার উদ্যানে মহত্বজের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কালো মার্বেলের একটি মহলের প্রিন্ট নির্মাণ রীতি তার এই পছন্দের উদাহরণ হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাজমহলের প্রাচুর কালো মার্বেল সংযুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চারটা মিনারিকার প্রতিটি সাদা মার্বেলের খঙের মাঝে কালো মার্বেল প্রণিহিত করা হয়েছে। সমাধিসৌধের চারপাশের নিচু দেয়ালে একই উপাদান দিয়ে করব করা হয়েছে এবং মূল মকবরার চিত্রলিপি এবং তার চারপাশের সীমানা অক্ষনে কালো মার্বেল ব্যবহৃত হয়েছে। পানির ও পাশে কালো তাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রূপান্তর আর কী হতে পারে?

মাহত্বাব বাগ প্রচলিত ধারণা অনুসারে মূলত একটি প্রমোদকানন। তৈমুরীয় আর মোগল রীতি অনুসারে শাসক আর অভিজাতদের প্রায়ই জীবিত অবস্থায় তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নির্মিত উদ্যানে সমাধিস্থ করা হতো। নূর যেমন শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীরের মকবরা শাহোরে তার প্রিয় প্রমোদকাননে নির্মাণ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের পিতা আকবরকে যেমন তার জীবদ্ধশায় নির্বাচিত উদ্যানের বিন্যাসের মাঝে সমাধিস্থ করা হয়েছে। জীবিত থাকাকালীন সময়ে শাহজাহান যখন নিজের মকবরার কাজ শুরু করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, ত্রৈর্বার্ণিয়ের ভাষ্য অনুসারে স্তুতি তখনই ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল। কালো তাজমহল নির্মাণ বা মাহত্বাব বাগে যেকোনো মকবরা নির্মাণ তখন আর তার ক্ষমতার ভেতরে ছিল না।

কালো তাজমহলের নির্মাণ পরিকল্পিত হয়েছিল এমন কোনো নিষ্পত্তিমূলক প্রমাণ ও পরের যুক্তির্কের মাধ্যমে পাওয়া না গেলেও জানা বিষয় আর প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের সমন্বয়ের সুস্থিত এখানে গৃহীত হয়েছে। সেইসাথে প্রত্যেক মানুষের গভীরে যে রোমান্টিক সন্তু লুকিয়ে রয়েছে তার কাছে এটা ভীষণ আবেদন সৃষ্টিকারী।

মকবরার সাদা মার্বেলের সমাধিসৌধের ভারবহনকারী নদীর উত্তর প্রান্ত বরাবর যে বেল পাথরের ঢতুর রয়েছে সেখানের পরম্পরার সম্পর্কিত একাধিক ডুগর্ভস্থ কক্ষগুলো কী উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল সেটা আরেকটা বিতর্কের বিষয়বস্তু। সেখানে পরম্পরার সাথে সংক্ষিপ্ত গলিপথ দ্বারা সংযুক্ত সতেরোটা কক্ষ রয়েছে। দুটো সিঁড়ি দ্বারা সতেরো ফিট ওপরের বেলে পাথরের ঢতুর সাথে ডুগর্ভস্থ কক্ষগুলোর সংযোগ সাধিত হয়েছে। প্রতিটি কক্ষ উচু ছাদবিশিষ্ট প্রতিটি আবার খিলানাকারে বেঁকে গিয়ে ছাদের শীর্ষবিন্দুতে এক প্রকার গম্বুজের আকার ধারণ করেছে। ছাদগুলো পলেস্টার করা আর হীরকাকৃতি নকশা দ্বারা অলংকৃত। দেয়ালের নিচের অংশে ড্যাডো পর্যন্ত লাল-সবুজের সীমারেখা দ্বারা ঠিক অনেকটা বুরানপুরের বাজকীয় হাত্তেলির শাহজাহানের

- 
- যারা মনে করেন শাহজাহানের অভিপ্রায় ছিল মাহত্বাব বাগে সমাধিস্থ হওয়া তাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক আ. সি আগরওয়াল আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইউয়ার বর্তমান জয়েন্ট ডিরেক্টর জেনারেল।

ইমারতগুলোতে যেমন রয়েছে। ড্যাডোর ওপর দেয়ালের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে আছে খিলানাকৃতি প্যানেল এবং ঘার সীমানা লাল আর সবুজ দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে। কক্ষগুলো নদীর প্রান্তের দেয়ালগুলোর এসব খিলান মনে হয় মোগল ইমারতের অন্যত্র ব্যবহৃত ছেট ছেটের সাহায্যে পরবর্তী সময়ে যুক্ত করা হয়েছে। (নদী থেকে দেখলে কক্ষগুলোর অঙ্গিত্বের একমাত্র বাহ্যিক লক্ষণ হলো পূর্ব প্রান্তের সিডি যেখানে নিচে নেমেছে তার কাছে বায়ু চলাচলের জন্য জাফরি করা তিরক্ষরণীর উপস্থিতি।)

দক্ষিণে ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোর পেছনে যমুনা নদী থেকে দূরবর্তী অংশে একটি পৃথক সংকীর্ণ উচু করিডর রয়েছে। পরিমাপ করে দেখা গেছে, কক্ষ আর সূড়সের সমিলিত প্রস্থ ছাঁকিশ ফিট দুই ইঞ্চি। তার মানে মকবরার ভারবহনকারী সাদা মার্বেলের স্তম্ভপিটের ভেতরে আট ইঞ্চি দূরত্বে তাদের সমষ্টি হয়েছে।

ইমারতের বাকি অংশের সাথে সমসাময়িক সূড়স্থপথ আর ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলো স্পষ্টতই সমসাময়িক। শাহজাহান যখন তাজমহল পরিদর্শনে আসতেন তিনি নদীপথ ব্যবহার করতেন। (১৯৫৮ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া জেটির ভার বহন করত এমন একটি মধ্যের অবশিষ্টাংশ চিহ্নিত করেছে।) অনেকে অবশ্য যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করে যে ওপরের ভারী কাঠামোর ভার সমানভাবে ভাগ করে দেয়ার জন্য স্থগতিদের একটি জাটিল কিন্তু পরিশীলিত ব্যবস্থার বেশি কিছু না খিলানযুক্ত কক্ষগুলোকে প্রতিক্রিয়া প্রচলিত ধারণা এই যে, তাজমহল যখন নির্মিত হয়েছিল ভূগর্ভস্থ মূল কক্ষগুলোর নদীর প্রান্তের খিলানগুলো উন্মুক্ত ছিল এবং এর ফলে স্তোরেটো কক্ষ পরস্পর সংযুক্ত একটি বারান্দার সৃষ্টি করেছিল স্মার্টের একান্কী হাঁটার জন্য যখন জেটি থেকে তিনি তার দ্বীর সমাধির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি বারান্দার আচ্ছাদনের নিচে থেকে ওপারের মাহত্বাবলীগের দিকেও তাকিয়ে থাকতে পারতেন। বারান্দাগুলো কেন ইট গেঁথে বৰ্ক করে দেয়া হয়েছে তার একটি কারণ সম্ভবত বন্যার বিরুদ্ধে সতর্কতা বা খুব সম্ভবত ফাটল আর পানি চোয়ানর বিষয়ে আওরঙ্গজেবের প্রতিবেদন পাবার পরে ১৬৫২ সালে মকবরার গম্বুজ আর তাজমহলের কাঠামো শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে এটা করা হয়েছিল।

তবে গলিপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। কোনো কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন যে, এটা মার্বেলের স্তম্ভপিটের ভিত্তের চারপাশ দিয়েই ছিল এবং কোনো একটি স্থানে এখান থেকে ওপরে বিদ্যমান সমাধির নিচে অবস্থিত ভূগর্ভস্থ সমাধি গর্ভে প্রবেশ করা যেত, যেখানে তৃতীয় একটি সমাধি সারি অবস্থিত ছিল, মূল সমাধি। তারা তাদের তত্ত্বের স্বপক্ষে একটি বিষয় উদ্ভৃত করে যে, গলিপথটা মার্বেলের স্তম্ভপিটের চেয়ে প্রায় নয় ফিট লম্বা, যা ভিত্তের চারধারে এখান থেকে উভয় প্রান্তে চার ফিট প্রশস্ত গলি পথের বিস্তারের সুযোগ করে দেয়। উনিশ শতকের বিতকিত নথিপত্র, যা বলা হয়ে থাকে হারিয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী নথিপত্রের নকল, সেখানে তিন কেতা সমাধিস্থলের পাথরের খরচ উল্লেখ করা হয়েছে। মৌখিক ইতিহাসের কেবল উনিশ শতকে লিপিবদ্ধকরণই যদি এসব নথিপত্রে উল্লেখিত হয়। তার পরও এটা উন্মুক্ত যে, মৌখিক ইতিহাসে তিন জোড়া সমাধির অঙ্গিত্ব যদি না থাকে তবু তাদের

বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। (সেখানে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়ার কারণ হতে পারে ১৬৫২ সালের সংক্ষারের সময় কাঠামোগত সংস্থিতি বজায় রাখা কিংবা পরবর্তী সময়ে আগ্রার ওপর মোগলদের নিয়ন্ত্রণ শীর্খিল হতে শুরু করলে লুটপাট কিংবা ধ্বংসাঞ্চ বন্ধ করা।) অবশ্য সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে হলে আরো প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং আকিঞ্জিক্যাল সার্টে অব ইভিয়া বলতে তারা বর্তমানে সে রকম কোনো অনুসন্ধান কাজ শুরু করতে আগ্রহী নয়।

তাজমহল মূলত একটি হিন্দু মন্দির এ বিষয়ে অদ্যাবধি একটি বিতর্ক চলে আসছে। ভারতের স্থাপত্য নির্দেশনে হিন্দু মুসলিম রীতির তুলনামূলক অর্জন সম্পর্কিত বিতর্ক নতুন কিছু নয় এবং যা প্রায়ই তাজমহল যে দুটো রীতির সংগ্রেষণ এ বিষয়টি থেকে বিচ্যুত হয়। ১৯২০ সালে অ্যালডাস হাস্কেল যেমন লিখেছেন : ‘তাজমহলের অলংকরণের তুলনায় হিন্দু স্থপতিদের নির্মিত ইমারতগুলোর কারুকাজ অনেক বেশি সমৃদ্ধ আর আকর্ষণীয়।’ অবশ্য সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কোনো কোনো প্রথাবিশেষ হিন্দু ঐতিহাসিক এই বিতর্কে নতুন একটি মাঝা যোগ করে ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করে যে, শাহজাহান শূন্য থেকে তাজমহল নির্মাণ করেননি, তিনি কেবল পুবেই এখানে অবস্থিত একটি ইমারতের আধারের (জয়পুর) রাজাৰ তৈরি একটি রাজপুত প্রাসাদ বা মন্দিরের কেবল পরিমার্জন করেছিলেন।

এসব ঐতিহাসিকদের দাবি, যা আগাতভাবে জাতীয় স্থাপত্যকলায় মোগল অবদানকে খাটো করে দেখাতে চায়। (কেউ এমনও প্রশ্ন তুলেছে যে, অন্য ইমারতগুলো যেমন হ্যায়ুনের মকবরা কে আদতেই মোগলদের তৈরি?) তারা অবশ্য যেকোনো প্রেক্ষাপট থেকে জাগত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহাসিকের সমর্থন লাভ করেনি এবং সময়সূচিক, রাজপুত বা মোগল বা ইউরোপীয় তথ্যসূত্র থেকে এবিষয়ের সমস্তেই কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন উন্নত দাবি মূলত শাহজাহানের দুজন সমসাময়িক দিনপঞ্জি রচয়িতার বক্তব্যের ওপর নির্ভরশীল যে, তাজমহলের নির্মাণ স্থানে, যা আধারের রাজা স্বাটকে উপহার দিয়েছিলেন, সেখানে কোনো একধরনের আউটহাউস জাতীয় মোকাম বা বাগানবাড়ি ছিল এবং যার পরিবর্তে তাকে অন্যত্র চারটা সম্পত্তি দেয়া হয়েছিল। এটা সেই ইমারত, যা ভিন্ন মতাবলম্বী ঐতিহাসিকরা দাবি করেন যে, শাহজাহান পরিবর্তন করেছিলেন হিন্দু বাস্তুরীতির স্পষ্ট নির্দেশন বজায় রেখে। সময়ের সাথে সাথে মূল ইমারতের বর্ণনা সমস্তে হিন্দু লেখকদের বক্তব্য বিতর্কের চাপে পড়ে পরিবর্তিত হয়ে কখনো প্রাসাদ আবার কখনো শিবমন্দির হয়েছে, যার নাম ‘তাজো মহালয়া’, যা থেকে তাজমহল নামের উৎপত্তি। তারা আরো দাবি করে, ভূগর্ভস্থ সূড়ঙ্গপথ ইট গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, কারণ সেই সূড়ঙ্গপথ দিয়ে শিবের প্রতিমার কাছে পৌছানো যেত।

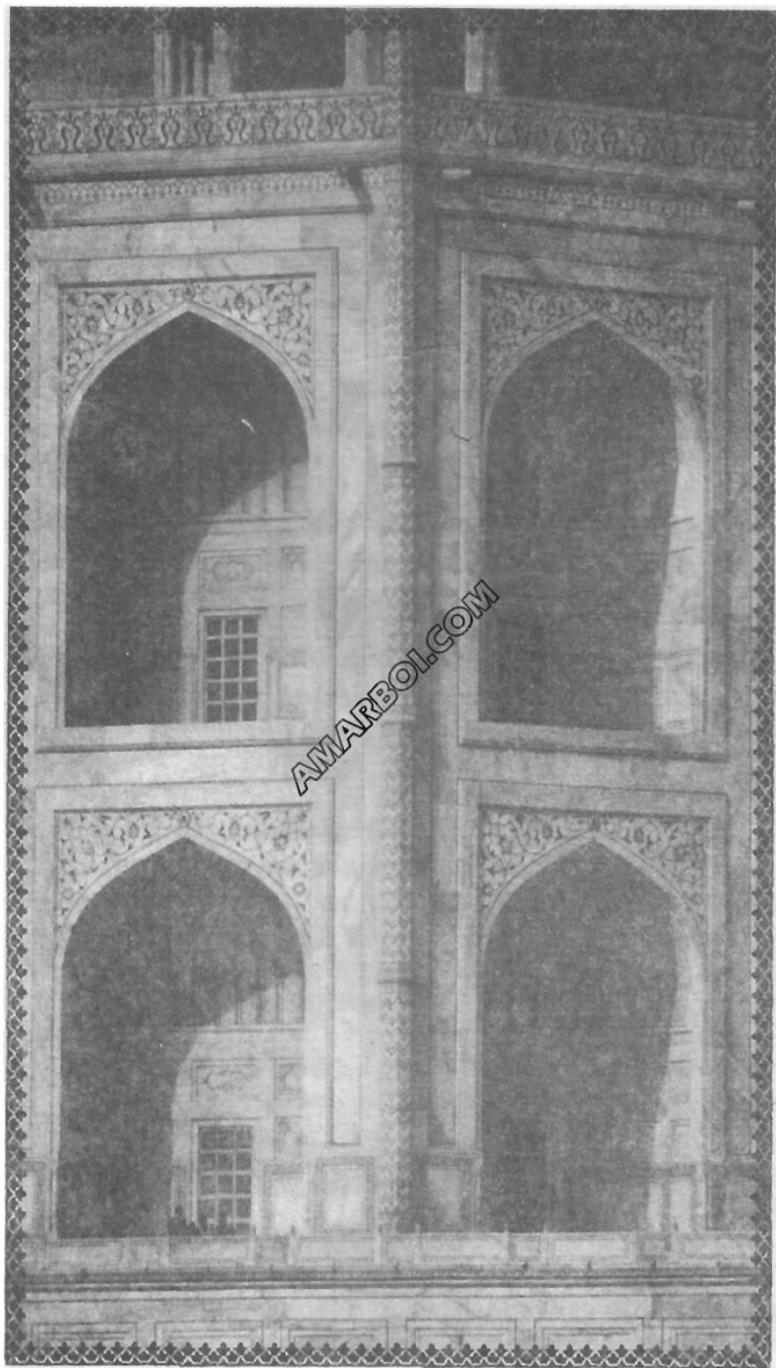
এসব যুক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী পাঞ্চ যুক্তি হলো, মকবরা নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হয় দরবারের ঐতিহাসিক কর্তৃক প্রণীত বা ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক দ্বারা রচিত যেমন পিটার মানডি যিনি নির্মাণ কার্য শুরু হবার সময় উপস্থিত ছিলেন একটি বিষয় সন্দেহাত্তীভাবে লিপিবদ্ধ করেছে যে, নির্মাণকার্য ভিত্ত থেকে

আরম্ভ হয়েছিল। দিনপঞ্জি রচয়িতা শাহোরি ‘পানির শুর’ পর্যন্ত খনন করে ‘ডিত স্থাপনের’ বিষয়ে লিখেছেন। পিটার মানডি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ‘মকবরা নির্মাণ শুরু হয়েছে...’ নির্মাণ স্থানে যদি পূর্ব থেকেই উল্লেখযোগ্য কোনো স্থাপনা থাকত অন্যান্য পর্যবেক্ষক যারা মহাতাজের মৃত্যুর পূর্বে আগ্রা এসেছিলেন তারা সেটার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। বাবর প্রথম যখন আগ্রা এসেছিলেন তখন তার এটার কথা উল্লেখ না করার কোনো কারণই থাকতে পারে না এবং তিনি তার চারপাশের পরিবেশ নিয়ে ভীষণ হতাশ ছিলেন। (তার জানবার কথা না যে একশ বছর পরে তার উত্তরসূরি এটাকে একটি মকবরায় রূপান্তরিত করে দাবি করবে যে তারা পুরোটাই শূন্য থেকে নির্মাণ করেছে।) একইভাবে ইউরোপীয়রা যেমন জেসুইট ফাদার মনসারেট যিনি ১৫৮০-১৫৮২ সালের ভেতর বেশ কয়েকবার আগ্রা ভ্রমণ করেছেন বা স্যার টমাস রো, যিনি আগ্রার বিভাগিত বর্ণনা এবং সন্তুলণ শতকের আগ্রার দরবার জীবনের কথা লিখে গেছেন এবং প্লেসার্ড ডাচ ব্যবসায়ী যিনি ১৬২০ থেকে ১৬২৭ সালের ভেতর আগ্রায় এসেছিলেন এবং যমুনার তীরে অবস্থিত উদ্যান এবং প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন, পূর্ব থেকেই অবস্থিত কোনো ইয়ারতের কথা উল্লেখ করেননি। আঘারের রাজা, যিনি নির্মাণের জন্য জমি উপহার দিয়েছিলেন তার রাজকীয় মহাফেজখানায় অন্যত্র নির্মাণ প্রকল্পের—মন্দিরসহ—উল্লেখ রয়েছে আগ্রায় এমন কোনো নির্মাণের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। তা ছাড়া তাজের হিন্দু স্থাপত্যকৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন ছাঁচি মূলত আকবরের সময়কাল থেকেই মোগল স্থাপত্যে বহুভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা হিন্দু আর মুসলিম রীতির সংগ্রেহের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় শিব মন্দিরের বিষয়টি বিশেষভাবে বিভ্রান্ত করেছে, কারণ মন্দির নির্মাণের পর বিক্রি করা যায় না আর শাহজাহান জমি অধিগ্রহণ করতে এমন অঙ্গুলজনক কাজ কখনো করবেন না এবং আরেকটা কারণ আঘারের রাজা হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ শাখার অনুসারী, যারা কখনো শিব মন্দিরে উপাসনা করবে না। সম্ভবত শ্রস্তব যুক্তির চেয়ে নির্ভরযোগ্য বজ্রব্য হলো, আমাদের পরিচিত কোনো মন্দির দেখতে তাজমহলের মতো নয়।

ধর্মীয় বিভক্তির আরেক দিক থেকে আগত বিতর্ক ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভক্তির সময় স্থাপিত ওয়াকফ বোর্ড দাতব্য প্রতিষ্ঠান, যা পরিত্যক্ত মুসলমান কবর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়েছিল। তারা সম্প্রতি তাজমহলের অভিভাবকত্ব দাবি করার চেষ্টা করে, যাতে শরিয়া আইনের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের ভেতর অবস্থান করে তারা এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। ২০০৫ সালে সুগ্রিম কোর্ট তাদের দাবি নাকচ করে দেয় এই জন্য যে, মোগল আর ব্রিটিশ উভয় আমলে তাজমহল রাষ্ট্র বা রাজার সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং যা আইনত স্বাধীন ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

এমন গোড়া মতবিরোধ আর মতান্বেক্য কোনো সন্দেহ নেই অব্যাহত থাকবে। ঠিক যেমন তাজ ৩৫০ বছর পূর্বে বার্নিয়ের যা বলেছেন সবার সেভাবেই ভাষ্য হয়ে থাকবে—বিশ্বের বিশ্বয়—হিসেবেই যদিও শাহজাহানের মানসপটের মূল দৃশ্যপট সব সময় খানিকটা রহস্যাবৃত থেকেই যাবে।



AMARBOI.COM

## পুনর্ক্ষ : শেষকথার আড় কথা

আমাদের এ বইটা লেখার সময় প্যানেল দেয়া অক্সফোর্ডের নীরব প্রস্থাগার থেকে শুরু করে ইস্পাহানের চিনামাটির সূক্ষ্ম কারুকাজ করা মসজিদ উজবেকিস্তানের ডেতর দিয়ে একেবেঁকে বয়ে চলা অঙ্গাস নদীর বালুকগাময় তীর আর অবশ্যই ভারতবর্ষে যেতে হয়েছিল। আমরা সেখানে তাজমহলের উত্তর মকবরা থেকে বুরহানপুরের প্রাসাদের তগুবশেষে যেখানে যমতাজ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, শাহজাহান আর যমতাজের জীবনকালে ফিরে যেতে চেষ্টা করেছি। অতীতে আমরা যদিও বহুবার তাজমহল দর্শন করেছি প্রতিবারই একে আমাদের নির্খৃত আর চিরসন সৌন্দর্যের প্রতীক মনে হয়েছে, এইবার অবশ্য আমাদের কখনো কখনো মনে হয়েছে যে, আমাদের নব্যপ্রাণ জ্ঞান কি কোনোভাবে এর আবেদন আমাদের কাছে হাস করবে? আমাদের দুষ্টিজ্ঞ করার কোনো কারণ ছিল না তাজমহল যেকোনো স্মৃতিকথা, যেকোনো প্রতিসাম্যের বিস্তারিত পরিমাপ, যেকোনো পরিকল্পনার আবেক্ষণ, যেকোনো রূপকের বাড়াবাড়ি উন্নেজনার সাথে সিজের আবিষ্ট করার চেষ্টা সব কিছুকে অন্যায়ে ছাপিয়ে যেতে পারে। আমরা যখন অহসর হচ্ছি তখন তোরণগুহের লাল বেলে পাথরের খিলানের ঝাঁঝে মরীচিকার মতো কাঠামোবিশিষ্ট ভাসমান সাদা মকবরার সহসা আবারও আমাদের থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে এবং নিজেদের অজান্তেই শ্বাসকুন্ধ হয়ে যায়।

অষ্টম এডওয়ার্ড, যিনি ১৮৭৫ সালে প্রিপ্স অব ওয়েলস থাকা অবস্থায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন, বিষণ্ণ হয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, তাজমহল সব লেখকের একটি সাধারণ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে, যারা তাজ দর্শন করে ‘তাজমহলকে বর্ণনা করা অসম্ভব বলে শীকার করে নিয়ে তারপর তাজ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়ার ধৃষ্টিতা প্রদর্শন করেন।’ শেকসপিয়রের সাথে যদিও একজন একমত হন যে, সৌন্দর্য নিজেই নিজের বোদ্ধা কোনো প্রচারক বক্তব্যই মানুষের চোখকে মুক্ষ করে এবং সৌন্দর্য ভীষণভাবে আত্মগুণ ভীষণভাবে স্বজ্ঞাত ভীষণভাবে দর্শনার্থীর চোখে অবস্থান করে যে কেউ কোনো কিছু সুন্দর বলে মনে করলেই কেবল সেটা সুন্দর হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে এটা

আসলেই একটি অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায় কিছু উপাদানকে আলাদা করে শনাক্ত করা, যা সারা পৃথিবীর নামা সংকৃতি আর উভয় লিঙ্গের মানুষকে তাজমহল সুন্দর বলে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে।

আমাদের প্রায় সবার কাঠামো আর প্রতিসাম্যকে সাংসিদ্ধিকরণে আকর্ষণীয় বলে মনে করি। গবেষকরা একই মানুষের দুটো ছবি যখন একটি আমাদের সবার মাঝে বিদ্যমান প্রাকৃতিক অপ্রতিসমতা যুক্ত আসল মুখের ছবি আর অন্যটা তাদের মুখের অর্ধেক এবং তার ছবি প্রতিরূপের ছবি হিসেবে দেখায়, যার ফলে প্রতিসাম্য বৃক্ষ পেয়েছে, বেশির ভাগ লোকই প্রতিসাম্য বিশিষ্ট ছবিটা পছন্দ করে। সংগীত আর অন্যান্য শিল্পের রস উপভোগ করতে সৌন্দর্যের জন্য মনে হয় কাঠামোর প্রয়োজন, যদিও প্রথমটা কোনোমতেই দ্বিতীয়টার নিশ্চিয়তা দেয় না। তাজমহলের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ঠিক এটাই হয়েছে, যার প্রতিসাম্য আর কাঠামোগত সংগতি আমাদের ভীষণভাবে সন্তুষ্টি দান করেছে। আমরা মকবরা অভিযুক্ত হেঁটে যাবার সময় আকৃতি আর স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টতা আর কোমনীয়তার সতত বৃহত্তর মাত্রায় প্রায় প্রাধান্য পরম্পরায় যেভাবে ভেসে ওঠে আমরা তার প্রশংসা করি।

ভারতবর্ষে আমাদের দেখা অন্যান্য ইসলামিক বা মোগল ইমারত থেকে একেবারেই আলাদা তাজমহলে ইসলামিক হিন্দু বাস্তুশাস্ত্রের উপকরণের কেবল সন্নিবেশই ঘটেনি, তাদের সংশ্লেষণ আর জটিল রূপান্তর ঘটানো হয়েছে এমন একটি ইমারত সৃষ্টিতে, যার প্রভাবের সম্মতাকে বহুণে ছাপিয়ে গেছে। আমাদের কাছে বেশির ভাগ মুসলিম স্থাপত্যের চেয়ে তাজমহল প্রাঙ্গণ অনেক বেশি ছন্দময়, মানবিক আর জাঁকালো আর কিছু হিন্দু মন্দিরের চেয়ে অনেক বেশি সাবলীল আর পরিষ্কার এর সংস্থিতি। আনুপুর্জিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আর বিশাল মাত্রার সমাবেশ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। উনিশ শতকের বিশপ হেবার যখন তাজমহল দানবদের দ্বারা নির্মিত আর রাত্নাকরদের দ্বারা সমাপ্ত বলেছেন তখন তার এই অনুভূতিটা নির্খুতভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাজমহল যখন নির্মিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়েই রেভারেড টমাস ফুলার একাধারে যাজক এবং প্রাবন্ধিক লেখেন যে, ‘নির্মাণের মূল সৌন্দর্য আসলে আলো (সূর্যের বড় মেঝে)।’ আমরা অনুভব করেছি তাজমহলের অভ্যন্তরে আর বহির্ভাগে উভয় ক্ষেত্রেই এটা চরম অভিভূতকর ঝুঁপে সত্য। মূল মকবরার অভ্যন্তরে আলোর পরিবর্তন খোদাই করা ভাস্কর্যগুলোকে আরো প্রবলভাবে উদ্ভাসিত করে এবং বেলা যত বাড়তে থাকে সাথে সাথে এটাও তীব্র বা কোমল হয়, মেজাজের পরিবর্তন ঘটায়। বহির্ভাগে শাহজাহান ঠিক যেমনটা পরিকল্পনা করেছিলেন তাজমহল আজও তার একমাত্র প্রেক্ষাপট হিসেবে আকাশের সান্নিধ্য পাচ্ছে। অন্য কোনো ইমারত এমনকি কোনো গাছও কোনো ধরনের

প্রতিযোগিতা বা কোনো বিক্ষেপ সৃষ্টি করেনি। জলাধার আর নহরের পানিতে সূর্যের আলোয় ইমারতটা প্রতিফলিত হয় প্রহর অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে ইবানের গভীরতার ছায়ার হাস্সা বৃক্ষ ঘটে। প্রেক্ষাপট এবং আলোর পরিবর্তনের প্রতি মাকরানা মর্মরের আঞ্চ্ছাহিতা বর্ণ আর মেজাজের নানান বিভঙ্গ সৃষ্টি করে। সূর্যাস্তের সময় অর্ধেক ইমারত আমরা গোলাপি কোমলতায় ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখি। সন্ধ্যাবেলো ইমারতের বাকি অর্ধেক কালচে কমলা রঙের ছোয়া পায়। সন্ধ্যার আকাশ কিছুক্ষণ পরেই উজ্জ্বল বেগুনি রঙের প্রচ্ছদপট সৃষ্টি করে তাজমহল বেগুনি পটভূমিতে বিলীন হয়ে যায়। পড়স্ত সূর্যের আলোয় কম দামি পাথরগুলো জুলজুল করে। চাঁদের আলোয় এই পাথরগুলোই জোনাকির মতো নিঝু নিঝু আর বিকমিক করতে থাকলে তাজমহল নিজে মৃদু ঝরালি আভার জন্য দেয়, কখনো বিষণ্ণ রহস্যময় কুয়াশায় আধেক অদৃশ্য হয়ে থাকে। মনেটের রেইমস ক্যাথিড্রালের ওপর আলোর পরিবর্তনের ছাপের সৌন্দর্য বা আঘাত চারপাশের মাঠে ঘেমন দেখা যায় ঠিক সে রকম ফরাসি খড়ের গাদার ওপর তাজমহলের ওপর আলোর অনন্যক্রিয়া থেকে মনেট কেমন ভেক্ষিত সৃষ্টি করতেন? উইস্লার কেমন ধরনের স্বপ্নীল সংগীতাংশ সৃষ্টি করতেন?

তাজমহলের সৌন্দর্যে যেসব উপকরণ অবস্থাম রেখেছে বলে আমরা মনে করেছি তার সবগুলোর ওপর একসাথে মনোযোগ দেয়া আমাদের কাছে প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছে। একটি উপাদানের ওপর বস্ত্রনিষ্ঠ মনোযোগ দিতে গিয়ে আমরা আবিক্ষার করেছি এটা দ্রুত অত্যধিক শুরুত্ব লাভ করে অন্য উপাদানের সাথে এর সম্পর্ককে বিকৃত করেছে। যাই হোক না কেন, তাজমহলের সৌন্দর্যের সাথে সাংস্কৃতিক ঝর্নে বিস্মৃতিপ্রবণ কিছু একটি রয়েছে। ১৬২৫ সালে ফ্রান্সিস বেকন লিখেছেন, ‘চিরকর্ম যা প্রকাশ করতে পারে না সেটাই সৌন্দর্যের সেরা অংশ।’ প্রত্যেকের তাজমহলকে কল্পনা করার বাস্তবিকই স্পর্শাত্মীত একটি মাত্রা রয়েছে, কিটসের দৃঢ়োক্তি দ্বারা সম্ভবত প্রকাশিত যে, সুন্দরই সত্য আর সত্যই সুন্দর বা সম্ভবত এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে যে, তাজ নিজে সব ধরনের পুনরাবৃত্তি, সব ধরনের পুরাতন উৎসাহকে ছাপিয়ে মৃত্যু হয়ে আছে। মুসলিম দর্শনার্থীদের কাছে কোরআনের আয়াতের বর্ণিত সত্যের জ্ঞান এটা একটি দারুণ উপলক্ষি যে, মকবরা প্রাঙ্গণের নকশায় পৃথিবীর বুকে বেহেশতকে উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে করা হয়েছে, কেবল তাদের সৌন্দর্যবোধ বৃক্ষি করতে পারে। আমাদের মতো আরো অনেকের কাছে আরেকটা কেন্দ্রীয় সত্য সম্পর্কে জ্ঞান যে, মমতাজ মহলের জন্য শাহজাহানের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই আসলে তাজমহলের সারকথা। তাকে কোনোভাবেই পুরোপুরি প্রশংসনীয় একজন মানুষ বলার অবকাশ নেই কিন্তু তার ভালোবাসার গভীরতা এবং ক্ষতির মাত্রা তাজমহলের মাঝে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা

সত্যিই আচল্ল করে দেয়। ১৮৮৬ সালে কবি স্যার এডউইন আর্নল্ড  
লিখেছেন:

কোনো হাপত্যকীর্তি নয় অন্যদের মতো  
কেবলই একজন স্ট্রাটের ভালোবাসার  
গর্বিত আবেগ  
জীবন্ত পাথরের মাঝে প্রোথিত যা দীপ্তিময় আর ভাসমান  
উজ্জ্বল আত্মা এবং ভাবনার সাথে সৌন্দর্যের দেহ।

স্মৃতিশ্মস্তের প্রতি সবার প্রতিক্রিয়া প্রেমের এই উপলক্ষিকে রঙিন করে তুলে  
কারো মাঝে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অনুভূতি সঞ্চারিত করে ভাবতে বাধ্য করে যে,  
মর্মরের মাঝে মাংসের মতো দীপ্তি দেখা যায় এবং গমুজটা আসলে শুনের  
প্রতীক। আবার অন্যদের মাঝে এমন ধারণার জন্ম হয়েছে যে, তাজমহল  
আসলে বাতাসে ভাসমান একটি মায়াবি দুর্গ। শাহজাহান আর মমতাজের  
পাশাপাশি শায়িত ফুলের নকশা করা স্মৃতিশ্মস্তের পাশে একদে দাঁড়িয়ে বুঝতে  
পারি তাজমহল আসলে গভীর আবেগের স্মৃতিশ্মস্তের প্রকাশ। সব মহিমাময়  
চমৎকারিতার কেন্দ্রস্থলে শায়িত রয়েছেন মুজল মানব-মানবী, যারা পরম্পরাকে  
সত্যিই ভালোবাসতেন।

## প্রামাণিকতার পঠন-পাঠন অন্বেষক পাঠকের জন্য অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জি

মূল তথ্যসূত্র (অনুবাদসহ)  
মোগল ও ভারতীয় তথ্যসূত্র

Abul Fazal, *The Ain-i- Akbari*, 3 vols, translated by H. Blochmann and H. S. Jarrett, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1873-94.

- *The Akbarnama*, 3 vols, translated by H. Beveridge, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1907-39.

*Adab-i-Alamgiri*, (Aurangzeb's letters), extracts translated by J. Scott, contained in *Tales, Anecdotes and Letters*, London, Cadell and Devis, 1800.

*Baburnama*, 2 vols, translated by A. S. Beveridge, London, Luzac, 1921.

*Baburnama*, translated by W. M. Thackston, New York, The Modern Library, 2002.

Ferishta, *History of Hindustan*, translated by A. Dow, 3 vols, London, J. Walker, 1812.

Gulbadan, *The Humayan-Nama*, translated by A. S. Beveridge, London, Royal Asiatic Society, 1902.

Haider, *Tarikh-i-Rashidi*, translated by E. D. Ross as *A History of the Moguls of Central Asia*, London, Sampson, 1895.

*The History of India as Told by its Own Historians*, 7 vols, compiled and edited by H. M. Elliot and J. Dowson, London, Trubner and Co., 1867-77.

Inayat Khan, *The Shah Jahan Nama*, edited by W. E. Begley and Z. A. Desai, Delhi, Oxford University Press, 1990.

*Jahangirnama*, translated by W. M. Thackston, Oxford, Oxford University Press, 1999.

*Taj Mahal – The Illumined Tomb. An Anthology of Seventeenth Century Mughal and European Documentary Sources*, compiled and edited by W. E. Begley and Z. A. Desai, Cambridge, MA, The Aga Khan Programme for Islamic Architecture, 1989.

Tirmizi, S. A. I., *Mughal Documents*, Delhi, Manohar Books, 1995.

*The Tuzuk-i-Jahangiri*, (Memoirs of Jahangir), edited by H. Beveridge, translated by A. Rogers, London, Royal Asiatic Society, 1909.

মোগল সাম্রাজ্যে ইউরোপীয় পর্যটকদের অ্রমণবৃত্তান্ত  
ব্যক্তিগত বিবরণী

Bernier, F., *Travels in the Mogul Empire*, Delhi, Low Price Publications, 1999.

Van den Broecke, *A Contemporary Dutch Chronicle of Mughal India*, Calcutta, Susil Gupta (India) Ltd, 1957.

De Clavijo, R. G., *Embassy to the Court of Timur at Samarcand, A.d. 1403-6*, translated by C. R. Markham, London, Hakluyt Society, 1899.

Floris, P., *Voyage of Peter Floris to the East Indies*, London, Hakluyt Society, 1934.

Jourdain, J., *The Journal of John Jourdain*, edited by W. Foster, London, Hakluyt Society, 1905.

Manrique, F. S., *Travels of F. S. Manrique*, London, Hakluyt Society, 1927.

Manucci, N., *Storia do Mogor*, vols 1-4, Delhi, Low Price Publications, 1996.

Monserrate, A., *The Commentary of Father Monserrate on his Journey to the Court of Akbar*, translated by J. Hoyland, Oxford, Oxford University Press, 1922.

Mundy, P., *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia*, vols 1-5, Hakluyt Society, 1914.

Pelsaert, F., *Remonstrante*, translated by W. H. Moreland as *Lahangir's India*, Cambridge, W. Heffer, 1925.

Roe, Sir T., *The Embassy of Sir Thomas Roe to India*, edited by W. Foster, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1990.

Tavernier, J.-B., *Travels in India*, vols 1& 2, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1995.

Della Valle, P., *The Travels of Pietro della Valle*, edited by E. Grey (from a translation of 1664 by G. Havers), 2 vols, London, Hakluyt Society, 1892.

### সংকলনসমূহ

*Early Travels in India- 1583-1619* (contains the accounts of Ralph Fitch, John Mildenhall, William Hawkins, Nicholas Withington, Thomas Coryat and Edward Terry), edited by W. Foster, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1985.

*India in the Seventeenth Century* (contains the accounts of John Ovington, Jean de Thevenot and Giovanni Careri), edited by J. P. Gupta, New Delhi, Associated Publishing, 1984.

De Laet, J., *The Empire of the Great Mogol*, translated by J. S. Hoyland, Bombay, D. B. Taraporevala Sons and Co., 1928.

### অন্যান্য তথ্যসূত্র

#### গ্রন্থসমূহ

Ansari, M. A., *The Social Life of the Mughal Emperors (1526-1707)*, Allahabad and New Delhi, Shanti Prakasan, 1974.

Asher, C. E., *Architecture of Moghal India*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Berinstain, V., *Mughal India- Splendour of the Peacock Throne*, London, Thames & Hudson, 1998.

- Blair, S., & Bloom, J., *The Art and Architecture of Islam 1250-1800*, London, Pelican, 1994.
- Byron, R., *The Road to Oxiana*, London, Pimlico, 2004.
- Canby, S. (ed.), *Humayun's Garden Party*, Mumbai, India, Marg, 1995.
- Carroll, D., *The Taj Mahal*, New York, Newsweek, 1978.
- Chakrabarti, V., *Indian Architectural Theory*, London, Curzon, 1999.
- Craven, R. C., *Indian Art*, London, Thames & Hudson, 1976.
- Crowe S., Haywood, S., Jellicoe, S., & Patterson, G., *The Gardens of Mughul India*, London, Thames & Hudson, 1972.
- Curzon of Kedleston, Lord, *Speeches* vol. 1 1898-1900 and vol. 3 1902-1904, Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1900 and 1904.
- Du Jarric, P., *Akbar and the Jesuits*, London, Routledge, 1926.
- Dutemple, L. A., *The Taj Mahal*, Minneapolis, Minnesota, Lerner Publications, 2003.
- Eraly, A., *The Mughal Throne*, London, Phoenix, 2004.
- Findly, F. B., *Nur Jahān, Empress of India*, New York, Oxford University Press, 1993.
- Footprint *Guide to India*, Bath, Footprint Handbooks, 2004.
- Gascoign, B., *The Great Moghuls*, London, Jonathan Cape, 1971.
- Godbole, V. S., *Taj Mahal and the Great British Conspiracy*, Thane, India, Itihas Patrika, Prakashan, 1996.
- Gommans, J., *Mughal Warfare*, London, Routledge, 2002.
- Hambly, G., *Cities of Mughal India*, London, Elek Books, 1968.
- Hansen, W., *The Peacock Throne*, Newyork, Holt, Rinehart & Winston, 1972.
- Hoag, J. D., *Islamic Architecture*, London, Faber & Faber, 1987.

- Huxley, A., *Jesting Pilate*, London, Triad Paladin, 1985.
- Jaffrey, M., *A Taste of India*, London, Pavilion Books, 1985.
- King, R., *Brunelleschi's Dome*, New York, Walker & Co., 2000.
- Koch, E., *Mughal Architecture*, New Delhi, Oxford University Press, 2002.
- Krishnan, U., & Kumar, M., *Indian Jewellery*, Bombay, India Book House, 2001.
- Lall, J., *The Taj Mahal and the Saga of the Great Mughals*, Delhi, Lustre Press, 1994.
- *The Taj Mahal and Mughal Agra*, New Delhi, Roli Books, 2005.
- Lall, K. S., *The Mughal Harem*, New Delhi, Aditya Prakashan, 1988.
- Lall, M., *Shah Jahan*, Delhi, Vikas Publishing, 1986.
- Lane-Smith, R., *The Taj Mahal of Agra*, Delhi, Stonehenge Publishing, 1999.
- Lear, E., ed. R. Murphy, *Indian Journal*, London, Jerrold's, 1953.
- Milton, J., *The English Poems*, Ware, Wordsworth Edition, 2004.
- Mitford, N., *The Sun King*, London, Hamish Hamilton, 1966.
- Moynihan, E. (ed.), *The Moonlight Garden- New Discoveries at the Taj Mahal*, Washington Dc, Smithsonian Institute, 2000.
- *Paradise as a Garden in Persia and Mughal India*, London, Scolar Press, 2004.
- Mukhia, H., *The Mughals of India*, Oxford, Blackwell Publishing, 2004.
- Nath, R., *Art and Architecture of the Taj Mahal*, Agra, The Historical Research Documentation Programme, 1996.
- *The Private Life of the Mughals of India*, Jaipur, Historical Research Documentation Programme, 1994.

- *The Taj Mahal and its Incarnation*, Jaipur, Historical Research Documentation Programme, 1985.
- Oak, P. N., *Taj Mahal The True Story- The Tale of a Temple Vandalized*, Houston, Texas, A. Ghosh, 1969.
- Okada, A., Joshi, M. C. & Nou, J. L., *The Taj Mahal*, New York, Abbeville Press, 1993.
- Pal, P., Leoshko, J., Dye, J. M. & Markel, S., *Romance of the Taj Mahal*, Los Angles & London, Los Angles County Museum of Art and Thames & Hudson, 1989.
- Peck, L., *Delhi, A Thousand Years of Building*, New Delhi, Roli Books, 2005.
- Prawdin, A. J., *The Builders of the Mogul Empire*, London, Allen & Unwin, 1963.
- Qaiser, A. J., *Building Construction in Mughal India*, Delhi, Oxford University Press, 1988.
- Richards, J. D., *The Mughal Empire*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
- Roosevelt, E., *India and the Awakening East*, London, Hutchison, 1954.
- Savory, R. M. (ed.), *Islamic Civilisation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1976.
- Bleeman, W. H., *Rambles and Recollections of an Indian Officials*, vols 1 & 2, New Delhi, Asian Educational Series, 1995.
- Stronge, S., *Painting for the Mughal Emperor- The Art of the Book, 1560-1660*, London, V & A Publications, 2002.
- Tannahill, R., *Sex in History*, London, Hamish Hamilton, 1980.
- Tillotson, G. H. R., *Mughal India*, London, Viking, 1990.
- Victoria & Albert Museum, *The Indian Heritage*, London, Victoria & Albert Museum, 1982.
- Weatherly, M., *The Taj Mahal*, Farmington Hills, MI, Lucent Books, 2003.

Zind, Z., *The Magnificent Moghuls*, Karachi, Oxford University Press, 2002.

### জার্নাল এবং ম্যাগাজিনসমূহ

*The Art Bulletin*

*The Indian Historical Quarterly*

*Islamic Culture*

*Islamic Quarterly*

*The Journal of Imperial and Commonwealth History*

*The Journal of Indian History*

*The Journal of the Pakistan Society*

*The Journal of the Royal Asiatic Society*

*The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*

*Muqarnas*

*National Geographic Traveler*

*Oriental Art*

*South Asian Studies*

### সংবাদপত্র

*Japan Times*

*Observer (London)*

*Sydney Morning Herald*

*The Times (London)*

### অন্যান্য

India History Congress- Proceedings of the Forty-Sixth Session, Guru Nanak Dev University, Amritsar, 1985.

Internet source- Built Heritage of Agra and Fatehpur Sikri, IGNCA, 2002.

## টীকা, টিপ্পনী আৰ তাদেৱ উৎস

ভাৰতবৰ্ষ সমক্ষে ইংৰেজিকে ঘোড়শ আৰ সণ্ডদশ শতকে লিখিত ভাষ্যে যেখানে প্ৰয়োজন অনুভূত হয়েছে সেখানে আমৰা পাঠকদেৱ সুবিধাৰ্থে অক্ষৰ, বানান, বিৱামচিহ্নেৱ ব্যবহাৰেৱ আধুনিকীকৰণ কৰেছি।

মোগল নথিপত্ৰেৱ নিয়লিখিত অমৃত্য উৎসসমূহ যেহেতু বাৰংবাৰ উল্লেখিত হয়েছে, আমৰা নিয়লিখিত উপায়ে তাদেৱ অভিস্বক্ষেপকৰণ কৰেছি :

*IT* আধ্যাত্মিকভাৱে উদ্বীপিত মকবৰা, তাজমহলেৱ সাথে সৱাসৱি সম্পর্কিত সণ্ডদশ শতকেৱ মোগল আৰ ইউরোপীয় উৎসেৱ একটি সংকলন, Z. A. Desai এবং W. E. Begley কৰ্তৃক অনুদিত আৰ সংকলিত।

ED ভাৰতবৰ্ষেৱ ইতিহাস তাৱ নিজস্ব ঐতিহাসিকদেৱ ঘাৱা লিখিত, H. M. Elliot এবং J. Dowson কৰ্তৃক অনুদিত আৰ সংকলিত। সাত খণ্ডেৱ এই অনুবাদে মোগল সময়কালেৱ প্ৰধান দিনপঞ্জি আৰ ইতিহাস থেকে বাছাই কৱা অংশেৱ অনুবাদ সংকলিত কৱা হয়েছে।

মুসলিম আৰ পচিমা দিনপঞ্জিৰ মাঝে এবং শেষোক্ততে পৱনবৰ্তী সমষ্টয় অনুবাদে বিভাস্তিৱ সৃষ্টি কৱে বলে, আমৰা আমাদেৱ এই টীকাগুলোতে শাহজাহান আৰ মমতাজেৱ জন্ম, মৃত্যু আৰ বিয়েৱ মতো প্ৰধান দিবসগুলো মুসলিম দিনপঞ্জি মতে সংযোজনেৱ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

### প্রারম্ভিক

- ১৫ : 'যখন...নিঃস্ব কৱে ফেলেন' : Qazwini, *IT*, পৃষ্ঠা. ১৫।
- ১৫ : 'তাৱ চোখ...মুক্তাবিন্দু হয়ে ঘৱে পড়ে' : প্ৰাণকৃত, পৃষ্ঠা. ১৩।
- ১৬ : 'বিশ্বেৱ বিশ্বয়েৱ...মিশ্ৰেৱ পিৱামিডেৱ...হওয়াৱ দাবিদার' : F. Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, p.299.
- ১৬ : 'তাজমহলেৱ...বয়ে আলে' : Kalim, *IT*, p.84.

- ১৬ : 'কালের কপোলে একটি অঞ্চলিন্দু' : R. Tagore, quoeted Internet source Built Heritage of Agra and Fatehpur Sikri.
- ১৬ : 'গজদত্তের তোরণ...পথের উপলক্ষ্মি...মৃত্যু প্রকাশ' : R. Kipling, *From Sea to Sea 1887*, quoeted D. Carroll, *The Taj Mahal*, p.156.
- ১৬ : 'এই অপূর্ব ঘনোরম...যারা করেননি' : E. Lear, *Indian Journal*, 16 February 1874, p.78.
- ১৬ : 'আমি তোমায়...নির্বাণ করা হবে' : W. H. Sleeman, *Rambles and Recollections of an Indian Official*, vol. 1, p.382.
- ১৭ : 'তাজমহলকে...দর্শন করতে আসেন' : T. Daniell, quoeted P. Pal et al. *Romance of the Taj Mahal*, p.199.
- ১৮ : 'অত্যধিক শ্রম...নুড়িপাথরে' : P. Mundy, *Travels in Europe and Asia*, vol. 2, p.213.

পঞ্চম অধ্যায় : মুঝ সম্মোহনের দেশ

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত সমস্ত উক্তি যে ক্ষেত্রে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি তার সবই বাবরের স্মৃতিকথা, বাবরনামা থেকে নেয়া হয়েছে। আমরা Wheeler Thackston এবং Annette Beveridge দুজনের অনুবাদেরই সাহায্য নিয়েছি। দুটো অনুবাদই চমৎকার।

- ২৭ : 'ইশ্বরের চাবুক' : C. Marlow, *Tamburlaine the Great*, pt. 2, line 4641.
- ২৭ : 'ফলের বৃক্ষের...উচ্চ মঞ্চ' : R. G. de Clavijo, *Embassy to the Court of Timur at Samarcand*, p.131.
- ২৮ : 'চারলিপি...হাতের কাজ' : Haider, *Tarikh-i- Rashidi*, (translated by E. Dennison Ross as *A History of the Moguls of Central Asia*), pp. 3-4.
- ৩১ : 'দীপ্তিহীন মোমের আলো' : quoted E. Moynihan, *Paradise as a Garden in Persia and Mughal India*, p. 72.
- ৩১ : 'মৃত শবদেহের...দৃষ্টি করে তোলে' : quoted B. Gascoigne, *The Great oghuls*, p.11.
- ৩১ : 'পরবর্তী দুই মাস আকাশে...যায়নি' : ibid., p. 13.
- ৩১ : 'এত বিপুল সংখ্যা...তাদের স্থান...বাস করত' : R. G. de Clavigo, op.cit., p. 171.
- ৩৪ : 'বাবর সেবার যদিও...(হমায়নের) ভেতর জুরের আকস্মিক হ্রাস ঘটে' : all quotes in this paragraph are from Abul Fazal, *Akbarnama*, vol.1, p. 276.
- ৩৫ : 'তোমার ভাইদের...তাদের প্রাপ্যও হয়' : ibid., p. 277.
- ৩৫ : 'বাইশ বছর বয়সী হমায়ন...কেটে ফেলতে বলেন।' : all quotes in this paragraph are from A. Early, *The Mughal Throne*, p. 42.
- ৩৬ : 'যাত্রাতিরিক্ত' : ibid.
- ৩৭ : হমায়ন পালিয়ে...১৫৮১ সালের ২১ আগস্ট। : all quotes in these two paragraphs are from Gulbadan, *Humayan-Nama*, pp. 144, 146 & 151.

- ৩৯ : 'শীতের তীব্রতায়...মাংস সিদ্ধ করে' : Gulbadan, op. cit., p. 167.
- ৩৯ : 'চার শুগের বেশি ছিল' : Abul Fazal, Akbarnama, vol.1, p. 439.
- ৪০ : 'রাজত্ব আর রাজ্য পরিচালনার...স্ত্রাটের শক্তি' : Gulbadan, op. cit., pp. 200-1.
- ৪০ : 'আমার নিজের দুষ্কর্মের...যা কিছু ঘটেছে' : Badauni, quoted A. Early, op. cit., p. 111.
- ৪১ : 'তার সম্মানিত...রক্ত নির্গত হয়...আমার ডাক এসেছে' : Abul Fazal, Akbarnama, vol.1, p. 657.

**বিভীষণ অধ্যায় : আল্লাহু আকবর**

এই অধ্যায়ে যেখানে কোনো উদ্ধৃতির জন্য কোনো উৎস উল্লেখ করা হয়নি সে ক্ষেত্রে সেগুলো আকবরের জীবনের সংপ্রিষ্ঠ সময়ের জন্য আবুল ফজলের আকবর-নামা থেকে গৃহীত হয়েছে বা তার রচিত আইন-ই-আকবরী থেকে গৃহীত হয়েছে, যেখানে তিনি আকবর কীভাবে তার সাম্রাজ্য শাসন করতেন সে সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, সেইসাথে তার দৈনন্দিন জীবনের কার্যবিবরণীর একটি সমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন।

- ৪৬ : 'শেছায় এবং আত্মপ্রশংসন...উপায় ছিল না' : quoted A. Early, op. cit., p. 139.
- ৪৯ : 'দেখতে অনেকটা কবুতরের বাসার মতো' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 73.
- ৫২ : 'আগুন, পানি, পাথর...ভজি করতে' : Badauni, *Muntakhab al-Tawarikh*, ED, vol. 5, p. 529.
- ৫২ : 'গভীর শুকার সাথে...নিজের মাথায়...ইঙ্গিতবহু' : P. du Jarric, *Akbar and the Jesuits*, p. 19.
- : E. Koch's article 'The Taj Mahal : Architecture, Symbolism and Urban Significance', vol. 22, *Muqarnas*, 2005, pp. 128-49, discusses the use of red and white coloured sandstone and the Hindu tradition.
- ৫৫ : 'পাথর খোদাইয়ের...পিছপা হতেন না' : A. Monserate, *Commentary*, pp. 200-1.
- ৫৬ : '(তারা) দুটো বিশাল বড়...অনেক বেশি' : R. Fitch from his account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, pp. 17-18.
- ৫৭ : 'যার রাজকীয় মহিমার...দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন' : A. Monserate, *Commentary*, op. cit., pp. 196-7.
- ৫৯ : 'অশিক্ষিত'...একেবারেই অশিক্ষিত' : Memoirs of Jahangir, ED, vol. 6, p. 290.
- ৫৯ : 'বিদেশিদের প্রতি দারুণ প্রসন্ন' : P. du Jarric, op. cit., p. 9.
- ৬০ : 'অন্য কোনো মেয়ে ন্যূন্যতা...পথা অনুযায়ী...কঠোরভাবে অনিচ্ছুক' : Ferishta, *History of Hindustan*, vol. 3, p. 21.
- : Shah Jahan ( Khurram ) was born on 30 Rabi II 1000 in the Muslim calendar.

: Mumtaz Mahal (Arjumand Banu) was born on 19 Rajab 1001 in the Muslim calendar.

৬৩ : 'আসল সন্তান' : *Jahangirnama*, translated by W. M. Thackston, p. 30.

৬৪ : 'দো-চোয়ানি অ্যালকোহলের বিশ্টা ছোট শিশি' : ibid., pp. 184-5.

৬৪ : 'কোনোভাবেই আমার বহু নন' : *Memoirs of Jahangir*, ED, vol. 6, p. 3.

৬৭ : 'যদি তিনি এই রাজবৈরী...হত্যা করতে পারে' : *Tuzuk-i-Jahangiri* (*Memoirs of Jahangir*), translated by A. Rogers and edited by H. Beveridge, vol. 1, p. 25.

৬৮ : 'শাহ বাবার (আকবর) দেহে...সরাতে পারবে না' : quoted M. Weatherly, *The Taj Mahal*, p. 25.

৬৯ : 'পৃথিবীর অধিষ্ঠর...নিয়ন্ত্রণ করা' : *Tuzuk-i-Jahangiri* (*Memoirs of Jahangir*), translated by A. Rogers and edited by H. Beveridge, vol. 1, p. 3.

তৃতীয় অধ্যায় : অতুলনীয় মৌতি আৱ চিঞ্চারী উপচার

এ অধ্যায়ে যেখানে কোনো উৎস উল্লেখ করা হয়নি সেখানে উক্তিগুলো জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে নেয়া হয়েছে। (the translation in *IT*, ED, A. Rogers and W. Thackston).

৭৩ : 'রক্তপাতের মাঝে খুব বেশি পুলক' : Sir Thomas Roe, *Embassy to India*, p. 104.

৭৭ : 'যিনি প্রায়ই পৃথিবীটাকে...ছোট স্লে মনে করতেন' : William Finch's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 186.

৭৭ : 'তাজমহলের মাঝে এর অন্ত সৌন্দর্য আরো উৎকৃষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়' : F. Bernier, op. cit., p. 293.

৭৭ : 'খুরামের...প্রতিযোগিতা আরম্ভ হতো' : the quotes in this paragraph come from William Hawkin's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 118.

৭৮ : 'খেয়ালি প্রকৃতির মেলা' : F. Bernier, op. cit., p. 272.

৭৮ : 'কৌমার্যের...নিষ্কলঙ্ক বংশানুক্রম...নিষ্পাপ চরিত্রে'র : Qazwini, one of Shah Jahan's official court historians, *IT*, p. 2.

৮০ : 'উরকোচ গ্রহণের...আপসহীন' : Muhammad Hadi, *Tatimma-i Wakiat-i Jahangiri*, ED, vol. 6, p. 397.

৮১ : 'কোনো প্রকার মনোযোগ...দীর্ঘসময় অবস্থান করেন' : ibid., p. 398.

৮১ : 'তার উপস্থিতি সন্তানের...অভর্তুক করে নেন' : Mutamid Khan, *Iqbalnama-i Jahangiri*, ED, vol. 6, p. 406.

৮১ : 'তার সৌভাগ্যের তারকা...সুন্তি থেকে জেগে উঠবার মতো...আরম্ভ করে' : Muhammad Hadi, *Tatimma-i Wakiat-i Jahangiri*, ED, vol. 6, p. 398.

৮৩ : 'এবং বড়, উজ্জ্বল সব মূল্যবান অলংকার...মুঝ বিশ্ময়ে তাকিয়ে থাকে' : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 378-9.

: Shah Jahan (Khurram) and Mumtaz Mahal (Arjumand Banu) married on 9 Rabi I 1021 in the Muslim calendar.\

৮৩ : পরবর্তী... ১৬১২ সালের ১০ মে... উৎসব উদ্যাপিত হয়' : all quotes in these four paragraphs are from Saha jahan's official court historians Qazwini and Lahori, *IT*, except for 'আমি খুররমের মহলে যাই... আমির ওমরাহদের সম্মানসূচক আলখান্দা থেনান করে', which from the Memoirs of Jahangir translated by W. M. Thackston.

৮৫ : 'রতিক্রিয়া সম্পর্কিত অনুসন্ধান... অনেক বেশি অগ্রসর ছিল' : R. Tannahill, *Sex in History*, p. 245.

৮৬ : 'রাজবংশের রত্ন প্রসবিনী আকর' : Inayat Khan, *Shah Jahan Nama*, edited W. E. Begley and Z. A. Desai, p. 71.

৮৬ : খুররমের দিনপঞ্জির রচয়িতারা... আকাতকা পোষণ করত' : quotes in this paragraph are from Qazwini, one of Shah Jahan's official court historians, *IT*, pp. 5-6.

৮৬ : শুমারির অভীত জনবহৃত্ত' : William Finch's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 182.

৮৬ : মোগল রাজধানীতে... শব্দ সৃষ্টি করত : quotes in this paragraph come from P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 173.

৮৮ : 'সব লোকের হৃদয় জয়... নিষ্পত্তিনের ক্ষত মুছে দেয়া' : Asad Beg's account given in ED, vol. 6, p. 3.

৮৮ : 'পুরো দড়িটার দৈর্ঘ্য বরবির সোনার গিণ্ঠি... ন্যায়বিচার করবেন' : William Hawkin's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 113.

৮৮ : 'স্ম্যাটের ঠিক সামনেই... পালন করতে প্রস্তুত' : ibid., p. 115.

৮৯ : 'তার রাজত্বে এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রে... জবাবদিহিতা আর বিবেচনার অর্ণগত' : P. della Valle, *Travels in India*, vol. 1, p. 30.

৮৯ : 'তার নিজের উত্তীর্ণ' : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 270.

৮৯ : 'আলোকিত পথ পরিত্যাগ... অঙ্ককারাচন্দ্র জীবনে ফিরে যায়' : quoted B. Gascoigne, op. cit., p 115.

৯০ : 'চওড়ার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা ছিল' : J. de Laet, *The Empire of the Great Mogol*, p. 37.

৯০ : 'এই কীর্তির্মান রমণীর (মমতাজকে) ... করতেন না...' : Inayat Khan, op. cit., p. 71.

৯০ : 'কামোদীপক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা... বেপরোয়া আমোদ-প্রমোদ' : F. Pelsaert, *Jahangir's India, Remonstrantic*, p.64.

৯০ : ‘পুরুষাদের আকৃতির যেকোনো কিছু...বিষমধারে পরিণত করা হতো’ : Thomas Coryat’s account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, pp. 278-9.

৯১ : ‘কুমারী রমণীদের...চতুর আর নিবেদিতপ্রাণ লেখক’ : Abul Fazal, *Ain-i-Akbari*, vol. 1, pp. 44-5

৯২ : ‘হাতির পদদলিত করার সাজা’ : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 191.

: Richard Burton’s observation is quoted in R. Tannahill, op. cit., p. 249.

৯৩ : ‘অভিজাত লোকেরা...খোজাদের বিশ্বাস...সম্পত্তি পাহারা দেয়াটা...’ : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 164.

৯৩ : ‘এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ অধিগম্য সুখ’ : N. Manucci, *Storia do Mogol*, vol. 2, p. 73.

৯৩ : ‘আলোচ্য রমণীর সামাজিক মর্যাদা...কিছুর তোয়াক্তা না করে’ : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 328.

৯৩ : ‘এইসব বেবুনের হাত আর মুখ একই সাথে...আদিরসাত্তুক গঞ্জের দারণ ভক্ত’ : ibid., p. 74.

৯৪ : ‘আমার পা পর্যন্ত বিশাল একটি...আমি একজন অঙ্গ লোক’ : F. Bernier, op. cit., p. 267.

৯৪ : (তার স্বামীর) হারেমের আটজন রমণীর গর্ভপাত ঘটিয়েছিল...সন্তানকে বেঁচে থাকতে দেবে না’ : J. -B. Tavernier, *Travels in Inian*, vol. 1, p. 313.

৯৪ : ‘তিনি চারপাশে প্রচুর ব্যয়বহুল ইমারত নির্মাণ করেছেন—সরাইখানা বা বণিক এবং পর্যটকদের জন্য বিশ্রামের স্থান এবং এমন সব প্রমোদ-উদ্যান আর প্রাসাদ যেমনটা পূর্বে কখনো নির্মিত হয়নি’ : F. Pelsaert, *Jahangir’s India*, p. 50.

৯৫ : ‘তিনি কখনো রাজকীয় কামরা...বিদেশে যেখানেই অবস্থান করেন’ : Inayat Khan, op. cit., p. 71.

### চতুর্থ অধ্যায় : চম্পতি যুবরাজ

এই অধ্যায়ে যেখানে কোনো উৎস উল্লেখ করা হয়নি সেখানে উদ্ভৃতিগুলো জাহাঙ্গীরের শৃঙ্খিকথা থেকে নেয়া হয়েছে (the translation in IT, ED, A. Rogers and W. Thackston).

১৮ : মহলে যখন কোনো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে আয়োজন করা হয় : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 320.

১০০ : ‘নড়োমওলের মতো জগত্তাল করতে থাকা হীরক খণ্ড আর বিশালাকৃতি মুক্তার কারুকাজ করা রূপালি কাপড়ের আলবাট্টা’ : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 282.

১০০ : খুরমের উদীয়মান...নিঃসন্দেহে একটি বিচক্ষণ উপহার : all quotes in these five paragraphs are from Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 119, 172, 177, 282, 283 and 324, with the exception of ‘, which is quoted in B. Gascoigne, op. cit., p. 154.

১০৩ : প্রাচ্যের এইসব যুদ্ধ প্রায়ই অবিশ্বাস্য সংখ্যক মানুষের ভেতরে যুদ্ধ শুরু করে : Edward Terry’s account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 315.

১০৩ : অর্শের কারণে তখনো...বিশ সঙ্গাহ যাবত : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 385-6.

১০৪ : ‘রাজনৈতিক বিবেচনায়...সন্তুষ্ট ছিল’ : Lahori, IT, p. 22.

১০৫ : ‘মঙ্গলময় মুহূর্তে যেহেতু...কখনো রাখেননি’ : Inayat Khan, op. cit., p. 8.

১০৭ : ‘তারা <মনে হয়> সন্তান জন্মেয়ার সময় অন্যান্য নথির মানুষ...পুনরায় যাত্রা শুরু করে’ : J. de Laet, op. cit., p. 81.

১০৯ : ‘একটি তদ্বালুতার কারণে বাধাধাও হতো...মহামান্য স্বার্টকে সমাবিষ্ট করে রাখত’ : Sir Thomas Roe, op. cit., p. 325.

১০৯ : ‘অন্যরা তার মুখে খাবার তুলে দিত’ : W. Hawkin’s account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 116.

১০৯ : ‘এখনে প্রচুর পশির ক্ষেত...ভাঙ্গি (মাদকাসক্ত) বলে’ : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 247.

১০৯ : ‘তিনি যেন একটি বাচ্চা ছেলে ঠিক সেভাবে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন’ : F. Pelsaert, op. cit., p. 53.

১১০ : ‘তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার মর্জি অনুযায়ী তিনি তাকে দিয়ে যা খুশি তা-ই করাতে পারেন’ : Sir Thomas Roe, op. cit., p. 270.

১১০ : ‘খোশমেজাজি আর স্বতাবত ইন্দ্ৰিয়পৱায়ণ’ : Ferishta, op. cit., vol. 3, p. 32.

১১০ : ‘তার প্রাক্তন আর বর্তমান সমর্থকরা বেশ ভালোভাবেই পুরস্কৃত হয়েছে...তার কাছে ঝণী...অনুমোদন লাভ করছে’ : F. Pelsaert, op. cit., p. 50.

১১১ : 'অন্য যেকোনো আরাম-আয়েসের সুবিধা...তার স্বামীর দুর্দশার সঙ্গী হবার' : Thomas Coryat's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 277.

১১২ : 'যুবরাজদের ডেতরে সবচেয়ে সুদর্শন' : *Intikhāb-i Jahangir-Shahi*, ED, vol. 6, p. 450.

১১৩ : 'দুর্বলচিত্ত আর জড়বুদ্ধির' : quoted E. B. Findly, op. cit., p. 49.

১১৪ : 'একজন মহানূভব যুবরাজ,...একজন ধূর্ত প্রিয়পাত্র' : Sir Thomas Roe, op. cit., p.325.

### পঞ্চম অধ্যায় : পর্দাৰ অস্তৱালে অপেক্ষমাখ স্ট্রাট

এ অধ্যায়ে যেখানে কোনো উৎস উল্লেখ করা হয়নি সেখানে উদ্ধৃতিগুলো জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে নেওয়া হয়েছে। (the translation in *IT*, ED, A. Rogers and W. Thackston).

১১৭ : 'এই বৰ্বৱোচিত পরিকল্পনার...শক্ত করে এমনভাবে আটকে দিয়ে যায় যেন তারা কিছুই করেনি' : S. Manrique, *Travels*, p. 301.

১১৮ : 'তার স্বামী নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে রাখেছে...কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বের হয়ে আসে' : Van den Broecke, *A Contemporary Dutch Chronicle*, p. 54.

১১৯ : 'খসরু অস্তিত্বের পিঞ্জর অনস্তিত্বের কারাগারে অস্তৱীণ হন' : Inayat Khan, op. cit., p. 10.

১২০ : 'ভাইয়ের রক্তের মাঝে তিনি নিজের সিংহাসনের ভিত রোপণ করেছেন' : Ferishta, op. cit., p. 56.

১২১ : 'সত্ত্ব ঘটনাটা তারা কেন তাকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে সেটা এবং সেইসাথে... অনুসন্ধান করে দেখেন' : J. de Laet, op. cit., p. 199.

১২২ : 'আদি-অস্তহীন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে' : Inayat Khan, op. cit., p. 10.

১২৩ : 'যাদের সততার মোহরে খাদ...পাঁচ বছর হিন্দুস্তানে জুলতে থাকবে' : Inayat Khan, op. cit., pp. 10-11.

১২৪ : 'স্ট্রাট আৰ তাৰ অমাত্যৱা নিজেদেৱ রমণীদেৱ যত্ন নেন...এতে খুব সামান্য লাভ হয়' : E. Terry's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 329.

১২৫ : 'সহসা অসুস্থায় আকৃষ্ণ হয়' : Muhammad Hadi, *Tatimma-i Wakiat-i Jahangiri*, ED, vol. 6, p. 396.

১২৮-১২৯ : শাহজাহান পরিস্থিতির...অবশ্যই উৎকঠিত হয়েছিলেন : all quotes in these three paragraphs are from Muhammad Hadi, *Tatimma-i Wakiat-i Jahangiri*, ED, vol. 6, pp. 396-7.

### ষষ্ঠ অধ্যায় : থাসাদের আরাধ্য মালকিন

যেখানে কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি সেখানের উদ্ভৃতিগুলো জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে গৃহীত, যা তার ব্যক্তিগত করণিক মুতামিদ খান কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বা তার জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল নিয়ে লিখিত ইতিহাস ইকবলা-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী থেকে গৃহীত হয়েছে। ED, vol. 6 এবং W.M. Thackston আমরা ব্যবহার করেছি।

১৩৫ : ‘তারা সবাই আফিম সেবন করে...ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে...সৎকারের বন্দোবস্ত করে’ : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 411.

১৩৯ : ‘নূর মহলের কাছে অল্লবয়সী মুবরাজরা নিরাপদ নন’ : Shah Jahan's official chronicler Lahori, translated in ED, vol. 7, p. 6.

১৪০ : ‘আশা কিংবা সুযোগ সামান্যই ছিল’ : Van den Broecke, op. cit., p. 90.

১৪২ : ‘আত্মরক্ষণ, মানবিক মানসিকতার অর্থম নীতি...তাদের আত্মা ঘৃণা করে’ : Ferishta, op. cit., p. 103.

১৪৩ : ‘তার স্বামীর মৃতদেহ তার আপন...‘কালো দিয়ে আবৃত একটি শবাধারে’ : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 213.

১৪৩ : ‘দুঃখের সমস্ত/ প্রতীক দিয়ে সাজিয়ে...‘কল্পিত পরলোকগত’’ : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 174.

১৪৩ : ‘নিজেকে উঁচু করে এবং সমবেত বাহিনীর সবার চোখের সামনে আবির্ভূত হন’ : J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 1, p. 271.

১৪৩ : ‘ডানে বামে স্তুপীকৃত মোহর বর্ষিত করে’ : Muhammad Hadi's Appendix, *Jahangirnama* (Memoirs of Jahangir), translated and edited by W. M. Thackston, p. 460.

১৪৩ : ‘চিরনবীন আঘার উঁচু আর নীচু শ্রেণী...শাসককে দেয়া অভ্যর্থনার তুলনা হয় না’ : P. Pal et al., op. cit., p. 28.

১৪৪ : ‘মহামান্য সন্তান্নী...আবেগাপুত হয়ে পড়েন’ : Inayat Khan, op. cit., p. 21.

১৪৫ : ‘নিজের সত্তানদের...গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছে’ : Ferishta, op. cit., p. 104.

১৪৫ : ‘আকাশে মঙ্গলময় এক...এই পৃথিবীর নিয়ামতসমূহ...‘অন্য পৃথিবীর শরণে’ : Inayat Khan, op. cit., p. 23.

১৪৫ : 'বর্তমান শাসকের প্রকৃতি...সেটা নিরাপদাহীন প্রতিপন্থ হবে' : J. de Laet, op. cit., p. 246.

### সপ্তম অধ্যায় : মুঠুর শিংহাসন

১৪৭ : 'উৎসবের সময় এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে' : *Tuzuk-i-Jahangiri*, (Memoirs of Jahangir), translated by A. Rogers and edited by H. Beveridge, vol. 1, p. 9.

১৪৮ : 'ভ্রমণকালীন সঙ্গী...বগুহে সাজ্জনা উৎস' : Kalim, *IT*, p. 34.

১৪৮ : 'আকাশস্পন্দনী' : Lahori, *IT*, p. 137.

১৪৯ : 'ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন বিচক্ষণ, প্রাণবন্ত, উদার আর মার্জিত স্বভাবের' : Ferishta, op. cit., p. 105.

১৫০ : "চাচাজান" বলে সাদুর সম্ভাষণ করতে শুরু করে, সবাইকে তার প্রতি ঈর্ষাঞ্চিত করে তোলে" : Inayat Khan, op. cit., p. 21.

১৫১ : 'মহামান্য স্মাটের পায়ের...মূল্যবান রত্ন, রত্নবচিতি...চমৎকার সব উপহার দিতেন' : *Tuzuk-i-Jahangiri*, (Memoirs of Jahangir), translated by A. Rogers and edited by H. Beveridge, vol. 1, p. 26.

১৫১ : 'রাজত্বের শেষার্ধে, প্রিয় সুলতানার (নুর), জৌলুশময় প্রদর্শনী শাহজাহানের দ্বারা প্রদর্শিত মহিমার বিশালতার কাছে হারিয়ে যায়' : Ferishta, op. cit., p. 103.

১৫২ : 'চাঁদোয়ার বহিরাবরণ ছিল...রত্ন দিয়ে সজ্জিত ছিল' : Lahori, *IT*, pp. 45-6.

১৫২-১৫৩ : 'নীলা আর অন্যান্য রঙিন রত্ন...নাশপাতি-আকৃতির একটি মুক্তা ঝুলছে' : J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 1, p. 304.

১৫৩ : মোগল ঐশ্বর্য আর প্রতাপ...ইরাকের সোনার জরিযুক্ত কাপড় দিয়ে সজ্জিত' : the information and quotes on this paragraph come from P. A. Andrews's article 'The Generous Heart or The Mass of Clouds : The Court Tents of Shah Jahan' in *Mugqarans*, vol. 4, pp. 149-65.

১৫৬ : অগাস্টিনিয়ান ফ্রায়ার...অবশ্য শাহজাহানের 'অতোষণীয় ধনপিসাসা' : the quotes in this paragraph are from S. Manrique, op. cit., pp. 201, 202 & 204.

১৫৬ : 'মঙ্গলময় প্রবর্তক', 'পর্বত বিনাশক', 'সদাসাহসী' : N. Manucci, op. cit., vol. 2, pp. 338-9.

১৫৭ : ‘প্রতিটি হাতিতে দুজনের...মাহতরা প্রাণীগুলোকে স্বাবকতাপূর্ণ শব্দ...‘মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির ন্যায় শেষ বিদায় নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হতো’ : F. Bernier, op. cit., pp. 276-7.

১৫৮ : ‘রাতের আকাশে তখনো তারারা দৃশ্যমান’...‘প্রয়াত সন্ত্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রবর্তিত...‘ভয়ংকর খুনি বুনো হাতির পালের’ : Lahori’s account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 567.

১৫৯ : ‘দেয়ালের মতো’ : quoted M. A. Ansari, *Social Life of the Mughal Emperor*, p. 97.

১৬০ : ‘ভগ্নহৃদয় নিপীড়িত ব্যক্তিদের’ : Lahori’s account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 571.

১৬১ : ‘দক্ষ সচিবরা’ : ibid., p. 570.

১৬২ : ‘হারেমের সচিবের কাছে বহু...সন্ত্রাঙ্গী মুমুতাজ আল-জামানির কাছে রক্ষিত রয়েছে’ : Lahori, *IT*, p. 9.

১৬৩-১৬৪ : ‘মহামান্য সন্ত্রাটের প্রবর্তিত আইন আর প্রবিধানের...যেন অপচয় না হয় বা হারিয়ে না যায়’ : ibid., p. 179.

১৬৫ : পরম কর্মণাময়...সহচর হয়েছেন : S. A. I. Tirmizi, *Mughal Documents*, p. 32.

১৬৬ : ‘তার নিজের স্তুর অঙ্গীয়ায়ের প্রতি এতটা অনুবর্তী নয়’ : *Intikhab-i Jahangir-Shahi*, ED, vol. 6, p. 452.

১৬৭ : ‘সন্ত্রাটের মন-মানসিকতার ওপর নৃজাহান...তাদের শব্দচয়ন সন্ত্রাটের মনে কোনো ছায়ী ছাপ ফেলতে পারবে না’ : ibid.

১৬৮ : তার আচরণের কারণে কবনো...প্রদর্শন করেছে : Kalim, *Padsha Nama*, *IT*, p. 34.

১৬৯ : ‘কতিপয় সৌভাগ্যবান রাজপুরুষ আর তার মুষ্টিমেয় পরীক্ষিত....মমতাজের আবাজান আসক খান ছিলেন।’ : Lahori’s account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 571.

১৭০ : ‘এতটাই চাতুর্যের সাথে যেখানে মসলা মিশ্রিত অবস্থায়...থাকত একটি সিদ্ধ মুরগি।’ : quoted M. Jaffrey, *A Taste of India*, p. 24.

১৭১ : ‘আম যখন ঠিকমতো পাকে সেটা সভ্যিই খেতে উপাদেয়’, ‘অবিশ্বাস্য ধরনের কৃৎসিত আর তারচেয়েও বাজে শব্দ...বাড়াবাঢ়ি ধরনের মিষ্টি শব্দ।’ : *Baburnama*, translated W. M. Thackston, pp. 344-5.

১৬৬ : ‘ফরাসিদের বন্দরে প্রাণ’, ‘আঘায...প্রতি বছর কয়েক হাজার আনারস উৎপন্ন হয়।’

: *Jahangirnama* (Memoirs of Jahangir), translated and edited by W. M. Thackston, p. 24.

১৬৭ : ‘গলিত তৃষ্ণাৰ’ : R. Nath, *Private Life of the Mughal's of India*, p. 70.

১৬৭-১৬৮ : ‘মহামান্য স্ট্রাট—অন্যান্য তুচ্ছ নৃপতিদের মতো ছিলেন না...তার অভিজ্ঞত আদব-কায়দা, বাগ্মীতা, আত্মবিশ্বাস...তারের মুর্চ্ছন্ন বা সুন্দর গান’, : Lahori's account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 572.

১৭০ : ‘মাথার পেছনে...বের হয়ে থাকে’ : quoted H. Mukhia, *The Mughals of India*, p. 148.

১৭০ : ‘ডারী বালা বা মুক্তার কঙ্গি বক্ষনীর কারণে,...কজিতে পেঁচানো থাকত’ , : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 317.

১৭১ : ‘(স্ট্রাট) যিনি মোগল শক্তির কাছে কোনো ধরনের অনীহা প্রদর্শন...সৃষ্টি আর ব্যয়বৃদ্ধি করেছে।’ : John Ovington's account, *India in the Seventeenth Century*, ed. J. P. Guha, p. 83

অষ্টম অধ্যায় : আমার জন্য একটি স্থায়িত্বসৌধ নির্মাণ করবেন

: all quotes in these two paragraphs are from P. Mundy, op. cit., pp. 193-4.

১৭৪ : ‘সেনাবাহিনীর সাথে যদি কোঝাগার থাকে,...নিরাপত্তাবোধও জন্ম নেয়।’ : quoted J. Gommans, *Mughal Warfare*, p. 105.

১৭৫ : ‘বাকি সব হাতির তুলনায় দামি সাজসজ্জায় সজ্জিত’ : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 193.

১৭৫ : ‘এখন পর্যন্ত সবচেয়ে আকর্ষণীয় আর জমকালো ভ্রমণ রীতি,...নিয়মিত বিরতিতে অব্যাহতি দিত।’

: F. Bernier, op. cit., p. 370.

১৭৬ : ‘!! রাজকীয় সৈন্য আর দরবার রাজসিক আর নিয়মিতভাবে অগ্রসর হতো, ....করে সে প্রতিবার ঘটার সংখ্যা ঘোষণা করত।’ : the quotes in this paragraph are from N. Manucci, op. cit., vol. 2, pp. 64-5.

১৭৭ : ‘এক ধরনের সুগন্ধিক্যুক্ত, শক্ত ঘাসের আঁটি...একটি দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা ঘটত।’

: P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 191.

১৭৮ : 'নানা রঙের রেশমের চমৎকার জালি দিয়ে সেটা...আরো দৃষ্টি নবদন করে তোলা হতো।' : F. Bernier, op. cit., pp. 371-2.

১৭৮-১৭৯ : 'খোজারা সেইসাথে পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে সামনে অবস্থান করে...থেকে দেবীদের আড়াল করতে হাতির অবতারণা করেছে, কল্পনার জগতে হারিয়ে গেছেন।' : all quotes in this paragraph are from F. Bernier, op. cit., pp. 372-3.

১৭৯ : 'শিবিরে নামাজ, রোজা রাখার মতো ইবাদতের পাশাপাশি জুয়াখেলা, মাতলামি, পায়ুকাম আর ব্যভিচারও সমানতালে চলত।' : J. Gommans, *Mughal Warfare*, p. 110.

১৮১ : 'রাতের আঁধারে দূর থেকে তাকালে একটি মহিমান্বিত আর চিঞ্চমৎকারী দৃশ্য ডেসে উঠত,....আলোকিত করে তুলেছে...' : F. Bernier, op. cit., p. 361.

১৮১-১৮২ : স্ট্রাট যদিও তার সভাসদবর্গ নিয়ে যুদ্ধক্ষাত্রা করেছেন, শাহজাহান আর...কখনো বা কদাচিত্ত শিকার ধরতে ব্যর্থ হয়।' : the quotes in this paragraph come from F. Pelsaert, op. cit., p. 51.

১৮৩ : 'তার বাহিনীর নেতৃত্বানকারী সেনাপতি....উদ্যোগ ব্যর্থ করতে চেষ্টা করত।' : A. Eraly, op. cit., p. 31.

১৮৪ : দুর্গশূলো শক্তিশালী, সৈন্য শিবিরের মনোভাব কঠোর : Ferishta, op. cit., p. 127.

১৮৫ : 'মানুষ এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, ...'বিষাদাক্রান্ত দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল।' : letters from English merchants named Rastell and Bickford, quoted P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 341.

১৮৬ : 'যারা তাদের সন্তানকে নিতে আগ্রহী... নিজের সন্তানকে তারা দেখতে পাবে না।' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 42.

১৮৫ : শাহজাহান পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করেন, যা ইতিমধ্যেই বুরহানপুরের....থেকে আলাদা হিসেবে দেখা হয়।' : the quotes in this paragraph come from Lahori, ED, vol. 7, pp. 24-5.

১৮৬-১৮৭ : 'আজ বিদ্যায়ের বেলা সমাগত;....বিছেদের সময় সমাগত।' disputed nineteenth century Persian manuscript given in R. Nath, *The Taj Mahal and Its Incarnation (Original Persian Data)*, pp. 5-6.

১৮৭ : 'সবুজ উদ্যানবেষ্টিত একটি সুন্দর প্রাসাদ দেখেছেন,... কোনো খুঁজে পাওয়া যাবে না' : another disputed nineteenth century manuscript, ibid., p. 6.

১৮৭ : : শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিক সাদামাটা কিন্তু মর্মস্পষ্টী কাহিনী লিপিবদ্ধ... 'ঘড়িতে বর্খন সেই কাল রাত্রির আরো তিন ঘণ্টা বাকি রয়েছে ধ্বনিত হয়....: all this in this paragraph come from the account of Shah Jahan's chronicler Salih, IT, p. 25.

: Mumtaz Mahal died on 17 Zil-Qada 1040 in the Muslim calendar.

### নবম অধ্যায় : যত্নশার মেরুকলা

১৮৯-১৯০ : মহতাজের আকস্মিক মৃত্যু শাহজাহানকে মানসিকভাবে একেবারে বিফর্স্ট করে... 'সৌভাগ্যের সমুদ্রের খিলুক, যিনি বছরের বেশির ভাগ সময়েই গর্ভবতী থাকতেন; যাতে করে... পৃথিবীর দায়িত্ব গ্রহণ করতাম' : which is Lahori, IT, p. 22, all quotes in these two paragraphs are Qazwini, IT, pp. 11-14.

১৯০ : 'মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ আন্তর্বিত্তি আলোকিত করা রত্নপাথর' : Lahori, IT, p. 20.

১৯০ : 'তোরের প্রথম আলোর মতো ধূসর সাদা লেবাস' : Qazwini, IT, p. 12.

১৯০ : ক্রমাগত ঝরতে থাকা অঙ্গ... সাদা হল শোকের রং : Kalim quoted H. Mukhia, op. cit., p. 149.

১৯০ : 'সমস্ত ভাগ্যবান যুবরাজ,... সাত্রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়' - : Qazwini, IT, p. 12.

১৯০ : 'সব ধরনের আমোদ-প্রমোদ আর মনোরঞ্জন, বিশেষ করে সংগীত আর বাদ্যযন্ত্র' : Lahori, IT, p. 20.

১৯০ : 'অনিছাসেন্দ্রেও ক্রমাগতভাবে শোক, দৃঢ়খ আর বিপর্যয়ের লক্ষণ আবিভূত হতে থাকে' : Qazwini, IT, p. 13.

১৯০ : যখন 'সর্বদা অঞ্চসজল থাকার কারণে তিনি চমশা পরিধানে বাধ্য হন' : Inayat Khan, op. cit., p. 70.

১৯১ : 'তার মাসলিক শুন্ধমাজিতে... দ্রুত সাদা হয়েছে' : Qazwini, IT, p. 13.

১৯১ : ‘অরোরে দীপ্তিময় মুক্তার মতো অক্ষবিন্দু বর্ষণ করেন।’ : Salih, *IT*, p. 26.

১৯১ : ‘সেদিন থেকে, রাজকীয় অধ্যাদেশে মহান সিলমোহর সংযুক্ত করার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়।’ : Inayat Khan, op. cit., p. 74.

১৯২ : পৃথিবী তার বাসিন্দাদের চেথে...শোকের নীল রঙে রঞ্জিত করে। : Qudsi, *IT*, p. 46.

১৯২ : ‘সময়ের রানি’র....‘একটি উজ্জ্বল সমাধিসৌধ’ : Salih, *IT*, p. 43.

: Although the Moghul chroniclers formally referred to the Taj as the *rauza-i-munavvara* or ‘Illumined Tomb’, Peter Mundy and other contemporary travellers wrote of the ‘Taj (sic) Mahal’.

১৯৩ : কতিপয় ঐতিহাসিক সাম্প্রতিক সময়ে মমতাজ মহলের প্রতি শাহজাহানের...আধ্যাত্মিক উপযুক্তা ধেকেই এমন প্রবল ভালোবাসা আর প্রীতি এবং সীমাহীন অনুরাগ আর ঘনিষ্ঠতার জন্য হয়েছিল।’ : all quotes in this paragraph are Qazwini, *IT*, pp. 13-14.

১৯৪ : ‘পরাক্রমশালী দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল যা ভীরুকে রক্ষা করবে, বিদ্রোহীদের ভীত করে তুলবে এবং অনুগতকে প্রীত করবে...প্রকাও মিনারও নির্মিত হয়েছিল...এবং যা মর্যাদার জন্য উপকারী, যা পার্থিব ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয়।’ : quoted G. H. R. Tillotson, *Mughal India*, p. 20.

১৯৪ : “...এইসব প্রমাণ আকৃতির আর চমৎকার ভবনসমূহের...ঐশ্বর্যের কথা নির্বাক বাণিজ্য খলে (যাবে)।” : Lahori, *IT*, p. 10.

১৯৪ : ‘আকাশস্পন্দনী আকাঙ্ক্ষায় সিঙ্গ একটি স্মৃতিসৌধ।’ : Lahori, *IT*, p. 43.  
(See also E. Koch’s article ‘The Taj Mahal : Architecture, Symbolism and Urban Significance’, vol. 22, *Mughrans*, 2005, pp. 128-49.)

২০১ : ‘জেরোনিমো ডেরোনিও নামে ভেনিসের এক জহুরি,...শহরেই মৃত্যুবরণ করেন।’ : S. Manrique, op. cit., p. 173.

২০৪ : ‘একটি মকবরা, যা হবে অনন্য আর অসাধারণ সুন্দর পৃথিবীতে যার তুলনা নেই, যা স্মাটের মহীরতের উপযুক্ত।’ : R. Nath, *The Taj Mahal and Its Incarnation*, p. 6.

২০৪ : ‘রাজকীয় মন্তিষ্ঠ, যা সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান,...পরিবর্তন আর পরিবর্ধন করেছেন।’ : Lahori’s account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 570.

২০৫ : 'তার প্রয়াত সন্তানীর শোকাবহ মৃত্যুর'...অন্মেই 'মহামান্য সন্তানের মন বিশ্রদ' : Inayat Khan, op. cit., p. 82.

২০৫ : 'আমাদের চোখ যত দূর...দৃশ্যটাকে একটি কেতাদুরস্ত মাঝা দান করেছে।' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 192.

২০৫ : 'রাজকীয় বাজারসরকার প্রয়াত সন্তানীর সমাধিস্থলের চারপাশের উদ্যানে আড়ম্বরপূর্ণ বসার আয়োজন করে,...'মহামান্য সন্তান মানুষের বিশাল ভিড় এড়াতে নিজের ব্যক্তিগত মহলে ফিরে যান।' : ibid., p. 84.

দশম অধ্যায় : নির্মাণ এই পৃথিবীর অধিবাসী নয়

E. Koch's article 'The Taj Mahal : Architecture, Symbolism and Urban Significance', vol. 22, *Muqarnas*, 2005, pp. 128-49, provides much detailed and valuable information on the architectural theories behind the Taj Mahal and related matters.

২০৮ : 'বেহেশতের পরিত্র বাসস্থানের অতিনিধিত্ব করতে...বেহেশতের উদ্যানের একটি দৃষ্টিকল্প জন্ম দেয়ার জন্মের নির্মিত' : Lahori, *IT*, p. 66.

২০৯ : "‘অস্থিবিষ্টি’ বলা হতো, স্থানাদির আটটি মহল থাকায় আমাদের ভাষায় যা আটটি অংশের নিদর্শন বর্ণনা করে।" : quoted R. A. Jairazbhoy, 'The Taj Mahal in the Context of the East and West', *Journal of the Warburg and Court auld Institutes*, vol. 24, 1961, p. 75. This article also contains other examples of the use of the nine-fold plan.

২১০ : নির্মাণকাজ শেষ হবার পরে 'স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত' আর 'পেয়ারা আকৃতি বিশিষ্ট'- : Lahori, *IT*, p. 66.

২১১ : 'বেহেশতের দিকে উঠে যাওয়া সৌপানসারি' : ibid., p. 67.

২১১ : 'একজন ধর্মিক ব্যক্তির আকাশের পানে উঠিত করুল হওয়া মোনাজাত।'

: Salih, *IT*, p. 79.

: The author who has suggested that the sight lines relate to the Shah Jahan's height is R. Lane-Smith.

: H. I. S. Kanwar discusses the significance of the 58-foot diameter of the central chamber in 'Harmonious Proportions of the Taj Mahal', *Islamic Culture*, vol. 49, 1975, pp. 1-17.

: A. J. Qaisar's *Building Construction in Mughal India* gives much useful information on Moghul building practices.

২১৫-২১৬ : নির্মাণের মূল ভার বহনের জন্য শ্রমিকরা...নির্মাণের মূল ভার বহনের জন্য শ্রমিকরা : all quotes in these three paragraphs come from Lahori, *IT*, pp. 65-6.

২১৭ : 'আমরা এই মর্মে আদেশ দিচ্ছি যে,...এই আদেশ পালন থেকে একচুলও বিচ্যুত হবে না' : imperial order quoted, *IT*, p. 163.

২১৭ : 'ইমারতটা...বিপুলসংখ্যক শ্রমিক...মামুলি পাথর হিসেবে বিবেচনা করে নির্মিত হচ্ছে' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 213.

২১৭ : 'পাথরের এই টুকরোগুলোর...কোনোমতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' : S. Manrique, op. cit., p. 172.

২১৮ : দুধের মাঝে নিঃশেষে...কৰ্ত্তৃনো কোথায় দেখেনি : Kalim, *IT*, p. 84.

২১৯ : 'সূর্যের মতো উজ্জ্বল' শর্ণের তৈরি পঞ্জের কারুকাজ স্থাপন করেছিলেন।  
: Lahori, *IT*, p. 66.

২২০ : 'প্রতিটি পঞ্জি' কীভাবে 'কাশ্মীরের সৌন্দর্যের মতো হৃদয়ঘাষাই।' : quoted S. Stronge, *Painting for the Mughal Emperor*, p. 168.

২২৩ : শান্তিতে এসো সমাগত প্রাণ  
এবং প্রবেশ করো আমার বেঁকুরতে।

: Koranic inscription, *IT*, p. 195.

২২৩ : 'কোরান থেকে নির্বাচিত ঐশ্বরিক অনুগ্রহের আয়তসমূহ...ছাপ আর অসিদ্ধকরণের সীমারেখা টেনে দিয়েছে।'

: Salih, *IT*, p. 79.

২২৪ : 'মকবরার অভ্যন্তর আর বহির্ভূগের সর্বত্র,...প্রতিবিম্বের মতো মনে হয়' : ibid.

২২৫ : 'চারপাশে ইয়াশ্ৰ আৱ ইয়াশ্ৰম পাথরের ছড়াছড়ি...সৃষ্টি আৱ সুন্দৰ কারুকাজা সৃষ্টি কৰা হয়েছে।' : F. Bernier, op. cit. p. 298.

২২৬ : 'বিশাল যোগল সাম্রাজ্য মণিমুক্তা সমঙ্গে আৱ কাৱো শাহজাহানেৰ চেয়ে বৃৎপত্তি ছিল না' : J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 2, p. 101.

২২৭ : শ্রেতপাথৰে তাদেৱ প্ৰণিহিত কৰা পাষাণ পুঞ্চ...

সত্য ফুলেৱ মাত্রা লাভ কৰেছে

: lines from the court poet Kalim, *Padshanama*.

২২৭ : ‘দেখতে এতটাই জীবন্ত মনে হয়...আলাদা আলাদা মুক্তা, পান্না বা পোর্চুরাজ দিয়ে তৈরি প্রতিটি পাতা, প্রতিটি পাপড়ি’ : Madame Blavatsky, quoted P. Pal et al., op. cit., p. 130

২২৮ : ‘বিশ্বয় সৃষ্টিকারী...জাদুকরী’ : Lahori, *IT*, p. 67.

### একাদশ অধ্যায় : এই বেহেশত-ভূল্য উদ্যান

২৩১ : একটি বছ-তোয়া জলের ফলুধারা উপরিত হয়েছে...দিঘিদিক ধেয়ে চলেছে...: J. Milton, *The English Poem*, p. 211.

২৩২ : উভয় (বাগিচা) ঘন শাখাপ্রশাখায় ভরা : The quotes from the Koran comes from S. Crowe et al. *The Gardens of Mughul India*, p. 42.

২৩৫ : ‘মালি যেমন উদ্যানকে গাছ দিয়ে সজ্জিত করে...এভাবেই নেতৃত্বের আর্দশ আবির্ভূত : *The Akbarnama*, vol. 2, pp. 486 & 487.

২৩৬ : যত দিন কানন আর পুষ্প

মেঘ আর বৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক বিবাজিবে : Kalim, *IT*, p. 85.

২৩৭ : ‘যে বৃক্ষ আর দুর্লভ সুগাঙ্কি সতাঞ্চা’ : Salih, *IT*, p. 80.

২৩৮ : ‘ফুলে ফুলে উদ্ধেল’ : F. Bernier, op. cit. p. 296.

২৩৯ : এটা ‘পরিশ্রমসাধ্য আর বেংচো...ঝাড়ের মুক্ত আর গোবর লেগে নোংরা হয়ে থাকায়’ : *The Baburnama*, translated by W. M. Thackston, p. 335.

২৪০ : ‘পৃথিবীর সব নন্দন-কাননের কপালে একটি কালো তিল এবং এখানের প্রতিটি পুল্পবীথির...‘ঘারা পুরোপুরি প্রকাশ করা অসম্ভব’ : Salih, *IT*, p. 80.

### দ্বাদশ অধ্যায় : আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বলিত সমাধি

২৪৩-২৪৪ : সেদিন সঙ্ক্ষ্যাবেলো আকাশের প্রেক্ষাপটে... পর আলোকিত উৎসবে হয় মাতোয়ারা : all quotes in this paragraph come from Kalim, *IT*, pp. 82-4.

২৪৪ : ‘ভাস্তর শুণাবলি আর নৈতিকতা’ : John Ovington’s account, *India in the Seventeenth Century*, ed. J. P. Guha, p. 108.

২৪৪ : ‘বেহেশতের বাগিচায় অবস্থানরত মমতাজের আত্মার শান্তির জন্য’ : Salih, *IT*, p. 77.

২৪৪ : ‘ক্রটিহীন আর ভীষণভাবে উজ্জ্বলিত করে তোলা...ভুক্তি রীতির অনুসরণে প্রাচীরের দুই প্রান্তে ইয়াশব নির্মিত দুটি প্রবেশদ্বার, গিল্ট করা কজা ঘারা সংযোজিত হয়েছে’ : Lahori, *IT*, p. 67.

২৪৫ : ‘মমতাজ মহলের সমাধির জন্য তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন...ওপর  
বিছিয়ে দেয়া হতো।’ : *Tarikh-i Khafi*, ED, vol. 7, p. 484.

২৪৬ : অনন্তের ইঙ্গিতে

বালুকণায় মুখ মুকিয়েছিল

: Qudsi, *IT*, p. 86.

২৪৬ : তৈমুরের সব উত্তরপূরুষের ভেতরে...আজীয় সম্পর্কিত বোনের সাথে  
দারা শুকোহুর : quoted P. Pal, et al., *Romance of the Taj Mahal*, p. 48.

২৪৬ : ‘বিশালাকৃতি সব হাতি,... যার সবই হাউই পূর্ণ।’ : P. Mundy, op. cit.,  
vol. 2, p. 202.

২৪৮ : জাহানারার প্রতি শাহজাহানের...ভীষণভাবে পুড়ে যায়’ : all quotes in  
this paragraph come from Inayat Khan, op. cit., p. 309.

২৪৮ : ‘এই কাপড় রঙানির অনুমতি বশিকদের ছিল না...নৃত্যগীতে অংশ নিতে  
পুরুষদের প্রায় বাধাই করত।’

: J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 2, pp. 46-7.

২৪৮-২৪৯ : নিদারুণ মনঃকট্টের কারণে...সংস্থাসনে আরোহণের ঘটনায়  
তিথিতেও এমন উৎসবের আয়োজন করা হয়নি...’ : all quotes in these two  
paragraphs come from Inayat Khan, op. cit., pp. 309-19.

২৫০ : ‘তিনি (শাহজাহান) তার অসংখ্য আজীয়ের রক্ষে হাত রঞ্জিত করার  
পরে...তিনি তার মৃতা স্তুর গভজাত আপন কন্যাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ  
করেন।’ : original Latin text of J. de Laet, quoted in *IT*, p. 306.

২৫০ : ‘প্রাচীন স্থানের অনুসারে মোগল রাজকন্যারা...বহুবারই তাকে অস্তরঙ্গ  
অবস্থায় দেখা গেছে।’

: P. Mundy, op. cit., vol. 2, pp. 202-3.

২৫০-২৫১ : আগ্রা আর সুরাটে অবস্থানরত ...পান হাসিমুর্খে হতভাগ্য যুবকের  
হাতে তুলে দিয়ে।

: all quotes in these two paragraphs come from F. Bernier, op. cit. pp. 11-13.

২৫২ : বার্নিয়ের গল্প অবশ্য সব ইউরোপীয়রা...মহলের খেদমতে নিয়োজিত  
খোজা আর দায়িত্বশীল রামণীদের গভীর আঙ্গ অর্জন করেছিলাম’ : all quotes  
in this paragraph come from N. Manucci, op. cit., vol. 1, pp. 208-11.

২৫৩ : ‘জাহানারা তার পিতার কাছে যা চাইতেন সেটাই পেতেন’ : N.  
Manucci, op. cit., vol. 1, p. 212.

২৫৩ : ‘হিন্দুস্তানের নেতৃত্বকাতা বিবর্জিত স্থানের অন্যতম।’

: Lahori, ED, vol. 7, p. 50.

২৫৪ : ‘অবিশ্বাসীদের শক্ত হাঁটি’ : ibid. p. 36.

২৫৪ : ‘কামান, য্যাচলক বন্দুক আৱ যুক্তেৱ অন্যান্য অনুষঙ্গ’ : Inayat Khan, op. cit., p. 85.

২৫৪ : ‘বারিজি সম্প্রদায়’ : ibid.

২৫৫ : ‘কতিপয় পর্তুগিজ হার্মান সহসা অভিনিষ্ঠমণে প্ৰবৃত্ত হয়... পৱৰত্তীকালে যাব জন্য তাদেৱ ভৌষণ মূল্য দিতে হয়েছে...’

: N. Manucci, op. cit., p. 170.

২৫৫ : ‘ইসলামেৱ যোক্তাৱা’ : Inayat Khan, op. cit., p. 87.

২৫৫ : ‘বিবাহিত আৱ কুমাৱী নিৰ্বিশেষে,... আনুষ্ঠানিকভাৱে খ্ৰিস্টান ধৰ্ম পৱিত্যাগ কৱতে।’ : F. Bernier, op. cit. p. 177.

২৫৬ : ‘তাদেৱ কুপৰামৰ্শেৱ প্ৰভাৱে’ মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং ‘পাৰ্থিব ঝকমারি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়াৱ সিদ্ধান্ত কৱেন’ : Lahori, *Badshanama*, ED, vol. 7, p. 43.

২৫৬ : ‘অদূৱদশী ইয়াৱদোন্ত আৱ তাদেৱ কুপৰামৰ্শেৱ প্ৰভাৱে’ মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং ‘পাৰ্থিব ঝকমারি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়াৱ সিদ্ধান্ত কৱেন।’ : ibid., p. 69.

২৫৬ : ‘আমি জানি (প্ৰতিপক্ষ) আমায় হত্যাৱ ষড়যজ্ঞ কৱছে...’

: quoted W. Hansed, *The Peacock Throne*, p. 128.

২৫৭ : ‘তাৱ বড়বোন’ বেগমসাহেবোৱ সন্িৰ্বক্ষ অনুৱোধেৱ কাৱণেই’ : Inayat Khan, op. cit., p. 319.

অয়োদশ অধ্যায় : সেই মহিমাময় মসনদ

২৬২ : ‘মহতাজেৱ মৃত্যুকে স্মৰণীয় কৱতে... সমানিত স্থানে আসন গ্ৰহণেৱ আহ্বান জানান’ : all quotes in this paragraph are from S. Manrique, op. cit., pp. 214-18.

২৬৩ : ‘একটি মনোৱম স্থানেৱ জন্য,... যাদেৱ চতুৱযুক্ত বাৱান্দা থেকে নদী দেখা যায়’ : Inayat Khan, ED, vol. 7, p. 85.

২৬৩ : ‘প্ৰায় প্ৰতিটি কক্ষেই দৱজাৱ কাছে বহমান... উষ্ণতা অনুভূত হয় না’ : F. Bernier, op. cit. p. 267.

২৬৪ : ‘সৌভাগ্যবান ইউরোপীয় অভ্যাগতদের ভেতরে যারা...প্রকৃতি ভালোভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছি’ : the quotes in this paragraph are from S. Manrique, op. cit., pp. 197-8.

২৬৬ : ‘এটা সবচেয়ে অলাভজনক একটি বিষয়, যা মুমিনের সম্পদ গ্রাস করে’ : quoted G. H. R. Tillotson, *Mughal India*, p. 22 and J. D. Hoag's, *Islamic Architecture*, p. 10.

: for a discussion of the costs of Shah Jahan's building project and of the Taj Mahal see S. Moosvi, 'Expenditure on Building Under Shah Jahan- A Chapter of Imperial Financial History', *proceedings of the Forty-Sixth Session of the Indian History Congress*, 1985, abd R. Nath, *Art and Architecture of the Taj Mahal*, pp. 16-17

২৬৭-১৬৮ : ‘ডেনিস থেকে আগত পর্যটক মানুষে...করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল’ : the quotes in these two paragraphs are from N. Manucci, op. cit., vol. 1, pp. 187-8.

২৬৮ : ‘তাদের ভাঙ্গামি আর বাতুলতা দিয়ে’ : তার মনোযোগ ভিন্নমুখী করত, যা তিনি ধূতধূত করে বলেছেন, ‘শালিমজহার সকল সীমালজ্ঞন করেছে’ : F. Bernier, op. cit. pp. 273-4.

২৬৮ : কোনো দোকান থেকে এক্সট্রাভালো দ্রব্য নিয়ে এসো।’ : N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 189.

২৬৯ : শাহজাহান তার ইমারত নির্মাণের...নাচগান-পান-হস্তার মাঝে অতিবাহিত করতে পারত’ : the quotes in these two paragraphs are from F. Bernier, op. cit. pp. 6-7.

২৭০ : ‘চাপা স্বভাবের, চতুর, কুশাখরুকি আর নিজের প্রকৃত মনোভাব...প্রচেষ্টা করার সময় পার্থিব মহিমার প্রতি বিরাগ’ : ibid., p. 10.

২৭০ : ‘আস্তা আর ভরসার অযোগ্য’ মনে করেন। ‘হায়! হায়! আমার রাশিচক্র কত দুর্জাগা আর অসুবী এবং অমার্জিত’ : *Adab-i-Alamgiri*, Aurangzeb's letter to Jahanara written in the 1650s, translated by J. Scott, p. 424.

২৭০ : ‘ভালোবাসে না’ : N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 181.

২৭০ : ‘একমাত্র চিঞ্চা’ আবারও বার্নিয়ের ভাষ্য অনুসারে, ‘সে কীভাবে নিজেকে আরো আমোদ-প্রমোদে ঘশতুল রাখতে পারে’....তার হাতের শঙ্কির ওপর আস্থাশীল’ : F. Bernier, op. cit. pp. 10-11.

২৭১ : ‘তার মহান পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী আর বাসস্থান’ : Lahori, ED, vol. 7, pp. 70-1.

২৭১ : ‘বদেশের প্রতি শার্শাবিক টান, ফিরে যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং হিন্দুস্তানের স্মৃতি, লোকজন অপছন্দ করায়...এবং আবহাওয়ার তীব্রতা’ : ibid.

২৭২ : ‘মনোবলের অভাবের কারণে’ : Inayat Khan, ED, vol. 7, p. 90.

২৭২ : ‘এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে এত আয়োজন সন্দেশ দুর্গতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি’...‘সৈন্যবাটিনীকে তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন না’ : *Adab-i-Alamgiri*, Aurangzeb recalled his father's words in a letter to Shah Jahan, translated by J. Scott, pp. 432 & 439.

২৭২-২৭৩ : ‘সেই বছরের ডিসেম্বরে, ...করতে এবার স্পষ্টতই বিশাল আয়োজন শুরু হয়’ : all quotes in this paragraph are from W. M. Thackston's translation given in *The Moonlight Garden*, ed. E. Moynihan, p. 28.

২৭৪ : ‘স্ম্যাটের মহিমাময় মসনদের নিকটে সোনালি একটি চেয়ারে উপবেশনের’ : Inayat Khan, ED, vol. 7, p. 105.

২৭৫-১৭৬ : ১৬৬৫ সালের গোড়ার দিক্কে,...বাইরে যাবার জন্য তিরক্ষার করেন : the quotes in these two paragraphs are from A. Eraly, op. cit., p. 327.

#### চতুর্দশ অধ্যায় : সাপের দাঁতের ছেঁয়েও শানিত

২৭৯ : ‘একজন স্ম্যাট সব সময় বিজয় অর্জনে...একজোট হয়ে উঠবে’ : Abul Fazal quoted A. Eraly, op. cit., p. 327.

২৮০ : মমতাজ যদি জীবিত থাকতেন...অনুভব করার মতো কারণ খুঁজে পাবে : the quotes in this paragraph are from N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 230.

২৮১ : ‘স্ম্যাট কোষ্ঠকাঠিন্য আর মৃত্যুখলির জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন’ : Inayat Khan, op. cit. p. 543.

২৮২ : ‘এমন একপ্রকার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন,...অসহায়ভাবে তা ব্যয় করতে থাকেন।’ : F. Bernier, op. cit. pp. 24-5.

২৮২ : ‘শাহজাহান এখনো একজন তরুণের ন্যায় জীবনকে...অসুস্থতায় সোপন্দ করেছেন’ : N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 231.

২৮২ : ‘সাম্রাজ্যের শাসনভাব সামলাবার অধিকাংশ দায়িত্ব’ দারাকে দিয়েছিল, ...অনুরোধ করেছিলেন’ : Inayat Khan, op. cit. p. 545.

২৮৩ : ‘গোঢ়া আর ভঙ্গ-নামাজি’ বলে অবজ্ঞা করেন, : ibid., p. 220.

২৮৫ : ‘সন্ত্রাট আরোগ্য লাভ করেছেন...’ ‘আমি এই প্রেমপূর্ণ আলেখনে কোনো ধরনের প্রতিবক্ষকতা সহ্য করব না’ : W. Hansen, op. cit., pp. 235-6.

২৮৫ : ‘নিতান্ত অনীহার সাথে বিদায় নেন...নিয়তির বিধান সম্বন্ধে অনবাহিত যে, এটাই তাদের শেষ সাক্ষাৎ বিহুল সন্ত্রাট নিজের অজান্তে ছেলেকে শক্ত করে আলিঙ্গন করেন’ : Inayat Khan, op. cit. p. 550.

২৮৫-২৯৩ : নিকোলোও মানুচি, দারার...সম্ভবত নিহত হয় : all quotes in these eleven paragraphs are from N. Manucci, op. cit., vol. 1, pp. 255-7, 269, 276, 282, 295 and 352.

২৯৩-২৯৪ : দারা আরো একবার পলায়ন করেন...। বার্নিয়ের নিজের জন্য অজুহাত সৃষ্টি করেন : the quotes in this paragraph are from F. Bernier, op. cit. pp. 89-90.

২৯৪ : ‘লজ্জাকর শোভাযাত্রা’ : ibid., p. 98.

২৯৪ : ‘সাত্রাঙ্গের সর্বত্র নিরীশ্বরবাদ আর নাস্তিক্যের বীতির পুনঃপ্রচলন’ : *Adab-i-Alamgiri*, Aurangzeb’s letter to Shah Jahan, translated by J. Scott, pp. 358-9.

২৯৬ : ‘রক্তের জন্য নিজের দাবি প্রয়োগে ব্যর্থতার’ : *Tarikh-i-Khafi Khan*, ED, vol. 7, p. 267.

২৯৭-২৯৮ : শাহজাহানের কার্যক্রম জীবনের...ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না’ : the quotes in this paragraph are from *Adab-i-Alamgiri*, translated by J. Scott, pp. 358-9.

২৯৮ : ‘সমস্ত জেনানাকুল যাদের ডেতরে নতকী আর গায়িকা ও রাঁধুনিরাও ছিল’, : F. Bernier, op. cit. p. 166.

২৯৮ : ‘মহান মোগল সন্ত্রাটের, কৃত্রিম উপায়ে যৌন-কামনাকে উদ্দীপিত করার চেষ্টাই,...তার নিজের মৃত্যুকে ভুরাস্তি করে’ : quoted IT, p. 309.

২৯৯ : ‘সম্মানজনক আর যথাযোগ্য অস্ত্রেষ্টিক্রিয়া’র : Salih, IT, p. 144.

: Shah Jahan died on 26 Rajab 1076 in the Muslim calendar.

### পঞ্চদশ অধ্যায় : তৰ্থ-ই-তাউদের নিপত্নন

৩০২ : ‘তাকে বিদায় জানান এবং তার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান, এমন একটি আচরণ, যা রাজকন্যাকে দ্রুত নিজের অবস্থান বুঝতে সহায়তা করে।’ : N. Manucci, op. cit., vol. 3, p. 276.

৩০৩ : 'সবচেয়ে সাহসী আৱ সবচেয়ে উচ্ছ্বল' : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 227.

৩০৪ : 'অনভিজ্ঞ যুবরাজ সত্তার পথ থেকে বিপর্যগামী হন...ফাঁদে আটকে পড়েন।' : the chronicler is Khafi Khan, translated in ED, vol. 7, p. 301.

৩০৫ : 'যেমনটা তাকে করতে বলা হয়েছিল'... 'গোলাবর্ষণের আওতায় অবস্থান করবে।' : ibid., p. 304.

৩০৬ : 'মদ আৱ রমণীৱ সাহচৰ্যে ভুলিয়ে রাখতে' : quoted W. Hansen, op. cit., p. 465.

৩০৭ : 'নিজেৰ অমাত্যদেৱ সাথে কোনো পৰামৰ্শ না করেই এবং নিজেৰ কোনো সম্পত্তি বা তাৱ পৰিবাৱ কিংবা হারেমেৰ মেয়েদেৱ কথা না ভেবেই' : quoted A. Eraly, op. cit., p. 491.

৩০৮ : 'নিজেৰ সঙ্গনদেৱ কথনো বিশ্বাস কৰবে না,...'একজন রাজাৰ প্ৰতিক্ৰিতি সব সময় উষৱ'।"

: quoted W. Hansen, op. cit., p. 486.

৩০৯ : 'শুৰূ দিকে বখন তাৰামুহলেৱ উদ্যানে বনভোজনেৱ আয়োজন কৰা হতো ... টুকৱো ঝুঁড়ে তোলাটা মোটেই অশ্বাঞ্চিক কিছু ছিল না।'

: Lord Curzon, *Speeches*, vol. 1, p. 223.

৩১০ : 'পৰিব্ৰতি শৃতিৰ উদ্যানে বনভোজনেৱ আয়োজন কৰা দেয়াটা ভণামি হতো।'

: quoted D. Carroll, *The Taj Mahal*, p. 133.

: The question of Lord William Bentinck and the auctioning of the Taj Mahal is discussed in P. Spear, 'Bentinck and the Taj', *The journal of the Royal Asiatic Society*, October 1949, pp. 180-7.

৩১১-৩১০ : লড় কাৰ্জন নিজে...আজও ঝুলন্ত রয়েছে : the quotes in these two paragraphs are from Lord Curzon, op. cit., vol. 4, p. 347, except 'আমাৱ নাম জৰ্জ নাথানিয়েল কাৰ্জন, আমি সবচেয়ে সেৱা ব্যক্তি', ... 'যেকোনো ব্যক্তিৰ মাঝে ভয়ংকৰ পামৱেৱ একটি অনুভূতি সৃষ্টি কৰতে পাৰত' : which come from the *Oxford Book of Political Anecdotes*.

৩১১ : 'মকবৱাটা রক্ষা কৰতে আমাদেৱ কি শহৱটাকে একটি সমাধিস্থোধে পৱিণত কৰতে হবে?' : B. Gautam, *Japan Times*, 11 October, 2004.

৩১২ : 'বেহেশ্তেৱ সমূনত খিলানেৱ নিচে, ... মাথা উঁচু কৱেনি।'

: Kalim, *IT*, p. 82.

ଶୋଭଣ ଅଧ୍ୟାୟ : ନଦୀର ଅପର ତୀରେ ତାର ଆପନ ମକବରା

The theory that the Taj Was a Symbolic representation of the throne of God is contained in W. E. Begley's paper 'The Myth of the Taj Mahal and a new Theory of Its Symbolic Meaning', *The Art Bulletin*, vol. 61, no. 1, ( March 1979), pp. 7-37. E. Koch's article 'The Taj Mahal : Architecture, Symbolism and Urban Significance', vol. 22, *Muqarnas*, 2005, pp. 128-49, is among those advancing the proposition that the placing of the Taj Mahal derives from the practice in Agra riverside gardens.

E. Moynihan କୃତ୍ତିମ ସମ୍ପାଦିତ, *The Moonlight Garden*, ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମହତାବ ବାଗେର ସାମ୍ପତିକ ଧରନକାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ।

The theory that the Taj Mahal was a Hindu temple is advanced in V. S. Godbole's *Taj Mahal and the Great British Conspiracy* and P. N. Oak's *Taj Mahal, The True Story- The Tale of a Temple Vandalsed*. G. H. R. Tillotson in *Oriental Art*, autumn 1986, pp. 266-9, discusses politics and the Taj Mahal.

୩୧୬ : 'ପୁରୋ ଏକଟି ବାଗଚାର ସୁରକ୍ଷାବେ' : *Jahangirnama*, translated in S. Crowe et al. op. cit., p. 192.

୩୧୯ : 'ଶାହଜହାନ ନଦୀର ଅପର ତୀରେ ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ମକବରା...ପରିକଳ୍ପନାଯ ବ୍ୟାଧାତ ଘଟେ' : J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 2, p. 91.

:The underground chambers are discussed by H. I. S. Kanwar, in 'Subterranean Chambers of the Taj Mahal', *Islamic Quarterly*, vol. 48 (July 1974), pp. 159-75.

୩୨୬ : 'ତାଜମହଲେର ଅଳଂକରଣେର ତୁଳନାଯ...କାର୍କକାଜ ଅନେକ ବେଶ ସ୍ଥର୍ଦ୍ଧ ଆର ଆକର୍ଷଣୀୟ' : Aldous Huxley, *Jesting Pilate*, p. 50.

୩୨୭ : 'ପାନିର ଶ୍ଵର'... 'ଭିତ ସ୍ଥାପନେର' : Lahori, *IT*, p. 65.

୩୨୭ : 'ମକବରା ନିର୍ମାଣ ଶୁରୁ ହେଁଛେ...' : P. Mundy, op. cit, vol. 2, p. 213.

ପୁନଃ : ଶେଷକଥାର ଆଡ଼ କଥା

୩୨୯ : 'ତାଜମହଲକେ ବର୍ଣନା...ଧୃତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବେନ' : quoted . Pal et al., op. cit., p. 206.

- ৩২৯ :সৌন্দর্য...মুক্ত করে : W. Shakespeare, *The Rape of Lucretia*, line 29.
- ৩৩০ :‘নির্মাণের মূল...(ঈশ্বরের বড় মেয়ে)’ : Thomas Fuller, *The Holy State and the Profane State*, chapter 7, ‘Of Building’.
- ৩৩১ :‘চিত্তকর্ম...সৌন্দর্যের সেরা অংশ’ : Francis Bacon, Essay No. 43, ‘Of Beauty’.
- ৩৩২ :কোনো স্থাপত্যকীর্তি...সৌন্দর্যের দেহ : Edwin Arnold, quoted on Built Heritage of Agra and Fatehpur Sikri website.

AMARBOI.COM

## চিত্রকর্মের চিত্রভাষ

প্রতিটা অধ্যায়ের সূচনায় দেয়া সাদা-কালো চিত্রকর্মগুলির সবই তাজমহলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, কেবল ১২ পৃষ্ঠার ছবিটি হ্যায়নের মকবরা থেকে নেয়া।

### পাঠ অভ্যন্তর চিত্রসূচি

২২: রেম্ব্রান্ট ডন রিভিন অঙ্কিত শাহজাহানের প্রতিকৃতি, প্যারিসের ইস্টিউট  
নিরল্যান্ডসের ফ্রিটস লুগট সংগ্রহ; ৫৮: বাবরের প্রতিকৃতি, ১৬০৫, Add. Or.  
1039, ইতিয়া অফিস লাইব্রেরী, ব্রিটিশ লাইব্রেরী; ৭৫, ৭৯: ভিট্টোরিয়া  
অ্যালবার্ট মিউজিয়াম/ ভি এও এ ইমেজেস; ৮২: নূর জাহান (?) সুরা পানরত,  
রাজস্থান, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ, লস এ্যাঞ্জেলেস কলেক্ষন মিউজিয়াম অব আর্ট, মি: এও  
মিসেস ডগলাস কর্তৃক দানকৃত (এন্ডু.১.২১৭.৭); ৮৭: টি. ক্রোয়াটের  
ট্রাভেলার ফর দি ইংলিশ ট্রাইটস: প্রিজেন্স ফ্রম দি কোর্ট অব দি গ্রেট মোগলস  
থেকে সংগৃহীত, ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ; ১৮১: এমএস. ১১এ, নং ৪, চেস্টার বিয়েটি  
লাইব্রেরী, ডাবলিন; ২১২: কপিরাইট ডরলিং কিনডারসলে; ২৪৭: ইয়ং লেডী  
বিনিথ এ ট্রি (জাহানারা?), দারা শকোহর অ্যালবাম থেকে নেয়া, ১৬৩৫  
খ্রিস্টাব্দ, Add. Or. 3129 f.34, ইতিয়া অফিস লাইব্রেরী, ব্রিটিশ লাইব্রেরী;  
২৫৮: কপিরাইট বিবলিওথেক ন্যাশনালে, প্যারিস/ দি বিজম্যান আর্ট লাইব্রেরী

### চিত্রসূচি

#### ২৯ এবং ৩০ পৃষ্ঠায়

তাজমহলের দৃশ্য: মাইকেল প্রেসটন; স্ম্যাট বাবর কর্তৃক ঝর্ণার গতিপথ  
পরিবর্তন, অলক্ষণ মহেশ, ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ, স্ম্যাট বাবরের স্মৃতিকথা থেকে  
সংগৃহীত: ব্রিটিশ লাইব্রেরী

## ৬৫ এবং ৬৬ পৃষ্ঠায়

পৃথিবীর শাসক হিসাবে জাহাঙ্গীর, অলক্ষণ বিচ্চির, ১৬১৫-১৮ খ্রিস্টাব্দ, সেন্ট. পিটার্সবার্গ অ্যালবাম: ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট, স্থিতসোনিয়ান ইস্টিউট, ওয়াশিংটন ডি.সি., ক্রয়কৃত, এফ১৯৪২.১৫এ; জাহাঙ্গীর আর খুরমের (শাহজাহান) জন্য নূরজাহানের আয়োজিত বিজয় উৎসব, অ্যালবাম পৃষ্ঠা, ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ: ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট, স্থিতসোনিয়ান ইস্টিউট, ওয়াশিংটন ডি.সি., চার্লস ল্যাঙ্গ ফ্রিয়ারের দান, এফ১৯০৭.২৫৮

## ১৬১ এবং ১৬২ পৃষ্ঠায়

রত্নপ্রেমী শাহজাহান উক্ষীয়ে পরিধানযোগ্য একটা অলক্ষার পর্যবেক্ষণ করছেন, ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ, মৃত শাহজাহানের অ্যালবাম থেকে গৃহীত: লস এ্যাঞ্জেলস কান্ট্রি মিউজিয়াম অব আর্ট, নাসলি আর অ্যালিস হিমানিক সংগ্রহ, মিউজিয়াম কর্তৃত ক্রয়কৃত (এম.৭৮.৯.১৫); মমতাজ মহলের প্রতিকৃতি, সপ্তদশ শতকের মোগল জলরং: ব্যঙ্গিগত সংগ্রহ; সন্ত্রাট হিসাবে অভিষিক্ত হবার পরে সন্তানদের সাথে শাহজাহান পুনরুদ্ধো মিলিত হন, রামদাসের প্রতি উৎসর্গিত, ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ, পাদশাহনামা, পৃথিবীর অধিশ্বরের রোজনামচা: দি রয়্যাল কালেকশন কপিরাইট ২০০৬ কীর্তি ম্যাজেস্টি কুইন দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

## ১৯৫ এবং ১৯৬ পৃষ্ঠায়

দারা তুকোহর বিবাহযাত্রা, বিশানদাসের প্রতি উৎসর্গিত, ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ, পাদশাহনামা, পৃথিবীর অধিশ্বরের রোজনামচা: দি রয়্যাল কালেকশন কপিরাইট ২০০৬ হার ম্যাজেস্টি কুইন দ্বিতীয় এলিজাবেথ; আতশবাজি উপভোগরত রঘণীবৃন্দ, অঙ্গাতনামা মোগল চিত্রকরের চিত্রকর্ম, ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ; শুলিস্তান ইস্পেরিয়াল লাইব্রেরী, তেহরান/ ওয়ার্নার ফোরম্যান আর্কাইভ।

## ২৮৯ এবং ২৯০ পৃষ্ঠায়

আঢ়া দূর্গ নির্মাণ, তুলসীর মিসকিনা কর্তৃক অঙ্কিত, ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ, আকবরনামা থেকে গৃহীত: ভিট্টোরিয়া এও অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ভি এও এ ইমেজেস; হ্যায়নের মকবরা, দিল্লী; ফতেহপুর সিক্রির স্তু; আকবরের মকবরা, সিকান্দ্রা; বুরহানপুর দূর্গ: সবগুলো মাইকেল প্রেস্টন।

৩২১ এবং ৩২২ পৃষ্ঠায়

তাজমহলের দৃশ্য: মাইকেল প্রেসটন; মোগলদের ব্যবহৃত জেড পাথরের  
হাতলযুক্ত ধৰ্মীয়: সোথবি'র চিত্রশালা, লন্ডন; জাহাঙ্গীরের জেড পাথরের তৈরি  
ভূম্রার এবং সঙ্গদশ শতকের নেফরাইট জেড রত্নখচিত লকেট, ১৬১৩-১৪:  
উভয়েই ভিক্টোরিয়া এও অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ভি এও এ ইমেজেস।

AMARBOI.COM